আবুল মাল আবদুল মুহিত

বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব

বাংলাদেশ :
জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব

বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব

আবুল মাল আবদুল মুহিত

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, ফাল্গুন ১৪০৬
ISBN 984-465-219-7

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৬০/এ-১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সারাটি জীবন জ্ঞানের তপস্যা করে গেছেন। আগ্রহী ব্যক্তির জ্ঞানসাধনায় তিনি ছিলেন অতি উত্তম পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা। অনুসন্ধিৎসা জাগাতে এবং জ্ঞানাহরণে উৎসাহ সৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ কারো কথা আমার জানা নেই।

এই বইটির প্রুফ দেখতে গিয়ে বারবার তাঁর কথা মনে হয়েছে। তাঁর বিনয়নম্র মন্তব্যের অভাব সদা অনুভব করেছি। আর মাতৃভাষার প্রতি তাঁর নিবেদনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছি।

সদাপ্রয়াত 'স্যারে'র স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হলো এই গ্রন্থ।

স্নেহধন্য মুহিত

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক গ্রন্থ সংখ্যাবিচারে বিপুল হলেও সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বিশেষ দৃষ্ট হয় না। ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এমনি এক অনুপম ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত— *বাংলাদেশ : ইমার্জেন্স অব এ নেশন*। আমরা লেখককে অনুরোধ করেছিলাম এই গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর করে দেয়ার জন্য। ধীমান গবেষক লেখক এ.এম.এ. মুহিত পরিশ্রমী কাজে কখনোই কুণ্ঠিত নন। ফলে ভাষান্তরের কাজ করতে গিয়ে অধুনা প্রকাশিত বহু দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে নতুন নতুন তথ্যের আলোকে তিনি ইংরেজি গ্রন্থের ভাষ্যে আর সীমাবদ্ধ রইলেন না। ফলস্বরূপ আমরা পেয়ে গেলাম বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের নতুন এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ। এ জন্য লেখকের কাছে আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা এবং পাঠকদের হাতে এমনি গ্রন্থ তুলে দিতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। আশা করি পাঠকমহলে এই গ্রন্থ যোগ্য সমাদর অর্জন করবে।

ঢাকা
জানুয়ারি, ২০০০

মফিদুল হক

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ ১৭

ভূগোল ও আবহাওয়া ১৭

মানবগোষ্ঠী ২০

ভাষা ২২

এলাকা ও ইতিহাস ২৩

অর্থনীতি ৩০

টীকা ও পাঠপঞ্জি। ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের উদ্ভব ৪৮

বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদের অবস্থান ৪৯

বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিকতা ৫১

নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ৫২

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ৫৩

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাকিস্তান দাবি ৫৬

১৯৪৫-৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন ও ভারত বিভাগ ৫৯

শেষ কথা ৬৩

টীকা ও পাঠপঞ্জি ৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের দুটো অংশ কখনোই এক হলো না ৬৭

সূচনায় পাকিস্তান ৬৭

জাতিগঠনের দুরূহ দায়িত্ব ও সঙ্কীর্ণতার জন্ম ৬৮

শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সঙ্কট ৭১

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া ৭২

পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন : ১৯৫৪ ৭৪

গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওপর নতুন আক্রমণ ৭৫

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ৭৮

সামরিক আইন জারি ৮৩

আইউবের ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন ৮৪

রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের প্রভাব ও বাঙালিদের বঞ্চনা ৮৬

সামরিক বাহিনী ও গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ৮৯

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ ১৭
ভূগোল ও আবহাওয়া ১৭
মানবগোষ্ঠী ২০
ভাষা ২২
এলাকা ও ইতিহাস ২৩
অর্থনীতি ৩০
টীকা ও পাঠপঞ্জি। ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
পাকিস্তানের উদ্ভব ৪৮
বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদের অবস্থান ৪৯
বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিকতা ৫১
নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ৫২
হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ৫৩
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাকিস্তান দাবি ৫৬
১৯৪৫-৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন ও ভারত বিভাগ ৫৯
শেষ কথা ৬৩
টীকা ও পাঠপঞ্জি ৬৪

তৃতীয় অধ্যায়
পাকিস্তানের দুটো অংশ কখনোই এক হলো না ৬৭
সূচনায় পাকিস্তান ৬৭
জাতিগঠনের দুরূহ দায়িত্ব ও সঙ্কীর্ণতার জন্ম ৬৮
শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সঙ্কট ৭১
গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া ৭২
পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন : ১৯৫৪ ৭৪
গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওপর নতুন আক্রমণ ৭৫
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ৭৮
সামরিক আইন জারি ৮৩
আইউবের ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন ৮৪
রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের প্রভাব ও বাঙালিদের বঞ্চনা ৮৬
সামরিক বাহিনী ও গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ৮৯

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির পদদলন ৯১
দুই অংশের সম্পর্কের মূল্যায়ন ৯৪
টীকা ও পাঠপঞ্জি ৯৫

চতুর্থ অধ্যায়
পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশ ৯৮
উপক্রমনিকা ৯৮
ভারত বিভাগকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থান ৯৯
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বিভাজন ১০১
পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের প্রক্রিয়া ১০৪
রাজস্ব আদায় ও ব্যয় ১০৫
বৈদেশিক সাহায্যের বিভাজন ও ব্যবহার ১০৮
আমদানি রফতানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ১১১
মুনাফা ও মূলধন আহরণের মাধ্যমে শোষণ ১১৮
উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শোষণ ১২০
উপসংহার ১২৫
টাকা ও পাঠপঞ্জি ১২৭

পঞ্চম অধ্যায়
ছয়-দফার সাংবিধানিক সমাধান ১৩০
নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও ১৩০
ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৩০
স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও পাকিস্তান ১৩১
ছয়-দফার জন্ম বৃত্তান্ত ও উদ্ভব ১৩৩
ছয়-দফা কার্যক্রম ১৩৪
ছয়-দফা কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ ও আকর্ষণ ১৩৭
টীকা ও পাঠপঞ্জি ১৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
আইউবের সামরিক শাসন ও মহাপ্রলয় ১৪০
ভারতীয় অনুপ্রবেশ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের আশঙ্কা ১৪০
আইউবের সামরিক শাসন ১৪২
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৪৬
আইউবের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ১৫১
ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির আট-দফা ও ছাত্রদের এগারো-দফা ১৫৪
গোল টেবিল বৈঠক ১৫৭
টীকা ও পাঠপঞ্জি ১৬১

সপ্তম অধ্যায়
ইয়াহিয়া সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের অগ্রগতি ১৬৩
ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ ১৬৩
আইনগত কাঠামো আদেশ ১৯৭০ ১৬৫
নির্বাচনী তৎপরতা ১৬৭
সাধারণ নির্বাচন ১৯৭০-৭১ ১৭২
নির্বাচনী ফলাফল ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ১৭৩

জাতীয় সংসদের অধিবেশন নিয়ে জটিলতা ১৭৭
টীকা ও পাঠপঞ্জি ১৮০

অষ্টম অধ্যায়
অসহযোগ আন্দোলন : মার্চের গৌরবদীপ্ত পঁচিশ দিন ১৮২
সূচনা ১৮২
মার্চের অসহযোগ আন্দোলন ১৮৩
মার্চের আন্দোলনের বিশেষত্ব ১৮৬
ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ ১৯১
সংলাপের ব্যর্থতা ১৯৩
টীকা ও পাঠপঞ্জি ১৯৭

নবম অধ্যায়
পাকিস্তানি সামরিক নৃশংসতা—কামানের মোকাবিলায় লাঠিসোঁটা ১৯৯
আদিপর্ব ১৯৯
অবদমিত ঢাকা ২০০
চট্টগ্রামে প্রতিরোধ ২০৩
দেশের অন্যত্র প্রতিরোধ ২০৬
পাকিস্তানি গণহত্যা ২০৯
টীকা ও পাঠপঞ্জি ২১৭

দশম অধ্যায়
স্বাধীনতা ঘোষণা ও বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ২১৯
অবতরণিকা ২১৯
স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার গঠন— রাজনৈতিক পদক্ষেপ ২২১
মুক্তিবাহিনী সংগঠন—সামরিক পদক্ষেপ ২৩১
মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি পর্ব ২৩৬
টীকা ও পাঠপঞ্জি ২৩৯

একাদশ অধ্যায়
প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার ২৪১
বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা—সরকারের ব্যবস্থাপনা ২৪১
রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগোষ্ঠী এবং মুজিবনগর সরকার ২৪৬
বাংলাদেশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও মনোবল অব্যাহত রাখার উদ্যোগ ২৫০
টীকা ও পাঠপঞ্জি ২৫৩

দ্বাদশ অধ্যায়
বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ ২৫৫
প্রবাসে বাঙালি সংগঠন এবং বিদেশি জনমত ২৫৫
বৃটেনে কূটনৈতিক অভিযান ২৬০
আমেরিকায় কূটনৈতিক তৎপরতা ২৬২
অন্যান্য কূটনৈতিক উদ্যোগ ২৬৭
টীকা ও পাঠপঞ্জি ২৭১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কলাকৌশল	২৭৩
পূর্বকথা	২৭৩
ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য	২৭৪
শরণার্থী সমস্যা	২৭৮
বাংলাদেশে পাকিস্তানি শান্তি প্রক্রিয়া	২৮০
ইয়াহিয়ার মিথ্যাচার	২৮৩
ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা	২৮৫
সমঝোতার জন্য মার্কিন মধ্যস্থতা ও বঙ্গবন্ধুর বিচার	২৯২
সঙ্কটের নির্বোধ মোকাবিলা	২৯৫
টীকা ও পাঠপঞ্জি	২৯৯

চতুর্দশ অধ্যায়

কালরাত্রির অবসান : জয় বাংলা	৩০৩
মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগ	৩০৩
ভারতের কৌশল	৩০৫
ডিসেম্বরের যুদ্ধ	৩১৩
বিজয়ের মুহূর্ত	৩১৭
টীকা ও পাঠপঞ্জি	৩১৯

পঞ্চদশ আধ্যায়

জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	৩২১
প্রশ্নাবলি : উপনিবেশবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, গণহত্যা ও মানবিক অধিকার, শান্তির প্রতি হুমকি	৩২১
জাতিসংঘে প্রতিক্রিয়া	৩২৫
১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন	৩২৭
স্বস্তি পরিষদে বিভিন্ন উদ্যোগ	৩২৯
বৃটিশ-ফরাসি উদ্যোগ ও নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা	৩৩৫
টীকা ও পাঠপঞ্জি	৩৩৮

ষোড়শ অধ্যায়

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ	৩৪০
ইতিহাসে বাংলাদেশ	৩৪০
বাংলাদেশে জাতিয়তার বিকাশ	৩৪১
পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া	৩৪৩
মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিরাষ্ট্রের অনন্য অভ্যুদয়	৩৪৫
উপসংহার	৩৪৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট -১	:	বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল	৩৫১
পরিশিষ্ট -২	:	বাংলার কালানুক্রমিক ইতিহাস খৃ.পূ. ৩২৭—১৭৬৫ সাল	৩৫২
পরিশিষ্ট -৩	:	ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের নির্ঘণ্ট	৩৫৬
পরিশিষ্ট -৪	:	পাকিস্তানের প্রথম যুগের মন্ত্রিসভা	৩৬০
পরিশিষ্ট -৫	:	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি	৩৬৫
পরিশিষ্ট -৬	:	১৯৭১-এর মার্চের পঁচিশ দিনের ঘটনাপঞ্জি	৩৬৭

পরিশিষ্ট -৭ : অসহযোগ আন্দোলনের পঁয়ত্রিশটি মৌলিক নির্দেশ ৩৭০
পরিশিষ্ট -৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ৩৭৫
পরিশিষ্ট -৯ : বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সেক্টর ও কমান্ডার ৩৭৭
পরিশিষ্ট -১০ : মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ও সচিব ২৭৮
পরিশিষ্ট -১১ : জোনাল প্রশাসন কাউন্সিল ৩৭৯
পরিশিষ্ট -১২ : পাকিস্তানের বাঙালি কূটনীতিবিদদের আনুগত্য পরিবর্তন ৩৮০
পরিশিষ্ট -১৩ : ভারতীয় যুদ্ধকৌশল ও সেনাপতিবর্গ ৩৮৩
পরিশিষ্ট -১৪ : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল ৩৮৫

সারণি

সারণি ১.১ : বাংলাদেশে জমির ব্যবহার ৩১
সারণি ১.২ : প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ ৩২
সারণি ১.৩ : কৃষি উৎপাদন ৩৪
সারণি ১.৪ : শিল্প উৎপাদন ৩৬
সারণি ১.৫ : বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবহন ক্ষমতা ৩৯
সারণি ১.৬ : বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি ও ব্যয় ৪১
সারণি ১.৭ : ছাত্র ভর্তির অবস্থা ১৯৯৫-৯৬ ৪২
সারণি ৩.১ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয় ৯০
সারণি ৪.১ : পাকিস্তানের জাতীয় আয় ১০০
সারণি ৪.২ : পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ১০৪
সারণি ৪.৩ : কেন্দ্রীয় রাজস্বের আঞ্চলিক উৎস ১৯৬৫-৬৮ ১০৬
সারণি ৪.৪ : পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয় ১৯৫০-৭০ ১০৭
সারণি ৪.৫ : পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার ১৯৪৭-৭০ ১০৯
সারণি ৪.৬ : পাকিস্তানে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বরাদ্দ ১৯৪৭-৭০ ১১০
সারণি ৪.৭ : পাকিস্তানের রফতানি আয় ১১৩
সারণি ৪.৮ : পাকিস্তানের আমদানি ব্যয় ১১৪
সারণি ৪.৯ : পাকিস্তানের ২৩ বছরের বৈদেশিক লেনদেনের সারাংশ ১১৫
সারণি ৪.১০ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ১৯৪৭-৬৯ ১১৬
সারণি ৪.১১ : পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয় ১৯৫০-৭০ ১২০
সারণি ৪.১২ : ১৯৭০ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রদত্ত ঋণ ১২২
সারণি ৪.১৩ : ১৯৬৮-৬৯ সালের উন্নয়ন কার্যক্রম ১২৪
সারণি : ৭.১ : জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আসন বিভাজন ১৬৭
সারণি ৭.২ : জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দল ও প্রার্থী ১৬৯
সারণি ৭.৩ক : নির্বাচনের ফলাফল ১৭৪
সারণি ৭.৩খ : নির্বাচনের ফলাফল ১৭৫

বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব

মাটি ও মানুষ

বাংলাদেশ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার বাংলা', ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের প্রাচীনকালের সর্বশক্তিমান ভারতীয় দেশ এবং অর্থনীতিবিদ রবার্ট ডর্ফম্যানের একটি অর্থনৈতিক ভ্রান্তি বিশেষ।[১] হিমালয় গিরিমালায় উদ্ভূত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মহানদী এই বদ্বীপকে সৃষ্টি করেছে। দেশটি আয়তনে ৫৫৬০০ বর্গমাইল অথবা ১৪৪০০০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৫১ সালে এই জনপদে অধিবাসী ছিল চার কোটি চল্লিশ লাখ এবং ১৯৯৮ সালে জনসংখ্যা হলো বারো কোটি সত্তর লাখ। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দেশ পরিচালনা করে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেশে ছয়টি বিভাগ এবং চৌষট্টিটি জেলা রয়েছে। পরবর্তী নিম্ন পর্যায়ে আছে ৪৯২টি থানা এবং ১২৭টি পৌর এলাকা। চারটি বড় শহরে আছে পৌর কর্পোরেশন। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান হলো ৮৮ ও ৯৩ দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে এবং ২০ ও ২৭ উত্তর অক্ষাংশে। কৃষি পরিবেশিক হিসেবে বাংলাদেশে ছয়টি এলাকা রয়েছে, যা পরিশিষ্ট-১এ বিবৃত হয়েছে।

ভূগোল ও আবহাওয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণস্থ ৪৩০ মাইল বা ৬৯০ কিলোমিটারের উপকূল রেখা হলো বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে। দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের সঙ্গে রয়েছে ১৮০ মাইল বা ২৯০ কিলোমিটারের স্থল সীমানা। বাকি দেশটিকে উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে ঘিরে আছে ভারত, ১৭৪০ মাইল বা ২৮০০ কিলোমিটারের স্থল সীমানা।

বাংলাদেশ উর্বর পলিমাটির দেশ। চারটি ছোট এলাকা ছাড়া গোটা দেশটি একটি বদ্বীপ বিশেষ। বেশির ভাগ এলাকাই সক্রিয় বদ্বীপ এলাকা, সামান্য জায়গা হলো পোক্ত অথবা ভঙ্গুর বদ্বীপ। সিলেটে আছে খানিকটা টিলা এলাকা, মধুপুরে আছে সামান্য উঁচ জমি, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আর উত্তর-পূর্বে রয়েছে বরেন্দ্র এলাকা

(এক সময়ে ছিল পতিত এলাকা)। মোটামুটিভাবে দেশটি সমতল; প্রায় দশ ভাগ জমি সমুদ্ররেখার নিচে, ষাট ভাগের উচ্চতা সমুদ্ররেখা থেকে বিশ ফুট বা ছয় মিটারের মধ্যে। বর্ষাকালে প্রায় চার মাস কেবল সামান্য টিলা এলাকা, বসতবাড়ি এলাকা, রাস্তা আর বাঁধ ছাড়া গোটা দেশ পানিতে ডুবে যায়; প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় পানি থাকে তিন ফুট বা প্রায় এক মিটারের মতো। "সারা দেশটিকে মনে হয় দিগন্তহীন সমতল শ্যামলিমা, মাঝে মধ্যে উঁকি মারছে গাছপালা আর বাঁশঝাড় আর সেখানে মাঝি আর চাষীরা প্রকৃতির তালে খেলে বেড়াচ্ছে।"[২]

বাংলাদেশের আবহাওয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে "অসহ্য গরম, দারুণ বৃষ্টিপাত, অত্যধিক স্যাঁতসেঁতে ভাব এবং তৎসঙ্গে লক্ষ্যযোগ্য ঋতুবৈষম্য।"[৩] হিমালয় পর্বতমালা এই দেশের ভূগোল ও আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে যেন নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের মহানদীর উৎস হলো হিমালয় এবং হিমালয়ের গলিত বরফ আর বৃষ্টিপাত বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দেয়। সুউচ্চ গিরিরাজিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মৌসুমি বায়ু অঝোরে বারিপাত করে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৯০ ইঞ্চি বা ২২৯০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় আর এর সবটাই এক হিসেবে পাঁচ মাসে সীমাবদ্ধ। নেপাল ও ভারত হয়ে গঙ্গা রাজশাহী এলাকায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নামে। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র নেপাল, তিব্বত ও ভারত পেরিয়ে যমুনা নামে রংপুর এলাকায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পূর্ব ভারতের মেঘালয় পর্বতে উদ্ভূত নির্ঝরিণী মরা ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহে এবং সুরমা ও কুশিয়ারা নামে সিলেট দিয়ে এসে সম্মিলিতভাবে মেঘনা নামে প্রবাহিত হয়। পদ্মা এবং যমুনা নিচে নেমে ফরিদপুরে এসে মিলে যায় এবং আরো খানিকটা দক্ষিণে চাঁদপুরে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। এই তিন নদী এবং তাদের শাখা-প্রশাখার অববাহিকা হলো প্রায় ছয় লাখ বর্গমাইল বা সাড়ে পনেরো লাখ বর্গ কিলোমিটার, যেখানে বৃষ্টিপাত খুব ঘন। তিনটি নদীনালার সর্বোচ্চ প্রবাহ হলো পঞ্চাশ লাখ কিউসেক এবং তারা বছরে মোট ২৪০ কোটি টন পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসে। হিমালয়ের কারণে তাই বাংলাদেশে বন্যার প্রাদুর্ভাব এবং হিমালয়ই এই বদ্বীপে প্রতি বছর প্রায় হাজার একর বা ৪০৫ হেক্টর জমি সংযোজিত করে। বাংলাদেশে প্রতি বছর পানি নামে প্রায় ১১.৩৫ কোটি একর ফুট এবং তার আশি ভাগ প্রবাহিত হয় জুন থেকে অক্টোবর এই পাঁচ মাসে।[৪]

মোটামুটিভাবে প্রায় সাতশো নদীনালায় বাংলাদেশ বিধৌত। এ ছাড়া পুকুর, দিঘি, হাওর এবং জলসিক্ত নিচু এলাকা সব মিলে জলাশয় হলো ৫৪ লাখ একর বা ২১.৯ লাখ হেক্টর। পানি নিষ্কাশন এবং সেচের জন্য এই জলাশয় অত্যন্ত মূল্যবান। বড় নদীনালা আছে প্রায় দুইশো তিরিশটি এবং এর মধ্যে চুয়ান্নটির উৎস হচ্ছে ভারতীয় এলাকা। বহুল পরিচিত নদীগুলোর মধ্যে আছে পাবনা-রাজশাহীতে পদ্মা; ময়মনসিংহে মরা ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনা; রংপুর-বগুড়া-পাবনা-ফরিদপুর দিয়ে প্রবাহিত যমুনা; রংপুরে তিস্তা; রংপুর-বগুড়ায় করতোয়া; দিনাজপুর-রাজশাহীতে আত্রাই ও মহানন্দা; যশোর-খুলনায় রূপসা ও কপোতাক্ষ; ফরিদপুর-বরিশালে আড়িয়াল খাঁ, ফুলেশ্বর ও মধুমতি; সিলেটে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই; নোয়াখালি-কুমিল্লায় গোমতি; ঢাকা-কুমিল্লায়

শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা; নোয়াখালিতে ফেনী এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মিলে কর্ণফুলি, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী।

হিমালয় পর্বতমালা বাংলাদেশের আবহাওয়াকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। উত্তরের সাইবেরীয় শৈত্য প্রবাহ থেকে বাংলাদেশ রক্ষা পায় এবং শীতকালটি হয় খুবই উপভোগ্য। শীতকালের গড় নিম্নতাপ হলো ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৫২ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর সর্বোচ্চ হলো ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৮৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ক্রান্তীয় দেশ যেখানে শীত কম আর বৃষ্টি বা জলপ্রবাহ এতো বেশি, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আর্দ্রতা খুব বেশি। সর্বোচ্চ আর্দ্রতা হলো ৯৭ শতাংশ আর গড় ৭০ শতাংশ, সর্বনিম্ন হলো ৪৭ শতাংশ। কদাচিৎ তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে যায়, কারণ গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৯৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সাধারণত মনে করা হয় বাংলাদেশে ঋতু তিনটি, যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ছয় ঋতুর পরিবর্তন অনুভব করা যায়। জুন মাসের মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী দু'মাস হলো বর্ষাকাল। এ-সময় বৃষ্টি তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে সূর্য যখন মেঘে ঢাকা পড়ে না তখন গরম এবং আর্দ্রতা খুবই অসহনীয় লাগে। এই মৌসুমে সর্বোত্তম ক্রান্তীয় ফল—আম, কাঁঠাল, জাম, পেয়ারা, কামরাঙা পাওয়া যায় বেশুমার। সারা দেশকে মনে হয় একটি পানির দরিয়া যার এখানে-সেখানে শ্যামলিমা এঁকে দেয় চমকপ্রদ রূপ। বর্ষার পরে হলো দু'মাসের শরৎ আর দু'মাসের হেমন্ত। শরৎ হলো বর্ষা শেষের ভ্যাপসা গরমের সময় এবং হেমন্তে উপভোগ করা যায় শুকনো আবহাওয়া আর শীতের পদধ্বনি। অক্টোবরের মধ্যভাগ থেকে হেমন্তের ফুল-সবজি বাজারে আসে। আর শীতের প্রারম্ভে শুরু হয় প্রধান ধান কাটার মৌসুম—আমন ফসল উঠানোর ধুম। ডিসেম্বরের মধ্য ভাগ থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে আরামদায়ক সময়, স্বল্পস্থায়ী শীতকাল। ফল-ফুলে, শস্য-সবজিতে ভরা এই মৌসুম। এই ঋতুতে বৃষ্টি হয় যৎসামান্য, মাত্র ০.২ ইঞ্চি বা ৫ মিলিমিটার ডিসেম্বরে আর ০.৫ ইঞ্চি বা ১৩ মিলিমিটার জানুয়ারিতে। মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে বসন্ত খুবই চমৎকার, কিন্তু এক মাসের মাথায়ই শুরু হয় গ্রীষ্মের আগমনী আর ঈশান কোণে উদ্ভূত কালবৈশাখীর প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্মের সূচনা ঝড়ের মধ্যে হলেও এই ঋতুটি হলো শুকনো এবং খুব গরম। বৃষ্টিপাত শুরু হলেই চলে আসে বর্ষাকাল। গ্রীষ্মের শেষ দিকেই ক্রান্তীয় ফলমূল পাওয়া যেতে থাকে। মে-জুনে এক মাস আর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আর এক মাস হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে অনারামদায়ক সময়—গরম ও আর্দ্রতা দুই-ই তখন মারাত্মক।

বাংলাদেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক বড় গভীর। প্রতি বছর তিন চার মাস জুড়ে দেশে বন্যা হয়। দেশটি সমতল বলে এবং ঘন বৃষ্টিপাত মাত্র কয়েকটি মাসে হয় বলে বাংলাদেশকে এই ঝামেলা পোহাতে হয়। রাক্ষুসী বান এবং প্রলয়ঙ্করী বন্যার প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশের স্বল্পায়তন এলাকা দিয়ে বিশাল তিন নদী গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার সব পানি প্রবাহ। বছরে দুই ঋতুতে দেশে হয় ঘূর্ণিঝড়।

বৃষ্টির শুরুতে এবং শেষে মৌসুমি বায়ু দিক পরিবর্তন করে আর এতেই হয় যতো ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গোপসাগরের চোঙ্গাকৃতির কারণে ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয় এবং এতে উপকূলীয় এলাকায় জানমালের মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয়। এই সব দুর্যোগ তথা বন্যা বা ঝড় থেকে ক্ষতির পরিমাণ হয় খুব বেশি; কারণ দেশটিতে বসতি খুব ঘন, তাই বাধ্য হয়ে নিচু জমি বা উপকূল এলাকায় মানুষকে ঘর বাঁধতে হয়। মানুষের বসতির প্রয়োজনে, আসবাবপত্র, নির্মাণ কাজ বা লাকড়ির প্রয়োজনে জঙ্গল অনবরত কাটা পড়ে। নদীপথ বা পানি নিষ্কাশনের খাল-নালা অনবরত ভরাট হয় ঘনবসতির কারণে। আর এতে দেশটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মানবগোষ্ঠী

বাঙালি গোষ্ঠীর বিকাশ একটি গলন পাত্র থেকে যেখানে দ্রাবিড়-মুণ্ডা লম্বা মাথা, আল্পীয় খাটো মাথা, আর্য লম্বা মাথা এবং মোঙ্গলীয় খাটো মাথার সমাহার ঘটেছে।[৫] এক সময়ে মনে করা হতো যে, মূল বং-রা দ্রাবিড় ও মোঙ্গল জাতির মিশ্রণে বিকশিত হয়, তবে পরবর্তী অনেক গবেষণায় দেখা যায় যে, তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অস্ট্রেলয়েড বা নিষাদ জাতি থেকে উদ্ভূত।[৬] আর্যরা উত্তর-পশ্চিম থেকে আসে কিন্তু পুণ্ড্রগোষ্ঠী তাদের প্রবলভাবে বাধা দেয়, যার ফলে বঙ্গদেশ পুরোপুরি আর্যাবর্ত হয়ে যায় নি। তবে আর্য প্রভাব অনস্বীকার্য এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য এবং হিন্দু সামাজিক কাঠামো। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গদেশ পশ্চিমের সঙ্গেই বেশি যুক্ত এবং পূর্ব সীমানা নিতান্তই অবহেলিত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন সাম্রাজ্য পশ্চিমেই ধাবিত হয়েছে, ঐদিকে বেড়েছে অথবা ঐদিক থেকে আক্রান্ত বা বিজিত হয়েছে।

লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গঙ্গারিদ্ধি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা সাম্রাজ্য। বাংলাদেশে মৌর্য, কুশান এবং গুপ্ত সম্রাটরা একের পর এক রাজত্ব করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে এখানে ছোট ছোট স্বাধীন নৃপতিরা সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজারা বাংলাদেশ বারবার আক্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন অংশ দখলও করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় চারশো বছর বাংলাদেশে ছিল বৌদ্ধ পাল রাজত্ব এবং পাল সাম্রাজ্যও পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর পরে প্রায় দেড়শো বছর ছিল হিন্দু (শৈব) সেন রাজবংশ। দিল্লির মুসলমান দাস রাজবংশের আমলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে মুসলমানরা বাংলাদেশ দখল করে। দিল্লির খিলজি ও তুগলক রাজারা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম লগ্ন পর্যন্ত বাংলায় তাঁদের রাজত্ব বজায় রাখে। ১৩৩৮ সালে বাংলায় স্বাধীন মুসলমান সুলতানি আমল শুরু হয় এবং বিভিন্ন রাজবংশ ১৬১২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করে। ১৫২৬ সালে মোগলরা দিল্লিতে নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করলে অনেক আফগান গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পরিবার বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বস্তুতপক্ষে বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের বেশির ভাগই ছিল আফগান গোষ্ঠীর। মোগলরা সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা দখল করে এবং মোগল নবাবরা এই দেশ প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করে। তাঁদের

হাত থেকেই ১৭৫৭ সালে বৃটিশ শক্তি ক্ষমতা দখল করে।

বাংলার বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন বাংলাদেশের জনগণের গোষ্ঠী পরিচিতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বেশির ভাগ রাজবংশ বাইরে থেকে বাংলায় এসে রাজত্ব কায়েম করে এবং তাঁদের সঙ্গে নতুন কুল বা গোষ্ঠী এদেশে আগমন করে এবং তাঁরা নিয়ে আসে তাঁদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি। আর্যরা আসে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো, কিন্তু কখনো স্থানীয় গোষ্ঠীকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি। মনে করা হয় যে, সেন রাজবংশ মূলত আর্য গোষ্ঠী ছিল কিন্তু বাংলায় আগমনের প্রাক্কালে তাঁরা দাক্ষিণাত্যে বহুদিন বসতি করে। তাই তাঁদের সঙ্গে যারা এসে বাংলায় বসতি করলো তাঁরা ছিল আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। বাইরে থেকে সর্বশেষ গোষ্ঠী যাঁরা বাংলায় বসতি স্থাপন করে তাঁরা হলো মুসলিম বিজয়ী গোষ্ঠী। উত্তর ভারতে মোগলদের কুক্ষি থেকে পালিয়ে এসে প্রচুর আফগান, ইরানি ও তুর্কি মুসলমান বাংলায় বসতি স্থাপন করে। একই সঙ্গে আসে অনেক সুফি-সাধক এবং ধর্ম প্রচারক পীর-ফকির, যাঁদের অনেকেই আরব ভূখণ্ড থেকে আগমন করেন। সাধক সুফি এবং পীর-ফকিররাই মূলত ইসলাম প্রচার করেন এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। যে সমাজে বৈষম্য জন্মগতভাবেই নির্ধারিত হয় এবং জাতিগত হীনতা সংশোধন কোনো রকমেই সম্ভব নয়, সেই প্রেক্ষাপটে ইসলামের সাম্যের বাণী এবং সংস্কারমুক্ত উদারতা সমাজের সর্বস্তর থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানের দল ভারি করলো। রাজার ধর্ম বলেও তার আকর্ষণ কম ছিল না। মুসলমান সমাজে স্থানীয় শিল্পকর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও সেবা এবং অতি সহজে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার রীতি সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে ধর্মান্তকরণে সমর্থন যোগায়। বৃহত্তর বাংলায় তাই মুসলমানেরা বাইরে থেকে আগমন না করলেও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। একজন ঐতিহাসিক হিসাব করেছেন যে, বৃহত্তর বঙ্গে তিরিশ শতাংশ মুসলমান ছিলেন বিদেশ থেকে আগত, আরো তিরিশ শতাংশ ছিলেন উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত এবং বাকি চল্লিশ শতাংশ ছিলেন সমাজের নিম্ন স্তর ও বৌদ্ধধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত। বর্তমান বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের আদমশুমারির হিসেবে মুসলমান জনসংখ্যা ৮৮.৩ শতাংশ, হিন্দু ১০.৫ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.৫ শতাংশ এবং খৃস্টান .০২৬ শতাংশ। ১৯৫১ সালে এই অনুপাত ছিল ৭৬.৮ : ২২ : .০.৭৬ : .০.২৫।

মৌর্য সাম্রাজ্যকালে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম শিকড় বিস্তার করে কিন্তু তার গৌরবময় যুগ ছিল পাল যুগের চারশো বছর। গুপ্ত আমলে হিন্দুধর্ম বিস্তার লাভ করে এবং পাল যুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রাধান্য পায়। কিন্তু শৈব গোত্রীয় সেন রাজত্বের আগ্রাসন ও গোঁড়ামি বৌদ্ধধর্মকে বাংলার মাটি থেকে প্রায় বিতাড়ন করে। ইসলাম এ-দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রথম আবির্ভূত হয় অষ্টম শতাব্দীতে আর তার বাহক ছিল আরব ব্যবসায়ী এবং সাধক ইসলাম প্রচারকরা। তবে মুসলিম শাসনামলে সুফি ও ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা খুব বেড়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ লগ্নে আর সপ্তদশ শতাব্দীতে খৃস্টধর্ম আসে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। কিন্তু বৃটিশ রাজও ইসলাম বা হিন্দুধর্মকে তাদের শক্ত অবস্থান থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিভক্ত হলে বাংলাদেশ থেকে অনেক হিন্দু ভারতে চলে যান আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশ এলাকা থেকে অনেক মুসলিম শরণার্থী এদেশে আগমন করেন। নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ নিতান্তই সমমাত্রিক বা সমকারী। তেরো কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র পাঁচ লাখ হলো পাহাড়ি বা উপজাতি গোষ্ঠী, যারা মূলত চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা এবং সিলেট ও ময়মনসিংহের উঁচুভূমিতে বাস করেন। বাংলাদেশের একটি বিশেষ গুণ হলো এটি মূলত এক-ভাষাভাষী একটি সমমাত্রিক জাতি।

ভাষা

বাংলাদেশের ভাষা বাংলা এবং এই ভাষা গোটা দেশের লিখিত ও কথ্য ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা একান্তই বিভিন্ন এলাকার স্বরভঙ্গির বিষয়, উচ্চারণেই যা বিভিন্নতা। বাংলা ভাষার মূল হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। ভারতীয় আদি কথ্যভাষা প্রাকৃত থেকে উদ্ভব হয় অপভ্রংশ। বাংলাভাষার বিকাশ ঘটে গৌড়ীয় অথবা মগধী অপভ্রংশ থেকে। অবশ্য সংস্কৃত ও পালি থেকে ভাষাটি প্রচুর উপাদান গ্রহণ করে। মনে করা হয় যে, এই ভাষার উদ্ভব হয় সপ্তম শতাব্দীতে। পাল রাজবংশ এই ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং প্রথম বাংলা গ্রন্থ পাল যুগে রচিত হয়। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (পরবর্তীকালে চর্যাপদ বলে পরিচিত), রামচরিত অথবা রোগবিনিশ্চয় ঐ সময়কার সাহিত্যচর্চার প্রতিভূ। সেন রাজবংশও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু তারা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার সাধন করেন। মুসলমানদের আমলে রাজভাষা ছিল পারসি এবং বৃটিশ যুগের প্রথম শতাব্দীতে তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ইলিয়াস শাহি (১৩৪২-৮৭) এবং হোসেন শাহি (১৪৯৩-১৫৩৮) আমলে বিকশিত হয়।

আধুনিক বাংলাভাষা বস্তুতপক্ষে ইলিয়াস শাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে প্রচলিত হয়। বাংলা সাহিত্যের শুরুতে স্থানীয় ও ইসলামি কাহিনী, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা, ঐতিহ্য, আদল ও কৃষ্টি একে প্রভাবিত করে। মুসলমান লেখকরা ইসলামি ঐতিহ্য ও কাহিনী নিয়ে চর্চা করেন এবং হিন্দুরা করেন হিন্দু ও স্থানীয় ঐতিহ্য ও কাহিনী নিয়ে। এই সময়কার গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির *পদাবলী,* কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, মইনুদ্দিনের *রসুল বিজয়*, সৈয়দ সুলতানের *নবী বংশ* ও *শবে মেরাজ*, শেখ ফজলুল্লার *গাজী বিজয়* এবং শাহ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা*। হোসেন শাহি আমলে আরো নতুন নতুন গ্রন্থ রচিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। ঐ যুগের বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* ও *পদ্মপুরাণ*, কংকার *বিদ্যাসুন্দর*, দ্বিজজনার্ধনের *চণ্ডীর উপাখ্যান*, বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভগবত*, শুলাপানির *স্মৃতিশাস্ত্র*, পরমেশ্বরের *মহাভারত*, শ্রীকর নন্দীর *অশ্বমেধ পর্ব,* গুনরাজ খানের *পুরাণ* ও চান্দ কাজীর *পদ্মাবতী*। হোসেন শাহি আমলের পরেও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হতে থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে অনেকগুলো কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল দৌলত উজিরের *লাইলি মজনু,* সোনাগাজীর *সাইফুল মুলক*, দৌলত কাজীর *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, আলাওলের *পদ্মাবতী* এবং মোজাম্মেল হকের *সাতনামা* ও *নীতিশাস্ত্র।*

মোগল রাজত্বে (১৫৭৫-১৭৫৭) বাংলাভাষার চর্চা ছিল না এবং লিখিত বাংলা প্রাচীন ও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। বৃটিশ বিজয়ের পর ধীরে ধীরে বাংলাভাষার পুনর্জাগরণ হয় এবং এতে দিশারীর ভূমিকা পালন করেন উনবিংশ শতাব্দীর টেঁকচাদ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সময়ে অবশ্য বাংলাভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কমে যায় এবং লোকসাহিত্যের বাংলা এবং আধুনিক বাংলার মধ্যে ফারাক সৃষ্টি হয়। মুসলমান সাহিত্যিকেরা আবার যখন বাংলা চর্চা শুরু করলেন তখন এই ধারায় পরিবর্তন আসে। আধুনিক বাংলায় পর্তুগিজ ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় যদিও ব্যবসা বা ক্ষমতার লড়াইয়ে পর্তুগিজরা এদেশে খুব সুবিধা করতে পারে নি; কিন্তু ভাষার উপরে তারা বেশ প্রভাব রেখে গেছে। বাংলাদেশে বাংলাভাষা স্বকীয়তায় মণ্ডিত এবং সে হিসেবে এতদ্‌ঞ্চলে প্রচলিত বাংলা যে-কোনো গতিশীল ও বহু দেশে প্রচলিত ভাষার মতো স্থানীয় নিজস্ব বিশেষত্বে ভূষিত।

এলাকা ও ইতিহাস

বাংলাদেশের ইতিহাস উপমহাদেশের পূর্ব এলাকার সামগ্রিক ইতিহাসের অংশবিশেষ। এই ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো আর এই এলাকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। মধ্য ভারতের মগধ থেকে শুরু করে পূর্ব সীমানায় কামরূপ পর্যন্ত এলাকার নানা সাম্রাজ্য, নানা দেশ এবং নানা স্বাধীন ভূখণ্ডের সামগ্রিক ইতিহাসে বাংলাদেশের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্বাব্দ তেরশো বছর আগে যখন আর্যরা এই উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করে, তখন তারা মগধ পর্যন্ত এসে ক্ষান্ত দেয়; তাই বঙ্গভূমিতে পুরনো জাতিগুলোর বসতিই চলতে থাকে। এই সব আদি জাতি বা গোষ্ঠীকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল জানতে হলে অসংখ্য দেশের কাহিনী শুনতে হবে। এই সব দেশ হলো মগধ, মিথিলা, উৎকল, তমলুক, শুমা, ব্রজভূমি, রাঢ়, দণ্ডমুক্তি, পুণ্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্র, লখনৌতি, বঙ্গ, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, হরিকেলা, সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং কামরূপ। শুমা একদা সুপ্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এটি রাঢ়ের অঙ্গ হিসেবে অবস্থান করে। তেমনি পুণ্ড্র, গৌড়, লখনৌতি বা বরেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে অনেকটা একই এলাকাকে আবৃত করে। বর্তমানে এইসব পুরনো নামে নির্দিষ্ট সীমিত এলাকাকেই বোঝায়। মগধ ও মিথিলা ছিল বর্তমানের উত্তর প্রদেশের একাংশ, বিহার এবং দক্ষিণ নেপালের তরাই এলাকা। উৎকল ও কলিঙ্গ বলতে উড়িষ্যা এলাকাকে বোঝা যায়। শুমা ছিল রাঢ় এলাকার দক্ষিণাংশ আর ব্রজভূমি ছিল উত্তরাংশ। বর্তমানের মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যই ছিল রাঢ়। তমলুক বা দণ্ডমুক্তি বলতে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এলাকাকে বোঝাতো। পুণ্ড্র সম্ভবত বাংলাদেশের বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী এলাকা এবং বিহারের পূর্ণিয়া এলাকা আবৃত করতো। গৌড় ছিল বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া এলাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও মালদা এলাকা নিয়ে। বরেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ এবং সম্ভবত ময়মনসিংহের কিছুটা। লখনৌতি বর্তমান

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বিহারের রাজমহল এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদে বিস্তৃত ছিল। বঙ্গ বলতে বাংলাদেশের ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর ও খুলনা এলাকাকে বোঝাতো। সমতটের অধীনে ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং সিলেটের কিছু অংশ। হরিকেলা বলতে সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ভারতের আগরতলার কিয়দংশ বোঝাতো। কামরূপ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার থেকে পূর্ব ভারতের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বোধহয় ময়মনসিংহের খানিকটাও আবৃত করতো। বরিশাল ও ফরিদপুর মিলে ছিল চন্দ্রদ্বীপ। বাংলার ইতিহাসের ক্রমবিকাশ পরিশিষ্ট ২-এ তুলে ধরা হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব চার শতকে গণ্ডারিদাই রাজ্য গঙ্গাঋদ্ধি, গঙ্গাগড় এইসব নামেও পরিচিত ছিল এবং এর বিস্তৃতি মগধ থেকে কলিঙ্গ, মিথিলা, রাঢ় হয়ে গৌড় পর্যন্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। ঐ শতাব্দীর শেষদিকে এই ভূখণ্ড মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যে মগধ ছিল কেন্দ্রস্থল এবং রাঢ় ও গৌড় সম্ভবত দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানা নির্ধারণ করতো। মৌর্য পতনের পর গণ্ডারিদাই আবার স্বাধীন হলো কিন্তু এবারে বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে উঠলো। খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী দুই শতাব্দীতে বাংলার কিছু এলাকা কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু স্বাধীন রাজ্যগুলো মোটামুটিভাবে স্বাধীনই থেকে যায়। বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেলায় এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য ছিল। কোনো কোনো সূত্রে অনুমান করা হয় যে, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ বরেন্দ্রের এক রাজবংশের লোক ছিলেন।

বাংলার এক বিরাট অংশ প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপি (৩২০-৫২৪ খৃস্টাব্দ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বলা হয় যে গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম বং এলাকা রাঢ়, গৌড় এবং বরেন্দ্র এলাকার সঙ্গে যুক্ত হয়। গুপ্ত সম্রাটেরা কিন্তু বাংলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। পশ্চিম বাংলার চন্দ্র বর্মা গুপ্ত প্রাধান্যকে অস্বীকার করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন গৌড় ও বঙ্গে দুইটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গে প্রসিদ্ধ রাজা গোপচন্দ্র সমতট দখল করেন। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খ্যাতমান দিগ্বিজয়ী রাজা। তিনি বঙ্গ, রাঢ়, কলিঙ্গ ও মগধ বিজয় করেন এবং অযোধ্যা ও কনৌজ পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা শশাঙ্ক তাঁর বিশ বছরের রাজত্বে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন এবং সারা এলাকায় এক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলায় শান্তি বিরাজ করলেও রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র এবং মগধে চললো ক্ষমতার লড়াই। এর সঙ্গে উত্তরের তিব্বত রাজা বারবার অভিযান চালিয়ে অস্থিতিশীলতা আরো জটিল করে তোলে। বাংলার উত্তর ও পশ্চিম এলাকায় নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে পঞ্চাশ বছরের এই নৈরাজ্যকে বলে মাৎস্যন্যায়।

এই নৈরাজ্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ৭৫০ সালে গৌড়, বরেন্দ্র ও রাঢ় এলাকার রাজন্যবর্গ পুণ্ড্রের প্রধান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। এতে নৈরাজ্যের অবসান হয় এবং প্রতিবেশী আর প্রতিবেশীর শিকারে পরিণত হয় না।[৮] পাল সাম্রাজ্যের চার

শতাব্দীতে দেশে ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধি। বৌদ্ধ উদারনৈতিক সমাজে শিল্পকলা, জ্ঞান সাধনা এবং বাণিজ্যের বহুল বিকাশ হয়। বাংলাভাষার পাল যুগেই হয় সূচনা। এই যুগেই ময়নামতি ও পাহাড়পুর বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটে। পাল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে মিথিলা, মগধ, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলাকে নিয়ে ছিল পাল রাজ্য এবং পূর্বে কামরূপ রাজ্য, পশ্চিমে সিন্ধু রাজ্য ও উত্তর-পশ্চিমে আরো কয়েকটি অনুগত রাজ্য সৃষ্টি করে পাল রাজ্যকে সংরক্ষিত করা হয়। পাল যুগের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য পাল প্রভুত্বকে অস্বীকার করে। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে পাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পালে আবার হাওয়া লাগে। কিন্তু ১১৬৫ সালে বিজয় সেন যখন শেষ পাল রাজাকে পরাজিত করেন তার আগেই পালদের দখল খুব কমে যায়।

একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সেন বংশ রাঢ় এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী শতাব্দীর মাঝামাঝি তাদের ক্ষমতা গৌড়, বরেন্দ্র, মিথিলা ও কলিঙ্গতে বিস্তৃত হয়। তারা বঙ্গ ও সমতটও দখল করেন এবং কামরূপে অনুগত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বারবার পরিবর্তিত হয়, তবে শুরুতে ও শেষে বরেন্দ্র এলাকায়ই ছিল রাজধানী। পাল সাম্রাজের গৌরবময় যুগে মগধের পাটলিপুত্রে পাল রাজধানী ছিল। বিজয় সেন গৌড়ে তাঁর রাজ্যের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করেন এবং সেন রাজ্যের রাজধানী হয় লখনৌতি, যার মূল নাম ছিল লক্ষণাবতী। রাজা লক্ষণ সেন (১১৭৯-১২০৬) ছিলেন এই বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি এবং তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বহু অভিযান চালালেও তার সময়ে অনেক স্বাধীন রাজন্য তার ক্ষমতা খর্ব করেন। তারই রাজত্বকালে দিল্লির দাস রাজার এক সেনাপতি মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি আকস্মিক আক্রমণ করে ১২০১ সালে রাজধানী নদীয়া দখল করেন। লক্ষণ সেন কোনো বাধা না দিয়ে সমতটে পলায়ন করেন এবং বিক্রমপুরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে পরবর্তী ষাট বছর সেন রাজবংশ রাজত্ব করে। অবশেষে দেব বংশের একজন স্থানীয় প্রধান ক্ষমতা দখল করেন।

বখতিয়ার খিলজী দিল্লি সুলতানের অধীন একটি প্রাদেশিক সরকার লখনৌতিতে গঠন করেন এবং ক্রমে ক্রমে রাঢ়, গৌড় এবং বরেন্দ্র এলাকা দখল করেন। তিনি মগধ ও মিথিলা বিজয় করে বঙ্গে আসেন এবং কামরূপ ও তিব্বতের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তিনি বিহার রাজ্যের নামকরণ করেন। তিনি বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বখতিয়ার খিলজির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ খিলজি (১২১৩-১২২৭ খৃষ্টাব্দ)। দিল্লির সুলতানদের উত্তরাধিকার যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তিনি বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিহার থেকে দিল্লির প্রতিনিধিকে বিতাড়ন করেন এবং সমতট দখলের প্রচেষ্টা করেন। ইয়াজ খিলজির পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর বাংলায় দিল্লির প্রতিনিধিরা শাসন করেন। তাঁদের অনেকেই দাস ছিলেন এবং প্রায়শই তাঁরা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে চেষ্টা করতেন। এই সময়ে মুসলিম রাজত্ব প্রথমে

সমতট ও পরে কামরূপে বিস্তৃত হয়। তুঘলক সুলতানদের আমলে হরিকেলা ও সাতগাঁও দিল্লির দখলে আসে এবং দিল্লি থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্য। বাংলাকে দিল্লি সুলতানরা সুশাসনের জন্য তিনটি বিভাগে ভাগ করেন—লখনৌতি (নদীয়া), সোনারগাঁও (ঢাকা) এবং সাতগাঁও (সিলেট)।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ তুঘলকদের অমান্য করে সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে ১৩৩৮ সালে স্বাধীন বাংলা রাজ্য ঘোষণা করেন। তাঁর আগে যাঁরাই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন মূলত দিল্লির প্রতিনিধি। এবার হলো ব্যতিক্রম। তুঘলক প্রতিনিধি বাহরাম খান মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী পৌছবার আগেই ফখরুদ্দিন দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তী আড়াইশো বছর বাংলায় দিল্লির কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। বাংলার ভূগোল ও প্রকৃতিই বাংলাকে কয়েক শতাব্দী ধরে তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।[৯] গোটা বাংলায় (অর্থাৎ দিল্লির নির্ধারিত তিন বিভাগে) স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭)। তিনি মোবারক শাহের সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে লখনৌতি যুক্ত করে শাহ-এ বাঙ্গালা উপাধি গ্রহণ করেন। প্রাচীন রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, সমতট, বঙ্গ ও হরিকেলাকে একত্র করে বাংলা নামের দেশ গঠন একান্তই শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব। ইলিয়াস শাহি বংশ ১৪১৪ সাল থেকে ১৪৪২ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে। তাঁদেরই এক সেনাপতি রাজা গণেশ ১৪১৪ সালে ক্ষমতা দখল করেন কিন্তু এই অত্যাচারী রাজা মাত্র চার বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন। পরবর্তী চব্বিশ বছর মুসলিম সেনাপতি ও অভিজাত গোষ্ঠী রাজা নিয়োগ করেন প্রথমে যদুর ধর্মান্তরিত পুত্র জালালুদ্দিন মাহমুদকে এবং পরে শামসুদ্দিন আহমদকে। শামসুদ্দিন ঘাতকের হাতে নিহত হলে ইলিয়াস শাহি রাজত্ব পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়। রুকনুদ্দিন বরবক শাহ (১৪৪৯-১৪৭৪) স্থানীয় সেনাপতিদের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য ৮০০০ হাবসি সৈন্যকে আবিসিনিয়া থেকে আমদানি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই হাবসি সেনাবাহিনী হয়ে গেল বাংলার প্রেটোরিয়ান গার্ড। তাঁরা নিজের খুশিতে রাজা নিয়োগ করতে থাকলো। অবশেষে ১৪৮১ সালে শেষ ইলিয়াস শাহি নৃপতি জালালুদ্দিন ফতেহ শাহকে হত্যা করে তাঁরা নিজেরাই সরাসরি ক্ষমতা দখল করে বসলো।

আবিসিনীয় ভাড়াটে সৈন্যরা সরাসরি ছ'বছর রাজত্ব করে এবং এই সময়ে পাঁচজন রাজা ক্ষমতায় আসীন হন। ইলিয়াস শাহি আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু পরবর্তী হাবসি সেনার রাজত্বকালে দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাঁরা ছিল অত্যাচারী, লুটেরা, অপচয়ী এবং ষড়যন্ত্রপ্রিয়। তাঁদের মধ্যে হানাহানি ও বিশ্বাসঘাতকতা লেগেই ছিল। তাঁদের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ বিদ্রোহ করে এবং ক্ষিপ্ত জনতা হাবসি সেনাগোষ্ঠীকে নিধন করে। হাবসি সামরিক শাসন অবসানের জন্য যে যুদ্ধবিগ্রহ হয় তাতে ১২০,০০০ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও দক্ষ রাজকর্মচারী সৈয়দ হোসেন। ১৪৯৩ সালে তাঁকে রাজা নির্বাচিত করা হয় এবং আলাউদ্দিন হোসেন

শাহ নামে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। হোসেন শাহি রাজবংশ ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করে। বাংলার ইতিহাসে এটা ছিল আরেক স্বর্ণযুগ। হোসেন শাহের রাজত্ব ছিল বিস্তৃত এবং তাঁর রাজসভায় ছিল বিখ্যাত পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক এবং প্রশাসকবৃন্দ। শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল তাঁর রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য। হোসেন শাহই বস্তুতপক্ষে এ দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

শেরশাহ শুরি ১৫৩৯ সালে বাংলা বিজয় করে শুরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগলরা যখন ১৫৫৬ সালে শেরশাহের বংশধরদের হাত থেকে দিল্লির সাম্রাজ্য পুনরাধিকার করলো, শুরি বংশ তখন শুধু বাংলায়ই তাঁদের রাজত্ব বহাল রাখলো। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে শুরিদের হাত থেকে ক্ষমতা গেল কররানি বংশে। ১৫৭৬ সালে আকবরের সেনাপতি তোদরমল দাউদ খাঁ কররানিকে পরাজিত করলেন কিন্তু বাংলা পুরোপুরি মোগলদের দখলে গেল না। আকবর অনেক সুযোগ্য সুবেদারকে বাংলায় প্রেরণ করেন কিন্তু বাংলার প্রধানরা তাঁদের অমান্য করেই চললেন। বিখ্যাত বারো ভুঁইয়া কখনো দিল্লির সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। এই সব রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইশা খান, মুসা খান, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, বাহাদুর গাজি এবং ওসমান খান। তাঁরা সেই যুগেই গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করেন এবং তাঁদের দ্রুতগতিসম্পন্ন ডিঙ্গিবহর নিয়ে মোগল সুবেদারদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা মোগলদের দখলে যায়। ইসলাম খানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সামরিক প্রতিভা ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় মোগল বিজয় সম্পন্ন করে। সুবেদার ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। আরাকানি দস্যু, পর্তুগিজ জলদস্যু, পূর্ব এলাকার বিদ্রোহী রাজন্যবর্গকে দমন করবার জন্য জাহাঙ্গীরনগর হয় কৌশলগত কেন্দ্র। পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বছর এই শত্রুদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে এবং বাংলার সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়।

সম্রাট শাহজাহানের ছেলে শাহ সুজা বাংলার সুবেদার হন ১৬৩৯ সালে। তাঁর একুশ বছরের শাসনামলে (১৬৬০ পর্যন্ত) দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। তিনি বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর দায়িত্ব আরো বাড়ে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। শাহজাহানের শেষ জীবনে তাঁর সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিবাদ লাগলে তিনিও তাতে যোগ দেন এবং বিফল মনোরথ হন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলায় মোগল শাসন ছিল সর্বোত্তম। দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে, বিদেশি ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সীমান্তবর্তী এলাকা (আরাকান, কাছাড় এবং আসাম) বশীভূত থাকায় শান্তি ব্যাহত হতো না। দুইজন প্রথিতযশা সুবেদার মিরজুমলা (১৬৬০-১৬৬৩) এবং শায়েস্তা খান, যিনি দুইবার সুবেদার হন (১৬৬৪-১৬৭৮ এবং ১৬৭৯-৮৮), মোগল আমলের বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭০০ সালে আওরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলি খানকে বাংলার দেওয়ান করে পাঠান এবং রাজস্ব বিষয়ে তাঁকে সুবেদারের কর্তৃত্বমুক্ত রাখেন। তখন সুবেদার ছিলেন তাঁর পৌত্র আজিমুদ্দিন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে দেওয়ানের দফতর রাজধানী

থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এই শহরের নামকরণও হয় সম্রাটের অনুমোদনে। মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন সৎ ও দক্ষ দেওয়ান এবং রাজস্ব বিষয়ক তাঁর নানা সংস্কার আজও চলে আসছে। সুবেদার আজিমুদ্দিনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুর্শিদ কুলি খান দাক্ষিণাত্যে বদলি হন। কিন্তু সম্রাট ফররুখ শিয়র মুর্শিদ কুলি খানকে আবার বাংলার দেওয়ান নিয়োগ করেন ১৭১০ সালে। একই সঙ্গে তিনি কতগুলো জেলার ফৌজদারও নিযুক্ত হন। ১৭১৩ সালে তিনি উড়িষ্যার সুবেদার এবং ১৭১৭ সালে বাংলার সুবেদার হন। দিল্লির সম্রাটরা তখন অত্যন্ত দুর্বল। মুর্শিদ কুলি খান স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব করেন। তিনি ত্রিপুরা ও আসাম রাজকে পরাভূত করেন। বৃটিশ, ফরাসি এবং ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে তিনি দিল্লির সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ থেকে সযতনে বিরত থাকেন। বাংলার অত্যন্ত দক্ষ এই সুবেদার ১৭২৭ সালে মারা যান। তারপর ক্ষমতা নেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান। সুজাউদ্দিন খান দক্ষ শাসক ছিলেন কিন্তু তিনি আমোদ-আহ্লাদে গা ভাসিয়ে দিলে রাজসভায় নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকে এবং তাঁর ক্ষমতার ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। বাংলা তখন অত্যন্ত বড় সুবা ছিল এবং সারা দেশের শাসন খুব সহজ ছিল না। মুর্শিদ কুলি খানের আমলে উড়িষ্যা বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে ১৭৩৩ সালে বিহারও এই সুবার সঙ্গে যুক্ত হয়। সুজাউদ্দিনের পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান নবাব হন। সুজাউদ্দিনের বন্ধু ও আশ্রিত সেনাপতি আলিবর্দি খান ১৭৪০ সালে সরফরাজকে পরাজিত করে নিজেই নবাব হন। তিনি তখন নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। উড়িষ্যা বিদ্রোহী হয়। বিহারের আফগান সেনাপতিরা শত্রুতা শুরু করে। মারাঠারা বারবার বাংলা আক্রমণ করতে থাকে। বিদেশি ব্যবসায়ীরা গোলমাল শুরু করে এবং স্বাধীন হতে প্রচেষ্টা চালায়। আলিবর্দি খানের সময়টি ছিল (১৭৪০-১৭৫৬) ভারতবর্ষের জন্য দুর্যোগপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল। আইন-শৃঙ্খলার অভাব, লুটতরাজ ও দস্যুদের প্রাধান্য এবং বিদেশি ব্যবসায়ীদের শোষণ নীতি ছিল ভারতের পচনশীল সমাজের বাস্তবতা। রাজনীতিতে মুখ্য বিষয় ছিল ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুঃশাসন। তৎকালীন উপমহাদেশে আলিবর্দি ছিলেন সবচেয়ে সুযোগ্য রাষ্ট্রনেতা। তাঁর রাজত্বে শান্তি কায়েম হয় এবং মানুষ যথেষ্ট সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। তিনি অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন। তাঁর সবচেয়ে দুশ্চিন্তা ছিল বিদেশি ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা লিপ্সা নিয়ে এবং বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ে তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

নবাব আলিবর্দি খানের দুশ্চিন্তা ছিল যথার্থ। নবাব আলিবর্দির উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পৌত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তিনি ভালো যোদ্ধা ছিলেন, তেজস্বী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁর দোষ ছিল যে, তিনি প্রবৃত্তিতাড়িত ছিলেন এবং বিচক্ষণতাকে বিসর্জন দিয়ে হঠকারী পদক্ষেপ নিতে পিছপা হতেন না। তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান শত্রু। খালাতো ভাই শওকত জংয়ের সঙ্গে তাঁকে উত্তরাধিকারের লড়াই করতে হয়। প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে দল পাকান। ১৭৫৭

সালের তেইশে জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত হন। বাংলা এই প্রথমবারের মতো সত্যিকারভাবে বিদেশির দখলে গেল। পূর্ববর্তী বিজেতারা সকলেই বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। এবারে ক্ষমতার চাবিকাঠি চলে গেল সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে বৃটিশ রাজের হাতে এবং বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা হলো প্রকৃত শাসক। প্রথমদিকে কোম্পানি সত্যিকার ক্ষমতাধিকারী হলেও মৌখিকভাবে নবাবের ও দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করে। তারা নিজেদের খুশিমতো নবাব নিয়োগ করলেও নামে নবাবই ছিলেন দেশের রাজা। মোগল সম্রাটের সনদের বলেই তাঁরা বাংলার দেওয়ানি লাভ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধে চালাতে পারে। লর্ড ক্লাইভ এদেশে মোগল অভিজাত শাসক শ্রেণীর একজন বলে বিবেচিত হতেন এবং নানা মোগল উপাধিতে ভূষিত হন। তাই তাঁর ক্ষমতাগ্রহণে যে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে সেই ধারণাই তৎকালীন শাসকমহলে ছিল না। ১৭৭২ সালে বণিকের মানদণ্ড সত্যি সত্যি রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলো। ১৭৭২ সালের নর্থ রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী বৃটিশ পার্লামেন্ট বাংলা শাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কলকাতায় একজন গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর কাউন্সিল নিযুক্ত হলো এবং দেওয়ানি দায়িত্ব সরাসরি গভর্নর জেনারেলের ওপর ন্যস্ত হলো। দিল্লির নবাবকে বৃটিশ সরকার নামকাওয়াস্তে স্বীকার করে চললো। তবে বাংলার শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করলো। বাংলা বিহার উড়িষ্যার এই অবস্থান থেকে বৃটিশ ক্ষমতা সারা ভারতে বিস্তৃত হলো এবং পরবর্তী অর্ধশতকে গোটা ভারতবর্ষ বৃটিশ দখলে চলে আসে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৫৭ পর্যন্ত এই রাজত্ব চালায়। তবে ঐ বছরের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে কোম্পানি রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ সালে হলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন তাঁর ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি (উপরাজ)। ১৭৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘটে হুজুগে, তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না, যোদ্ধাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল, সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্ব ছিল দুর্বল এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠী বিশেষ করে শিখ ও পাঞ্জাবিরা ছিল বিশ্বাসঘাতক অথবা নিষ্ক্রিয়।

বৃটিশ রাজত্বে বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত। ১৯০৫ সালে এই বিশাল প্রদেশ ভাগ করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের আসামসহ গোটা উত্তর-পূর্ব এলাকার রাজ্যগুলো নিয়ে হয় একটি প্রদেশ—ইস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য নিয়ে হয় আর একটি প্রদেশ—বেঙ্গল। ১৯১২ সালে এই বঙ্গভঙ্গ নাকচ করে দেয়া হয়। বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম হয় দুটি আলাদা প্রদেশ এবং বর্তমানের বাংলাদেশ (সিলেট ছাড়া) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নিয়ে হয় বাংলা প্রদেশ। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানে বর্তমানের বাংলাদেশ হয় পাকিস্তানের পূর্ব বঙ্গ প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ হয় ভারতের একটি প্রদেশ। ১৯৫৬ সালে পূর্ব বঙ্গ প্রদেশের নতুন নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য পূর্ব পাকিস্তানে কায়েম করে স্বাধীন বাংলাদেশ।

অর্থনীতি

প্রাচীনকালে গঙ্গারিদাই ছিল একটি মহান জাতি, তাদের ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী, যার অংশ ছিল অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী। নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়া দেশটি এতো শক্তিশালী হতে পারতো না। বাংলার ইতিহাসে পাল যুগকে বলা হতো সুবর্ণযুগ, দেশ তখন যেমন ছিল বিরাট তেমনি ছিল সমৃদ্ধিশালী। মুসলমান যুগে বাংলার সমৃদ্ধির কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট আকবরের রাজসভার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলার বেশুমার ফলফুলের প্রাচুর্য এবং তিন ফসলি জমির উর্বরা শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।[১০] ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার রফতানি বাণিজ্য ছিল বিশ্ববিখ্যাত। উৎপাদনের বিভিন্নতা ও উৎকর্ষের চমৎকারিত্বে বাংলার কাপড় ও চিনি শিল্পের কোনো জুড়ি ছিল না।[১১] বাংলার মসলিন ছিল তাঁতিদের নৈপুণ্যের অনবদ্য নিদর্শন। বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের আক্রমণ এবং পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ ব্যবহারের শিকার হয়েও বাংলার তাঁত শিল্প এখনো বেঁচে আছে। জাহাজ নির্মাণ সেন রাজত্বকালে উৎকর্ষ লাভ করে এবং মোগল বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বাংলার রাজন্যবর্গের নৌবাহিনী সব আক্রমণকারী ও দখলদারদের বিব্রত রাখে। মোগল যুগে ডিঙি বাহিনী বিলুপ্তিই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার ব্যর্থতার অন্যতম হেতু। সোনারগাঁও, বাগেরহাট এবং চট্টগ্রাম ছিল জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। বাংলার সম্পদের আকর্ষণেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। বাংলায় রাজস্ব আদায় ও অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ ছিল আর্থিকভাবে অত্যন্ত লোভনীয়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে এই দুইটি সুযোগই বস্তুতপক্ষে খরিদ করে। কোম্পানি এবং বিশেষ করে তার কর্মচারীদের সীমাহীন লোভ এদেশে নিয়ে আসে ব্যাপক ও মারাত্মক দুর্গতি। ১৭৬৯-৭০ সালে এদেশে ইতিহাসের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাকে বলা হয় ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তর। বাংলার প্রায় তিন কোটি লোকের মধ্যে এক কোটি লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। কোম্পানির রাজস্ব বা তার কর্মচারীদের উপরি লাভ কিন্তু মোটেই কম ছিল না। বাংলার প্রধান খাত কৃষি এই দুর্ভিক্ষে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রমে ক্রমে বাংলার কাপড়, লবণ ও তামাক শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নীল চাষ পুরোপুরি উঠে যায়। ফলফুলের চাষ ব্যাহত হয় এবং প্রসিদ্ধ আমবাগান তার গৌরব হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি সম্পদশূন্য দেশ। দেশের ৬৫ শতাংশ এলাকা চাষের উপযুক্ত এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার জলপ্রবাহ দেশটিকে পলিমাটি দিয়ে সদা উর্বরা করে রাখে। কিন্তু জনবসতির তুলনায় দেশের সম্পদ নিতান্তই অপর্যাপ্ত। ১৯৮৮ সালের হিসেবে সারা দেশে রয়েছে ৩৬৫ লাখ একর (১৪৮ লাখ হেক্টর) জমি। এই জমির ব্যবহার নিম্নরূপ (সারণি-১.১)

সারণি ১.১

বাংলাদেশে জমির ব্যবহার

চাষোপযুক্ত জমি	২৩৪	লাখ একর
বনভূমি	৪৯	
নদী ও খাল এলাকা	২১	
পুকুর ও আবদ্ধ জলাশয়	৩২	
বসতি এলাকা	৯	
বিবিধ	২০	
	মোট ৩৬৫	লাখ একর

উৎস

১. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Managing Public Resources for Higher Growth, 1991.* চাষাবাদ ও বনভূমির হিসাব, পৃ. ২০২

২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocket Book, 1989.* বসতি এলাকার হিসাব, পৃ. ১০০

৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Year Book 1989.* নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের হিসাব,পৃ. ১৯৭

অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা খুব বেশি। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪০ লাখ, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতালগ্নে ছিল ৭ কোটি ৩০ লাখ। কিন্তু ১৯৯৮ সালে জনসংখ্যা হলো বারো কোটি সত্তর লাখ।[১২] জনবসতির ঘনত্ব অস্বাভাবিক হারে বেশি এবং দারুণ শঙ্কাজনক। প্রতি বর্গমাইল এলাকায় আছে ২২৮৪ জন লোক অথবা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৮২ জন।

দেশে খনিজ সম্পদ নেই বললেই চলে। ১৯৬৩ সালে উত্তরাঞ্চলে কিছু কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। জামালপুরে প্রায় ১০০ কোটি টনের খনি আছে কিন্তু তার গভীরতা হলো এক হাজার মিটার। দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ায় ৩০ কোটি টন কয়লা মজুদ আছে প্রায় ১৬০ মিটার নিচে এবং রংপুরের খলাসপুরে আছে ৪০ কোটি টন প্রায় ৪০০ মিটার গভীরে। দিনাজপুরের দিঘিপাড়া ও দাউদপুরে আরো কয়লাখনির সন্ধান পাওয়া গেছে। পলিমাটির দেশে বেশি গভীর থেকে কয়লা উৎকলন বিপদসঙ্কুল এবং বিশেষ করে এতো জনবহুল দেশে উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া কয়লা উৎকলন সম্ভব নয়। কয়লা উৎকলনের জন্য অধুনা অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চীনা প্রযুক্তির সহায়তায় কয়লা উৎকলন ও ব্যবহারের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে আমদানিকৃত কয়লার ব্যবহার হয় মূলত ইট পোড়ানো ব্যবসায়। কয়লাচালিত কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নেই। পিট কয়লা খুলনা ও ফরিদপুরে বেশ পাওয়া যায়, প্রায় সাড়ে তের কোটি টন। আরো নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় ৪৫ কোটি টন পিটের মজুদ আছে। কিন্তু এই সম্পদ ব্যবহারেরও কোনো উপযুক্ত সুযোগ নেই।[১৩] বাংলাদেশে যা চুনাপাথর আছে তা সবই মাটির গভীরে এবং তাই বাণিজ্যিক ব্যবহারে লাভজনক নয়। পূর্বাঞ্চলে টাকেরঘাটে পানির নিচে পাওয়া যায় ৩০ লাখ টন আর উত্তরাঞ্চলে জয়পুরহাটে প্রায় ৫০০ মিটার গভীরে আছে ২০ কোটি টন চুনাপাথর।[১৪] কিছু চীনা মাটি আছে ময়মনসিংহে আর কাচবালু আছে সিলেটে। বর্তমানে এদের সন্ধান দিনাজপুরেও পাওয়া গেছে। একমাত্র

প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি সহজে উন্নয়ন করা যায়। বিভিন্ন গ্যাসফিল্ড এবং তাদের মজুদের হিসাব সারণি ১.২-এ দেয়া আছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সব গ্যাসফিল্ড পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত, পদ্মা-মেঘনার ওপারে এখনো গ্যাস আবিষ্কৃত হয় নি। গ্যাস নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিংহভাগ হয়, গ্যাস থেকে রাসায়নিক সার হয়, ঢাকা ও চট্টগ্রামের নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শক্তির উৎস হচ্ছে গ্যাস, গার্হস্থ্য প্রয়োজনও পূর্বাঞ্চলের অনেক এলাকায় গ্যাস দিয়ে মেটানো হয়। দেশে মজুদ গ্যাস নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ১৯৯০ সালের হিসেবে প্রাক্কলিত মজুদ ছিল ২৫.৬৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (অথবা ২৫.৬৬ হাজার কোটি ঘনফুট)। এখন সরকার বলছেন যে, সঠিক হিসেব হবে ১২.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। অতি অধুনা ধারণা করা যাচ্ছে যে, মজুদের পরিমাণ ৪০ থেকে ৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট হবে। ১৯৯৫ সালের জুন পর্যন্ত মোট গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে ২.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে বছরে গ্যাসের ব্যবহার হলো প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সিলেটে অধুনা একটি ছোট তেল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মজুদ হলো চার কোটি ব্যারেল। এছাড়া অধুনা ভোলা ও উপকূল এলাকায় দুটি গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়েছে।

সারণি ১.২

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ *(ট্রিলিয়ন ঘনফুটের হিসেবে)*

গ্যাসফিল্ডের নাম		আবিষ্কারের তারিখ	প্রমাণিত মজুদ	সম্ভাব্য মজুদ
১.	সিলেট	১৯৫৫	০.৪৪	-
২.	ছাতক	১৯৫৯	১.৯০	৫.২০
৩.	রশিদপুর	১৯৬০	২.৭৮	১.৬৭
৪.	তিতাস	১৯৬২	৮.৩২	০.১৪
৫.	কৈলাসটিলা	১৯৬২	৩.৬৬	-
৬.	হবিগঞ্জ	১৯৬৩	২.৯৮	-
৭.	বাখরাবাদ	১৯৬৯	১.৬৮	২.৯৯
৮.	সেমুতং	১৯৬৯	০.১৬	-
৯.	কুতুবদিয়া	১৯৭৭	০.৭৮	-
১০.	বেগমগঞ্জ	১৯৭৯	০.০৩	-
১১.	ফেনী	১৯৮১	০.০২	-
১২.	বিয়ানিবাজার	১৯৮১	০.২৪	১.৩২
১৩.	কামতা	১৯৮১	০.৩২	-
১৪.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৯৮৮	০.৩৫	-
১৫.	জালালাবাদ	১৯৮৯	১.৫০	-
১৬.	সরিষাকান্দি	১৯৯০	০.৫০	০.৫০
১৭.	বেলাবো	১৯৯০	অনির্ধারিত	-
			২৫.৬৬	১১.৪২

উৎস : বিশ্বব্যাংক *Bangladesh : Managing Resources for Higher Growth* ১৯৯১ পৃ. ২২৩
মন্তব্য : ১. বাংলাদেশ সরকারের *National Energy Policy*, September 1995-এ বলা হয়েছে যে, প্রমাণিত মজুদ হলো মাত্র ১২.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
২. ১৯৯৫ সালে আরো তিনটি গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কৃত হয়েছে : সাংগু ১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট; শাবাজপুর ০.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট; শালদা নদী ০.২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশে ভৌত অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল, উৎপাদনী ক্ষমতা অতি নিম্নমানের এবং মানুষের দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। ১৯৬৫ সালে জাতীয় আয়ের ৫৩ শতাংশ ছিল কৃষিখাতে এবং এই খাতে ৮৭ শতাংশ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল।[১৬] ১৯৯৩-৯৪ সালে এই হিস্যাগুলো হলো যথাক্রমে ৩০.৫ এবং ৬৫ শতাংশ।[১৭]

ধান বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য এবং প্রতি বছর তিনটি ধানের ফসল চাষ করা হয়। আউশ হয় বর্ষার শুরুতে, জুলাই-আগস্টে এই ধান কাটা হয়। আমন হলো বৃষ্টি-নির্ভর প্রধান ফসল, নভেম্বর থেকে এই ধান কাটা শুরু হয়। বোরো একটি রবিশস্য এবং এই ফসল তোলা হয় এপ্রিলে। গম চাষ শুরু হয় ষাটের দশকে এবং এটাও একটি রবিশস্য। সাধারণত খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রয়োজনের চেয়ে দশ শতাংশ কম; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই ঘাটতিকে প্রায়শই বাড়িয়ে দেয়। সারণি ১.৩-এ বিভিন্ন ফসলের চাষের জমি ও উৎপাদনের হিসেব উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঁচটি বছরের জন্য এই হিসেব দেয়া হলো। ১৯৬৯-৭০ ছিল স্বাধীনতা পূর্বকালের সবচেয়ে স্বাভাবিক বছর। ১৯৭৪-৭৫-এ যুদ্ধের জন্য উৎপাদনে যে ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে। আশির দশকের প্রথম ও শেষ বছরের পরিসংখ্যানের সঙ্গে যুক্ত আছে সর্বশেষ যে বছরের বিস্তৃত হিসেব পাওয়া গেছে (১৯৯৩-৯৪)। উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অবশ্যই লক্ষণীয় তবে বিশেষভাবে অনুধাবনের বিষয় হলো, রবিশস্যের প্রবৃদ্ধি যা সম্ভব হয়েছে সেচের প্রসারে। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১১৯ লাখ টন আর চাষের জমি ছিল ২৫৭ লাখ একর। এর মধ্যে মাত্র ১০ লাখ টন বোরো চাল এবং এক লাখ টন গম ছিল রবিশস্য। ১৯৯৭-৯৮ সালে মোট উৎপাদন ছিল ২০৭ লাখ টন, কর্ষিত জমি ছিল ২৭২ লাখ একর। বোরো চালের উৎপাদন আট গুণ বেড়ে হয় ৮১ লাখ টন আর গম আঠারো গুণ বেড়ে হয় ১৮ লাখ টন। বাংলাদেশে অনেক জমিতে বছরে তিনবারও চাষ হয়। চাষের নিবিড়তা ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ১৩৪ শতাংশ, বর্তমানে তা হচ্ছে ১৮০ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫ সালে উন্নত ধান বীজের ব্যবহার হয় মাত্র ৩৬.৫ লাখ একর জমিতে অর্থাৎ ১৪ শতাংশ এলাকায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পরিমাণ ছিল ১২৮ লাখ একর অর্থাৎ অর্ধেক কর্ষিত এলাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রতি একরে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় মাত্র ১১ কিলোগ্রাম, ১৯৯৫-৯৬তে এই পরিমাণ ছিল ১৩৩ কিলোগ্রাম। ১৯৭৪-৭৫ সালে মাত্র ৩৫ লাখ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল, ১৯৯৬-৯৭ সালে ৯৩ লাখ একর ছিল সেচের আওতায়। ফলন কিন্তু তেমন বাড়ে নি। প্রতি একরে গমের ফলন শুধু দ্বিগুণ হয়েছে—৭৪৮ কিলোগ্রাম অথবা হেক্টরপ্রতি ১.৯ টন। চালের ফলন মাত্র ৭৩৩ কিলোগ্রাম (হেক্টরপ্রতি ১.৮ টন), ১৯৭৪-৭৫-এর তুলনায় প্রায় ৫২ শতাংশ বেশি।[১৮]

খাদ্যশস্যের পর গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য হলো পাট। পাটের উৎপাদন অনবরত কমছে। পাট প্রায় দুশো বছর আগে বিশ্ববাজারে একটি স্থান করে নেয় কিন্তু এখন তার চাহিদা

সারণি ১.৩

কৃষি উৎপাদন লাখের হিসেবে

পণ্য	১৯৬৯-৭০ জমি একর	১৯৬৯-৭০ ফসল	১৯৭৪-৭৫ জমি একর	১৯৭৪-৭৫ ফসল	১৯৮০-৮১ জমি একর	১৯৮০-৮১ ফসল	১৯৮৯-৯০ জমি একর	১৯৮৯-৯০ ফসল	১৯৯৩-৯৪ জমি একর	১৯৯৩-৯৪ ফসল
চাল (টন)	২৫৫	১১৮.১	২৪২	১১৯	২৫৪	১৩৬	২৬৯	১৮৫	২৪৭	১৮০
বোরো	২২	১৯.০	২৮.৭	২২	২৮	২৮	৬২	৬২	৬৪	৬৮
আউশ	৮৪	২৯.৩	৭৯	২৮	৭৭	৩২	৬৬	২৮	৪১	১৮.৫
আমন	১৪৮	৬৯.৫	১৩৪	৬০	১৪৯	৭৮	১৪১	৯৫	১৪৩	৯৪
গম	২১	১	৩.১	১.১	১৪	১১	১৪.৬	৯	১৫	১১.৩
পাট (বেল)	২০	৭১	৪১	৪০	১৫	৪৯	১৩	৪৬	১২	৪৪.৫
চা (কেজি)	১	৩১২	১	৩২২	১.১	৩৬৭	১.১৫	৪২১	১.২	৫০০
আখ	৪	৭৪	৩.৮	৬৭	৩.৭	৬৫	৪.৬	৭৪	৪.৫	৭১
তামাক	২.১	.৪	১.১	.৪	১.৩	.৫	১.১	.৩৮	.৯	.৩৭
আলু	২১	৮.৫	২.৩	৮.৮	২.৫	৯.৮	২.৯	১০.১	৩.৩	১৪.৪
মিঠা আলু	১.৮	৮.৪	১.৬	৭	১.৭	৭	১.৩	৫	১.১	৪.২
তেলবীজ	৮.৫	২.৯	৭.৬	২.৩	৭.৬	২.৫	১৪.২	৪.৭	১৩.৭	৪.৭
ডাল	৯.১	২.৯	৭.৬	২.৩	৮.১	২.১	১৮.৪	৫.২	১৭	৫.১
সবজি	৩	৯	২.৮	৭.৪	২.৯	৭.৯	৪.১	১০	৪.৫	১১.৬
ফল	৩.৪	১৬.৬	৩.৩	১৩.৪	৩.৬	১৩.৮	৪.২	১৫.৩	৪.৩	১৪.৬
তুলা (বেল)	.৩৩	.১৩	.১৮	.০৬	.১৯	.১	.৫	.৮	.৮	১.৪
মাছ (মিঠা পানি)		৭.২		৭.৩		৬.১		৬.১		৮.৪
মাছ (সামুদ্রিক)		০.৯		০.৯		২.৩		২.৪		২.৫

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৩-৯৪, পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪৮

বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Managing Resources for Higher Growth* 1991 পৃ. ১৭৫-১৮৩
Bangladesh Recent Economic Devlopment & Priority Agenda for Rapid Growth. 1995 পৃ. ৯২-৯৩
Bangladesh Fisheries : Sector Study, 1991 পৃ. ৯৩
Bangladesh Economic Trends & Development Administration Vol II 1994 পৃ. ৫৮-৫৯

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *পরিসংখ্যান বুলেটিন, অক্টোবর ১৯৯৪*, পৃ. ৪৯-৫০
Statistical Pocket book 1995 পৃ. ১৬৭ ১৬৭-১৬৮,

পরিকল্পনা কমিশন : *The First Five Year Plan* 1973 পৃ. ১১৪

শুধু কমছে। বর্তমানে অর্ধেকের কিছু কম অর্থাৎ প্রায় ১৭ লাখ বেল কাঁচা পাট রফতানি হয় এবং পাটজাত দ্রব্যের রফতানি হলো উৎপাদনের ৯০ শতাংশ, প্রায় চার লাখ টন।[১৯] পাট ১৯৬৯-৭০ সালে সারা পাকিস্তানের রফতানি আয়ে ৪৭ শতাংশ ছিল।[২০] ১৯৭৪-৭৫ সালে এই পণ্যদ্রব্য থেকে বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ ভাগ পাওয়া যেত।[২১] ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট রফতানি আয় ছিল ৪৪১৮ মিলিয়ন ডলার আর পাটের হিস্যা তাতে ছিল মাত্র ৪৩৪ মিলিয়ন ডলার।[২২]

আর একটি বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য হলো চা। প্রায় দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান মালনিছড়া প্রতিষ্ঠা পায়। পাকিস্তান আমলের শুরুতে চা মূলত রফতানি হতো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়লে সব চা-ই পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানি হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চা আবার রফতানি পণ্যে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট উৎপাদন ছিল ৫১,০০০ টন আর রফতানি হয় প্রায় ৩৩,০০০ টন।[২৩]

আখ এ দেশে প্রাচীনকাল থেকে উৎপাদিত হয় কিন্তু এই আখ থেকে শর্করা খুব কমই পাওয়া যায়। এ ছাড়া আখ জমির সব সার এতো শুষে নিয়েছে যে ফলনও নিতান্ত নিম্নমানের। বাংলাদেশে চিনি শিল্প আছে কিন্তু চিনি উৎপাদনের কোনো যৌক্তিকতা নেই, এতো বিপুল ব্যয়ে আর কোথাও চিনি তৈরি করা হয় বলে জানা নেই। আন্তর্জাতিক বাজার দরের প্রায় তিনগুণ খরচে বাংলাদেশে চিনি উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে যে তামাক হয় তার প্রায় সবটিই দেশে লাগে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর উন্নত মানের ভার্জিনিয়া তামাক উৎপাদন শুরু হয়। স্বাধীনতার পর আলু উৎপাদনেও অগ্রগতি হয়েছে এবং দেশি মিঠা আলুর পরিবর্তে উন্নত গোল আলুর উৎপাদন জনপ্রিয় হয়েছে। তুলা চাষও স্বাধীনতার পর শুরু হয়। বস্ত্রকলের চাহিদা মেটাতে এখনো প্রচুর আমদানি করতে হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়ে হয় ১০০,০০০ বেল আর আমদানি করতে হয় ৩৪৪,০০০ বেল।[২৪] ডাল, ফলমূল, সবজি এই সবের উৎপাদন গত পঁচিশ বছরে বেড়েছে সত্যি কিন্তু জনপ্রতি সরবরাহ তেমন বাড়ে নি। ভোজ্য তেলের সমস্যাটি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তেলবীজের উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও ১৯৯৬-৯৭-এ প্রায় দুই লাখ টন তেলবীজ এবং ৩১০,০০০ টন ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ।[২৫]

পুরাকালে বাংলাদেশের নদীনালা আর বিল-পুকুর থেকে পর্যাপ্ত মাছ আহরণ করা যেত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মাছ সরবরাহে ভাটা পড়ে এবং মিঠা পানির মাছ সরবরাহ কমতে থাকে। গত দু'চার বছরে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামুদ্রিক মাছ আগে শুধু উপকূলীয় এলাকায়ই পাওয়া যেত। এখন অনেক বেশি সামুদ্রিক মাছ আহরণ করা হয় এবং সারাদেশে তার চাহিদা রয়েছে। জনবিস্ফোরণের ফলে খাল বিল পুকুর যেমন কমছে তেমনি জঙ্গল এলাকাও কাটা পড়ছে বা বসতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই অবক্ষয় রোধে জনপ্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। গোশত, ডিম, দুধের সরবরাহও অপর্যাপ্ত। এখানেও জনসংখ্যার চাপ এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অভাবই সমস্যা প্রকট করে তুলছে।

শিল্পায়নে বাংলাদেশে সবিশেষ অগ্রগতি হয় নি। ১৯৬৫ সালে শিল্প খাতে জাতীয়

আয়ের মাত্র সাত শতাংশ উদ্ভূত হতো এবং শ্রমিকদের মাত্র তিন শতাংশ নিযুক্ত হতো। বর্তমানে তুলনামূলক হিসেব হলো ১৮.৭ শতাংশ এবং ৯.৮ শতাংশ।[২৬] ১৯৭৩-এ যদি শিল্প উন্নয়নসূচককে ১০০ ধারা যায় তা হলে ১৯৯৩-৯৪ সালে তা হয় ৩৩৭।[২৭] সারণি ১.৪-এ কয়েকটি বছরের জন্য শিল্প উৎপাদনের হিসেব দেয়া হলো। পাট শিল্পে বাংলাদেশের শুরুতে ছিল ৭৩টি কারখানা আর ২৪০০০ তাঁত। বর্তমানে আছে সরকারি খাতে ৩১টি ও বেসরকারি খাতে ৪১টি কারখানা (৫টি বন্ধ) এবং মোট তাঁত সংখ্যা হলো ২২৫০০, তবে ৫০০০ তাঁত অকেজো।[২৮] চিনি শিল্পেও অধোগতি লক্ষণীয়। শুরুতে পনেরোটা মিলে ১৭০০০০ টনের মতো উৎপাদন ছিল, বর্তমানে ষোলটি মিলে ২৭০০০০ টন হলো বার্ষিক উৎপাদন। কাগজ শিল্পেও পরিবর্তন খুব সামান্য। একটি মণ্ড কারখানা স্থাপিত হওয়ায় মণ্ড আমদানি খানিকটা কমেছে। ইস্পাত ইঙ্গট এখন মোটামুটি হয়ই না, যদিও ইস্পাত দ্রব্যাদি অনেক বেশি প্রস্তুত হয়। এর কারণ হলো জাহাজ ভাঙা শিল্পের বিকাশ, পুরনো জাহাজ ভেঙে ইস্পাত স্ক্র্যাপ পর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করা হয়।

সারণি ১.৪

শিল্প উৎপাদন (হাজার টনের হিসেবে)

		১৯৬৯-৭০	১৯৭৪-৭৫	১৯৮০-৮১	১৯৯০-৯১	১৯৯৪-৯৫
১.	পাটজাত দ্রব্য মোট	৫৮৭	৪৪৪	৫৯০	৪৩৪	৪০৫
২.	কার্পেট ব্যাকিং	৩৩	৪০	৭০	৫৭	৫০
৩.	তুলার সুতা (লাখ কেজি)	৪৮০	৪১০	৪৬০	৫৬০	৪৯০
৪.	কাপড় (লাখ মিটার)	৫৫০	৭৮০	৭৯০	৬০০	১৭০
৫.	চিনি	৯৩	৩৮	১৪৫	২৪৬	২৭০
৬.	সিমেন্ট	৫৩	১২৭	৩৪৪	২৭৫	৩১৬
৭.	কাগজ	৩১	৩০	৩৩	৩৬	৩২
৮.	নিউজপ্রিন্ট	৩৬	২১	৩৯	৪৭	৪৩
৯.	রাসায়নিক সার মোট	১০১	১০৫	৪২২	১৫৩৩	২১৪৪
১০.	ইউরিয়া	৯৬	৬৮	৩৪২	১৮২২	১৯৮১
১১.	টি.এস.পি	০	৩২	৫৭	১১১	৭৭
১২.	পেট্রোলজাত দ্রব্য	৮১৮	৭৭২	১২০০	১০৮৬	১৩৭১
১৩.	সিগারেট (লাখ সংখ্যা)	১৭৭৮৬০	১০৪৪১০	১০৯০৬০	১৩৬০৪০	১৭৩৭৯০
১৪.	হিমায়িত খাদ্য	১.৭	১.২	১.১	৬.১	৮.২
১৫.	ইস্পাত ইঙ্গট	৫৫	৭৬	১৩৯	৫৮	২৫
১৬.	ইস্পাত রড		৩৫	৬৭	৫৮	১৪৯
১৭.	দিয়াশলাই (হাজার গ্রস বাক্স)	১৩০০০	৬২২৭	১০০৮৩	১০৮৬১	১১৮১৭
১৮.	জুতা (হাজার ডজন)	৫৮৬	২৮০		৩১৬	২৪৩
১৯.	পোশাক (লাখ ডজন)	০	০	নামমাত্র	১৪০	৪৭২
২০.	চামড়া (লাখ সেন্টিমিটার)				১০০	১১৫
২১.	প্রাকৃতিক গ্যাস (বিলিয়ন ঘনফুট)	২৬	২৭	৫০	১৭৪	২৪৯

মন্তব্য : ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯৪-৯৫-এর জন্য তুলা শিল্পের হিসেব শুধু সরকারি খাতের হিসেব (মোট সামর্থ্যের ১/৩-এর কম)

উৎস :

১. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন : *প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা* (ইংরেজি) ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ১৯৬-৯৮, ৩৫৮-৩৬০
২. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh Economic Trends & Development Administration* Vol II, ১৯৯৪
৩. বিশ্বব্যাংক : *From Stabilization to Growth.* ১৯৯৪ পৃ. ২২৬
৪. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh Economic Update.* ১৯৯৬ পৃ. ৫৫
৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocket book* ১৯৮৩, পৃ. ২৫৩
৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Year book* ১৯৯৩, পৃ. ২৩৪-২৩৮
৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Year book* ১৯৯৫ পৃ. ১৯০-১৯১, ১৯৩
৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocket book* ১৯৯৬ পৃ. ২২২

যেসব শিল্পের প্রবৃদ্ধি হয়েছে তা হলো নিম্নোক্ত। রাসায়নিক সার উৎপাদন প্রায় পঁচিশ গুণ বেড়েছে এবং সার রফতানিও হয়। সিমেন্টের উৎপাদন বাড়লেও এখনো প্রায় ২৪ লাখ টনের মতো আমদানি করতে হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং টেলিকম যন্ত্রপাতি যথেষ্ট উৎপাদিত হয়। পাটের পরিবর্তে কাপড় শিল্প এখন হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় খাত। ১৯৭৪-৭৫ সালে ৪৯টি কারখানায় ৯ লাখ টাকু এবং ৭৬০০ তাঁত ছিল।[২৯] ১৯৯০ সালে ৭৭টি কাপড় কলে ১৬.২ লাখ টাকু এবং ৮৭০৭টি তাঁত ছিল। এ ছাড়া ছিল ২৭৭৯৩ টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁত এবং ৫.৩ লাখ হাতে চলা তাঁত। কুটির শিল্পের তাঁতে দেশের ৬৫ শতাংশ কাপড় বোনা হতো। কাপড় শিল্প ছিল শিল্পখাতের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর এই খাতে নিযুক্ত ছিল শিল্প খাতের অধিক শ্রমিক।[৩০] পোশাক শিল্প আশির দশকে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে; ১৯৮১ সালে এই খাতে রফতানি আয় ছিল মাত্র ৩২ লাখ ডলার, ১৯৮৯.৯০-তে তা বেড়ে হয় ৬১ কোটি ডলার এবং ১৯৯৩-৯৪-এ হয় ১৫৬ কোটি ডলার। ১৯৯৬-৯৭-এ ১১৮টি কাপড় কলে এবং তাঁত শিল্পে প্রায় ১৮ লাখ শ্রমিক কাজ করতো এবং এর প্রায় বারো লাখ ছিল তাঁত শিল্পে। প্রয়োজনের তুলনায় তাদের উৎপাদন ছিল সুতার অর্ধাংশ এবং কাপড়ের এক-তৃতীয়াংশ।[৩১] হিমায়িত খাদ্য আর একটি প্রবৃদ্ধিশালী শিল্প। ভারত থেকে চুনাপাথর সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারলে সিমেন্ট শিল্পেও প্রবৃদ্ধি দ্রুত অর্জিত হবে। পেট্রোলজাত দ্রব্যাদির চাহিদা প্রায় ২০ লাখ টনে সীমাবদ্ধ, এর অর্ধেক আমদানি হয় (ডিজেল আর কেরোসিনই বেশি) এবং বাকি অর্ধেকের জন্য রিফাইনারির ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়িয়ে পেট্রোলের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।[৩৩]

বাংলাদেশে জ্বালানির ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তিকালে মোট উৎপাদন ছিল ২৭০ ট্রিলিয়ন বি.টি.ইউ, যার মধ্যে মাত্র ৭০ ট্রিলিয়ন ছিল বাণিজ্যিক জ্বালানি। ১৯৯৩-৯৪ সালে এই দুই পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৪৫৬ ট্রিলিয়ন বি.টি.ইউ এবং ১৮০ ট্রিলিয়ন। সাধারণ পরিচিত হিসেবে বাণিজ্যিক জ্বালানির ব্যবহার জনপ্রতি ১৮ কিলোগ্রাম তেলসম থেকে ৫৯ কিলোগ্রামে বেড়েছে।[৩৪] সনাতনী জ্বালানির উৎস হচ্ছে বনসম্পদ এবং কৃষিপণ্য। জৈব সমাহার (Biomass) থেকে জ্বালানি সরবরাহের ৬৫

শতাংশ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মিলে ২১ শতাংশ আর পেট্রোল থেকে আসে ১১ শতাংশ।[৩৫] এই হিসাব ১৯৯০ সালের। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক গ্যাসের হিস্যা বেড়েছে এবং জৈব সমাহারের হিস্যা খানিকটা কমেছে। জনপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক বেড়েছে, ১৯৭৩-এ ছিল ১৪.৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা,[৩৬] ১৯৯৩-৯৪ সালে ৮৬.৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা,[৩৭] স্বাধীনতা-পূর্বকালে মোট চাহিদা ছিল ২২৫ মেগাওয়াট[৩৮], ১৯৯৩-৯৪ সালে সেই চাহিদা হলো ১৮৭৫ মেগাওয়াট।[৩৯] মুক্তিযুদ্ধকালে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা আক্রান্ত হয়। ১৯৭০ সালে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৪৫ মেগাওয়াট।[৪০] খুব দ্রুততার সঙ্গে এসবের মেরামত সম্পন্ন করা হয়। ১৯৭৮ সালে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৬০২ মেগাওয়াট এবং সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩৯৬ মেগাওয়াট।[৪১] ১৯৯০-৯১ সালে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৩৫০ মেগাওয়াট আর সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৬৪০ মেগাওয়াট। কিন্তু তারপর চলছে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব। ১৯৯৩-৯৪ সালে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হয়েছে মাত্র ২৬০৮ মেগাওয়াট, যার ফলে চাহিদা ব্যাহত হচ্ছে।[৪২] ১৯৭২-৭৩ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২২ শতাংশ পেট্রোলজাত দ্রব্যের ওপর নির্ভর করতো (ডিজেল, ফুয়েল),[৪৩] ১৯৯৩ সালে এই নির্ভরশীলতা মাত্র ৬.৮ শতাংশে পর্যবসিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বিদ্যুতের ৮৬.৬ শতাংশ উৎপাদিত হয় আর পানি শক্তির হিস্যা মাত্র ৬.৬ শতাংশ।[৪৪] ১৯৮২ সালে পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠা হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেলের ব্যবহার কমে যায়; কারণ গ্যাসে উৎপাদিত বিদ্যুৎ তখন সহজেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাঠানো যেত। পশ্চিমে গ্যাস নেই বলে সেখানে কিছু বিদ্যুৎ তেলে উৎপাদিত হয়; কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার মোটেই হয় না। যৎসামান্য কয়লা আমদানি করা হয় এবং এর ব্যবহার প্রধানত হয় ইট পোড়াতে এবং খানিকটা রেল বিভাগে। দেড় লাখ টনের মতো কয়লা বছরে আমদানি করা হয়।[৪৫] পল্লী বিদ্যুৎ সরবরাহ বস্তুতপক্ষে শুরু হয় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রায় ২৩৮০০ গ্রামের বিদ্যুতায়ন হয়েছে।[৪৬]

বাংলাদেশের ভৌত অবকাঠামো স্বাধীনতালগ্নে ছিল নিতান্তই মান্ধাতা আমলের। বৃটিশ আমলে সারা বাংলাদেশ ছিল কলকাতার অবহেলিত পশ্চাৎভূমি। ১৯৬০-এর দশকে প্রথমে শুরু হয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার হয় একটি বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। রাস্তাঘাট, সেতু, রেলওয়ে লাইন, ট্রাক-বাস, জ্বালানি সরবরাহের সব ব্যবস্থা এবং সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই পুনর্গঠনের কাজটি ছিল প্রায় এক দশকের ব্যাপার।

প্রথম রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয় ১৮৬২ সালে এবং তারপর প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই বাহনটিই ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে ১৭৭৬ মাইল বা ২৭৪৬ কিলোমিটার হলো রেলওয়ের বিস্তার; উত্তরাঞ্চলে মাত্র ৫৪৫ মাইল বা ৯২৪ কিলোমিটার হলো ব্রড গেজ, বাকি সব মিটার গেজ। স্বাধীনতালগ্নে এই ব্যবস্থায় ছিল ৫০০ ইঞ্জিন, ১৬৭৪ কোচ আর ১৮৬৬৭টি ওয়াগন।[৪৭] ১৯৯৩-৯৪ সালে ছিল ২৭৫টি

ইঞ্জিন, ১৩৫৯ কোচ আর ১৭৬৬৮টি ওয়াগন।[৪৮] রেলের অবস্থা খারাপ। যমুনা সেতু হয়েছে, তাই দুই পারের রেল লাইন সংযুক্ত হবে। তাতে যে খুব ফায়দা হবে তা মনে হয় না। দুই গেজের সমস্যা থেকেই যাবে এবং রেলওয়ের সার্বিক দুরবস্থা বহাল থাকবে। যানবাহনে রেলওয়ের গুরুত্ব অনবরত কমছে। ১৯৬৯-৭০ সালে রেলওয়ে বছরে ৭২৮ লাখ যাত্রী এবং ৪৮ লাখ টন মাল বহন করে।[৪৯] ১৯৯৪-৯৫ সালে তা কমে গিয়ে হয় ৪০০ লাখ যাত্রী এবং ২৭ লাখ টন মালামাল।[৫০] বাংলাদেশের রেলওয়ে দক্ষতায় অত্যন্ত নিম্নমানের এবং সরকারি অনুদানে এই শ্বেতহস্তীটি পরিচালিত হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে রেলওয়ে খাতে ভরতুকির পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি টাকা।[৫১]

বাংলাদেশে সবচেয়ে গতিশীল যানবাহন হচ্ছে মোটর গাড়ি। রাস্তা যেমন বাড়ছে, বাস-ট্রাকের সংখ্যাও তেমন বাড়ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দেশের যাত্রী ও মালামাল যে হারে বহন করে তার একটি হিসাব নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি ১.৫

বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবহন ক্ষমতা ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯৭ (শতাংশ হিসাবে)

		রাস্তাযান	নৌযান	রেলওয়ে
যাত্রী	১৯৮৯-৯০	৬১%	২০%	১৯%
	১৯৯৭	৭২%	১৭%	১১%
মালামাল	১৯৮৯-৯০	৪৮%	৩৮%	১৩%
	১৯৯৭	৬৫%	২৮%	৭%

সূত্র : *চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা*। ১৯৯০ পৃ. XIII.23
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ১৯৯৭ পৃ. XVII. 6

১৯৭২ সালে পাকা রাস্তা ছিল ৩৫৮৯ কিলোমিটার এবং কাঁচা রাস্তা ৫৬৩ কিলোমিটার, মোট যন্ত্রচালিত গাড়ি ছিল ৪৫১৭৫ (৪৪৯৭টি বাস এবং ৭২৭৮টি ট্রাক)।[৫২] ১৯৯৪-৯৫ সালে এসবের পরিমাণ ছিল : পাকা রাস্তা ৮৮৬২ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৬৭৪২ কিলোমিটার, যন্ত্রচালিত যানবাহন মোট ১৭০,০০০, এর মধ্যে বাস ২৭ হাজার ও ট্রাক ৩৫ হাজার।[৫৩]

বাংলাদেশে জলপথ এখনো বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বর্ষব্যাপি নাব্য পথের ক্রমাগত সঙ্কোচন হচ্ছে। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার হিসেবে নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য হলো ৩৮০০ কিলোমিটার এবং বর্ষাকালে ৬০০০ কিলোমিটার।[৫৪] উপকূলীয় এলাকায় জলপথই বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের একমাত্র উপায়। জলপথে যানবাহন প্রধানত ব্যক্তিমালিকানা খাতে আছে। আশির দশকের শেষদিকে সনাতনী নৌযানে ডিজেল ইঞ্জিন লাগিয়ে জলযানের দক্ষতা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। এখনো সনাতনী নৌকা নৌপথের ট্রাফিকের একটি বড় অংশ বহন করে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মালামাল এবং ৬ শতাংশ যাত্রী।[৫৫]

১৯৭২ সালে ৬৭০০ লোকের জন্য একটি পোস্ট অফিস ছিল এবং ১৬০০ লোকের জন্য ছিল একটি টেলিফোন।[৫৬] ১৯৯২-৯৩ সালে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ৮৩১২টি অর্থাৎ ১৩৬১৪ জনের জন্য একটি ডাকঘর। কিন্তু টেলিফোন ছিল প্রতি ৪৬০ জনের জন্য একটি।[৫৭] ডাক বিভাগ সরকারি ভরতুকিতে চলে। অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল খুব মন্দ নয়। যদিও বিমান সংস্থার জন্য ভরতুকি দিতে হয় বিস্তর। ১৯৯৩ সালে বিমানে ২১.৩ লাখ যাত্রী চলাচল করে, ২২৬১৮ টন মালামাল পার হয়।[৫৮]

বাংলাদেশে দুটো সামুদ্রিক বন্দর আছে। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বন্দর বছরে ৩৫ লাখ টন মালামাল খালাস করতো আর চালনা নোঙরে ২৫ লাখ টন খালাস হতো।[৫৯] ১৯৯২-৯৩ সালে চট্টগ্রামে ১০০ লাখ টন ও মংলাতে ২৪ লাখ টন মাল আমদানি ও রফতানি হয়।[৬০] সত্তরের দশকে চালনা নোঙরকে মংলা বন্দরে উন্নীত করা হয়। দুটো বন্দরেই গভীরতা খুব কম, তাই ২৪ ফুটের বেশি গভীর জাহাজ পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করতে পারে না।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেশ সীমিত। ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের মোট রফতানি ছিল প্রায় ২৫০ কোটি টাকা আর আমদানি প্রায় ২৮০ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত এবং সেখানে রফতানিকৃত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক মূল্য ধরলে মোট রফতানি ছিল ৫০০ মিলিয়ন ডলার আর আমদানি ছিল ৫৩০ মিলিয়ন ডলার। এ সম্বন্ধে তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বরতায় দেশের ভৌত অবকাঠামো ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে আমদানির বহর খুব বেড়ে যায়। একই সঙ্গে দেখা দেয় খাদ্য ও তেল সঙ্কট। খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে প্রায় চারগুণ, তেলের বাজার হয় আগুন এবং সারের দামও খুব বেড়ে যায়। এই প্রতিকূল অবস্থায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা রফতানি আয়ও অনেকটা কমিয়ে দেয়। তাই ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশের রফতানি আয় হয় মাত্র ৩৪৪ মিলিয়ন ডলার আর আমদানি ব্যয় হয় ১৪০৩ মিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কলেবর তখনো কিন্তু জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশের নিচে। বর্তমানে এই হিস্যা এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছেছে এবং রফতানি আয় হয়েছে গতিশীল। সারণি ১.৬-এ কয়েকটি বছরের আমদানি-রফতানির হিসাব তুলে ধরা হলো। রফতানিতে তিনটি খাতে আয় বাড়ছে, যথা পোশাক শিল্প, হিমায়িত খাবার আর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য। আর একটি বিশেষ পরিবর্তন হলো রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি। স্বাধীনতা-পূর্বকালে রেমিট্যান্স ছিল ৩০ মিলিয়ন ডলার, বর্তমানে ১৫২৫ মিলিয়ন ডলার। আমদানির মধ্যে বিশেষ দ্রব্যাদি হলো খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, তুলা ও তন্তু, পেট্রোল, সিমেন্ট ও কাপড়।

বাংলাদেশে মানব সম্পদের কলেবর বিশাল কিন্তু তার গুণগত অবস্থান অত্যন্ত নিম্নমানের। মানুষের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য দুটোর অবস্থাই খুব শোচনীয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালে একজন বাঙালির দৈনিক ক্যালোরি সরবরাহ ছিল ১৭০০, সম্ভবত বিশ্বের নিম্নতম স্তরে।[৬১] ১৯৭২ সালে ৬৩০০ জন লোকের জন্য ছিল একজন চিকিৎসক এবং ৫৯০০ জনের জন্য একটি হাসপাতাল শয্যা।[৬২]

সারণি ১.৬

বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি ও ব্যয় (মিলিয়ন ডলারের হিসেবে)

প্রাপ্তি

	১৯৬৯-৭০	১৯৭৪-৭৫	১৯৮০-৮১	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৭-৯৮
রেমিট্যান্স	জানা নেই	৩৫	৩৭৯	১২৪৭	১৫২৫
মোট রফতানি	৩৫০ + ১৬৪	৩৪৪	৭১১	২৫৩৪	৫১৭২
কাঁচা পাট	১৬২	৮৩	১১৯	৫৭	১০৮
পাট দ্রব্য	১৬৪ + ৩৪	২০১	৩৬৭	২৮৪	২৮১
চা	+ ৫১	২১.৫	৪১	৩৮	৪৭
চামড়া	১৩	২৪.৩	৫৭	১৬৮	১৯০
হিমায়িত খাবার	৩২	৪.০	৪০	২১০	২৯৪
পেট্রোলজাত দ্রব্য		৪.০	৪৯	১৫.৬	১১
পোশাক		০	৩.২	১৫৫৬	৩৭৮৩
সার		০	৯.৫	৫৪.৪	৫৯
কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট	+ ২৩	৩.০	৮.৭	১৪.৪	জানা নেই
ফল ও সবজি		০.০৮	২.০	১৪.১	৩৯

ব্যয়

মোট আমদানি	৩৮১ + ২০২	১৪০৩	২৫৩৩	৪১৯১	৭৫২৪
মূলধনী দ্রব্য	১২৪ + ১৩	১৬১	৬৯০	১৩৯৬	২০৭২
খাদ্যশস্য	৮২ + ৬৭	৫৪৪	২৫১	১৬৮	৩৬৯
ভোজ্য তেল ও বীজ	১৮ + ২৬	৪৮	১০৩	২০৫	৩১০
পেট্রোল-ক্রুড ও অন্যান্য	১০.৫	১৫৬	৫০৩	৩২৩	৪৩৫
তুলা ও সুতা এবং স্টেপল ফাইবার	৩ + ৫৩	৭৫	১৪১	২২৪	৫৮২
সিমেন্ট	৩.৮ + ১৫	২৪	৪৮	১২৯	১৫২
কাপড়	+ ৫১	৯	৩৬	৬৭৪	১২৬৪
সার	১০	৮৬	১০৪	১৩৫	১০৮
জাতীয় আয়	৪৭১২	৮৯৮১	১২৮৩৭	২৫৮৮৭	৪৪০৯০

ব্যাখ্যা : + সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানিকৃত অথবা সেখান থেকে আমদানিকৃত পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য দেখায়।

উৎস :

১. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Development in a Rural Ecomomy* 1974. Vol II. সারণি ১০.১, ১০.৩, ১০.৫ অ ১০.৬ (১৯৬৯-৭০ সালের হিসাব)

২. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Ecomomic Trends & Development Administration* 1984 Vo. II পৃ. ১৫-২১ (১৯৭৪-৭৫ ও ১৯৮০-৮১র হিসাব)

৩. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Recent Economic Development & Prioity Reform Agenda for Rapid Growth.* 1995 পৃ. ৬৮-৭০। ১৯৯৩-৯৪ সালের তথ্যের জন্য অতিরিক্ত দুইটি বই বিবেচনা করা হয়েছে
বাংলাদেশ ব্যাংক : ১. *Import Payments 1993-94* ২. *Export Receipts 1993-94.*

৪. বাংলাদেশ সরকার : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৯ পৃ. ১৫০, ১৫১
বাংলাদেশ ব্যাংক : *বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯৯৭-৯৮ পৃ. ১১৭ ও ১১৮
বিশ্বব্যাংক : *World Bank Tables 1999*

১৯৯৬ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা হলো ২৪৬৩৮ অর্থাৎ প্রতি ৪৯৫৫ জনে একজন ডাক্তার, হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা হলো ২৯১০৬ অর্থাৎ ৩২৮৮ জনে একটি বিছানা। জনপ্রতি ক্যালোরি সরবরাহ হলো ২২৪৪।[৬৩] অপুষ্টির শিকার প্রায় অর্ধেক জনগণ। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি যথাযথ অবকাঠামো গঠনে দেশে বেশ প্রগতি হয়েছে। ১৯৯৬ সালে মোট ৩৯৫টি থানায় থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়। এইসব কমপ্লেক্সে ৩১টি শয্যা এবং ৯ জন করে চিকিৎসক থাকার কথা। একই সঙ্গে ২৭০০টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।[৬৪] ১৯৯৪ সালে এছাড়া ১৩৯৭টি সরকারি ডিসপেনসারি ছিল এবং স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ছিল ৭৫৫৬৭।[৬৫]

জনসংখ্যা পরিকল্পনায় অধুনা কিছু সাফল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সত্তরের দশকে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশে পৌছে, বর্তমানে তা ২ শতাংশের নিচে নেমেছে বলে অনুমিত হয়। ১৯৮১-১৯৯১ আদমশুমারিকালে এই হার ছিল ২.২ শতাংশ। ১৯৭৫ সালে জন্মহার ছিল ৪৭, মৃত্যুহার ১৯.৪, প্রজনন হার ৬.৬, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারকারীর হার ৭.৭, শিশু মৃত্যুহার ১৩৮ এবং জীবনের আশা ছিল ৪৬ বছর।[৬৬] ১৯৯৩-৯৪ সালে পরিবর্তন বৈপ্লবিক এবং এই পরিবর্তনের সূচনা হয় আশির দশকের শেষদিকে। প্রজনন হার এখন ৩.৪, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার ৪৪.৬ শতাংশ, শিশু-মৃত্যুর হার ৯১, জন্মহার ২৭.৮, মৃত্যুহার ৯, জীবনের আশা ৫৮।[৬৭] মহামারী দেশে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে এবং দারিদ্র্যই হচ্ছে আশু মৃত্যু ও অপুষ্টির প্রধান কারণ।

বৃটিশ-ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ শতাংশ। স্বাধীনতালগ্নে ১৯৭৪ সালে এই হার উন্নীত হয়ে ২৫ শতাংশ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রভর্তির সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল ৫৫ লাখ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৫ লাখ, বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্রে ১১০০০, ডিগ্রি-শিক্ষাস্তরে ৬০০০০ এবং প্রকৌশলী পর্যায়ে ২৩০০।[৬৮] বর্তমানের অবস্থান সারণি ১.৭-এ দেয়া হলো।

সারণি ১.৭

ছাত্রভর্তির অবস্থা ১৯৯৫-৯৬

	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
প্রাথমিক পর্যায়	৭৮৫৯৫	১৭৮ লাখ	৩.২ লাখ
মাধ্যমিক পর্যায়	১২৫৫৩	১২.৫ লাখ	১.২৭ লাখ
ডিগ্রি কলেজ	১৪২৪	১৯.২ লাখ	৪৬৯১০
বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি	১১	১.১৯ লাখ	৩৯২৭
প্রকৌশলী	১	৫০৩২	৪০২
কৃষি	১	৪৮৩৯	৩২৯
প্রকৌশলী কলেজ	৪	২৪৮০	২৪৭
মেডিকেল কলেজ	১৮	৯৬৬৫	১২৫৭
অন্যান্য পেশাভিত্তিক কলেজ	৮৯	৫৯০৯৭	৩১১৫
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়	১২	৩৬৭৬	৪৬৮
মাদ্রাসা	৬১০০	১.৮৭ লাখ	৮৭১২২

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিদ্যালয়ের হিসাব অন্তর্ভুক্ত নয়।

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocket Book* ১৯৯৭ পৃ. ৩৩১-৩৩৬

১৯৯১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি ছিল বড় মন্থর। সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৩৩ শতাংশ। ঝরে পড়ার হার ছিল ৬০ থেকে ৮৫ শতাংশ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র ছিল মাত্র ৫৫ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকে শিক্ষার প্রতি জাতীয় অঙ্গীকার পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে ছাত্র ভর্তির হার হয়েছে ৭৮ শতাংশ, ঝরে পড়ার হার নেমেছে ৪৮ শতাংশে, মেয়েদের ভর্তি বেড়ে হয়েছে মোট ভর্তির ৪৮ শতাংশ এবং সাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে ৪৭ শতাশং।[৬৯] প্রাথমিক শিক্ষায় দুই ধারা প্রচলিত, একটি হলো আধুনিক ধারা আর অন্যটি হলো ধর্মীয় শিক্ষার ধারা, এই দ্বিতীয় ধারাটি বাংলাদেশে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় খুব বিস্তৃতি লাভ করে এবং প্রগতির পথে এই ধারা একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। আধুনিক ধারায় পাঠ্য বিষয় পুরনো ও অনাকর্ষণীয় এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নেহায়েত মান্ধাতা আমলের। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এই দুই ক্ষেত্রেই নতুনত্ব ও আধুনিকতার দিশারী। শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো ভ্রান্ত এবং অদক্ষ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ। ঢাকা থেকে দেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক নিযুক্তি, শিক্ষা বিষয় নির্ধারণ ও বই বিতরণের কাজ চলে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে ব্যর্থতা প্রচুর ও দুর্নীতি সর্বত্রগামী। শিক্ষার আর দুই সমস্যা হলো উচ্চশিক্ষিত বেকার সমস্যা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলপুষ্ট সন্ত্রাসের ছড়াছড়ি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ অতি সামান্য। ১৯৮৬-৮৭ সালে শিক্ষা বাবদ জনপ্রতি সরকারি খরচ ছিল ৯৭ টাকা আর স্বাস্থ্য বাবদ মাত্র ৩৪ টাকা। ১৯৯৬ সালে এই হিসাব যথাক্রমে ২৮৮ টাকা এবং ১৩২ টাকা।[৭০]

দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনীতির দুই অভিশাপ। স্বাধীনতা-পূর্বকালেই অবস্থা খারাপ ছিল, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকালে তা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করে। ১৯৬৩ সালে ৫৫ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করতো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এই অবস্থার অবনতি ঘটে, তবে মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলার ফলে দারিদ্র্য খুব করে বেড়ে যায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রায় ৮৩ শতাংশ লোক ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হলে এবং দারিদ্র্য নিবৃত্তির জন্য জোর প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫১ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান নেয়। অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।[৭১] বাংলাদেশের গ্রামে হলো মানুষের ভিড়, ১৯৭০ সালে ৯৪ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করতো, এখনো প্রায় ৮৫ শতাংশ লোক গ্রামবাসী। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী ২৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার ভূমিহীন, আরো ২৮ শতাংশের আধা একরের কম জমি ছিল এবং ১২ শতাংশের জমি ছিল আধা থেকে এক একর।[৭২] ১৯৯৬ সালের শ্রমিক জরিপ অনুযায়ী মোট শ্রমজীবী ছিল ৫.২ কোটি, যাদের মধ্যে ৩.৪৫ কোটি ছিল কৃষি-নির্ভর আর ৫২ লাখ ছিল বিভিন্ন শিল্প খাতে। এদের মধ্যে প্রায় দুই কোটি শ্রমিকের কাজ বলতে কিছুই ছিল না।[৭৩] স্বাধীনতা-পূর্বকালেও অবস্থা খুব ভালো ছিল না, তখন কর্মহীন শ্রমিকের হার ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ।[৭৪] তাই বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ যেমন নেই, তেমনি তারা কাজকর্মেও নিয়োজিত নয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস মহিমামণ্ডিত এবং উত্তরাধিকার নিতান্তই গর্বের বিষয়। প্রকৃতিই যেন এদেশের জনমানবকে খুব কোমল ও নম্র আবার তেমনি দৃঢ়চেতা ও সাহসী করে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের স্রোতস্বিনী, সমুদ্রসম গর্জনকারী নদীমালা এবং কুলুকুলু তানে প্রবাহিত অসংখ্য নির্ঝরিণীই বাঙালিদের সঙ্গীত ও চারুকলায় আসক্তি এনে দিয়েছে। সবুজ শ্যামলিমা, সীমাহীন গুল্মোদ্যান আর বিস্তৃত মর্মরিত ধানখেত সুরুচির বিকাশে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করে। পাখির কিচিরমিচির, কোকিলের তান, ঘুঘুর গান আর বৃষ্টির টাপুরটুপুর বাঙালি চরিত্রে সুষমা ও স্নিগ্ধতা প্রদান করে। প্রকৃতির খেয়ালে উর্বরা মাটি তাই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন মানব সমাবেশের দেশ হিসেবে বানিয়েছে বাংলাদেশ। অশিক্ষিত এবং গরিব বাঙালির এক ধরনের পরিমার্জনা ও পরিশীলিত স্বভাব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন জাত ও বর্ণের গলন পাত্র বাংলাদেশের রয়েছে এক উদারনৈতিক আদর্শ এবং প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা একান্তই হতবুদ্ধির বিষয়। বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ এখানে যেন লেগেই রয়েছে। অধুনা দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রিত ও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আশাব্যঞ্জক। বেকারত্ব এবং অপুষ্টি নিত্যদিনকার ব্যাপার। মানব সম্পদের গুণগত অবস্থান হৃদয়বিদারক। অর্থনৈতিক অবকাঠামো অথবা ভৌত অবকাঠামোর দারুণ দুরবস্থা। সামাজিক সম্পর্কে এক ধরনের নৈরাজ্য ও হতাশা বিরাজমান। লাভের খাতায় আছে প্রায় বারো কোটি মানুষের সমজাতীয়তা বা সমমাত্রিকতা, কথা বলার এবং ভাব প্রকাশের একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ভাষা এবং সমাজে এক ধরনের সমতাবাদ। জাতিটি একটি অগ্নিদীক্ষা অতিক্রম করে চিতাভস্মের ওপর নবজীবন লাভ করেছে। সর্বোপরি বাঙালিরা তাদের দেশ ও ভাষাকে বড় ভালোবাসে। তাই তাদের জাতীয় সঙ্গীত হলো "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।
ঐতিহাসিক ডিওডোরাস লেখেন যে, আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন সবচেয়ে শক্তিশালী ভারতীয় জাতি ছিল গঙ্গারিদাই যা বর্তমানের বাংলাদেশ। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *History of Bengal.* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৬৩, পৃ. ৪১।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ডর্ফম্যান মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির শুনানিতে বলেন, "অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তান বস্তুতই একটি ভ্রান্তি।" House of Representations : *Crisis in East Pakistan,* Hearings before the Sub-committee on Foreign & Pacific Affairs of the Committee on Foreign Affairs ১১ ও ২৫ মে ১৯৭১, পৃ. ২৬।

২. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সম্পাদিত *East Pakistan-A Profile* ওরিয়েন্ট লংম্যান ঢাকা, ১৯৬২।
আহমদ হাসান দানির প্রবন্ধ "The Land & the People".

৩. হারুন রশীদ : *East Pakistan : A Systematic Regional Geography and the Development Planing Aspects* : শেখ গোলাম আলী, লাহোর ১৯৬৫, পৃ. ৫২।

৪. বাংলাদেশে যে বৃষ্টিপাত হয় তাতে ২৬৩০ লাখ একর ফুট পানি হয়। বাকি ৮৬৯০ লাখ একর ফুট পানি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার বহির্দেশের অববাহিকা থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে আসে। জুন থেকে শুরু করে পাঁচ মাসে পানির ঢল হলো যথাক্রমে ১৪২০, ২০৩০, ২৪১০, ২০০০ এবং ১১৪০ লাখ একর ফুট।
বিশ্বব্যাংক *Bangladesh Land & Water Resource,* Sector Study, Vol. VI. Washngton DC, 1972 Table I.

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত, *History of Bengal,* পৃ. ৩৭৪।

৬. কামরুদ্দিন আহমদ : *The Social History of East Pakistan.* ওরিয়েন্ট লংম্যান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৮।

৭. এম.এ. রহিম : *Social & Cultural History of Bangladesh,* পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটি, করাচি, ১৯৬৩, পৃ. ৬৮, বাংলাদেশ সরকার : 1991 Population Census Vol 1. Page 101.

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার : *History of Bengal*, পৃ. ৯৭।

৯. এম.এ. রহিম : *Social & Cultural History,* পৃ. ২৮।

১০. এম.এ. রহিম : পৃ. ৩৮৫-৩৮৯।

১১. এম.এ. রহিম : পৃ. ৩৯১-৩৯৩।

১২. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Managing Public Resources for Higher Growth.* ওয়াশিংটন, ১৯৯১, পৃ. ১৫৫।

১৩. পরিকল্পনা কমিশন : *Draft of the Fourth Five Year Plan.* বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. VII-I এবং VII-19.

১৪. পরিকল্পনা কমিশন : *The First Five Year Plan.* ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৫৩

১৫. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Managing Public Resoures for Higher Growth,* পৃ. ২২১।

১৬. বিশ্বব্যাংক : *World Development Report, 1985,* পৃষ্ঠা ১৭৮, ২১৪।

১৭. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Recent Econmic Developments & Priority Reform Agenda for Rapid Growth.* 1995, পৃ. ১।

১৮. ১৯৭৪-৭৫ সালের হিসাবের সূত্র—
আবুল মাল আবদুল মুহিত : *বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য,* ১৯৯১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৮১-৮৮।
১৯৯৩-৯৭ সালের হিসাবের সূত্র—
বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৮, পৃ. ১১৩।

১৯. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Annual Economic Update, 1997,* পৃ. ৪৪, ৫৮, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ সালে কাঁচা পাট রফতানি খুব কম ছিল, মাত্র ১৪ লাখ টন।

২০. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন : *The Fourth Five Year Plan.* করাচি, ১৯৭০, পৃ. ৬৩। পাকিস্তানের মোট রফতানি আয় ছিল ৩২৫ কোটি রুপি আর পাটের হিস্যা ছিল ১৫৯ কোটি রুপি।

২১. বাংলাদেশ সরকার : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ* ১৯৭৪-৭৬, পৃ. ৪৪, বাংলাদেশের মোট রফতানি আয় ছিল ৫৫৪ কোটি টাকা আর পাট থেকে উদ্ভূত ছিল ৪৩৪ কোটি টাকা।

২২. বিশ্বব্যাংক : *Bangladesh : Recent Economic Developments 1995,*, পৃ. ৪৪।

২৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : Statistical Pocketbook 1995, পৃ. ৪৪,৫৮।

২৪. বিশ্বব্যাংক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫, ৫৪।

২৫. বিশ্বব্যাংক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫, ৫৪।

২৬. বিশ্বব্যাংক : *World Development Report 1985.* পৃ. ১৭৮, ২১৪।

Bangladesh Recent Economic Developments 1995, পৃ. ১
শিল্পখাত বলতে খনিজ সম্পদ আহরণ, নির্মাণ, জ্বালানি ও পানি সরবরাহও অন্তর্ভুক্ত। শুধু শিল্পের (প্রক্রিয়াজাতকরণ) হিস্যা হবে যথাক্রমে ১০ শতাংশ এবং ১৪ শতাংশ।

২৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1995*. পৃ. ১৮৮, সূচক নির্ধারণের জন্য প্রথম ভিত্তি বছর ছিল ১৯৭৩, পরবর্তীকালে ১৯৮০-৮১-কে ভিত্তি বছর ঠিক করা হয়। ১৯৭৩-এর সূচক অনুযায়ী ১৯৮০-৮১-তে ছিল ১৪৩। ১৯৮০-৮১র সূচক অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪-এ ছিল ২৩৬।

২৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1996*, পৃ. ২১।

২৯. বিশ্বব্যাংক : *Managing Public Resources for Higher Growth*, 1994, পৃ. ২১৮।

৩০. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন : *The Fourth Five Year Plan 1990*,পৃ. XI. 23.

৩১. পরিকল্পনা কমিশন, *Draft of the Fifth Plan, 1997*, পৃ. XIV. 6, 23, 24.

৩২. বিশ্বব্যাংক : *Recent Economic Developments & Priorty Reform Agenda for Rapid Growth, 1995*, পৃ. ৬৮।

৩৩. ১৯৯৩-৯৪ সালে অপরিশোধিত পেট্রোল আমদানি হয় ১২.৪ লাখ টন আর পেট্রোলজাত দ্রব্য আমদানি হয় ৯.২ লাখ টন, যার মধ্যে ডিজেল ছিল ৬.৮ লাখ টন আর কেরোসিন ১.২ লাখ টন।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1995*, পৃ. ২০৭।

৩৪. ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসাব আছে
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1995*, পৃ. ১৯৯।
১৯৭০-এর সময়কার (১৯৭৪) হিসাব আছে
জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক : *Bangladesh Energy Study 1976*, মূল প্রতিবেদন, পৃ. ১.৬-১.৮।

৩৫. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন : *The Fourth Five Year Plan 1990*, পৃ. XII. I

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. VII. 31.

৩৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1995*, পৃ. ১৯৯

৩৮. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন : পূর্বোক্ত, পৃ. VII. 31.

৩৯. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : পূর্বোক্ত।

৪০. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন : *The First Five Year Plan. 1973*, পৃ. ৩২৪।

৪১. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন : *The Fourth Five Year Plan 1990*, পৃ. XII.31.

৪২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook, 1995*, পৃ. ১৯৯।

৪৩.

৪৪. বাংলাদেশ সরকার : *National Energy Policy Statement 1995*, পৃ. ৭।

৪৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1995*, পৃ. ২০৯।

৪৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো : *Statistical Pocketbook 1997* পৃ. ২২৮।

৪৭. বাংলাদেশ সরকার : *Bangladesh Economic Survey 1975-76*, পৃ. ২৪৩।

৪৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook, 1995*, পৃ. ২১৫।

৪৯. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook, 1979*, পৃ. ৪৩০-৪৩১।

৫০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1990*, পৃ. ২৩৫।

৫১. বাংলাদেশ সরকার : *বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ*, ১৯৯৫ জুন।

৫২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook, 1979*, পৃ. ৪২০-৪২১।

৫৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook, 1993*, পৃ. ২৩৫ এবং ১৯৯৫, পৃ. ২১৫।

৫৪. বাংলাদেশ সরকার : *The Fifth Five Year Plan 1998,* পৃ. ৩৯১।
৫৫. বিশ্বব্যাংক : *World Development Report, 1991,* পৃ. ২২৬।
সনাতনী নৌকা ২৫ লাখ টন মালামাল এবং ৪৬ লাখ যাত্রী বহন করে।
৫৬. বাংলাদেশ সরকার : *অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৭৫-৭৬,* পৃ. ২৫২, ২৫৫, ২৫৭।
৫৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook 1994,* পৃ. ২৭০।
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮, ২৬৯।
৫৯. পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগ : *Economic Survey of East Pakistan 1969-70,* পৃ. ১০৭।
৬০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook 1994,* পৃ. ২৭।
৬১. Jhon.E Rohde & Lincon C Chen : *Famine & Civil War in East Pakistan.* The Lancet, London, 1971.
৬২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Digest 1973,* পৃ. ১৯৮-২০০।
৬৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1997,* পৃ. ৩৪৫, ৩৬৫।
৬৪. বাংলাদেশ সরকার : *অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৩-৯৪,* পৃ. ২৪২-২৪৩।
৬৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1997,* পৃ. ৩৪৫-৪৬।
এবং বাংলাদেশ সরকার : *Fifth Five Year Plan 1998,* পৃ. ৪৫৬।
৬৬. বিশ্বব্যাংক : *World Tables 1989-90,* পৃ. ১১৪-১১৫।
৬৭. রিপোর্ট : *Demographic & Health Survey 1993-94,* পৃ. ২৭, ৪৫, ৯৩।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1995,* পৃ. ৩০৯।
৬৮. ইস্ট পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগ : *Economic Survey of East Pakistan 1969.70,* পৃ. ৮৭।
৬৯. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook 1994,* পৃ. ৪৬৭।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর : *Primary Education in Bangladesh* জুলাই ১৯৯৮।
Education Watch ১৯৯৯ সালে তাদের প্রতিবেদনে বলেছেন যে ১৯৯৮ সালে ভর্তির হার ছিল ৮১ শতাংশ, ঝরে পড়ার হার ২৮ শতাংশ এবং স্বাক্ষরতার হার ৫১ শতাংশ।
৭০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook 1997,* পৃ. ৩৩১, ৩৪৫।
শিক্ষা বাবদ ১৯৮৭-৮৮র খরচ *Bangladesh Education in Statistics 1991* থেকে নেয়া (১৪২ পৃ.)।
৭১. মাহবুব হোসেন ও বিনায়ক সেন : *Rural Poverty in Bangladesh : Trends and Determinats* : Asian Development Review, Vol 10, No. 1 1992.
৭২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Pocketbook 1989,* পৃ. ১০৯-১১০।
৭৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Yearbook 1996,* পৃ. ৬২
৭৪. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন : *The Fourth Five Year Plan, 1970,* পৃ. ১১১।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

পাকিস্তানের উদ্ভব

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে থাকে। ১৭৫৭ সালের তেসরা জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় সুবা বাংলায় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। নবাব মীর কাশিম সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের একটি সাহসী উদ্যোগ নেন; কিন্তু ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাভূত হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে নামমাত্র মোগল সম্রাট শাহ আলমের ফরমান বলে সুবা বাংলার দেওয়ানি হস্তগত করে। এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে বৃটিশ শক্তি বেশ সংহত এবং দিল্লির সম্রাট, অযোধ্যার নবাব, পাঞ্জাবের রাজা, মহীশুরের সম্রাট বা অন্যান্য কর্তাব্যক্তি বৃটিশের ওপর খুব নির্ভরশীল। কোম্পানি তাদের ফরমান খরিদ করে অর্থ দিয়ে, তাদের একে অন্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করে সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এবং প্রয়োজনে তাদের ভয় দেখিয়ে কাবু করে। ভারতীয় রাজা-রাজন্যদের কলহে কোম্পানি সুবিধামতো ভূমিকা নিয়ে তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করে চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কোম্পানি অযোধ্যা, মহিশুর, দাক্ষিণাত্য, দিল্লি ও সিন্ধুতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নিজেদের সর্বশক্তিমান করার লক্ষ্যেও তারা সাফল্যের সঙ্গে ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ প্রভাব ও প্রতিপত্তি একে একে নিঃশেষ করে। প্রায় দেড়শ' বছরের বৃটিশ শাসনামলে গোটা ভারতের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা ছিল। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে দুইটি স্বাধীন দেশ ভারত ও পাকিস্তানের আবির্ভাব হলো। পরিশিষ্ট ৩-এ ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের নির্ঘণ্ট দেয়া হলো। বৃটিশ-ভারতের বিভক্তির মূল কারণ ছিল দেশের দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরোধিতা। একত্র ভারতের শেষ অধ্যায়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধিতা ও বিদ্বেষ ছিল চরম এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অগণিত জনগণ মৃত্যুবরণ

করে ও বিত্তহীন হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনামূলক পশ্চাৎপদ অবস্থানই কিন্তু আসলে বৃটিশ ভারতের বিভক্তির কারণ।

বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদের অবস্থান

বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নতুন শাসকরা পরাজিত শক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং অন্য সম্প্রদায়ে দোসর খুঁজতেন। মুসলমানরাও সহজে ভুলতে পারতেন না যে এই সেদিনও তারা রাজত্ব করতেন এবং তাই সামান্যতেই বৈষম্য অনুভব করতেন। তাদের অনেকে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনকে সহজে নিতে পারেন নি এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ছিল। প্রথম প্রথম বৃটিশদের তারা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, বৃটিশ সভাসদকে মোগল উপাধিতে ডাকা হতো, তাদেরকে নিজেদের একজন মনে করা হতো। এরা যে এরকম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং রাজক্ষমতা কেড়ে নেবে সেটা তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড ক্লাইভ যখন সুবা বাংলার দেওয়ানি পেলেন, তখন তাকে বিদেশি মোটেই ভাবা হয় নি। তিনি ছিলেন মোগল সভাসদ। অবস্থার এই পরিবর্তনে মুসলমান সম্প্রদায় তাই খুবই হতাশায় নিমজ্জিত হয়। বৃটিশ শাসনের সূচনাতেই আবার তারা জমির ওপর কর্তৃত্ব হারান। লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে ভূমি প্রশাসনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা চালু করেন। কলকাতার কাঁচা পয়সাওয়ালা অনেক হিন্দু এই সুযোগে জমিদার হয়ে যান। এ ছাড়াও সূর্যাস্ত আইনের ধাক্কায় অনেক মুসলিম জমিদার তাদের চতুর নায়েব বা দেওয়ানদের কাছে জমিদারি হারান। বেশ কিছু দিন কিন্তু মুসলমানেরা প্রশাসনে উচ্চপদে আসীন থাকেন; কারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে তারাই ছিলেন পারদর্শী। তবে ১৮৩৭ সালে যখন আদালতের ভাষা থেকে ফারসি বিতাড়িত হলো এবং ইংরেজি হলো রাজভাষা, তখন তাদের সেই বিশেষ অবস্থান থাকলো না। একই সঙ্গে নতুন আইনের প্রচলনও শুরু হলো এবং মুসলমানরা বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ হারালেন। মনমরা এবং ক্ষুব্ধ মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে রইলেন, পরিবর্তে ধর্মশিক্ষায় তারা ব্রতী হলেন এবং পশ্চাৎমুখিনতা ও কুসংস্কার তাদের পেয়ে বসলো। আধুনিক শিক্ষায় তাদের এতই অনীহা ছিল যে মুসলিম শিক্ষা প্রসারের জন্য নির্দিষ্ট আমানতি তহবিল ব্যবহার করবারই সুযোগ হলো না। হুগলি কলেজ ১৮৩৬ সালে স্থাপিত হয় এবং এর প্রতিষ্ঠায় মহসিন তহবিল থেকে কিছু ব্যয় বহন করা হয়। বিবেচনায় ছিল যে মুসলমানেরা এই কলেজে পড়তে আসবেন, কিন্তু ১৮৫০ সালে এই কলেজের মাত্র পাঁচ শতাংশ ছাত্র মুসলমান ছিলেন।[১] কলকাতা মাদ্রাসা ছিল বৃটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। ১৭৮১-তে এটি স্থাপন করা হয় বৃটিশ প্রশাসনে উপযুক্ত সহযোগী পাওয়ার জন্য। এগারো বছর পর বেনারস হিন্দু কলেজ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। তারপর ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান হয় ১৮০০ সালে স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ডেভিড হেয়ার ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৮৫৫ সালে এইটিই হয় প্রসিদ্ধ

প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮১৯ সালে আর একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় বিশপ কলেজ। মুসলমানেরা সব আধুনিক শিক্ষা বর্জন করেন। ১৮৩৫ সালে এডামের জরিপে দেখা যায় যে, এমন কি ফারসি শিক্ষায়ও হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে এগিয়ে ছিল। এই জরিপে আরো দেখা যায় মক্তব ও পাঠশালায় তখন একই রকমের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল ছিল। একটিতে আরবি ও ইসলাম শিক্ষা অতিরিক্ত পড়ানো হতো এবং অন্যটিতে কখনো সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ হতো। আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের উৎসাহের অভাব অচিরেই তাদের প্রশাসনে উচ্চপদ দখলের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পেশাজীবীর সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। উকিল-ডাক্তার সবাইকে ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী হতে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে দিল্লির শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুসলিম শুদ্ধি আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে এই তত্ত্বকথা হয় সৈয়দ আহমদ বেরিলির জঙ্গি ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলনের পাথেয়। পশ্চিম বাংলার তিতুমীর, ফরিদপুরের হাজি শরিয়তুল্লাহ ও তদীয় পুত্র দুদু মিয়া শুধু ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলনেই নেতৃত্ব দিয়ে বিরত থাকেন নি, তাঁরা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও ব্রতী ছিলেন। বাঙালি মুসলমানের ফরাইজি আন্দোলন বা মধ্য ভারতের মুসলমানদের তরিকা-এ-মোহাম্মদিয়া আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আচার-আচরণের শুদ্ধি নিয়ে মশগুল ছিল না, বরং অবিশ্বাসী, বিধর্মী ও অত্যাচারী বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তোলে।[২] মুসলমানদের আনুগত্য নিয়ে বৃটিশ সন্দেহ এইসব কারণেও ঘনীভূত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে মুসলমানদের পরিকল্পিতভাবে দূরে রাখা হতো আর এই শূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় পূরণ করেন। "বৃটিশ শাসন শুরু হলো আর মুসলমানদের অবক্ষয় ও পতনেরও হলো সূচনা। প্রশাসনিক এবং আইনগত যা কিছু পরিবর্তন বৃটিশ সরকার নিয়ে আসে তাতে মুসলিম সম্প্রদায় একের পর আরেক ধাক্কা খায়।"[৩] বাংলার মুসলমানদের ওপর নির্যাতন ছিল সবচেয়ে বেশি, কারণ বৃটিশবিরোধী রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি। ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই নির্যাতন ও অবজ্ঞা আরো বেড়ে গেল। স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত এবং সশস্ত্র সেনাগোষ্ঠীর অসংগঠিত বিদ্রোহের শামিল। এর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ছিল নড়বড়ে আর বৃটিশের অনুগত ভারতীয়রা এর শক্ত প্রতিরোধ করে। এই যুদ্ধে ব্যর্থতার একটি তাৎক্ষণিক প্রতিফল ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি এবং মধ্য ভারতীয় এলাকা থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্রমান্বয়ে বিতাড়ন এবং পরিবর্তে অনুগত শিখ ও পাঞ্জাবি সৈন্যের নিযুক্তি।[৪]

বৃটিশ আমলের প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল লক্ষণীয়, যেমনটি ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা বৃটিশ-ভারতের রাজধানী থাকায় বাঙালি হিন্দুরা অনেক সুবিধা উপভোগ করেন। তারা সরকারি অনুগ্রহ ও চাকরি লাভে সমর্থ হন। তারা শাসকদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ তারা গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের শূন্যস্থান দখল করেন। ১৮২৮

সালে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল বাঙালি রেনেসাঁর একটি মাইলস্তম্ভ, সূচনা নির্দেশক। এই রেনেসাঁ-পরবর্তী অর্ধশতক পুরোপুরি হিন্দু রেনেসাঁই ছিল। নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কিন্তু তার আবেদন ছিল অতি সীমিত।[৫] ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর *ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স্* গ্রন্থে মুসলমানদের তুলনামূলক পশ্চাৎপদতার বিষয়টি তুলে ধরেন। হান্টারের বর্ণনায় অতিরঞ্জন তেমন ছিল না। "একশ' পঁচাত্তর বছর আগে একজন অভিজাত মুসলমানের পক্ষে গরিব হওয়া অসম্ভব ছিল। বর্তমানে তাঁর পক্ষে ধনী থাকাটাই অসম্ভব। বিগত পঁচাত্তর বছরে আমাদের শাসনের ছত্রছায়ায় যে নতুন সামাজিক প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তাদের চাপে মুসলমান অভিজাত পরিবার হয় বিলীন হয়ে গেছে অথবা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে।"[৬]

বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিকতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে মুসলমানদের সমাজে সোপান বেয়ে উঠতে গেলে দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। প্রথমত, তাদেরকে বৃটিশ আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হতো। দ্বিতীয়ত, তাদের চেয়ে অগ্রসর গোষ্ঠী হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফলকাম হতে হতো। জঙ্গি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা যুদ্ধে নেহাত বিফলতা মুসলিম সমাজকে নতুন করে তাদের কলাকৌশল নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করে। শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে শুরু হয় একটি আনুগত্য আন্দোলন বা অনুগত মুসলমানদের উদ্যোগ। নবাব আবদুল লতিফের কলকাতা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির পর এলো স্যার সৈয়দ আহমদের আলিগড় সাইন্টিফিক সোসাইটি (১৮৬৪ সাল)।[৭] ১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমির আলী প্রতিষ্ঠা করলেন ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন।[৮] আবদুল লতিফ ও আমির আলী ছিলেন মুসলিম আধুনিকতার প্রবক্তা। তাঁদের পরে ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা পেল মোহামেডান রিফর্ম সোসাইটি। এইসব প্রতিষ্ঠানই শুরু করে মুসলিম নবজাগরণ ও রেনেসাঁ। ইসলামকে নতুন করে উপস্থাপন করা হয়। খৃস্টানদের সঙ্গে মুসলমানের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেল। বৃটিশ শাসন ও ধর্মের মধ্যে বিরোধের বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো হলো। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, ইংরেজি শিক্ষা এবং পশ্চিমি ভাবধারার বিশ্লেষণকে জায়েজ করার প্রচেষ্টা চললো। মুসলিম সম্প্রদায়ে আলোকসম্পাত, বৃটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং বৈধ অভিযোগের ন্যায়বিচার দাবিই ছিল এসব বিভিন্ন সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও আন্দোলন শুরু হয় আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজনে কিন্তু এতেই সূচনা হয় মুসলিম সমাজের আধুনিকতা বা চিন্তার মুক্তি।[৯]

একই সময়ে অনেক বৃটিশও ভারতীয় মুসলমানদের নতুন দৃষ্টিতে বিবেচনা করার দাবি উত্থাপন করেন। মুসলমানদের প্রতি অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিকার অনেকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ভারতীয় বিষয়াদি নিয়ে অবহিত ও প্রতিপত্তিশালী নেতৃবর্গ বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তনের আবেদন জানান। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল, উইলিয়াম ডাবলিউ হান্টার, উইলিয়াম এ গ্রেগরি এবং স্যার জন স্ট্র্যাচি।[১০]

নিখিল ভারত কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো। একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা এলান ওক্টেভিয়ান হিউম এতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। প্রতিবছর যাতে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা সমবেত হয়ে বৃটিশ শাসনের পর্যালোচনা করে কোথায় ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে আর কীভাবে তা শুধরানো যাবে এমন ধরনের পরামর্শ দিতে পারেন তার ফোরাম হবে কংগ্রেস।[১১] উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন অচিরেই এই প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে সজ্ঘাতের পথে যাবে বলে প্রথম থেকেই স্যার সৈয়দ নিশ্চিত ছিলেন। প্রধানত এ কারণেই তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে এই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে বলেন; তারা সবে তাদের আনুগত্য প্রমাণে ব্যস্ত, এ সময় সজ্ঘাতের রাস্তা উপযুক্ত নয়। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি গোঁড়া হিন্দুদের দখলে চলে যায় এবং মুসলমানরা আরো দূরে সরে যায়। কংগ্রেস গরু জবাইর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলো, তারা গণপতি ও শিবাজি উৎসবে মেতে উঠলো। মুসলমানেরা আরো আলাদা হয়ে গেল। গুটিকয়েক মুসলমান দূরদর্শী নেতা কংগ্রেসকে মুসলমানদের কাছে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলেন।

১৮৮৬ সালে স্যার সৈয়দ বার্ষিক মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সকে একটি বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করান। ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে সরানোর জন্য তিনি ভারতীয় প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। মুসলমানরা এইসব প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট না হলেও কংগ্রেস থেকে মোটামুটিভাবে দূরে থাকেন।

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বাংলা প্রেসিডেন্সি তখন মধ্য প্রদেশের সীমান্ত থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৭৪ সালে আসামে চিফ কমিশনারের প্রদেশ বানালেও নানা ব্যাপারে আসাম বাংলা প্রেসিডেন্সির অংশবিশেষ ছিল। বর্তমানের বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকার সবগুলো রাজ্য (আসামসহ) নিয়ে ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি। এই বৃহৎ প্রদেশ দুই ভাগে ভাগ হবে। পূর্ব বাংলা আর আসাম নিয়ে হবে এক প্রদেশ। আর অন্যটি হবে বাকি এলাকা নিয়ে, তবে কয়েকটি জেলা বাংলা ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে সুবিন্যস্ত হবে। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের আয়তন হবে ১০৬,৫৪০ বর্গমাইল (২৭৫,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার) আর অধিবাসী হবে ৩ কোটি ১০ লাখ। এর রাজধানী হবে ঢাকায়, অবশ্য শিলং-এ হবে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এটি হবে প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত, প্রায় এক কোটি আশি লাখ মুসলমান। বাংলা প্রদেশের আয়তন হবে ১৪১,৫৮০ বর্গমাইল বা ৩৬৬,৬৯২ বর্গকিলোমিটার আর অধিবাসী হবে ৫ কোটি ৫৪ লাখ, তার মাত্র ৯০ লাখ হবে মুসলমান। বাংলার রাজধানী কলকাতায় থাকবে আর দার্জিলিং থাকবে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।[১২] বিভক্তি পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ছিল অনেকদিনের, প্রশাসনিক সুবন্দোবস্তের জন্য এই বিশাল প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করার বিষয় অনেকদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছিল।[১৩] বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ সালে ঘোষিত হয় এবং ১৯১১ সালে রহিত হয়। এই অল্প সময়ে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা ছিল লক্ষণীয়, এমনটি

ভারতের কোথাও আগে ঘটে নি। চাকরির সুযোগ বাড়ে কিন্তু এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল শিক্ষার সুযোগ। বঙ্গভঙ্গের কঠোর সমালোচনা করে কংগ্রেস এবং হিন্দু সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যায়।[১৫] হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জঙ্গি মনোভাব এবং আপোসহীন সংগ্রাম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বাড়ায় এবং মুসলমানদের সংগঠিত হতে আগ্রহী করে। তারা তখন একটি রাজনৈতিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে।

১৯০৬ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া (ভারত বিষয়ক মন্ত্রী) জন মোর্লি তার বাজেট বক্তব্যে আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা বলেন। তখন মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি ভারতে রাজপ্রতিনিধির (ভাইসরয়) কাছে পেশ করার উদ্যোগ নেন মুসলমান সচেতন গোষ্ঠী। নবাব মহসিন-উল মুলক লর্ড মিন্টোর সঙ্গে এক প্রতিনিধিদলের মোলাকাতের আয়োজন করেন। প্রতিনিধিদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় স্যার আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে আর ভাইসরয়ের সঙ্গে মোলাকাতে দলের নেতৃত্ব দেন মহামান্য আগা খান। প্রতিনিধিদলের প্রধান তিনটি দাবি ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচন, মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনে ইতিবাচক গুরুত্ব যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে তারা কোণঠাসা না হয় এবং প্রশাসনে মুসলমানদের অধিকতর অংশীদারিত্ব।[১৬] সিমলা আবেদনে এই দাবিগুলো পেশ করা হয়। কংগ্রেস মহলে এর খুব প্রতিক্রিয়া হয় এবং তারা এজন্য বৃটিশ সরকারকে দোষারোপ করেন। একে অনুগত মুসলমানদের হুকুমপ্রাপ্ত আচরণ বলে নিন্দা করেন। কিন্তু তা থেকে শুরু হয় রাজনীতিতে মুসলমানদের সক্রিয় ভূমিকা।[১৭] ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ গোটা ভারতের মুসলমান নেতাদের ঢাকায় আমন্ত্রণ জানালেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু আন্দোলন মুসলিম নেতৃত্বকে শঙ্কিত করে তোলে। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সম্ভাব্য অবদান রাখার সুযোগ তাদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরে সকল মুসলিম নেতা সমবেত হন ঢাকার শাহবাগে। নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো, এটি হলো মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন আর তার উদ্দেশ্য হয় ত্রিবিধ। বৃটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সৃষ্টি, মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, সুযোগের প্রসার ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধিতার নিরসন ও নিবৃত্তি।[১৮]

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

মোর্লি-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে স্বতন্ত্র নির্বাচন বিধি গৃহীত হওয়ায় মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হলো, তখন তারা খুব ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যায় এবং বৃটিশ বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে মুসলমানেরা হতাশ হয়ে পড়ে। এই সময়ে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন ভারতের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, মহামতি গোখেলে। তাঁর প্রধান দুই লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম সখ্য আর দায়িত্বশীল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। ইম্পেরিয়াল বিধানসভার

সদস্য হিসেবে গোখেলে প্রকাশ্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন সমর্থন করেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বকালে কংগ্রেসে যেসব চরম অবস্থান নেয়া হয় সেগুলো গোখেলে শুধরে নেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অনুভূতিতে আঘাত দেয়—এমন সব অবস্থান পরিহার করা হয়। ভারতীয় সমাজের বিভিন্নতা সংরক্ষণের খাতিরে গোখেলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বেও ছিলেন একজন মধ্যপন্থী নেতা মহামান্য আগা খান। তিনি ১৯০৭ সালে মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন, তবে ১৯১৪ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। আর একজন দূরদর্শী নেতা গোখেলের সুযোগ্য সহকর্মী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দুই দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগ একটি বিশেষ পদক্ষেপ নেয়, যাতে দুই দল অনেক কাছাকাছি এসে যায়। বৃটিশ আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করে, তবে ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং যথাযথ প্রতিনিধিত্বের বিশেষ বিধান দাবি করে।

স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি ছিল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এবং গুরুত্ব প্রদানের দাবি ছিল যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য; মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হিন্দু প্রতিনিধিত্ব হবে অনুপাত থেকে অতিরিক্ত আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হবে মুসলমানদের অধিকতর গুরুত্ব। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি গোখেলের পরিকল্পনায়ই ছিল, মুসলমানরা তাতে আরো জোর দেয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম সরকার সম্ভব হলেও কেন্দ্রে যে কোনোদিন তা হবে না সেটা ভেবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। গোখেলে ১৯১৫ সালে মারা যান কিন্তু তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার সুফল দেখা দেয় ১৯১৬ সালে। সমঝোতার একটি দুর্লভ ও অমূল্য মুহূর্তে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লখনৌ চুক্তি সম্পাদন করে।[১৯] কংগ্রেস মুসলমানদের দাবি মেনে নিল এবং যুদ্ধ শেষে একটি নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করলো। অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা তাদের ভোটাধিকারে ত্যাগ স্বীকার করলেন। পাঞ্জাবে মুসলমানেরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছেড়ে দিয়ে শুধু অর্ধেক প্রতিনিধিত্বেই সন্তুষ্ট রইলেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের অনুপাতের অতিরিক্ত আসন ছিল কিন্তু কোথাও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালো না। শুধু বাংলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বেই রাজি হয়ে গেল। এমন ত্যাগ আর কাউকে স্বীকার করতে হয় নি।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল। কিন্তু বিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সি অবশেষে বিভক্ত হয়ে গেল। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের সৃষ্টি হলে বাংলা হলো পূর্ব ও পশ্চিমের বাংলা ভাষাভাষীদের একটি প্রদেশ। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৭ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ভাগ করে সিন্ধু প্রদেশের সৃষ্টি হলো এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে পাঞ্জাব কেটে একটি প্রদেশ বানানো হলো।

কংগ্রেসের নেতৃত্ব গিয়ে পড়লো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হাতে। তিনি ১৯১৫

সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সার্থক অহিংস আন্দোলন শুরু করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। হিন্দু-মুসলিম মধুচন্দ্রিমা তখনো বহাল। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত বৃটেনকে অর্থ ও জনবল দিয়ে প্রভূত সাহায্য করে। ভারত এবং লন্ডনে তখন ভারতে স্বশাসন বা দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি উঠেছে। ১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশ করা হলো। এতে সীমিতভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয় এবং সরকারি কার্যনির্বাহে এক ধরনের দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে সম্রাটের প্রতিনিধির হাতে দেয়া হয় অনন্য ক্ষমতা। এই প্রস্তাব ভারতীয় আশার গুড়ে বালি দেয়; তবুও কতিপয় নেতা, বিশেষ করে জিন্নাহ ও গান্ধী তা অবলম্বনে প্রচেষ্টা নিতে উদ্যোগী ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারি অপরাধ বিষয়ে রাওলাট কমিটির প্রতিবেদনের জোরে অত্যন্ত দমনমূলক আইন গৃহীত হয় এবং তাতে স্বেচ্ছাচারী কারা-নির্যাতন ও অন্যায় বিচারের ব্যবস্থা হয়। এই আইনগুলো জনসাধারণ গ্রহণ করলো না এবং এর বিরুদ্ধে হলো দেশব্যাপী বিক্ষোভ। ১৯১৯ সালে এমনি একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয় জালিওয়ানালাবাগে। এই নিরস্ত্র জনসমাবেশে জেনারেল ডায়ার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিলে প্রচুর লোক হতাহত হয়। জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ড বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। একই সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তির অধীনে তুর্কি সাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তুর্কি সাম্রাজ্যের মুসলিম বিশ্বে এক বিশেষ অবস্থান ছিল। তুর্কি সুলতানকে ভারতবর্ষে ইসলামের খলিফা হিসেবে সম্মান করা হতো। তুর্কি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে খেলাফত বিলুপ্তির প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ায় ভারতে বৃটিশ শক্তি বিরোধিতার সম্মুখীন হলো। ১৯২০ সালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃবর্গ ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী এবং গান্ধী। ১৯২২ সালের দিকে আন্দোলনে ভাটা পড়লো। যুক্ত প্রদেশে চৌরিচৌরার সহিংসতা এই আন্দোলনের অহিংস চরিত্রে আঘাত হানলো এবং গান্ধী এককভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ১৯২৩ সালে তুর্কি সেনাপতি মোস্তাফা কামাল পাশা খেলাফতের অবসান ঘোষণা করে খেলাফত আন্দোলনের ভিত্তিই বিনষ্ট করে দিলেন। খলিফা যখন তাঁর দেশে স্বধর্মাবলম্বী কর্তৃক বিতাড়িত, সেখানে বিদেশে তাঁর জন্য কেঁদে লাভ কি? ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৪ সাল ছিল বৃটিশ আমলের রাজনৈতিক ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির গৌরবময় যুগ। ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র কোনো সম্মেলনও আহ্বান করে নি। এই সময়ে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিও জোরদার হয়।

১৯২৪ সালে খেলাফত নেতৃবৃন্দ যখন কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন তাঁরা যেন এক নতুন দেশে পদার্পণ করলেন। হিন্দু-মুসলিম হৃদ্যতা বিদায় হয়েছে। জঙ্গি হিন্দুত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ১৯২৩ সালে শুরু হয় শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন এবং ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। এদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বের উদ্ধার ও

বিকাশ। হিন্দুয়ানিকে বিশুদ্ধ করতে হবে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত করতে হবে, অন্তত হিন্দু আচার-আচরণ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানের গোমাংস ভক্ষণ এবং মসজিদের সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিয়ে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে।[২০] ১৯২৪, ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালের মুসলিম লীগের সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা হয় আলোচনার প্রধান বিষয়। এছাড়া ঐক্য সম্মেলনও হতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেস কখনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার নিন্দা করলো না, গান্ধী তাঁর নিজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন রইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ছেড়ে স্বরাজ্য দল গঠন করলেন এবং ১৯২৩ সালে 'বাংলা চুক্তি' প্রণয়ন করলেন। বাংলা চুক্তির অধীনে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম মধুচন্দ্রিমা অব্যাহত রইলো। কিন্তু ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু এই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিল। একই সঙ্গে হিন্দু মহাসভার বিকাশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবর রচনা করলো। জিন্নাহ তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে 'ঐক্যের দূত' উপাধিতে ভূষিত হন। এই খেতাবটির শব্দচয়ন করেন শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। সেই ঐক্যের দূত সম্প্রীতি পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ চেষ্টা নিলেন ১৯২৭ সালে। তাঁর প্রস্তাব হলো : প্রথমত, কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে স্বতন্ত্র নির্বাচন রহিত করা; দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসন এবং তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কিছুটা সুযোগ প্রদান।[২১]

১৯২৭ সালের নভেম্বরে বৃটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশের জন্য সাইমন কমিশন নিয়োগ করে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের তরফ থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু একটি সুপারিশমালা দাখিল করেন। বিখ্যাত নেহরু প্রতিবেদনে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়। মুসলমানরা যে ধরনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চায় তা মানা হলো না। সব প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবিও অগ্রাহ্য করা হলো। পশ্চাৎপদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে স্বশাসনের দাবিও এই সুপারিশে নাকচ করা হয় এবং সিন্ধু প্রদেশ গঠনের জন্য মুসলমানদের দাবিও অস্বীকার করা হলো।[২২] মুসলমানরা নেহরু প্রতিবেদনে খুবই মনোক্ষুণ্ন ও হতাশ হলো। তাদের তরফ থেকে জবাব দিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ১৯২৯ সালে তিনি চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করলেন।[২৩] মুসলমানদের চাকরি ক্ষেত্রে যথাযথ অধিকার চাই, নির্বাচিত পদে তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব চাই, তাদের কৃষ্টি তহজিব তমদ্দুনের বিশেষ সংরক্ষণ চাই এবং মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগে তাদের জন্য চাই উপযুক্ত হিস্যা।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং পাকিস্তান দাবি

১৯২৪ সাল থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ছিল টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এবং ১৯২৮ সালে তা চরমে পৌঁছলো। কংগ্রেসের একজন নিবেদিত সদস্য মওলানা মোহাম্মদ আলী

কংগ্রেস ছাড়লেন এবং দেশত্যাগও করলেন। ১৯২৯ সালে ঐক্যের দূত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে চৌদ্দ দফা পেশ করলেন। বিফল মনোরথ ও হতাশ হয়ে তিনি দেশত্যাগ করে বিলেতে বসতি স্থাপন করলেন। সাইমন কমিশন ১৯৩০ সালে তাদের প্রতিবেদনে ভারতের জন্য এক ইউনিটের সরকার নাকচ করে দিল। প্রদেশে ক্ষমতার প্রতিসংক্রম অব্যাহত রেখে সেখানে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব পেশ হলো। কিন্তু কেন্দ্রে শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে শাসন পরিচালনার সুপারিশ করা হলো এবং এরা কোনো ভোটদাতাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না। প্রতিবেদনে সাংবিধানিক কাঠামোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়। কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই প্রতিবেদনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁর দাবি হলো দুটো : প্রথমত, লবণ কর রহিত করা আর দ্বিতীয়ত, নেহরু প্রতিবেদনের সুপারিশ গ্রহণ করা। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন চললো, অন্যদিকে ১৯৩০ সালে গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো লন্ডনে। ১৯৩১ সালে বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধীর একটি সমঝোতার ফলে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হলো এবং গান্ধী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। তিনি নেহরু প্রতিবেদনের বাস্তবায়ন দাবি করে ফিরে এসে আবার অসহযোগ আন্দোলন চালু করলেন। গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনের পর ১৯৩২ সালে রামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি ঘোষণা করলেন।[২৪] ১৯৩৪-এর দিকে অসহযোগ আন্দোলন ঝিমিয়ে গেল এবং এই সুযোগে ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন পাস হলো। ১৯৩৪ সালে মুসলিম নেতারা জিন্নাহ্‌কে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সার্থক চাপ প্রয়োগ করে। তিনি মুসলিম লীগের পুনর্জাগরণের ভার নেন। ১৯৩৫ সালের আইন সবদিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কিন্তু তা ছিল মন্দের ভালো। প্রদেশে দায়িত্বশীল নির্বাচিত সরকার হবে। কেন্দ্রেও ক্রমে ক্রমে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দুই দলই এই অসম্পূর্ণ সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সুযোগ দিতে রাজি হলেন, চেষ্টা করে দেখা যাক কি হয়। একটি যৌথ নির্বাচনী কৌশল এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠন নিয়ে দলের মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ চললো।

১৯৩৭ সালে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়।[২৫] দুই বছরব্যাপী কংগ্রেস শাসনের অভিজ্ঞতা মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই তিক্ত। অনেক জায়গায় গো-মাংস নিষিদ্ধ হয়, বিভিন্ন অছিলায় আজান প্রদান বিঘ্নপ্রাপ্ত হয়। নানা জায়গায় মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং মুসল্লিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান দ্বীন-দর্শনের শিক্ষা তো দেয়াই হলো না, পরিবর্তে হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্মাচার হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয়।[২৬] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে যুদ্ধ-উদ্যোগে অংশগ্রহণ নিয়ে মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সর্বত্র পদত্যাগ করে। মুসলমানেরা এই উপলক্ষে নাজাত দিবস পালন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এই দু'বছর সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনো

দাবি-দাওয়া শুনলো না বা তাদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা নিলো না। এতেই নিহিত ছিল ভারত বিভাগের বীজ। সুপ্ত স্বাতন্ত্রবোধ সহসাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কবি ইকবাল ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ অধিবেশনে উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে বসেন। ১৯৩৩ সালে বিলেতে অধ্যয়নরত গোঁড়া মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চৌধুরী রহমত আলী উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান-প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। এইসব কল্পনাবিলাস কংগ্রেস শাসনের অভিজ্ঞতার ফলে বাস্তবরূপ পেতে থাকলো। আল্লামা ইকবাল তাঁর মুসলিম রাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্ক কি হবে সে বিষয়ে কোনো স্বচ্ছ ধারণা দেন নি, সম্ভবত তিনি একটি ভারতীয় ফেডারেশনে এই রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন।[২৭] চৌধুরী রহমত আলী চারটি প্রদেশ ও কাশ্মির রাজ্য নিয়ে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেন।[২৮] এ ধরনের আরো প্রস্তাব ১৯৪০ সাল পর্যন্ত উত্থাপিত হতে থাকে। এবারে মনে হলো যে, অবিভক্ত ভারতের ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন নয়, স্বাতন্ত্র্যবাদের পালে হাওয়া লেগেছে।

১৯৪০ সালে সত্যি সত্যি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য ঐকান্তিক চিন্তাভাবনা রূপ পেল। লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠলো। ২৩ মার্চ বাঙালি নেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করলেন এবং পরদিন এই প্রস্তাব কাউন্সিল গ্রহণ করে। মূল প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ :[২৯]

> *"প্রস্তাবিত হচ্ছে যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে দেশে একটি কার্যকরী ও মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে। ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন এলাকা নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সীমানা পুনর্বিন্যাস করে আঞ্চলিক দেশ গঠন করা হবে, যাতে যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, সেসব এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা হবে এবং এইসব রাষ্ট্র হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।*
>
> *এইসব এলাকায় ও অঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সংরক্ষণের জন্য সবিশেষ কার্যকরী এবং বাধ্যতামূলক সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হবে। ভারতের অন্যান্য এলাকায় যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানেও সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যথোপযুক্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক বিশেষ নিশ্চয়তা সংবিধানে সন্নিবেশিত হবে।*
>
> *এই অধিবেশন কার্যকরী কমিটিকে এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতে একটি সংবিধানের কাঠামো প্রণয়নের দায়িত্ব দিচ্ছে। এই কাঠামো অনুযায়ী চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যেকটি আঞ্চলিক দেশ বিভিন্ন বিষয়ে যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করবে।"*

১৯৪০ সালের এই পাকিস্তান প্রস্তাবে প্রকৃতপক্ষে দুই বা ততোধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ধারণা ছিল। পরবর্তী বছরে মাত্র দুটি মুসলিম বসতির কথা উল্লেখ করা হয়

এবং লাহোর প্রস্তাবের ভাষা বদলানো হয়। তখন বলা হয়, "ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যে সেখানে স্বাধীন মুসলিম জাতীয় বসতি হিসেবে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যেখানে গঠনকারী ইউনিটগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।"[৩০] এক পাকিস্তানের ধারণা সুবিধাজনক কৌশল হিসেবে ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস ভারতের যে-কোনো বিভক্তিরই বিরোধিতা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুইভাগে ভাগ করার প্রস্তাবে যত জোর পাওয়া যায় তিনভাগে ভাগ করাতে তেমন যুক্তি ছিল না। তদুপরি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইতে সারা ভারতের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এক পাকিস্তানের দাবি সেই ঐক্যের পরিচায়ক ছিল। সর্বশেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে দুই জাতিতত্ত্ব তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ প্রদান করে। যদি অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মুসলমানরা একটি জাতি হয় তবে তাদের জন্য একটি রাষ্ট্রই হওয়া উচিত। সরকারিভাবে কিন্তু এক পাকিস্তানের দাবি ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাংসদদের সম্মেলনে জায়েজ করা হয়। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় :[৩১]

"উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বাংলা ও আসামকে নিয়ে এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে, অর্থাৎ পাকিস্তান এলাকাগুলো যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলোকে নিয়ে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে অনতিবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হবে।"

পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পরেও স্বাধীন ভারতে কি করে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায় তাই ছিল মুসলিম লীগের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ মিশন যখন ভারতের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আসে তখন তাদের কাছেই সর্বপ্রথম পাকিস্তান দাবি উত্থাপন করা হয়। এই মিশন পাকিস্তানকে সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাব্য উপায় মনে করে কিন্তু একে ততোটা গুরুত্ব দেয় নি এবং পাকিস্তানকে অবশ্যম্ভাবী মনে করে নি। ক্রিপ্স্ মিশন অভিমত দেয় যে, এমন কোনো ব্যবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর ঠিক হবে না যেখানে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তাতে আপত্তি জানাবে এবং তাদের বলপ্রয়োগে দমন করতে হবে। তাই মিশনের প্রস্তাব ছিল যে ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে, যেন প্রদেশ কোনোটি ইচ্ছে করলে সেই ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে।[৩২]

১৯৪৫-৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন ও ভারত বিভাগ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে ওয়াভেল পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।[৩৩] ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর ও ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয়। মুসলিম

লীগ দাবি করলো যে, তারাই মুসলমানদের প্রতিনিধি এবং তাদের লক্ষ্য পাকিস্তান। কংগ্রেস এই দাবি অস্বীকার করে বললো যে, তারা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনসাধারণ অবিভক্ত ভারত চায়। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের সব মুসলিম আসনে নির্বাচিত হলো এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৪৬টি (৯০ শতাংশ) দখল করলো।[৩৪] লক্ষণীয় বিষয় ছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগের ব্যর্থতা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মোট ৩৬টি মুসলিম আসনের মাত্র ১৭টি পেল মুসলিম লীগ। সিন্ধু প্রদেশ ৩৫টির মধ্যে পেল ২৭টি এবং পাঞ্জাবে ৮৬টি আসনের মধ্যে ৭৫টি। সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ালিশন সমানসংখ্যক আসন পেলে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং অতি কষ্টে মুসলিম লীগ সরকার গঠনে সফল হলো। বাংলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের ১১৩টি পেয়ে মুসলিম লীগ সহজেই সরকার গঠন করলো। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট-আকালি-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো।[৩৫]

নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সমস্যা সমাধান এবং ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এলো ক্যাবিনেট মিশন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং আলবার্ট আলেকজান্ডার ২৩ মার্চ করাচিতে পৌছলেন। বিভিন্ন কর্মকর্তা ও দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ১৬ মে-তে তাঁরা সাংবিধানিক নীল নকশা পেশ করলেন।[৩৬] এইটি ছিল সব প্রদেশকে নিয়ে তিনটি গ্রুপ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমবিভ্যাহারে একটি ভারতীয় কনফেডারেশন পরিকল্পনা। খ-গ্রুপ ছিল উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে এবং গ গ্রুপ ছিল পূর্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে। তাই এই দুই গ্রুপে ছিল পাকিস্তান এলাকা এবং ক গ্রুপে ছিল ভারতের বাদ-বাকি প্রদেশ। কনফেডারেশনের দায়িত্ব ছিল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ এবং এইসব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ক্ষমতা। প্রাদেশিক পরিষদগুলো ইউনিয়নের সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করবে এবং এই পরিষদ সদস্যরা তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে তাদের গ্রুপের সংবিধান প্রণয়ন করবেন। নতুন সংবিধানের অধীনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কোনো প্রদেশ তার গ্রুপ পরিত্যাগ করে সরাসরি ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হিসেবে অবস্থান নিতে পারবে। ক্যাবিনেট মিশন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনেরও প্রস্তাব দেয়। এতে কংগ্রেসের ছয়জন, মুসলিম লীগের পাঁচজন এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের দু'জন নিয়ে মোট তেরজন সদস্য থাকবেন। যদিও এই নীলনকশায় পাকিস্তান দাবি পুরোপুরি মানা হলো না, তবুও মুসলিম লীগ সমঝোতার খাতিরে একে গ্রহণ করলো। ২৫ জুন একই দিনে কংগ্রেসও এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তাদের সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দিয়ে সংবিধান প্রণয়নে অংশ নেবে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবে না। কিছুদিন পর কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু বোম্বাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে (১০ জুলাই) ঘোষণা করলেন

যে, কংগ্রেস সাংবিধানিক পরিষদে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সংবিধান রচনা করবে, তাতে কোনো পূর্বতন চুক্তি বা সমঝোতা মানা হবে না এবং প্রতিটি সমস্যাকে সমাধানের জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরো বললেন যে, তাঁর মতে গ্রুপগুলো সংগঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং বিভিন্ন প্রদেশ শুরুতেই গ্রুপ পরিত্যাগ করতে পারবে। মুসলিম লীগের কাছে গ্রুপ ব্যবস্থা ছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মৌলিক বিষয় এবং এর প্রত্যাখ্যান ছিল গোটা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের শামিল।[৩৭] একই সঙ্গে তারা দেখলেন যে, বড়লাট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে গড়িমসি করছেন, যদিও কথা ছিল যে কোনো দল গররাজি হলেও সরকার গঠন করা হবে।[৩৮]

মুসলিম লীগ পর্যবেক্ষণ করলো যে, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসও এই নীলনকশা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নি এবং গ্রুপ ব্যবস্থা মানছে না; অন্যদিকে বৃটিশ সরকার এর বাস্তবায়নে ততো উন্মুখ নয়। এই হতাশার সম্মুখীন হয়ে ২৭ জুলাই কাউন্সিল সভায় মুসলিম লীগও এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করলো। পরিবর্তে তারা ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দিল। তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণিত হলো, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়, বৃটিশ দাসত্বের অবসান এবং পরিকল্পিত উচ্চবর্ণ হিন্দু রাজত্বের মূলোৎপাটন'।[৩৯] দ্বিতীয়বারের মতো কংগ্রেসের একগুঁয়েমি এবং অদূরদর্শিতা অবিভক্ত ভারতের সম্ভাবনা বিনষ্ট করলো। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম দিশারী মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই বিষয়ে মন্তব্য করেন, '১৯৩৭ সালের ভুলটি ছিল খুবই খারাপ। তবে ১৯৪৬ সালের ভুলটি হলো মারাত্মক।' এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পর।[৪০] ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক সরকার গঠনে মুসলিম লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন হতে পারলে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনেরই সম্ভাবনা রহিত হতো। ১৯৪৬ সালে গ্রুপ ব্যবস্থা মেনে নিলে অখণ্ড ভারতে একটি শক্তিশালী কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো।

১৬ আগস্টে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গার দাবানল জ্বালিয়ে দিলো। কলকাতায় মুসলমানরা হিন্দুদের হাতে মার খেল।[৪১] এর প্রতিক্রিয়া হলো আরো মারাত্মক। অক্টোবরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলায় দাঙ্গা বাধলো। মাসের শেষ দিনে বিহারে শুরু হলো আরো রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। তারপর যুক্ত প্রদেশে। বছর শেষ হতে না হতে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলো তা ছিল আরো পাশবিক এবং আরো ব্যাপক।[৪২] জুলাই মাসে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রত্যাখ্যান করে, মুসলিম লীগও এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। কিন্তু ২৪ আগস্টে কংগ্রেস তাদের অভিমত বদলে ২ সেপ্টেম্বরে সরকার গঠন করলো। দাঙ্গার সময় দেখা গেল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মারপ্যাঁচে মুসলমান স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল এবং হিন্দু দাঙ্গাকারীরা সুযোগ গ্রহণ করছিল। বড়লাট ও মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে একই মতে পৌঁছলেন যে, মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিলে মুসলমানদের ভালো হবে, সরকারি নিগ্রহ বল প্রয়োগে ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা পাবে। ২৬

অক্টোবরে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা সদস্যদের মধ্যে কিন্তু কোনো সখ্য ছিল না। মুসলিম লীগ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে তফসিলি সম্প্রদায় থেকে মনোনয়ন দিলে কংগ্রেস খুবই ক্ষুব্ধ হয়। লিয়াকত আলী খানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ সরদার প্যাটেল বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না। যাই হোক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহাল হলো। কিন্তু সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন ডাকাই গেল না। মুসলিম লীগ জানালো যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে সংবিধান রচনা সম্ভব নয় এবং তারা কোনো অধিবেশনে অংশ নেবে না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতা ও বিস্তার লন্ডনে বৃটিশ সরকারকে নিতান্তই আতঙ্কিত করে তোলে। লর্ড ওয়াভেল একটি সর্বসম্মত সমাধান প্রচেষ্টার খোঁজে অটল থাকলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলেন। লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করলেন এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন এলেন নতুন বড়লাট হয়ে।[৪৩] মাউন্টব্যাটেনের অবিশ্রান্ত প্ররোচনা দেশ বিভাগের পক্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করলো। তবে সরদার প্যাটেলের যুদ্ধংদেহি মনোভাবই কংগ্রেসের মত পরিবর্তনে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করে। সর্বপ্রথম পণ্ডিত নেহরুকে সম্মত করাতে হলো এবং তারপর সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হলো মহাত্মা গান্ধীর ওপর। মহাত্মা গান্ধী মোটেই ভারতের বিভক্তি চান নি। তিনি এক সময় বলেছিলেন, ভারত বিভাগ হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর।[৪৪] নেহরু ও প্যাটেলের চাপে অবশেষে মহাত্মা গান্ধীও রাজি হলেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন।[৪৫] বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবে ভারত ও পাকিস্তানের স্বতন্ত্র দুটি সাংবিধানিক পরিষদ বা গণপরিষদ। বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হবে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের ভোটে। সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় সিদ্ধান্ত হবে গণভোটের মাধ্যমে। সীমানা নির্ধারণ করবে একটি কমিশন।

এপ্রিল মাস থেকেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দি ২৭ এপ্রিল এ ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন এবং ২০ মে শরৎ বসু ও আবুল হাশিম দুজনে মিলে এই স্বাধীন দেশের একটি কাঠামো তুলে ধরলেন। সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সম্মতি আদায় করলেন এবং শরৎ বসু মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি নিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনেরও এই ব্যবস্থায় কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস এতে ঘোর আপত্তি ওঠালেন। যখন ভারত বিভাগের নীলনকশা চূড়ান্ত হলো তাতে স্বাধীন বাংলার কোনো সুযোগ রইলো না। মে মাস শেষ হতে না হতে সংযুক্ত বাংলার সমাধি রচিত হলো। ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ বৈঠকে মুসলমান সদস্যরা বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করলেন। তবে হিন্দু সদস্যদের বিভাগের পক্ষে দাবি তোলায় তারা পাকিস্তানে যোগ দিতে মত দিলেন। ২৩ জুন পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদে এই রকম

সিদ্ধান্ত হলো। সিন্ধু ও বেলুচিস্তানও পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সিলেটে ৬ ও ৭ জুলাইয়ের গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে অভিমত হলো (২৩৯, ৬১৯–১৮৪,৯১৪)। সীমান্ত প্রদেশে পাখতুনিস্তানের দাবি উঠলো তবে তার কোনো অবকাশ না থাকায় গণভোটের ফলাফল পাকিস্তানের পক্ষে গেল। র‍্যাডক্লিফ সীমানা কমিশন ১৩ আগস্টে রোয়েদাদ দিয়ে পাঞ্জাবে ও সিলেটে ভারতের পক্ষে সুযোগ করে দিল। ১৪ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের নতুন বড়লাট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। ১৫ তারিখে দিল্লিতে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।[৪৬]

শেষ কথা

বৃটিশ শাসনের অবসানে পাকিস্তান ও ভারত দুটি স্বাধীন দেশের উদ্ভব হয় অনেক রক্তক্ষরণের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারায় প্রায় দশ লাখ লোক। বিরাট জনগোষ্ঠী এক দেশ থেকে অন্য দেশে বসতি পরিবর্তন করে। পূর্ব পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার থেকে প্রায় নব্বই লাখ মুসলমান পাকিস্তানে আশ্রয় নেয় আর প্রায় ৬৫ লাখ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতে পলায়ন করে।[৪৭] অন্যান্য প্রদেশ থেকেও দুই সম্প্রদায়ের লোক এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে আশ্রয় নেয়। বাংলা প্রদেশে এধরনের গণহত্যা ও জনসংখ্যা স্থানান্তর ততো প্রকট ছিল না এবং এর জন্য কৃতিত্বের দাবিদার হলেন মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। তাঁদের যৌথ শান্তি উদ্যোগ বিরাট সাফল্য লাভ করে এবং মানুষের কষ্ট ও হয়রানি বহুলাংশে লাঘব করে।

অতীতের দিকে নজর দিলে ভারতীয় মুসলমানের মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা কৌতূহলের উদ্রেক করে। মুসলমান সমাজে আধুনিকতার সূচনা হয় বাংলা ও মধ্যভারতে (যুক্ত প্রদেশ)। এই এলাকার অধিবাসীরাই মূলত পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনা করে। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা থেকে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিল মুখ্য। পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে যখন ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তখন শুধু বাংলায়ই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। পাঞ্জাবি নেতারা যে-পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেন তাতে নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কোনোদিকে নজর ছিল না; তারা পাঞ্জাবের খাতিরে উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম আবাসভূমি চান, অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না। পাঞ্জাব বা সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সচেতন গোষ্ঠী বা বুর্জোয়া সমাজ পাকিস্তানে বিশ্বাসই করতেন না। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট এবং সীমান্তের খুদাই খিদমতগার শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরোধিতাই করে। কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনা এবং গোঁড়ামি ঐসব এলাকায় যে-কোনো মুহূর্তে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারতো। বাঙালি চরিত্রে এই গোঁড়ামি বা উন্মাদনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান চায় এবং তার জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলেও এই ত্যাগ স্বীকার অব্যাহত থাকে।

পাকিস্তানের ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য বাঙালিকেই শুধু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। পশ্চিমের মুসলমানদের পাকিস্তানের প্রতি, মুসলিম একটি আবাসভূমির প্রতি অঙ্গীকারের অভাবই তাদের পাকিস্তানের জন্য কোনোরকম ত্যাগ স্বীকারে নিরস্ত করে। তারা শুধু সুবিধা ভোগেই ছিল ব্যস্ত। পাকিস্তানকে তাদের পক্ষে ভেঙে দেয়াতে তাই আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. সুফিয়া আহমদ : *Muslim Community in Bengal 1884-1912.* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৪। পৃ. ১২

২. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন : *East Pakistan—A People*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ঢাকা, ১৯৬২। এমএ খানের প্রবন্ধ Muslim Struggle for Freedom in Bengal 1757-1947. পৃ. ৬৩-৭১।

৩. বি আর আমবেদকর : *Pakistan or Partition of India* : থেকার ও কোম্পানি, বোম্বাই, ১৯৪৬, পৃ. ৩০।

৪. পূর্বোক্ত : পৃ. ৫৬

৫. নবাব আবদুল লতিফের জন্ম ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে ১৮২৮ সালে। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন এবং ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। প্রায় তিরিশ বছর কলকাতায় নিযুক্ত থেকে ১৮৮৫ সালে তিনি অবসর নেন। ১৮৬১ সালে ইন্ডিয়া কাউন্সিল আইনে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের বিধানসভায় মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৬২ সালে আবদুল লতিফ হন প্রথম মুসলমান মনোনীত সদস্য। ১৮৮০ সালে তাঁকে নবাবের খেতাব দেয়া হয়, ১৮৮৩ সালে তিনি হন সিআইই এবং ১৮৮৭ সালে নবাব বাহাদুরের খেতাবে ভূষিত হন।

৬. উইলিয়াম ডাবলিউ. হান্টার : *The Indian Mussalmans*, কমরেড প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ১৫০, ১৫৭।

৭. স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান দিল্লিতে ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সালে তিনি হন মুনসিফ এবং ১৮৫৭ সালে তিনি ছিলেন বৃটিশের অনুগত। তিনি লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬৯ সালে তিনি বিলেতে যান এবং প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ব্রত হয় পশ্চিমি শিক্ষার প্রসার। ১৮৬৪ সালে তিনি আলিগড় সাইন্টিফিক সোসাইটি স্থাপন করেন এবং ১৮৭০ সালে তাহজিবাল আখলাক নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি এ্যাংলো ওরিয়েন্টেল কলেজ স্থাপন করেন, যা বিশ বছর পর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে তিনি মুসলমানদের তাতে যোগ না দিতে বলেন এবং ১৮৮৬ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বার্ষিক মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স গড়ে তোলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

৮. সৈয়দ আমির আলী ১৮৪৪ সালে হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে হুগলি কলেজ থেকে বিএ পাস করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং আইন পাস করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি কলকাতা মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে বাংলার বিধান কাউন্সিলে মনোনীত হন এবং ১৮৮৩ সালে ভারতীয় কাউন্সিলে মনোনীত হন। ১৮৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ সালে তিনি বৃটিশ প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৮৮৯ সালে তিনি *হিস্ট্রি অব সারাসিনস্* এবং ১৮৯১ সালে *স্পিরিট অব ইসলাম* রচনা করেন।

৯. উইলিয়াম কান্টওয়েল স্মিথ : *Modern Islam in India*, শেখ মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৬৩, পৃ. ৩-৮, ৪৬-৪৭, ৫০-৫১।

১০. ইশতিয়াক হোসেন কোরেশি : *The Struggle for Pakistan*, করাচি ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৬৫, পৃ. ১৯।

১১. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী : *The Emergence of Pakistan*, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস,

নিউইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃ. ৭।

১২. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : *History of the Freedom Movement*, তৃতীয় খণ্ড। ডা. এ.আর. মল্লিকের প্রবন্ধ The Muslims and the Partition of Bengal 1905; পৃ. ১৯।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১-৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

১৬. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : *History of Freedom Movement.* Vol III; জামিলুদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ Foundation of All India Muslim League. পৃ. ৩২।

১৭. বি.আর. আমবেদকার : *Pakistan or Partition of India;* পৃ. ৪২৮-৪৪৩।

১৮. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : *History of Freedom Movement.* Vol-III, জামিলুদ্দিন আহমদের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ৩৫-৩৮।

১৯. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : পূর্বোক্ত
মাহমুদ হোসেনের প্রবন্ধ *The Lucknow Pact,* পৃ. ১৩১-১৩৭।

২০. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : *History of the Freedom Movement.* Vol-III আইএইচ কোরেশির প্রবন্ধে Hindu Communal Movements, পৃ. ২৫৫-২৭৫। আইএইচ কোরেশি *The Muslim Community of the Indo-Pak Subcontinent;* দ্য হ্যাগ, ১৯৬২, পৃ. ২৭৯-২৮২।
শুদ্ধি আন্দোলন ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমানদের হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনা। সংগঠন ছিল হিন্দু যুব শক্তিকে যুদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ প্রদান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ছিল জঙ্গি হিন্দু বাহিনী।

২১. পাকিস্তান ইতিহাস পরিষদ : পূর্বোক্ত
জি. ডাবলিউ চৌধুরীর প্রবন্ধ Nehru Report, পৃ. ২৭৭-২৭৮।

২২. পূর্বোক্ত; পৃ. ২৮৬-২৯২।

২৩. পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯৮-৩০০।

২৪. পূর্বোক্ত; পৃ. ২৬।
সাম্প্রদায়িক রায়ে আসন বিভাজন ছিল নিম্নোক্ত :

	মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা হার	মুসলিম আসন শতকরা হার
কেন্দ্রীয় সরকার		৩৩
প্রদেশ : বাংলা	৫৫	৪৮
আসাম	৩৪	৩১
বিহার ও উড়িষ্যা	১১	২৪
যুক্ত প্রদেশ	১৫	২৯
মধ্য প্রদেশ	৫	১৪
পাঞ্জাব	৫৭	৪৯
সিন্ধু	৭১	৫৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯২	৭২
মাদ্রাজ	৮	১৩
বোম্বাই	৯	১৭

২৫. আইএইচ কোরেশি : *Struggle for Pakistan,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০৫।

২৭. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা, *Evolution of Pakistan.* অল পাকিস্তান লিগ্যাল ডিসিশন্‌স্, লাহোর, ১৯৬৩, পৃ. ২৪।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১ ।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২ ।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪ ।
৩২. খালেদ বিন সাইদ : *Pakistan : The Formative Phase,* পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, করাচি, ১৯৬০, পৃ. ১২৬ ।
৩৩. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা : *Evolution of Pakistan,* পৃ. ২২৫-২২৬ ।
৩৪. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী : *The Emergence of Pakistan,* পৃ. ৪৮ ।
৩৫. আইএইচ কোরেশি : *The Struggle for Pakistan,* পৃ. ২৪৩-২৪৪ ।
৩৬. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা : *Evolution of Pakistan,* পৃ. ২৩৩-২৪৭ ।
৩৭. এ কে আজাদ; *India Wins Freedom,* ওরিয়েন্ট লংম্যান, মাদ্রাজ ১৯৮৮, পৃ. ১৬৪-১৬৭ ।
৩৮. আইএইচ কোরেশি : *The Struggle for Pakistan,* পৃ. ২৭৫ ।
৩৯. আইএইচ কোরেশির বইয়ে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭৫ ।
৪০. এ কে আজাদ : *India Wins Freedom,* পৃ. ২০৩-২০৪ ।
৪১. ইয়ান স্টিফেনস : *Pakistan,* ফ্রেডারিক এ প্রেগার, নিউইয়র্ক ১৯৬৩, পৃ. ১০৯ ।
৪২. পূর্বোক্ত, ১০৯-১১৪ ।
৪৩. পূর্বোক্ত, ১১৭-১১৯ ।
৪৪. এ কে আজাদ : *India Wins Freedom,* পৃ. ২০৩-২০৪ ।
৪৫. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা : *Evolution of Pakistan,* পৃ. ২৪৯-২৫৬ ।
৪৬. এস. এম. বার্ক ও সলিম আল দিন কোরেশী : *The British Raj in India : The Historical Review.* ইউনিভার্সিটি প্রেস ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৯,৫১৩-৫১৭ ।
৪৭. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী : *The Emergence of Pakistan,* পৃ. ২৬৪, ২৬৮, ২৭৪ ।

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের দুটো অংশ কখনোই এক হলো না

সূচনায় পাকিস্তান

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয় অত্যন্ত দুর্বল একটা রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমাভুক্ত মুসলমান জনগোষ্ঠী ছিল ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে বেশি পশ্চাৎপদ। এছাড়াও, একটা স্বাধীন সত্তার জন্য রাজনৈতিকভাবে তারা প্রস্তুত ছিল না। বেশির ভাগ লোক রাজনৈতিকভাবে ততো সচেতন ছিল না এবং স্থানীয় নেতৃত্ব ছিল যথেষ্ট নিম্নমানের। পাকিস্তান আন্দোলনে মূল নেতৃত্বদানকারী মুসলমানেরা ছিলেন ভারতের অন্যান্য এলাকার অধিবাসী। এঁদের মধ্য থেকে কিছু নেতা পাকিস্তানে চলে আসেন। স্বাধীন ভারতের জন্য কংগ্রেস ১৯২৭ সালে একটি সাংবিধানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এটি 'মতিলাল নেহরু প্রতিবেদন' নামে বহুল পরিচিত। তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের জন্য সে রকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না। শুধু ছিল তিন অনুচ্ছেদে লিখিত 'লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাব'।

স্বাধীন ভারতের জন্য একটা শিক্ষা পরিকল্পনাও তৈরি করে রেখেছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হুসেইন। 'ওয়ার্ধা স্কিম'-এর মতো কোনো স্কিমই পাকিস্তানের জন্য ছিল না। পাকিস্তান একটি আধুনিক প্রজাতন্ত্র, না ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে, সে ব্যাপারেও ছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা। কংগ্রেস নেতারা তাঁদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং এজন্য অনেক পরিকল্পনাও প্রস্তুত ছিল। মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে সর্বপ্রথম এসব বিষয়ে চিন্তা করার জন্য একটা অর্থনৈতিক কমিটি স্থাপন করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন লিয়াকত আলী খান এবং একমাত্র অর্থনীতিবিদ ছিলেন এম.এল. কোরেশি, পরবর্তীকালে যিনি পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং সদস্য হন। পাকিস্তান যখন হাসিল হলো, তখনো এই কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তো দূরের কথা, কোনো অর্থনৈতিক রূপরেখাও তৈরি করতে পারে নি। অনেকেই মনে করতেন, পাকিস্তানের জন্ম যখন হওয়ার কথা ছিল, তার চাইতে বেশ আগেই হয়েছে। এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জাতি ততোটা প্রস্তুত ছিল না।

পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী। বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ পড়ে পাকিস্তানের ভাগে এবং এতে ছিল সম্মিলিত সেনাবাহিনীর বেশ ক'টি শ্রেষ্ঠ ইউনিট। বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পাঠান ও পাঞ্জাবি ইউনিটগুলো ছিল খুবই সুসংগঠিত। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর বৃটিশ সেনাবাহিনীতে এই ইউনিটগুলোর জন্যই খুব বেশি করে সৈন্য ভর্তি করা হতো এবং তাদের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বেসামরিক প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়েও পাকিস্তান বৃটিশ-ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ লাভ করে। 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস', 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিস' এবং 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল পুল'-এর প্রায় সমস্ত মুসলমান সদস্য পাকিস্তানে চলে আসেন। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে মোট ১৫৭ জন আইসিএস এবং আইপিএস কর্মকর্তাদের মধ্যে ৫০জন ছিলেন বৃটিশ, ২জন বাঙালি এবং আর বাদ বাকি সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অথবা ভারত থেকে আগত মোহাজের।[১] এছাড়াও ৮জন পুল কর্মকর্তার প্রত্যেকেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি।[২] বৃটিশ ভারতের অনেক আইসিএস অফিসার ১৯৪৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন বৃটেনের অধিবাসী। উচ্চতর পর্যায়ে যেসব প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন, তাঁদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানে চলে আসেন।

জাতিগঠনের দুরূহ দায়িত্ব এবং সঙ্কীর্ণতার জন্ম

শূন্যের কোঠা থেকে একটা দেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে যে চাপ পড়ে, সেটা ছিল অসহনীয়। কেন্দ্রীয় এবং পূর্ব বাংলা সরকারের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন করতে হয়। ভারত থেকে আগত লাখ লাখ শরণার্থীর পুনর্বাসন ছিল একটা দুরূহ কাজ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ পাকিস্তানে ছিল খুবই সীমিত এবং এসবই বৃটিশ-ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে আমদানি করতে হতো। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমার ভেতরে যেসব কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো, সেগুলো শুধু প্রক্রিয়াজাত করাই নয়, বরং সেসবের ব্যবহারও করা হতো ভারতের ভৌগোলিক সীমায়। সম্পর্কের এই ধরনটির পরিবর্তন করা ছিল একটা দুঃসাধ্য কাজ। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে দেখা দিলো ১৯৪৮ সালের কাশ্মির যুদ্ধ। অর্থনৈতিক জটিল সব সমস্যা, প্রতিরক্ষাগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একটি নতুন সরকার গঠনের উদ্যোগ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এর মোকাবিলা করতে সমর্থ হন নি। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রায় একনায়কসুলভ নেতৃত্ব। পাকিস্তানের প্রথম ক'বছর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালি নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবদান রাখবার কোনো সুযোগ পান নি। বটবৃক্ষের নিচে লতাগুল্ম বেড়ে উঠবার সুযোগ পেলেও অন্য কোনো বৃক্ষ বা গাছ বেড়ে উঠবার সুযোগ পায় না। পাকিস্তানের রাজনীতি থেকেও এসব মহান নেতা বিতাড়িত হন। মোহাম্মদ আলী

জিন্নাহর পর লিয়াকত আলী খান তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন।

মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে সোহ্‌রাওয়ার্দি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঊর্ধ্বতন মহলের কারসাজিতে তিনি পূর্ব বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হতে পারলেন না। পরিবর্তে নমনীয় এবং অনুগত খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। এই হতাশা সোহ্‌রাওয়ার্দিকে উপমহাদেশের ব্যাপক-বিশাল রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখবার সুযোগ করে দেয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় (বিশেষ করে বাংলা, বিহার ও পাঞ্জাবে) যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তার প্রশমনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর সোহ্‌রাওয়ার্দি পাকিস্তানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিষেধাজ্ঞার ফলে তাঁকে ঢাকা ছাড়তে হয়। কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উদ্যোগে তাঁকে জাতীয় রাজনীতি থেকেও সাময়িকভাবে অবসর নিতে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর গণপরিষদ সদস্যপদও কেড়ে নেয়া হয়। যাই হোক, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং একটি বিরোধী দল গঠনে উদ্যোগী হন।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৪১ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে একমত হতে না পেরে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে পরাস্ত করে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। দেশভাগের সময় তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে পাকিস্তানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সামনে হাজির হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাকে বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, বিশেষ করে কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগে তাঁর কোনো স্থান ছিল না। দেশভাগের পর কিছুকাল তিনি কলকাতায় অবস্থান করে শেষে ঢাকায় চলে আসেন। এখানে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না এবং তিনি তাঁর নিজস্ব দল গঠনেরও কোনো উদ্যোগ নেন নি। পাকিস্তানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি রাজনীতিবিদ ছিলেন, তাঁদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনো রকম ভূমিকা নিতে দেয়া হয় নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যতোদিন জীবিত ছিলেন, ততোদিন তিনি ঔপনিবেশিক বড়লাটের মতো রাজত্ব করেন। তিনি একাধারে যেমন গণপরিষদের সভাপতি এবং সরকারি দল মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্তে তাঁকে জাতির মহান নেতা হিসেবে (কায়েদে আযম) মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সব বৈঠকে সভাপতিত্ব করার অধিকার দেয়া হয়। এ ছাড়াও, তাঁকে যে-কোনো মন্ত্রীর মতামত নাকচ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। তিনি যে-কোনো বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতাও রাখতেন। তদুপরি, প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে মন্ত্রণালয়ের যে-কোনো

সচিবের কাছ থেকে যে-কোনো তথ্য দাবি করতে পারতেন।[৩] ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মৌলবী তমিজউদ্দিন খান হলেন গণপরিষদের নতুন সভাপতি বা স্পিকার। মুসলিম লীগের সভাপতি হলেন লিয়াকত আলী খান। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে বড়লাট নিযুক্ত করা হলো। সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হলেন নির্বাহী বিভাগের মুখ্য কর্তা এবং বড়লাট খাজা নাজিমউদ্দিন হলেন সংবিধান সম্মত রাষ্ট্রপ্রধান। তিন বছর পর ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তাঁর তিরোধানে রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হলো আরো গভীর এক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা। মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং বড় বড় নেতা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ এবার কাঁধে তুলে নিলেন বড়লাটের দায়িত্ব। এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন দেশের শীর্ষচূড় আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গোলাম মোহাম্মদ এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাঞ্জাবের শক্তিশালী উপদলের নেতৃত্বে সমাসীন হলেন। তাঁরাই ঠিক করলেন যে দুর্বল প্রকৃতির ও নমনীয় স্বভাবের খাজা নাজিমউদ্দিন হবেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাই দেখে বাঙালিরা মনে করলেন যে একজন বাঙালি অন্তত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।[৪]

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালি রাজনীতিবিদরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দেন। সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ পূর্ব বাংলার হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজধানী স্থাপিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। এ জন্য যে দুটি বিকল্পের কথা ভাবা হয়, সেগুলো ছিল সিন্ধু প্রদেশের করাচি এবং সীমান্ত প্রদেশের এ্যাবোটাবাদ। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান দফতরগুলো স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সশস্ত্র তিনটি বাহিনীর প্রধান দফতর স্থাপিত হয় করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান দফতর হয় করাচিতে। বাঙালি রাজনীতিবিদরা প্রথমদিকে এসব বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ করেন নি। পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন দুটি অংশের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত গণপরিষদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং নিজেদের আসনে পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে মূলত ৬৯ জন সদস্য ছিলেন, যার মধ্যে ৪৪টি আসন ছিল পূর্ব বাংলার। পরবর্তীকালে আরো ১০টি আসন সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট সদস্য সংখ্যার পাল্লা ভারি করা হয়।[৫] পূর্ব বাংলার আসন থেকে ৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাকে নির্বাচিত করা হয়।[৬] এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ (পরবর্তীকালে বড়লাট), একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ইশতিয়াক হোসেন কোরেশি (পরবর্তীকালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) এবং প্রখ্যাত মওলানা সাব্বির আহমদ ওসমানি। মন্ত্রিপরিষদেও বাঙালি প্রতিনিধিত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত। পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ছিল

৭ এবং এঁদের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালি। পরবর্তীকালে ৩ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করলে আরো ৭ জন নিযুক্তি লাভ করেন। এই মোট ১৩ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন বাঙালি। এছাড়াও আরো ৬ জন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন, যার মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালি।[৭] পরিশিষ্ট ৪-এ এর বিস্তারিত তালিকা দেয়া হলো। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনে বাঙালিদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যুগে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল খুবই সীমিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারই ছিল সর্বেসর্বা।[৮] সরকার তখন মোটামুটিভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুসরণে পরিচালিত হতো। সেই আইনে যেসব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়, পাকিস্তানে তারও কিছু কিছু কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করে। উদাহরণস্বরূপ শিল্প খাতকে প্রাদেশিক দায়িত্ব থেকে কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়।[৯] ক্ষমতা কেন্দ্রায়নের আরেকটি নজির হলো, বৃটিশ ভারতের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'-এর পুনর্বিন্যাস। বিভাগ-পূর্বকালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের যে প্রাদেশিক ক্যাডার ছিল, পাকিস্তানের একেবারে শুরুতেই তাকে পরিবর্তন করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসকে একটি কেন্দ্রীয় ক্যাডারে পরিণত করা হয়।[১০] পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান-প্রেমে এতোটাই অন্ধ ছিলেন যে, এইসব অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থার পরিণতি তারা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সঙ্কট

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা ছিল একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল ভিন্ন। পাকিস্তান ধারণার প্রতি পূর্ব বাংলার অঙ্গীকার ছিল খুবই দৃঢ়, পক্ষান্তরে ঐ ধারণার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের আনুগত্য তেমন পোক্ত ছিল না। দুই দেশের সমাজ-কাঠামোও ছিল ভিন্ন। পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক মানসিকতা ছিল অনগ্রসর। পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল ছিল একটি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করা ছিল একটি সহজাত প্রবৃত্তি। দেশের দুই অংশের দুইটি সমাজ ও মানসিকতার এই পার্থক্য সংবিধান রচনায় স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সংবিধান রচনার জন্য যে মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়, তার প্রথম দুইটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বাহ্যত দুটি মৌলিক বিষয়েই সমঝোতার অবকাশ ছিল না। বাঙালিদের দাবি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান শুধু উর্দুকেই সেই সম্মান দিতে রাজি ছিল। বাঙালিদের আরেকটি দাবি ছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কোনোমতেই বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে রাজি ছিল না। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে পূর্ব বাংলাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়। এই প্রতিবেদনে দুইটি

পরিষদের প্রস্তাব দেয়া হয় : নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হবে এবং উচ্চ পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশের সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই দুই পরিষদকে সমান ক্ষমতা প্রদান করে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নস্যাৎ করা হয়।[১১]

মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দুই পরিষদেই পাকিস্তানের দুই অংশকে সমান প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয়। এই প্রতিবেদন নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে, কিন্তু মন্ত্রিসভার পাঞ্জাবি চক্রটি তাতে ঘোর আপত্তি জানায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং মুশতাক আহমেদ গুরমানি এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে লিপ্ত হন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিয়া মমতাজ দৌলতানার প্ররোচনায় বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠী ধর্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই সুযোগে লাহোরে কাদিয়ানি-বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাদের দাবি ছিল যে, কাদিয়ানি গোষ্ঠীকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কাদিয়ানি সদস্য স্যার জাফরুল্লাহ খানকে বহিষ্কার করা হবে, আর না হলে নাজিমউদ্দিন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।[১২] পাঞ্জাবের আপত্তির মুখে এই প্রতিবেদন বস্তুতপক্ষে প্রত্যাহৃত হয়।[১৩] মুখ্যমন্ত্রী দৌলতানার প্ররোচনায় ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে লাহোরে কাদিয়ানি-বিরোধী দাঙ্গা বাধে। নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভা বাধ্য হয়ে সেখানে জারি করে সামরিক শাসন এবং এর প্রতিবাদে দৌলতানা পদত্যাগ করেন। পাঞ্জাবি চক্র এই সাময়িক সঙ্কট মোকাবিলায় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে। বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া

বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ যখন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে বরখাস্ত করলেন, তখন থেকেই শুরু হলো পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক রীতি ধ্বংসের প্রক্রিয়া। গণপরিষদে খাজা নাজিমউদ্দিনের কোনো শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল না এবং তিনি ছিলেন পরিষদের বৃহত্তম দলের নেতা। গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে বরখাস্ত করার জন্য একটা নতুন অজুহাত সৃষ্টি করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও অদক্ষতার অপবাদ তিনি আরোপ করলেন। কিন্তু পাকিস্তানের অপরিপক্ব রাজনীতিতে এইরকম স্বেচ্ছাচারিতার কোনো প্রতিবাদ হলো না। বস্তুতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হলো সামরিক আমলাতান্ত্রিক আঁতাতের কর্তৃত্ব। পাঞ্জাবি ক্ষমতাসীন চক্র গণতন্ত্রের ওপর এই অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতকে সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য একজন বাঙালি রাজনীতিবিদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। অবিভক্ত বাংলার সোহরাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। তাঁকে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানো হলো। গোলাম মোহাম্মদ, মুশতাক আহমেদ গুরমানি ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর এই ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিলেন। সঠিকভাবেই তাঁরা বিবেচনা করেন যে, পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন মোহাম্মদ আলী সবসময়ই অনুগত থাকবেন।[১৫] প্রায় ছয় মাসের মাথায় ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে

প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তাঁর সাংবিধানিক প্রস্তাব পেশ করলেন। নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব হবে এবং উচ্চ পরিষদে হবে প্রদেশের ভিত্তিতে। কিন্তু সম্মিলিত দুই পরিষদে থাকবে সমান সমান প্রতিনিধি, পূর্ব এবং পশ্চিম অংশ থেকে প্রত্যেকের ১৭৫ জন করে প্রতিনিধি থাকবে। মোহাম্মদ আলীর এই প্রস্তাব 'বগুড়া-নিশতার সমীকরণ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।১৬ এর ফলে যেন মনে হলো, পাওয়া গেল বিদ্যমান সাংবিধানিক সঙ্কটের একটা সমাধান।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার প্রথম থেকেই জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসেই ছাত্ররা একটি সরকার-বিরোধী সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করে। মার্চ মাসে সূচিত ভাষা আন্দোলনের দুটো দিক লক্ষণীয়। একটি হলো মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অন্যটি হলো মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা করা। একই সঙ্গে আরো অনেক সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে কৃষকরা অন্যায় ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এইসব আন্দোলন ছিল জনগণের প্রত্যাশারই বিস্ফোরণস্বরূপ। কিন্তু সরকার যেভাবে জনগণের প্রত্যাশা-সম্পৃক্ত এইসব আন্দোলন-বিক্ষোভ-সমাবেশ দমন করেন, তাতে করে তাদের জনপ্রিয়তা, বলতে গেলে, শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। ১৯৪৯ সালের শুরুতে পূর্ব বাংলায় প্রথম উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। টাঙ্গাইলের এই উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী তরুণ এক ছাত্রনেতা শামসুল হকের কাছে পরাজিত হলেন। মুসলিম লীগ সরকার এই ঘটনায় এতোটাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে, তাদের ছয় বছরের শাসনামলে আর দ্বিতীয় কোনো উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করার সৎসাহস দেখায় নি। ১৯৫৪ সালে যখন মুসলিম লীগ সরকারের পতন হলো, তখন আইন পরিষদের ৩২টি আসন শূন্য ছিল।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে সোহরাওয়ার্দির উদ্যোগে এবং তরুণ প্রগতিশীল নেতাদের উৎসাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিভাগ-পূর্বকালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনিই হলেন নবগঠিত এই রাজনৈতিক দলটির প্রথম সভাপতি। সোহরাওয়ার্দির প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি নিখিল পাকিস্তান সংগঠনে পরিণত হয় এবং বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে মুসলিম লীগ পরিণত হয় একটি পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে। জনগণের মধ্যে এ ধারণা জোরদার হতে থাকে যে, এই দলটি প্রদেশের মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে কিছু প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। একজন অত্যন্ত প্রতাপশালী মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীকে তাঁর নিজের দলই অপাঙক্তেয় ঘোষণা করে এবং দুর্নীতির কারণে তাঁকে 'প্রোডা' বলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিষিদ্ধ করা হয়।

পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন : ১৯৫৪

প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইউনিয়ন নির্বাচনে ১৯৫২ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। সলিমুল্লাহ হলে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট বিরাট ভোটের ব্যবধানে মুসলিম লীগ সমর্থিত ছাত্র গ্রুপটিকে পরাজিত করে। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। শেরে বাংলা তাঁর পুরনো দলকে পুনর্গঠিত করে নতুন নামকরণ করেন কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)। নির্বাচনের ঘোষণা ছাত্রসমাজকে যুক্তফ্রন্ট গঠনে তৎপর করে তোলে। আওয়ামী মুসলিম লীগভুক্ত যুব সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত মওলানা ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দি এবং শেরে বাংলার যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে মিলিত হয় আরো বেশ কয়টি ছোট ছোট রাজনৈতিক দল, যেমন, নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানি পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি। যুক্তফ্রন্ট প্রধানত প্রদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কায়েমের দাবি-দাওয়া সংবলিত ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে।[১৭]

২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। এ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি দফা ছিল, যেমন, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে শহীদ মিনার নির্মাণ, শহীদদের পরিবারকে ভাতা প্রদান, একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য একুশ দফায় ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র তিনটি দায়িত্ব রাখা হয়, যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা। একই সঙ্গে বলা হয় যে, দেশের দুই অঞ্চলে যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আরেকটি দফায় বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং সরকারি সমর্থনে অভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ দাবি করা হয়। ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন, সেচ ব্যবস্থার প্রসার এবং শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন লক্ষ্য এই ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণতান্ত্রিক আচরণ সমুন্নত করার খাতিরে নিয়মিতভাবে উপনির্বাচনের ব্যবস্থারও দাবি করা হয়। যদি তিনটি উপনির্বাচনে সরকারি দল পরাজিত হয়, তাহলে তারা পদত্যাগে বাধ্য থাকবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক নির্বাচনের ছয় মাস আগে পদত্যাগ করে সার্বিক রাষ্ট্র-ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করার অঙ্গীকারও এই ইশতেহারে সন্নিবেশিত হয়। অন্য একটি দফায় সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়া এবং যাবতীয় কালাকানুন রহিত করার প্রস্তাব রাখা হয়। প্রশাসনিক ব্যয়হ্রাস এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কার্যক্রম এই ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সুচিন্তিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা হয়।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের ভরাডুবি হয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ১১টি আসনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে শেরে বাংলা ফজলুল হক সরকার গঠন করেন। একেবারে সূচনাতেই যুক্তফ্রন্টভুক্ত দুইটি প্রধান অঙ্গদল আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার তিন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রথম অসুবিধা ছিল নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল; দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক প্রশাসনের সহযোগিতার অভাব এবং সর্বশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন চক্রান্ত। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদানের নির্দেশ আমলাতন্ত্রের গড়িমসির কারণে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলো না। কর্ণফুলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং আদমজি শ্রমিক এলাকায় স্থানীয় ও অস্থানীয়দের যে দাঙ্গা বাধে, তাতে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ছিল। এইভাবে সার্বিক পরিস্থিতি বেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। তবে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনী সাফল্যে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। বিজয়ের একটা আনন্দ পরিলক্ষিত হতে থাকে সর্বত্র। এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলন।

গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওপর নতুন আক্রমণ

পূর্ব বাংলায় দুই মাসের মধ্যেই নবনির্বাচিত ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্রীয় সরকার বরখাস্ত করলেন এবং লাট সাহেবের রাজত্ব কায়েম করলেন। ফজলুল হক যদিও আইন পরিষদের ৯০ শতাংশ সদস্যের নেতা ছিলেন, তবুও তাঁকে কলমের এক খোঁচায় বিদায় দেয়া হলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, প্রদেশে শ্রমিক অসন্তোষের কোনো বিহিত তিনি করতে পারেন নি। এছাড়াও তাঁকে 'দেশদ্রোহী' এবং ভারতের 'হাতের পুতুল' হিসেবে অপবাদ দেয়া হয়। তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এলেন প্রদেশের নতুন লাট বাহাদুর হিসেবে। ইস্কান্দার মির্জা মূলত বৃটেনের প্রসিদ্ধ সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্যান্ডহার্স্ট-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। বৃটিশ আমলে তিনি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্তি পেয়ে সীমান্ত প্রদেশে জেলা প্রশাসক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মির্জা সরাসরি রাজনীতি ক্ষেত্রে এবারই প্রথম নামলেন। তাঁর পেছনে ছিল সেনাবাহিনীর সমর্থন। পূর্ব বাংলায় তিনি মাত্র ছয় মাস ছিলেন। এবং সেখান থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে যখন বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ শারীরিকভাবে একেবারেই অক্ষম হয়ে যান, তখন ইস্কান্দার মির্জা সেই পদে সমাসীন হন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই, যে মির্জা ফজলুল হককে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছিলেন, তাঁকেই তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কিছুদিন পরেই ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার লাট বাহাদুর হিসেবে প্রেরণ করেন।

পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বহাল থাকে।

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শহীদ দিবস উপলক্ষে ছাত্রদের অসন্তোষ প্রদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করে। এক হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী দেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্রেফতার হয়। আওয়ামী লীগ এবং কেএসপি দুই দলই লাট সাহেবের শাসন অবসানের জন্য আন্দোলনে নামে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে সংসদীয় সরকার পুনর্স্থাপিত হয় এবং আবু হোসেন সরকার একটি কেএসপি কোয়ালিশন দলের নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টে ফাটল আগেই ধরেছিল, এবারে তার ভাঙন সম্পূর্ণ হলো।

পূর্ব বাংলায় একবছর দীর্ঘ গভর্নর শাসনের চাইতেও গণতন্ত্রের ওপর আরো কঠোর আঘাত এলো এর প্রায় ছয় মাস পর। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান গণপরিষদই ভেঙে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আন্তরিকভাবেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ এক্ষেত্রে তাঁর জন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি করেন। তাঁদের প্রথম প্রস্তাব হলো পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশকে বিলুপ্ত করে একটি একক প্রদেশের সৃষ্টি। এই উদ্যোগ যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা পেলেন একটা আঞ্চলিক সাব-ফেডারেশন।[১৮] এ ধরনের নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলে। ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই শাসনতন্ত্র ঘোষণা করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়।[১৯] কিন্তু সেটা হওয়ার ছিল না। পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদরা এক জোট হয়ে এই উদ্যোগকে ব্যর্থ করতে তৎপর হন। এবং ষড়যন্ত্রী এই চক্রের নেতৃত্ব দেন বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ। তিনি 'প্রোডা'র (Public and Representative Offices Disqualification Act, 1949) অধীনে তাঁর সঙ্গে দ্বিমতকারী মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেন। সবশেষে তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও এই হুমকি দেন। গোলাম মোহাম্মদ তখন শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ এবং তাঁর মানসিক ভারসাম্যের বিষয়টি নিয়েও সন্দেহের অবকাশ ছিল।

গণপরিষদ সদস্যরা এই অবস্থা বিবেচনা করে বড়লাটের ক্ষমতা খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা 'প্রোডা' বাতিল করে দেন এবং বড়লাটের মন্ত্রিসভা বাতিল করার অধিকারও কেড়ে নেন।[২১] ক্রুদ্ধ বড়লাট সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা বরখাস্ত না করে গণপরিষদকেই বাতিল করে দেন। তিনি এই পদক্ষেপের সমর্থনে দুইটি যুক্তি হাজির করেন। প্রথমত, তিনি দাবি করেন যে গণপরিষদ ৭ বছর সময়সীমায় একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না করে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গণপরিষদটি প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কারণ সরকারি দল ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে। দুইটি যুক্তির মধ্যেই যথেষ্ট খাদ ছিল। গণপরিষদ বস্তুতপক্ষে তখন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে। বড়লাট পূর্ব বাংলার জন্য শুধু মায়াকান্নাই কাঁদেন, কারণ তখন ঐ প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বহাল ছিল এবং প্রাদেশিক পরিষদ আরো নয় মাস পর্যন্ত অকার্যকর ছিল।

বড়লাটের এই পদক্ষেপ মোটেই আইনসম্মত ছিল না, নির্বাহী বিভাগের আইন

পরিষদ ভাঙার কোনো এখতিয়ার ছিল না। গণপরিষদের স্পিকার তমিজউদ্দিন খান বড়লাটের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সিন্ধুর উচ্চ (চিফ) আদালতে নালিশ রুজু করেন। তিনি গণপরিষদকে পুনর্বহাল করার দাবি জানান এবং বড়লাট কর্তৃক গণপরিষদের ক্ষমতা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করার আবেদন জানান। সিন্ধুর উচ্চ আদালত স্পিকারের আবেদন মঞ্জুর করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বড়লাট সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মুনীর একটি সামান্য ছুতো দেখিয়ে বড়লাটের পদক্ষেপ বৈধ ঘোষণা করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন'-এর ২৩৩-ক ধারায় উচ্চ আদালতকে রিট ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই আইন গণপরিষদ পাস করে এবং বড়লাট তাতে দস্তখত করেন নি, সেজন্য এই আইনের অধীনে সিন্ধুর উচ্চ আদালত কোনো রায় দিতে পারেন না। বড়লাটের গণপরিষদ বিলুপ্ত করার কোনো অধিকার আছে কি না, সে বিষয়ে বিচারপতি মুনীর কোনো অভিমত প্রদান করলেন না। বিচারপতি মুনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই রায় ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি এবং তাঁকে সেখান থেকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই বড়লাট তাঁর ইচ্ছেমতো গণপরিষদে গৃহীত কিছু কিছু আইনে সম্মতি দেন এবং কিছু কিছু আইন বাতিল করেন। এই কারণে ক্ষুব্ধ একটি মহল আদালতের শরণাপন্ন হন এবং শেষ পর্যন্ত মামলাটি গড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায়। 'সরকার বনাম ইউসুফ প্যাটেল' নামে খ্যাত এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে যে, বড়লাট গণপরিষদের ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো একটি আইনে সম্মতি দেবেন এবং অন্যটি বাতিল করবেন, সেটা চলবে না। অতীতে ঘটে-যাওয়া বিষয়ের ক্ষেত্রে বড়লাট বর্তমান কোনো আইনকে প্রয়োগ করতে পারবেন না। এক কথায় সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত দিল যে, আইনের চোখে গণপরিষদের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং অন্য কেউ তার ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে না। এই সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে বড়লাট বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত চেয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করলেন। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে যে অভিমত পাঠালো, তাতে শুধু আইনের দিকটিই বিবেচনা করা হয় নি, পাশাপাশি রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও স্বীকার করে নেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, গণপরিষদ বিলুপ্ত করার অধিকার বড়লাটের নেই। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বড়লাটকে এই অধিকার দিতে সুপ্রিম কোর্ট সম্মত হয়। সুপ্রিম কোর্ট বড়লাটের সঙ্গে একমত হয় যে, গণপরিষদ তার প্রতিনিধিত্ব হারিয়েছে এবং একটি চিরস্থায়ী পরিষদে পরিণত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে আরো বলা হয় যে, গণপরিষদে গৃহীত সব আইনে বড়লাটের সম্মতির প্রয়োজন। অধিকন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ অভিমতও দেয় যে, বিলুপ্ত গণপরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অসমর্থ। এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বড়লাটকে নতুন করে গণপরিষদ গঠনের আহ্বান জানায়। তবে বড়লাট এই পরিষদের কোনো সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে না। কেবল প্রাদেশিক পরিষদগুলোই তাদের নির্বাচন করতে পারবে।[২১]

বড়লাটের অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক এই পদক্ষেপ দেশের রাজনীতিতে তেমন কোনো সাড়া জাগাতে সক্ষম হলো না। পাঞ্জাবের রাজনীতিবিদরা একে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন। পাঞ্জাবি কর্তৃত্বাধীন আমলাতন্ত্রও এতে সায় দেয়। পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদরা এই গণপরিষদের বিলুপ্তিতে বরং খুশিই হলো; কারণ এতে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। তাঁরা এও ভেবেছিলেন যে, সরকার পরিবর্তনের ফলে পূর্ব বাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে বড়লাটের অনুকূলে সবচেয়ে জোরালো সমর্থন আসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। আইউব খান তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন যে, অর্ধোন্মাদ ও অসুস্থ বড়লাট তাঁকে দেশ শাসন করার আহ্বান জানান। কিন্তু তখন এর জন্য তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। তিনি আরো বলেন যে, বড়লাটের পদক্ষেপকে গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর ওপর চাপ প্রয়োগ করেন।[২২] আইউব খান সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ না করলেও, রাজনৈতিক অঙ্গন এরপর থেকে তাঁর প্রভাবমুক্ত ছিল না। গোলাম মোহাম্মদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে আবারো মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন। এবারে তিনি 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস্' অর্থাৎ 'বিজ্ঞজনদের মন্ত্রিসভা' গঠন করলেন। আইউব খান এই মন্ত্রিসভার সদস্য হন এবং তাঁর ধ্যান-ধারণাই হয় এই মন্ত্রিসভার আদর্শ। তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে একটি প্রদেশ গঠন এবং দুই অংশের ভেতরে প্রতিনিধিত্বের সমতাগত ধারণার প্রবক্তা।[২৩] সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী একটি নতুন গণপরিষদ গঠন করা হলো এবং এই পরিষদে ছিল প্রতিনিধিত্বের সমতা। দেশের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ জন করে মোট ৮০ জন এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নানা বিষয়ে তিনি সুবিধা আদায় করেন। তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্বে থাকবেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন বন্ধ করা হবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্তি এবং মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হবে। নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে এক বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গোলাম মোহাম্মদের এসব অঙ্গীকারের মধ্যে মাত্র দুটি রক্ষা করা হয়। শেখ মুজিব কারাগার থেকে ছাড়া পান এবং অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর মওলানা ভাসানী দেশে ফিরে আসেন।[২৪] নতুন গণপরিষদ নির্বাচিত হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে জোর দেয়া হয়। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন জুলাই মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের মারিতে শুরু হয়। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ তখন একটি সমঝোতায় পৌছুতে চেষ্টা করেন। এরই ফলে গোলাম মোহাম্মদের আশীর্বাদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৮ জন নেতা তথাকথিত 'মারিচুক্তি'তে সই করেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবি ছিল দুইটি—এক.

প্রতিনিধিত্বের হিসেবে তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সমান হতে হবে এবং দুই, তাদের নিজেদের অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সম্পর্ক কী হবে, সেটা তারা নিজেরা নির্ধারণ করবে। এই চুক্তির যে মূল পাঁচটি দিক ছিল, সেগুলো হলো: ১. পশ্চিম পাকিস্তানে একটি প্রদেশ, ২. দুইটি প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ৩. শুধু প্রতিনিধিত্বে নয়, জনপ্রশাসনে, ব্যবসাবাণিজ্যে, অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে দুই অংশের মধ্যে সমতা, ৪. যুক্ত নির্বাচন এবং ৫. উর্দু ও বাংলা দুইটিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই চুক্তিতে পূর্ব বাংলার পক্ষে স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দি, আবুল মনসুর আহমদ এবং আতাউর রহমান খান। পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এতে স্বাক্ষর করেন মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, মুশতাক আহমদ গুরমানি, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং খান সাহেব আবদুল গফুর।[২৫] এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা একটি মারাত্মক ভুল করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে যে ব্যক্তিটি তখন মূল চাবিকাঠি ঘোরাচ্ছিলেন, এই চুক্তিতে সেই ইস্কান্দার মির্জার স্বাক্ষর নেয়া হলো না। তিনি ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানে শুধু 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' চলতে পারে, আর কিছু নয়।[২৬] রাজনীতিবিদদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে আগস্ট মাসের শুরুতে গোলাম মোহাম্মদ বড়লাটের পদ থেকে অপসারিত হলেন এবং ইস্কান্দার মির্জা হলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত। 'মারিচুক্তি' মেনে চলার ব্যাপারে ইস্কান্দার মির্জার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তিনি ক্ষমতায় এসেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং এ. কে. ফজলুল হককে দলে টেনে সোহরাওয়ার্দিকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রয়োজন ততোদিনে ফুরিয়ে গেছে। এবারে ইস্কান্দার মির্জা আগস্টের ১১ তারিখে (১৯৫৫) চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। ৮০ সদস্যের গণপরিষদে সাকুল্যে ২৬ জন সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগই ছিল সবচেয়ে বড় দল। তাদের সিদ্ধান্ত হলো, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীই হবেন তাদের নেতা। এদিকে এক সময়ের সহযোগী কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৬ এবং আওয়ামী লীগ ১৩ জন সদস্য নিয়ে কোয়ালিশন করতে ব্যর্থ হলো। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রথম কাজ হলো পশ্চিম পাকিস্তান গঠন আইন করা। ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হলো এক পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ। যতোই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক যুক্তি তুলে ধরা হোক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানে এক প্রদেশ গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল, আর কিছু নয়, পাঞ্জাবি কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালে প্রকাশিত দৌলতানা দলিল থেকে এই সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় যে, মারিচুক্তি নিতান্তই দুরভিসন্ধিমূলক ছিল। তার প্রথম লক্ষ্যই ছিল পূর্ব বাংলাকে সর্বতোভাবে অবদমিত করা এবং পরবর্তী লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।[২৭] পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ প্রতিষ্ঠা আইনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ধারা ছিল 'পূর্ব বাংলা'কে 'পূর্ব পাকিস্তানে' রূপান্তরিত করা।

শাসনতন্ত্র আইনটি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী গণপরিষদে উপস্থাপন করেন। এই আইনে স্বতন্ত্র অথবা যুক্ত নির্বাচন সম্পর্কে কোনো অভিমত প্রকাশ না করে বিষয়টি

ভবিষ্যতের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়। একুশ দফা অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এই শাসনতন্ত্রে প্রতিভাত হলো না। যোগাযোগ, বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদসহ নির্দিষ্ট কিছু শিল্প খাত ফেডারেল সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। এছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, ব্যাঙ্কিং, বীমা এবং মোটামুটিভাবে আর্থিক খাতে ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারকে যৌথভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়।[২৮] সরকার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্র হলেও রাষ্ট্রপতিকে স্ববিবেচনার যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করবেন।[২৯] নির্বাচন কমিশন এবং কর্মকমিশনও তিনি স্বাধীনভাবে নিয়োগ করবেন।[৩০] নির্বাহী এবং আইন বিষয়ে মন্ত্রিসভার সমুদয় সিদ্ধান্ত তাঁকে জানানো হবে এবং তিনি যে-কোনো বিষয়ে তথ্য দাবি করতে পারবেন। তদুপরি মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন।[৩১] শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা আওয়ামী লীগ এবং আরো ছোট ছোট কিছু দল গ্রহণ করলো না। আওয়ামী লীগের আপত্তি ছিল চারটি বিষয়ে যথা, প্রতিনিধিত্বের সমতার নীতি, নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতা, সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির মাত্রাতিরিক্ত স্ববিবেচনার সুযোগ এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অবনয়ন। কংগ্রেস আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলিত হয়ে আরেকটি অতিরিক্ত আপত্তি তোলে। তারা পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় নি। আজাদ পাকিস্তান পার্টি এবং গণতন্ত্রী দল পাকিস্তানকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা না দেয়ায় আপত্তি জানায়। ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি এবং তফসিলি সম্প্রদায় ফেডারেশন আওয়ামী লীগের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি শাসনতন্ত্র গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং এর প্রতিবাদে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জন ওয়াক-আউট করেন। এই ২৪ জনের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের ১৩ জন, কংগ্রেসের ৪ জন, তফসিলি ফেডারেশনের ৩ জন, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টির ২ জন, গণতন্ত্রী দলের একজন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র ১ জন সদস্য আজাদ পাকিস্তান পার্টির মিয়া ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে চালু হলো।[৩২]

আসলে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গ্রহণের এই পদ্ধতিটি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা বিভিন্ন সদস্যকে রীতিমতো ব্ল্যাকমেইল করেন এবং নিজের ক্ষমতা ও নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নানা ধরনের চাপ প্রয়োগ করেন।[৩৩] তিনি সত্যিকারভাবে নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যদিও তাঁর ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটে, তবুও এই শাসনতন্ত্রকে মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। প্রায় দুই বছর এই শাসনতন্ত্র বহাল ছিল কিন্তু নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হলো না। রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বীয় অবস্থান সংহত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। রিপাবলিকান পার্টির ইশতেহার রচনা করেন পশ্চিম পাকিস্তানের লাট বাহাদুর মুশতাক আহমেদ গুরমানি। তাঁরই ছত্রছায়ায় এই দলের সদস্যরা একত্র হন এবং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা তাঁদের আশীর্বাদ করেন।[৩৪]

প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী শত চাপের মুখেও এই দলে যোগ দিতে অস্বীকার করে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করলেন। এই পরিবর্তিত অবস্থায় গণপরিষদের নেতৃত্বের ভার পড়লো শহীদ সোহরাওয়ার্দির কাঁধে। রাষ্ট্রপতি তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান করলেন। শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যকার সম্পর্ক ছিল টানাহ্যাঁচড়ায় ভরা এবং গোলমেলে। রাষ্ট্রপতির সমর্থনে ছিল পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সোহরাওয়ার্দি তাঁর এক বছরের শাসনকালে (১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ১৮ অক্টোবর) পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেন। ক্ষমতা প্রয়োগে রাজনীতিবিদদের ব্যাপকতর ভূমিকা পালনের সুযোগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলির প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদানের বিষয়টি থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্যগোচর হয়।৩৫ এর ফলে রাষ্ট্রপতি মির্জা সন্ত্রস্ত হলেও, তাঁর চিরাচরিত ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার করলেন না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো।৩৬ অবশেষে রাষ্ট্রপতি মির্জা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিকে পদত্যাগের আহ্বান জানালেন। আইনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিকে তাঁর জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগটি পর্যন্ত দিলেন না।

রাষ্ট্রপতি এবার মুসলিম লীগ নেতা আই.আই. চুন্দ্রিগড়কে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন। দুই মাস এই পদে বহাল থেকেও চুন্দ্রিগড় আইনসভায় তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলেন। ১৯৫৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর রিপাবলিকান পার্টির নেতা হিসেবে ফিরোজ খান নুন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এই সরকারকে সমর্থন দিলো। শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি তখন শুরু হলো। নির্বাচনের তারিখ কয়েকবার পরিবর্তনের পর ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগই তখন জনপ্রিয় দল। ইস্কান্দার মির্জা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটেই নিশ্চিত ছিলেন না। ফেডারেল সরকারে তখন একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। মির্জা এবার প্রাদেশিক সরকারের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

উল্লেখ্য, এর আগেই আমরা জেনেছি, ১৯৫৫ সালের জুন মাসে কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকার পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর নিযুক্তি নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল এবং কেএসপি পরিষদের বৃহত্তর দল ছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার নিজেদের দলীয় স্বার্থে কেএসপি-কে পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন দেখতে চায়। পূর্ব বাংলার লাট বাহাদুর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন এই আদেশ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে পদত্যাগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার প্রাদেশিক পরিষদের আর কোনো অধিবেশন আহ্বান না করেও এক বছরের বেশি সময় ধরে শাসন কাজ চালিয়ে যান। এই সময় প্রদেশে একটি গুরুতর খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয় এবং ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় এক ভুখ-মিছিলে গুলিবর্ষণ হয়। এরই ফলে আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের ৬

সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন। এই সরকার পরবর্তী দুই বছর ক্ষমতায় সমাসীন ছিল।

ফেডারেল সরকারে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান বিষয় নিয়ে রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বিদ্যমান শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, কিন্তু সোহরাওয়ার্দি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারা বলতে থাকে যে, এই শাসনতন্ত্রেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ন আছে। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি পররাষ্ট্র বিষয়ে যে নীতি অবলম্বন করেন, সে ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমি জোটের সমর্থনে অবস্থান নেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এতোদিন জোট নিরপেক্ষতার সমর্থক ছিল। উল্লিখিত দুটি বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগ মহলে যে প্রকাশ্য তর্ক-বিতর্কের সূচনা হলো, তার একটা কিনারা করতে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংগঠনের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কাগমারিতে অনুষ্ঠিত এই বিখ্যাত সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দি ও ভাসানীর মধ্যে চূড়ান্ত ফাটলের সৃষ্টি হলো। পরবর্তী ১৮ মার্চে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেন। জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তানে একটি নতুন দলের অভ্যুদয় ঘটলো। ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত এই দলটির নাম হলো 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি', সংক্ষেপে 'ন্যাপ'। এদিকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের মধ্যেও অনেক ব্যাপারে কোন্দল দেখা দিলো। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং শক্তিশালী সংগঠক শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্কে চিড় ধরে। শেখ মুজিব অবশেষে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং দল গঠনের উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল দলটিকে দুর্বল করে ফেলে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না। তাঁর মনোনীত লাট সাহেব এ. কে. ফজলুল হক এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগান। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ লাট সাহেব আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। ফেডারেল সরকারে আওয়ামী লীগের তখন যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তার সদ্ব্যবহার করে পরের দিনই ফেডারেল সরকার প্রাদেশিক লাট সাহেবকে বরখাস্ত করে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা বহাল থাকলেও, এখনকার সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়লো। রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা আওয়ামী লীগকে কাবু করার জন্য এবার নতুন কোনো ফন্দিফিকির খুঁজতে লাগলেন। ন্যাপ গঠনের পর তাঁর সে সুযোগও মিলে গেল। প্রাদেশিক রাজনীতিতে ন্যাপ-এর অনিশ্চিত অবস্থান একটি ছোটখাট সঙ্কটের সৃষ্টি করে। সেই সময় প্রাদেশিক পরিষদের এক অধিবেশনে খুবই হট্টগোল হয়। প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার ছিলেন আবদুল হাকিম খান। কেএসপির এই নেতা যুক্তফ্রন্টের মধুচন্দ্রিমার সময় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ এখন তাঁকে পদচ্যুত করতে চাইলো এবং তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে ঘোষণা করলো। পরিষদের অধিবেশন তখন আওয়ামী লীগ দলের

ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পরিচালনা করছিলেন। ক্ষুব্ধ কেএসপি সদস্যরা স্পিকারের মঞ্চে উঠে শাহেদ আলীকে সেখান থেকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। ইতোমধ্যে কয়েকজন আওয়ামী লীগ সদস্য স্পিকারের মঞ্চে আরোহণ করেন। বিবদমান দুই দলের ঠেলাঠেলিতে শাহেদ আলী গুরুতর আহত হন। ২৩ সেপ্টেম্বরের দুঃখজনক রাতে শাহেদ আলী মারা যান।

সামরিক আইন জারি

এই রকম অস্থিতিশীল এক অবস্থায় সামরিক বাহিনীর সমর্থনে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনায় লিপ্ত হন। এবারে সামরিক বাহিনী পর্দার অন্তরাল থেকে বীরদর্পে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি মির্জা দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করলেন। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ নয় বছরের টানা-হ্যাঁচড়ার পর পাকিস্তানে নতুন সংবিধান চালু হয়। যে প্রক্রিয়ায় সংবিধান গৃহীত হয়, সেটা শুভলক্ষণযুক্ত কিছু ছিল না। রাষ্ট্রপতি মির্জা সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাহত করতে তৎপর থাকেন। প্রথমেই স্থির হলো যে, ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচন হবে। এই তারিখ দুই দু'বার পরিবর্তন করে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত হয়। বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৫৫ সালের মধ্যেই সব ক'টি প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই যুক্তি থেকেই রাষ্ট্রপতি মির্জা বারবার সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে চলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতাসীন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা তাঁর সঙ্গে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। যা কিছু বিপত্তি দেখা যায়, তার সবই ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে। ফেডারেল সরকারে রিপাবলিকান পার্টি এবং আওয়ামী লীগের কোয়ালিশনের ফলে মনে হয়, যেন নির্বাচনকে আর কোনো মতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। পাশাপাশি এও মনে হয় যে, ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অগ্রগতিকে আর রোখা যাবে না।

১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবরে সামরিক শাসন জারির ফলে সংবিধান বাতিল হলো, সবগুলো আইন পরিষদ বিলুপ্ত হলো এবং রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হলো। রাষ্ট্রপতি মির্জা পাকিস্তানের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আইউব খানকে দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন তৎপরতা এবং তাদের পারস্পরিক কোন্দলে অসন্তুষ্ট ছিল এবং দুর্নীতি ও চোরাচালানের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু সামরিক শাসনের ঘোষণা তাদেরকে সাময়িকভাবে হতচকিত করে দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল থেকে সদ্য মুক্ত স্বাধীন দেশে এটাই ছিল প্রথম সামরিক শাসন। এ ধরনের শাসন পদ্ধতির ব্যাপারে জনগণের সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। ১৯৫৩ সালে লাহোরে কাদিয়ানি দাঙ্গা দমনের উদ্দেশ্যে মাত্র স্বল্প সময়ের জন্য সামরিক শাসন জারি করা হলেও, তার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। সংবিধান বাতিল

করার ফলে দেশে আইনের শাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়লো। একই সঙ্গে বড় বড় শহরে সশস্ত্র বাহিনীর মহড়া বা কুচকাওয়াজ জনগণের মনে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার করলো। সামরিক শাসনের তিন দিনের মাথায় 'আইন-শৃঙ্খলা' ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে Laws Continuance in Force Order শীর্ষক আইন জারি করা হয়। সামরিক শাসনে আমলাতন্ত্রকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় আমলা আজিজ আহমদকে সাধারণ সচিব ও উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি মির্জা কয়েকজন বেসামরিক মান্যগণ্য ব্যক্তি এবং তিনজন জেনারেলকে নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। সামরিক সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, চোরাচালান রোধ এবং সার্বিক নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জনগণের মনে সামরিক শাসন সম্পর্কে যে আপাত ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, সেটা দূর হলো। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে জনগণের মনে স্বস্তির ভাব ফিরে এলো। বলতে গেলে সাধারণ মানুষ সামরিক শাসনকে খুশির সঙ্গেই গ্রহণ করলো। কিন্তু গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার যে অপমৃত্যু হলো, সেটা তারা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারলো না।

দেশে রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হলো। নির্বাচন নিয়ে কথা বলার অবকাশ থাকলো না। মাস যেতে-না-যেতেই আরেকটি বিরাট পরিবর্তন ঘটলো। রাষ্ট্রপতি মির্জাকে সেনাবাহিনীর নেতারা আর ক্ষমতায় রাখতে চাইলেন না। জেনারেলদের চাপে মির্জাকে বৃটেনে নির্বাসন দেয়া হলো। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সমগ্র দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইউব খান হলেন একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং অন্যদিকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। পরবর্তীকালে জানা যায় যে, সামরিক শাসন জারি করার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়েছিল ঐ বছরেরই ৩০ সেপ্টেম্বরে।[৩৭] বস্তুতপক্ষে জেনারেল আইউব খান রাষ্ট্রপতি মির্জাকে সামরিক শাসন ঘোষণা করতে বাধ্য করেন; তাঁকে হুমকি দেন এই বলে যে, অন্যথায় তিনি নিজেই সামরিক শাসন ঘোষণা করবেন।[৩৮]

সামরিক শাসন একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে হত্যা করলো, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতার চৌহদ্দি থেকে বাঙালিদের বিতাড়িত করলো। এক হিসেবে পাকিস্তানে বিদ্যমান যে রাজনৈতিক অবস্থার সোহরাওয়ার্দি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, সামরিক শাসন সেই অবস্থাকেই জোরালোভাবে পুনর্প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্বন্ধে তারেক আলী বলেন, "যখন সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র সামরিক শাসনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা বিভাগোত্তরকালে দেশে যে অবস্থা প্রায় অক্ষুণ্ন ছিল, তাকেই পুনরায় বহাল করে।"[৩৯]

আইউবের ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন

আইউব খান ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তান সরকারের ফেডারেল চরিত্র পাল্টে ফেললেন। এমন কি নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে তাকে কেন্দ্রীয় সরকার-এ আখ্যায়িত করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি সমগ্র দেশে আইন ও নির্বাহী বিষয়ে সার্বিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রাদেশিক লাট সাহেবরা হন তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি। এক হিসেবে তিনি

ছিলেন একজন বৃটিশ বড়লাটের চাইতেও ক্ষমতাধর। বৃটিশ বড়লাট বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকতেন। কিন্তু আইউব খানকে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হতো না। ১৯৬২ সালে রাজকীয় কায়দায় তিনি তাঁর প্রজাদের উপহার দিলেন একটি শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার কোনো ছলচাতুরি ছিল না। আইউব খান ১৯৫৪ সালে একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর খুব জোর দেন এবং মাত্র চারটি বিষয়ে ফেডারেল সরকারকে দায়িত্ব দেন। এই চারটি বিষয় ছিল : প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা।[৪০] এই রকম যাঁর চিন্তাভাবনা, তিনি কি না শেষ পর্যন্ত এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করলেন, যেখানে প্রাদেশিক সরকারগুলো কোনো রকম দায়িত্বের অধিকারী হলো না। শুধু প্রদেশের লাট সাহেবকেই তিনি নিযুক্তি দিতেন না, বরং তাঁর মন্ত্রী অথবা সচিব কারা হবেন, তাও তিনি নির্ধারণ করে দিতেন।[৪১] এই শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের একটি বিস্তারিত ফর্দ তৈরি করে। এই ফর্দে যেসব বিষয় বাদ পড়ে যায়, শুধু সেগুলোই ছিল প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত।[৪২] প্রাদেশিক সরকারের ওপর আইউব খানের আসলে কোনো আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না এবং সর্ববিষয়ে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বহাল করা হয়। তিনটি অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোনো ব্যাপারে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো। এই তিনটি অজুহাত ছিল যথাক্রমে ১. জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা অথবা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, ২. দুইটি প্রদেশের কর্মকাণ্ডে অভিন্নতা রক্ষা করা এবং ৩. পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন করা।[৪৩]

এই শাসনতন্ত্রের অধীনে আইন পরিষদ পরিণত হলো একটা লোক দেখানো ব্যাপারে। পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে মানুষের ভোটাধিকারও বস্তুত কেড়ে নেয়া হলো। আইউবের সরকারকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বহুল প্রচলিত একটি রাজনৈতিক প্রবাদকে পাল্টে দিয়ে বলেন, এই সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রপতির, রাষ্ট্রপতির জন্য এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত।[৪৪] আইউব তাঁর মন্ত্রিসভায় দুই প্রদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে সমতা বজায় রাখেন। কিন্তু এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর পছন্দের লোক। দক্ষতা বা প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র নয়, বরং প্রভুর প্রতি অন্ধ আনুগত্যই ছিল তাঁদের যোগ্যতার মাপকাঠি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এঁদের চাইতে বেশি প্রতিপত্তিশালী ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আমলা কর্মকর্তারা। আইউবের ১১ বছরের রাজত্বে এ কারণেই নীতি-নির্ধারণে বাঙালিদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। আইউবের এক সময়কার প্রিয়পাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালিদের প্রতি আইউবের এই চরম তাচ্ছিল্যবোধ খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন।[৪৫] আইউবের আমলে অবশ্য এক ধরনের স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও দেশ রাজনৈতিকভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সাধারণ মানুষ বাহ্যত আইউবের রাষ্ট্র পরিচালনাগত বিভিন্ন পদক্ষেপ মেনে নিলেও, ভেতরে ভেতরে তারা ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের প্রভাব এবং বাঙালিদের বঞ্চনা

রাষ্ট্র গঠনে যেসব বিভিন্নমুখী সমস্যা অচিরেই দেখা দিতে শুরু করলো, সেগুলোর মোকাবিলায় রাজনীতিবিদরা ততো পারদর্শী ছিলেন না। অধিকতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমলাতন্ত্র এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে। পাকিস্তান জন্মের প্রথমদিকে এই দু'টি গোষ্ঠী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও, অল্প দিনের মধ্যেই আমলাতন্ত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করে। লিয়াকত মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্য ছিলেন সাবেক আমলা এবং তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন অর্থমন্ত্রী আর স্যার জাফরুল্লাহ খান ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। এ ছাড়াও মহাসচিব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি তাঁর কর্মপরিধি সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকেই দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য ভূমিকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৪৬] পরবর্তীকালে তিনি প্রথমে অর্থমন্ত্রী ও পরিশেষে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন।

কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চ পর্যায়টি ছিল সবদিক থেকেই রক্ষণশীল ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী। প্রথমত, তাঁরা সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। যেসব সদস্য ভারত থেকে শরণার্থী হিসেবে আসেন, তাঁরাও পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, তারা সমাজের একটি বিশেষ স্তরের সদস্য ছিলেন। সামাজিক এবং বৈবাহিক সূত্রে উচ্চস্তরের সকলেই এক গোষ্ঠীতে অবস্থান করতেন। এঁদের মধ্যে ছিল আমলারা ছাড়াও সামরিক কর্মকর্তা ও ভূস্বামীরা। তৃতীয়ত, ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পরেও এই গোষ্ঠীতে নতুন কারো অনুপ্রবেশ ঘটলো না। ভারতে প্রশাসনের উচ্চতর মহলে নতুন রক্তের সঞ্চালন ব্যাপকভাবে ঘটলেও, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটা হলো না। রাজনীতিতে যে মুহূর্ত থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মেরুকরণ শুরু হলো, ঠিক তখন থেকেই এই উচ্চতর মহলটির সঙ্কীর্ণতার চূড়ান্ত বহির্প্রকাশ ঘটতে শুরু করলো। পাশাপাশি তাঁরা রাজনীতিবিদদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে অভ্যস্ত ছিল এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাঁরা নিজেরাই নিতে শুরু করলো।

পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত উচ্চপদে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই বহাল থাকে এবং বিশেষভাবে বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কোনো বাঙালিই এই প্রদেশে মুখ্য সচিবের পদটি দখল করতে পারেন নি। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রদেশে একজন বাঙালি লাট সাহেব নিযুক্ত হলেন, তখুনি মুখ্য সচিব কাজী আনওয়ার-উল হককে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হলো। সম্ভবত বাঙালি লাট সাহেবের ওপর মাতবরি করার জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানি একজন আমলার প্রয়োজন পড়ে। অনেক কাল পর ১৯৬৯ সালে এস.এম. শফিউল আজম দ্বিতীয় বাঙালি মুখ্য সচিব হন। দুই বছর পরেই যখন আরেকজন বাঙালি লাট সাহেব নিযুক্ত হলেন, তখুনি তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়। ডাক্তার আবদুল মুতালেব মালিক যখন লাট নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর মুখ্য সচিব হন মুজফফর আহমদ নামের একজন পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা। পূর্ব বাংলায় প্রথম বাঙালি লাট সাহেব নিযুক্ত হন ১৯৫৬ সালে। কিন্তু ৩ বছর পরেই আবার পশ্চিম পাকিস্তানি লাট সাহেবদের আগমন ঘটতে থাকে। আইউব খানের

শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর তাঁর পদলেহী রাজনীতিবিদ আবদুল মোনায়েম খান লাট সাহেব নিযুক্ত হন এবং একাধারে তিনি ৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পদে বহাল থাকেন।

অনেকেই মনে করে থাকেন যে, দেশের দুই অংশের জনগণের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাদের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো আচরণ এবং স্থানীয় মানুষদের চরমভাবে হেয়জ্ঞান করতেন। একজন সংবেদনশীল পর্যবেক্ষকের মতে, "তাঁরা ছিল উচ্চতর শ্রেণীর। তাঁরা কখনোই বাংলা ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতো না। বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে তাঁরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।"[৪৭] পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্য সচিব আজিজ আহমেদ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তাঁর মন্ত্রীদের হুকুম মানার পরিবর্তে তাঁদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নালিশ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন তাঁকে এতোটাই দুর্বিনীত করে তোলে যে, তিনি তাঁর মন্ত্রীদের হুকুম মানা তো দূরের কথা, তাঁদের আগে থেকে কোনো রকম জানান না দিয়েই ইচ্ছেমাফিক তৎপরতা চালাতেন।[৪৮] বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানি আমলারা জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বাঙালি-বিদ্বেষকেই প্রকট করে তোলেন। এই জাতি-বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আইউব খান নিজেও বাঙালিদের সম্পর্কে চরম কটুবাক্য উচ্চারণে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি তাঁর দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এরকম উচ্চারণও করেন যে, জাতিগতভাবেই বাঙালিরা নিচু শ্রেণীর।[৪৯]

কেন্দ্রীয় সরকারের এই আমলাতন্ত্রই বাঙালিদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে এবং তাঁরা সেটা করে রাজনৈতিক রীতিনীতি লংঘন করে হলেও। এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো উচ্চ আমলাতান্ত্রিক পদে লোক বাছাই সংক্রান্ত নীতির অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ। ১৯৪৮ সালের ১৯ মে লিয়াকত মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য একটি 'রিক্রুটমেন্ট নীতি' গ্রহণ করে। এতে স্থির করা হয় যে, ১৫ শতাংশ সদস্যকে তাঁদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে এবং বাকি ৮৫ শতাংশকে দুই অংশে সমভাবে বণ্টন করা হবে। এই নীতিতে ১৯৫০ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে সামান্য রদবদল করা হয়। তখন মেধার জন্য নির্দিষ্ট হয় ২০ শতাংশ পদ, ৪০ শতাংশ হয় পূর্ব বাংলাবাসীর জন্য, ২৩ শতাংশ হয় পাঞ্জাবি, ১৫ শতাংশ সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ এবং ২ শতাংশ হয় ফেডারেল রাজধানী করাচির অধিবাসীদের জন্য।[৫০] এই রিক্রুটমেন্ট নীতি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশ সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয় কথিত আমলাতন্ত্রই। তাঁরাই ঠিক করে দিলো যে, প্রাদেশিক ক্যাডারের অবস্থা বিবেচনা করে নতুন নিযুক্তি সম্পন্ন করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানের দুটি ক্যাডারই পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের দিয়ে পূরণ করা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কখনো বাঙালিরা ৪০ শতাংশ পদে নিযুক্ত হতে পারে নি। ১৯৫৬ সালে কিছু বাঙালি মন্ত্রীর তৎপরতার ফলে এই কোটা সর্বপ্রথম কার্যকর করা হয়। কিন্তু ৩ বছর পর ভিন্ন এক উপায়ে এই রেওয়াজটি ব্যর্থ করে দেয়া হয়। ১৯৬০ সাল থেকে এই কোটার বাইরে কিছুসংখ্যক সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করার রীতির প্রবর্তন

করা হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও আরো নানাভাবে এই বঞ্চনা চলতেই থাকে। নিচুস্তরের কর্মচারীদের পদোন্নতি দিয়ে নতুন নিযুক্তির পথ রুদ্ধ করা হয়। আবার কখনো সাময়িকভাবে পদ সৃষ্টি করে নিযুক্তি মারফতও কোটার প্রয়োজনীয়তা বানচাল করা হতো। রিক্রুটমেন্ট নীতিমালা শুধু সরকারি পদে নিযুক্তির ব্যাপারে প্রয়োগ করা হতো, অন্যদিকে আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সৃষ্টি করেও একে অকার্যকর করে রাখা হতো। এইভাবে নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে কোটা ব্যবস্থার প্রয়োগ বানচাল করে দেয়া হয়। এ জন্যই পাকিস্তানের ২৩ বছরে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল এক-চতুর্থাংশেরও নিচে।

কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব বাংলাকে শোষণের ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানের দুই অংশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার পাকিস্তান সরকারের ঘোষিত নীতি এরা কখনোই অনুসরণ করে নি। অথচ পাকিস্তানের প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য নিরসন করা।[৫১] এমন কি ১৯৬২ সালে আইউব খান প্রণীত শাসনতন্ত্রে এই লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি ছিল একটা বাধ্যবাধকতা।[৫২] আমলাতন্ত্রের ধারাবাহিক ছলচাতুরির কারণে এ ব্যাপারে প্রকৃত উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ ঘটে নি। পরিকল্পনা মাফিক সরকারি খাতে পূর্ব বাংলার জন্য যে উন্নয়ন ব্যয় হওয়ার কথা ছিল তা প্রদেশটির স্বার্থের অনুকূলে কখনোই যায় নি। বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো পূর্ব বাংলায় কখনো গড়ে তোলা হয় নি। এ জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রয়োজন ছিল, পূর্ব বাংলাকে তা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। পূর্ব বাংলায় উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা কখনোই করা হয় নি।

এখানে একটা বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়, সেটা হলো, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি পূর্ব বাংলায় বসবাস করতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এদেশের মানুষের প্রতি পোষণ করতেন সত্যিকার মমত্ববোধ, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিও ছিল তাঁদের গভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আইউব খান নিযুক্ত প্রাদেশিক লাট সাহেব জেনারেল আজম খান। তিনি ১৯৬০ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬২ সালের মে পর্যন্ত ছিলেন এই দেশের একচ্ছত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তাঁর দুই বছরের শাসনকালে সরকার এদেশের জনগণের কল্যাণের দিকে মনোযোগ দেয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার হয়, ছাত্রদের নানা সমস্যা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একমাত্র আজম খানের আমলেই এই প্রদেশের বার্ষিক বাজেটের পুরোটাই ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হয়রানি করার তৎপরতা একমাত্র তাঁর উদ্যোগেই বন্ধ হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। কোম্পানিটির দোষ ছিল তারা শেখ মুজিবকে তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মনিযুক্তি দিয়েছিল। জেনারেল আজমের হস্তক্ষেপে সরকারের এই উদ্যোগ

বানচাল হয়ে যায়। তাঁর সময়ই ঢাকার অসমাপ্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। আজম খানের অন্যতম অবস্থান ছিল সরকারি কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালি আমলা-কর্মকর্তাদের আত্মমর্যাদাশীল হিসেবে গড়ে তোলা। পূর্ব বাংলায় লাট সাহেব হিসেবে আসার আগে যে আজম খান সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা ছিল, সেই তিনি যখন এখান থেকে চলে যান, তখন প্রদেশবাসীকে কান্নার ধারাস্নানে ভাসিয়ে যান। আইউব খানের সঙ্গে মত-বিরোধের কারণেই তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং এরপরে আইউব খানের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তাঁর আপত্তি ছিল দুটি বিষয়ে, আইউব খানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার তিনি অস্বীকার করেন এবং রাজনৈতিক বিরোধিতাকে আইউব খান যেভাবে মোকাবিলা করতে চাইতেন, তাঁর সেটা মনোপূত ছিল না। তাঁর পদত্যাগের চূড়ান্ত কারণ ছিল, এনডিএফ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আইউব কর্তৃক গ্রেফতার।[৫৩]

সামরিক বাহিনী এবং গণতন্ত্রের ব্যর্থতা

১৯৪৮ সালে কাশ্মির যুদ্ধের সময় থেকেই পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তানে সামরিক খাতে ব্যয় কী রকম দ্রুততার সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, সারণি ৩.১-এ সেটা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ১৯ মে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। এই সময় রাজস্ব আয়ের অর্ধেকেরও বেশি সামরিক খাতে ব্যয় করা হতো। এতে শুধু উন্নয়ন ব্যয়ই কমে নি, বরং একটি শক্তিশালী প্রচাপ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। আমেরিকার বিবেচনায় পাকিস্তানের সঙ্গে তার সামরিক চুক্তি ছিল কমিউনিজম রোধ করার উদ্দেশ্যে এবং পাকিস্তানের কাছে সেটা ছিল ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়। পাকিস্তান একই উদ্দেশ্যে 'সিয়াটো' এবং 'সেন্টো' সামরিক জোটে যোগ দেয়। এসব বিভিন্নমুখী চুক্তির ফলে সামরিক বাহিনী আরো শক্তিশালী হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ২শ' কোটি ডলার সামরিক সাহায্য প্রদান করে।[৫৪] সামরিক বাহিনী পাকিস্তানে একটি অদ্বিতীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই বাহিনী জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, দেশের রাজনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করে, দেশের অপ্রতুল সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয় এবং সরকারে সবকিছু চেপে যাওয়ার একটা রীতির প্রচলন ঘটে। এতে কেবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেই পাকিস্তানের সম্পর্ক তিক্ত হয় নি, বরং তার নিজের দুই অংশের মধ্যে বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তোলা হয়।

সারণি ৩.১

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয়

লাখ টাকার হিসেবে

বছর	মোট রাজস্ব	প্রতিরক্ষা ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১৯৯০	১৫৪০
১৯৪৮-৪৯	৬৬৮০	৪৬২০
১৯৪৯-৫০	৮৮৫০	৬২৫০
১৯৫০-৫১	১২৭৯০	৬৫০০
১৯৫১-৫২	১৪৪৮০	৭৭৯০
১৯৫২-৫৩	১৩৩৪০	৭৮৩০
১৯৫৩-৫৪	১১১১০	৬৫৩০
১৯৫৪-৫৫	১১৭৩০	৬৩৫০
১৯৫৫-৫৬	১৪৩৬০	৯১৭০
১৯৫৬-৫৭	১৩৪১০	৮০১০
১৯৫৭-৫৮	১৫২৫০	৪৫৪০
১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯০	৯৯৭০
১৯৫৯-৬০	১৯৭৮০	১০৪৪০
১৯৬০-৬১	২১২৩০	১১১২০
১৯৬১-৬২	২৩১৭০	১১০৯০
১৯৬২-৬৩	২০৬৪০	৯৫৪০
১৯৬৩-৬৪	২৮৩০০	১১৫৭০
১৯৬৪-৬৫	৩৩০১০	১২৬২০
১৯৬৫-৬৬	৩৭৯৮০	২৮৫৫০
১৯৬৬-৬৭	৪৪৭৫০	২২৯৪০
১৯৬৭-৬৮	৪৭০৪০	২১৮৭০
১৯৬৮-৬৯	৫৭৭৪০	২৪২৭০
১৯৬৯-৭০	৬৪৮৪০	২৭৬০০
১৯৭০-৭১	৬৪৭৫০	৩১০৪০
১৯৪৭-৭০	৫৪১৮৮০	২৭৪৭১০

উৎস ১. অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief-1970-71*, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৭।

২. অর্থ মন্ত্রণালয় : *Annual Budget Statement 1971-72*, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ, পৃষ্ঠা ২-৩।

সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ১৯৪৯ সালেই লিয়াকত আলী খানকে সতর্ক করে তোলে। তিনি সামরিক ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ নেন। এই সঙ্গে তিনি সামরিক

কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সরকারি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আত্তীকরণের ব্যবস্থা করেন এবং নতুন নিযুক্তি কমিয়ে দেন। এই প্রচেষ্টার অন্যতম পরিণতি ছিল পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে বিপুলসংখ্যক সামরিক বাহিনীর সদস্যের বিভিন্ন পদে নিযুক্তি। তবে লিয়াকত আলী খানের এই উদ্যোগ অনেক পদস্থ সামরিক কর্মকর্তার মনোপূত হয় নি। অনেকেই মনে করেন যে, রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র এবং সবশেষে লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ড এই সামরিক অসন্তোষেরই পরিণতি।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সুযোগ-সুবিধা মোটেই দেয়া হতো না। এই বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য যে-কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন হতো অন্তত পাঁচ ফুট সাড়ে ছয় ইঞ্চি উচ্চতা এবং একশ' পঁচিশ পাউন্ড ওজন। উচ্চতা ও ওজনের এই যে মাপকাঠি গড়পড়তা বাঙালির পক্ষে সেটা পূরণ করা সম্ভব হতো না। এছাড়াও পূর্ব বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসীদের অসামরিক গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের জন্য সর্বোচ্চ কোটা নির্ধারণ করা ছিল এবং কোনোখানেই সেটা ১২ শতাংশের বেশি ছিল না। তদুপরি বেশির ভাগ সামরিক দফতর ও স্থাপনাদি পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় বাঙালিরা স্বভাবতই সেগুলোতে নিযুক্তি পেতো না। পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য পাকিস্তানিরা একটা ভুয়া যুক্তির অবতারণা করে। তারা বলতো, পশ্চিম পাকিস্তান শক্তিশালী হলে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা কেউ বিঘ্নিত করতে পারবে না। এই যুক্তি যে কতোখানি অসারোক্তি ছিল, তার সবচাইতে বড় উদাহরণ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। যাই হোক, পাকিস্তানে যে সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে, সেটা ছিল একান্তভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। এই বাহিনীর ৭০ শতাংশ ছিল একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী পাঞ্জাবিদের দ্বারা গঠিত।

পাকিস্তানে সেনাবাহিনী বিরাটাকার ধারণ করার ফলে দেশের সীমিত সম্পদের ওপর তাদের দাবি বেড়ে যায়। তার ওপর এই বাহিনী পাঞ্জাবিদের দ্বারা গঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালিরা যাতে ক্ষমতায় না আসতে পারে, তার জন্য সব রকমের ছলচাতুরির আশ্রয় এই বাহিনী নিতে থাকে। গণতন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রধান শত্রু। এই ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের শক্তিশালী আমলাতন্ত্র সামরিক বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই পাকিস্তানের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এবং গণতন্ত্র ব্যাহত করতে সামরিক বাহিনী প্রধান ভূমিকা পালন করে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পদদলন

পাকিস্তানের তেইশ বছর ছিল বাঙালি সংস্কৃতি দমনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। প্রথম আক্রমণ এলো বাংলা ভাষার ওপরে। বাংলা এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধশালী ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯১৩) সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। পাল রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়।

পরবর্তীকালে ইলিয়াস শাহি ও হোসেন শাহি আমলে বাংলা ভাষার বিকাশ হয়। পাকিস্তানে এই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৫৬ শতাংশ। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত ছিল অনেকগুলো ভাষা, যথা পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, হিন্দকো, গুরমুখী এবং উর্দু। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রস্তাব করা হয় যে, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের ভাষাও। ফলে এই ঘোষণা বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব বাংলায় চরম বিক্ষোভের সঞ্চার করলো এবং দাবি উঠলো যে, উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে।[৫৫]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বিধি করা হলো যে, শুধু ইংরেজি এবং উর্দু হবে গণপরিষদের ভাষা। ফলে আবার শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বাংলা ভাষার আন্দোলন। গণপরিষদের কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিধিটির প্রতিবাদ করেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। পূর্ব বাংলায় এর আশু ও জোরালো প্রতিবাদ হলো। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ একটি প্রগতিশীল সংগঠন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। এর প্রথম সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এদের উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে একটি ধর্মঘট পালনের ভেতর দিয়ে। ২ মার্চ ছাত্রদের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। ১১ মার্চ বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চলে। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্মপরিষদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন কর্মপরিষদের সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেন।[৫৬] এই সময়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর প্রথম পূর্ব বাংলা সফরে আগমন করেন। ১৯ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ২৪ মার্চ তিনি একই বক্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায়ও উল্লেখ করলেন। ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলো। জিন্নাহ্ তাঁর পুনরুক্তিতে বক্তব্যের কিছুটা পরিবর্তন করে বললেন যে, তাঁর মতে, জাতীয় সংহতির স্বার্থে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হলে ভালো হয়।[৫৭] এই ঘটনার পর সরকার আর কোনো উচ্চবাচ্য করলো না এবং ভাষা আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে গেল।

মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে ভাষার বিষয়টি আবার সামনে এসে দাঁড়ালো। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকা সফরে এসে ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। চার বছর আগে নাজিমউদ্দিন যে আপোসনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁর বর্তমান অবস্থান এর পুরোপুরি বিপরীতমুখী। নাজিমউদ্দিনের এই ঘোষণা যে বিক্ষোভের সূচনা করলো, তাতে করে প্রাদেশিক প্রশাসন অচল হয়ে পড়লো। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ সারা দেশে হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিলের আহ্বান জানায়। ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার গোলযোগের

আশঙ্কা থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আগের দিন রাতে ১৪৪ ধারা জারি করলো, যাতে কেউ বিক্ষোভ-সমাবেশ করতে না পারে। এই নিষেধাজ্ঞা.অগ্রাহ্য করে ঢাকা মহানগরীর সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পথে নেমে আসে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় নিষেধাজ্ঞা অমান্যের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে ছাত্র এবং পুলিশের মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধের অবতারণা হয়। অপরাহ্নে তৎকালীন মেডিকেল কলেজের মোড়ে পুলিশ বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং তাতে ছাত্রসহ বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটে। এই আন্দোলনে ছাত্ররা ছাড়া তমদ্দুন মজলিশ, যুবলীগ ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগও অংশগ্রহণ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেরে বাংলা ফজলুল হক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। মনে হলো, সারাদেশ যেন বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। কয়েকজন পরিষদ সদস্য এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল থেকে পদত্যাগও করেন।[৫৮] ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। যে জায়গাটিতে ছাত্র-জনতা শহীদ হয়, সে জায়গাটিতে সরকারিভাবে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। সামরিক শাসন এই কাজ বন্ধ রাখে। পরবর্তীকালে জেনারেল আযমের উদ্যোগে এর কাজ শেষ করা হয় ১৯৬২ সালে। জেনারেল ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে এই স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে এর পুনর্নির্মাণ ও ১৯৮৩-৮৪ সালে একে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভাষার বিষয়টি ভোটদাতাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ভাষার জন্য ছাত্রদের রক্তদান এবং পূর্ব বাংলার নির্বাচনী রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ১৯৫৪ সালের ৭ মে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হন। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের দুইটি শাসনতন্ত্রেই বাংলাকে পাকিস্তানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সরকারি কার্যক্রমে বাংলার প্রচলন অথবা এই ভাষাকে পশ্চিম পাকিস্তানে পরিচিত বা চালু করার কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হলো না।

বাঙালি সংস্কৃতিকে আরো নানাভাবে বিপর্যস্ত করার প্রয়াস নেয়া হয়। ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম করা হলো 'পূর্ব পাকিস্তান', যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকাগুলোকে তাদের পূর্বতন নামেই বহাল রাখা হয়। অনেক বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের রচনাকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়, তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁরা খাস বাঙালি হলেও মুসলমান ছিলেন না। এরকম কোনো ব্যবস্থা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সর্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও, পশ্চিম পাকিস্তানে তা আদৃত হতো না। বাঙালি পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সৌন্দর্যচর্চার রীতিনীতি পাকিস্তান সহ্য করতে পারতো না। এই ধরনের সূক্ষ্ম আঘাত ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর।

দুই অংশের সম্পর্কের মূল্যায়ন

পাকিস্তানের দুই অংশের তেইশ বছরের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল বিবদমান এবং অস্থিতিশীল। পারস্পরিক সহযোগিতা অথবা ত্যাগের এতে কোনো স্থান ছিল না। সমস্ত ত্যাগ শুধু বাঙালিদের একাই স্বীকার করতে হয়। প্রথমে প্রায় ১২ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ছেড়ে দিতে হলো এবং পরবর্তীকালে ক্ষমতার চৌহদ্দিতেই তাদের ছায়া বলতেও ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানিদের কিন্তু সে রকম কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠী কোনো মতেই গণতন্ত্র চর্চার ধারাকে সমুন্নত রাখার সুযোগ দিল না। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তারা একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক ভাবধারার পরিপোষণ শুরু করে, অন্যদিকে তেমনি প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাকে চাঙ্গা করে তোলে। কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, দুই দেশের ভাষাই শুধু বিভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবধারায়ও কোনো মিল নেই। পাকিস্তানের আন্দোলনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে অভিযোগ ছিল, পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদেরও একই ধরনের অভিযোগ গড়ে উঠলো। তারা দেখলো, তাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সত্তা দলিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত থাকছে এবং ক্ষমতার অঙ্গনে তাদের কোনো স্থান নেই। অবিভক্ত ভারতে ধর্ম যেভাবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল, পাকিস্তানে তার কোনো সুযোগ ছিল না। সামরিক শক্তি ক্ষমতা গ্রহণ করলে অনেকেই ভাবতে শুরু করেন যে রাজনৈতিক পরিবর্তন জাতীয় সংহতিতে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, দুই অংশের মধ্যে সমস্যা যতো কম থাকবে, ততোই মঙ্গল। এরই ফলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সামনে উঠে আসে।

পাকিস্তানের প্রথম দশক শেষে বাঙালিদের অবস্থান সম্পর্কে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক কিথ কালার্ড একটি অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেন। পরবর্তী ১৩ বছরে এই উপসংহার আরো জোরালো হয়। কিথ কালার্ডের মন্তব্যটা ছিল এ রকমের, "নিজেদের অকার্যকারিতার জন্য অথবা অন্য দলের মেকিয়াভেলিসুলভ চক্রান্তের জন্য বাঙালিরা পাকিস্তানে কোনোদিন নিয়ামক ভূমিকা রাখতে পারে নি। নাজিমউদ্দিন ছিলেন গভর্নর জেনারেল। কিন্তু তখন মূল ক্ষমতা ছিল প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর হাতে। নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হলেও, তাঁর দৃঢ়চিত্ততার অভাব তাঁকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ করলো এবং অবশেষে পাঞ্জাবি গভর্নর জেনারেল তাঁকে বরখাস্ত করলেন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হলো। যদিও তিনি বাঙালি ছিলেন, কিন্তু যাঁদের সমর্থনে তিনি ক্ষমতায় এলেন, সেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের পুতুল হিসেবেই তিনি কাজ করেন। গণপরিষদের বাঙালি সদস্যরা তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাঞ্জাবি গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নিলেন, কিন্তু গভর্নর জেনারেল সেজন্য তাঁদের বরখাস্ত করলেন। পূর্ব বাংলায় জনগণ সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করলো কিন্তু তাতেও ক্ষমতা তাঁদের হাতে এলো না; এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ প্রদেশে গভর্নরের রাজত্ব চালালেন।

সামরিক বাহিনী ছিল পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তানি। জাতীয় জনপ্রশাসনেও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাদের প্রাধান্য। বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও বাঙালিদের কোনো ভূমিকা ছিল না। পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরের ইতিহাস বাঙালিরা এভাবেই বিবেচনা করে। এরই ফলে জাতীয় পর্যায়ে সমতার কোনো সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে তারা ক্রমশ অধিকতর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।"[৫৯]

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. লা পালোম্বারা সম্পাদিত *Bureaucracy & Political Development,* প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৩।
রালফ ব্রাইবান্টির প্রবন্ধ Public Bureaucracy & Judiciary in Pakistan, পৃ. ৩৬৫-৩৬৭।

২. *Report of the Administrative Reorganisation Committee,* Efficiency and OM Wing, সংস্থাপন বিভাগ, পাকিস্তান সরকার, করাচি, ১৯৬৩, পৃ. ৩২৩।

৩. পাকিস্তান মন্ত্রিসভা সচিবালয়ের কাগজপত্র থেকে লেখক ১৯৬৬ সালে এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

৪. খালেদ বিন সাঈদ : *Pakistan : The Formative Phase.* পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, করাচি, ১৯৬০, পৃ. ৪১৫।

৫. মুশতাক আহমদ : *Government & Politics in Pakistan.* পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, করাচি, ১৯৫৯, পৃ. ৯০।

৬. পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম থেকে চতুর্থ অধিবেশনের বিবরণে সদস্যদের শপথ গ্রহণের হিসেব মিলে। *Proceedings of Pakistan Constituent Assembly.* এই চারজন ছাড়া আরো তিনজন বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এরা হলেন বর্তমানে পাকিস্তানে বসবাসরত বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, প্রয়াত ড. মাহমুদ হোসেন, যিনি করাচি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হন এবং মীর্জা আহমদ হাসান ইস্পাহানী।

৭. ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান মন্ত্রিসভা সচিবালয়ে লেখক এই বিষয়ে একটি ফর্দ প্রস্তুত সম্পন্ন করেন।

৮. খালেদ বিন সাঈদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২।

৯. পরিকল্পনা বিভাগ : *Economic Disparities between East & West Pakistan.* পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত প্রতিবেদন, ঢাকা ১৯৬৩, পৃ. ৭।

১০. ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে মুখ্য সচিবদের একটি সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ২৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে এটি কার্যকরী করা হয়।

১১. খালেদ বিন সাঈদ : *The Political System of Pakistan.* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৬৫, পৃ. ৬৭-৬৮।

১২. *Report of the Court of Enquiry into the Punjab Disturbances of 1953.* পাঞ্জাব সরকার, লাহোর, ১৯৫৪, পৃ. ১৩১-১৩২।

১৩. খালেদ বিন সাঈদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

১৪. *Report of the Court of Enquiry.* পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮, ২৬৩-২৬৪, ২৬৬-২৬৭।

১৫. কিথ কালার্ড : *Pakistan : Political Study,* জর্জ এলেন অ্যান্ড আনউইন, লন্ডন, ১৯৫৭, পৃ. ১৩৮।

১৬. মোহাম্মদ আলী : *Constitutional Proposals.* ফিরোজ সন্স, করাচি, ১৯৫৩।

১৭. এ.আর আজাদ ও এস.এ. রেজা : একুশ দফা থেকে পাঁচ দফা, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ১২৭-১২৯।

১৮. *Constitutional Assembly Debate.* ১৬ খ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪, পাকিস্তান সরকারি প্রেস, করাচি, ১৯৫৪, খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতা, পৃ. ৩৬১।

১৯. *Dawn* দৈনিক পত্রিকা, করাচি, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪।

২০. জি. ডব্লিউ. চৌধুরী : *Constitutional Developments in Pakistan*. ইউনিভার্সিটি অব বৃটিশ কলাম্বিয়া, ভানকুবার, ১৯৬৯, পৃ. ৮৫।
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৯১।
২২. আইউব খান : *Friends not Masters*. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি ১৯৬৭, পৃ. ৫২।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭-১৯০।
২৪. আবুল মনসুর আহমদ : *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৭৪-২৭৮।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৫।
২৬. *Dawn*. করাচি, ৩১ অক্টোবর, ১৯৫৪।
২৭. খালেদ বিন সাঈদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৯।
২৮. *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*. পাকিস্তান সরকার, করাচি ১৯৫৬, পৃ. ২০৬-২১৩।
২৯. পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৩৭(৩), পৃ. ২৫।
৩০. পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৪২ ও পঞ্চাশ সিডিউল, পৃ. ২৫, ১২৫, ১৩৭-১৩৮।
৩১. পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৪৩, পৃ. ২৮।
৩২. কিথ কালার্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-১২২।
৩৩. *Pakistan Legal Documents : Supreme Court*, ১৯৭২, পৃ. ১৩৯। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমান পাঞ্জাব সরকার বনাম আসমা জিলানি মামলায় গভর্নর জেনারেলের অবৈধ কর্মকাণ্ডের ইতিহাস বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মীর্জার অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের কথা বলেন।
৩৪. খালেদ বিন সাঈদ : *Pakistan : The Formative Phase*. পৃ. ৯০।
৩৫. খালেদ বিন সাঈদ : *The Political System of Pakistan*. পৃ. ৯০ এবং ১৯২-১৯৩।
৩৬. কামরুদ্দিন আহমদ : *The Social History of East Pakistan*, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ১৪৬-১৪৮।
৩৭. ফজল মকিম খান : *The Story of Pakistan Army*. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৯৪।
৩৮. আইয়ুব খান : পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৬০।
৩৯. তারিক আলী : *Pakistan : Military Rule or People's Power*. উইলিয়াম মারে এন্ড কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০, পৃ. ৮৭-৮৮।
৪০. আইউব খান : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০।
৪১. *The Constitution of Islamic Republic of Pakistan*. পাকিস্তান সরকার, করাচি, ১৯৬২, অনুচ্ছেদ ৬৬ ও ৮২, পৃ. ৪১-৪৭।
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-১৩৪।
৪৩. পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ১৩১, পৃ. ৬৮-৬৯।
৪৪. খালেদ বিন সাঈদ : *The Political System of Pakistan*. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।
৪৫. জেড. এ. ভুট্টো : *The Great Tragedy*. ভিসন পাবলিকেশনস্, করাচি, ১৯৭১, পৃ. ৭।
৪৬. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী : *The Emergence of Pakistan*. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃ. ২৪৪-২৪৯।
৪৭. খালেদ বিন সাঈদ : *Pakistan the Formative Phase*. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২।
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯, ৩৮৫।
৪৯. আইউব খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
৫০. পাকিস্তান মন্ত্রিসভা সচিবালয়ের দলিলপত্র পরীক্ষা করে ১৯৬৮ সালে লেখক এই তথ্য আবিষ্কার করেন।
৫১. পরিকল্পনা বোর্ড : *First Five Year Plan*. পাকিস্তান সরকার, করাচি, ১৯৫৯, পৃ. ১৩, ১৭, ১৮, ২৯।

পরিকল্পনা বোর্ড : *Second Five Year Plan.* করাচি, ১৯৬০, পৃ. ৬, ১৯৭।
পরিকল্পনা বোর্ড : *Third Five Year Plan.* করাচি, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫, ৩৮, ১২৮-১২৯।
পরিকল্পনা বোর্ড : *Fourth Five Year Plan.* ইসলামাবাদ, ১৯৬৯, পৃ. ১৯।

৫২. *The Constitution of Pakistan* : পাকিস্তান সরকার, করাচি, ১৯৬২, ১৬৫ অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৬।

৫৩. লেখকের নিজস্ব সূত্রে এবং জেনারেল আজমের পদত্যাগপত্রের আলোকে। লেখক জেনারেল আজমের উপসচিব ছিলেন (সেপ্টেম্বর ১৯৬০ থেকে ১০ মে-তে পদত্যাগ করে তাঁর পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগ পর্যন্ত)।

৫৪. ই.এস. ম্যাসন, আর ডর্ফম্যান এবং এস মার্গালন : *Conflict in East Pakistan : Background & Prospects* প্রবন্ধ ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতর সঙ্কলিত, *Bangladesh Documents* প্রথম খণ্ড, ভারত সরকার, মাদ্রাজ, ১৯৭১, পৃ. ১০।

৫৫. বদরুদ্দিন উমর : *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ২০-২৪।

৫৬. পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা ৫০-৫২, ৫৯-৬১, ৬৬-৭১, ৭৭-৮২।

৫৭. পূর্বোক্ত : পৃ. ৬৬-৩৭, ৮১, ১০৪-১১১,
এম.এ.জিন্নাহর দুইটি বক্তব্যই পাওয়া যায় : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড*, ঢকা ১৯৮২, পৃ. ৮৩ ও ৮৭।

৫৮. ২১ ফেব্রুয়ারিতেই প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে মুসলিম লীগ সদস্য আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ অধিবেশন বর্জন করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্রদের আসরে বক্তৃতা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার সুপারিশ প্রস্তাবাকারে পেশ করে। আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সম্পাদকীয়তে এই গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ করেন ও মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। তিনি নিজে মুসলিম লীগ সদস্য হিসেবে পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালের অনেক আওয়ামী লীগ নেতা এই সময়েই মুসলিম লীগ থেকে সরে আসেন, যেমন খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা বেগম। লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির বিবরণ অনুযায়ী এই তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

৫৯. কিথ কালার্ড : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

চতুর্থ অধ্যায়

পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশ

উপক্রমণিকা

বহু যুগ ধরে বাংলাদেশ একটি শোষিত অঞ্চল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সম্পদ—এর লবণ, চিনি, কাপড় শিল্প এবং এর উর্বরা জমি ও উন্নত কৃষি বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোভাতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃটিশ শাসনের একশ' নব্বই বছর বাংলাদেশ ক্রমাগত শোষিত হয়। তার শিল্প সম্ভার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বাংলা হয় একটি পশ্চাৎভূমি। একই সঙ্গে বিলেতি শিল্পজাত দ্রব্যের একটি বাজারে পরিণত হয় এই দেশ। দেশের কৃষি ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে আর এতে অবদান রাখে কৃষির প্রতি সার্বিক অবহেলা এবং জমি ভোগদখলের এক মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)। এই পর্যায়ে এলো বৃটিশ শাসনের অবসান এবং পাকিস্তান যুগ। পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে পেল একটি দুগ্ধবতী গাভী হিসেবে এবং শোষণ প্রক্রিয়া চললো আরো জোরেশোরে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য তাকে দেশের সম্পদ বিভাজনের সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করে। পাকিস্তানের তেইশ বছরে সম্পদের বিভাজন পূর্ব বাংলাকে একটি শোষিত উপনিবেশে পরিণত করে। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশ থেকে এই সময়ে প্রচুর সম্পদ পশ্চিমে পাচার হয়।

বাঙালিদের দেশপ্রেম ছিল এতো প্রবল ও গভীর যে, পাকিস্তানের যে-কোনো এলাকার উন্নয়ন তাদের খুশি করে। নিজে ত্যাগ স্বীকার করে তারা পশ্চিম পাকিস্তানে শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মেতে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী স্থাপন এবং অন্যান্য সরকারি দফতর স্থাপনের ফলে যে সম্পদ-প্রবাহ শুধু পশ্চিমের জন্য অনুকূল হবে তাতে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা মোটেও উদ্বিগ্ন ছিল না। সামরিক খাতে ব্যয় পূর্ব বাংলা থেকে সম্পদ পাচারকে আরো প্রভাবিত করে। কারণ সমুদয় প্রতিরক্ষা দফতর ও সেনানিবাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আর সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিল বিপুলভাবে পশ্চিমের। গরিবের নামে যে বৈদেশিক সাহায্য মিলে তারও সিংহভাগ ব্যবহৃত হয়

পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা স্থাপন করা হলো, যার জন্য মূলধন এলো পূর্ব বাংলার কৃষিকে নিংড়িয়ে। এই শিল্পকারখানাকে লাভজনক করার লক্ষ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য গড়ে তোলা হলো প্রতিযোগিতাহীন সংরক্ষিত বাজার। পূর্ব বাংলার রফতানি-আয়ের বেশির ভাগ পাচার হলো পশ্চিমে। এখানে ভৌত অবকাঠামো তেমন গড়ে তোলা হলো না, ফলে দেশটি বিনিয়োগের অনুপযোগী রয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান সমুদয় ঋণ প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দে একচেটিয়া প্রাধান্য পেল। আমদানি লাইসেন্স ব্যবস্থা যেন পশ্চিমের সুবিধার জন্যই করা হয়েছিল, বাঙালিরা সেখানে কোনো সুযোগ পেত না। পুঁজি বাজার একান্তই পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠলো। এক সঙ্কীর্ণমনা আমলাতন্ত্র এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাধিকারী পাকিস্তান সরকার সর্ব উপায়ে পূর্ব বাংলায় একটি উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস পেল।

ভারত-বিভাগকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থান

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিকভাবে এটি একটি সম্ভাবনাহীন দেশ। পাকিস্তানের দুটো অংশেই ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থনীতি। জাতীয় আয়ের ষাট শতাংশ ছিল কৃষিখাত উদ্ভূত। সারণি ৪.১-এ দেশের অর্থনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালের অর্থনীতি কোথায় ছিল এবং ১৯৬৯-৭০-এ তা কোথায় এসে পৌঁছে সেই হিসাব এই সারণিতে পাওয়া যাবে। জাতীয় আয়ের ৫২.৬ শতাংশ ছিল পূর্ব বাংলার হিস্যা, যদিও জনপ্রতি আয় পূর্ব বাংলায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৮ শতাংশ কম। দুটি এলাকাই ছিল শিল্প ও বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ।

শিল্প বলতে ছিল ছোট ও মাঝারি গুটিকয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দুই অংশেই সেগুলো সমানভাবে বিন্যস্ত ছিল। কুটির শিল্পে পূর্ব বাংলা সামান্য এগিয়ে ছিল। পাকিস্তানের সব কাপড় ও চিনিকল ছিল পূর্ব বাংলায়। মারদানের প্রিমিয়ার চিনিকল তখন নির্মাণাধীন ছিল। পশ্চিমে তুলা জিনিং ক্ষমতা ছিল ৬ লাখ টন এবং পূর্বে পাট বেলিং ক্ষমতা ছিল ১১ লাখ টন। পশ্চিমে গম ভাঙার কলে ৪ লাখ টন আর পূর্বে চাল কলে ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাত করা যেত। দিয়াশলাইয়ের সব কারখানা ছিল পূর্ব বাংলায়। চামড়া ও প্রকৌশলী কারখানা দুই অংশেই সমানভাবে ভাগ করা ছিল। পূর্ব বাংলায় চা শিল্পের ছিল সাড়ে দুই কোটি কিলোগ্রাম উৎপাদন ক্ষমতা। পশ্চিমে সিমেন্ট বেশি উৎপাদন হতো এবং একটি ১.১ কোটি গ্যালনের ক্ষমতাসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ছিল।[১]

সারণি ৪.১

পাকিস্তানের জাতীয় আয় (১৯৫৯-৬০ সালের মূল্যে) কোটি টাকা

	১৯৪৯-৫০			১৯৬৯-৭০		
	মোট	পূর্ব	পশ্চিম	মোট	পূর্ব	পশ্চিম
কৃষি	১৪৬৭	৮৫০	৫৯০	২৪৫৯	১২৩৪	১২২৪
খনিজ	২.৭			২৬	১	১৫
শিল্প	১৪৩			৬৫৪	১৯৯	৪৫৫
বৃহদায়তন		১২	১৮	-	-	-
নির্মাণ	২৪			২৭৩	১৩৫	১৩৭
পরিবহন	১২৪			৩৬০	১৩০	১২৯
বাণিজ্য	২৮৬			৬৭০	২৫১	৪২০
সেবা	১৫১			৩৫২	১১৩	২৩৯
জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১০৬			৩৩১	৫০	২৮১
ইমারত	১৩৯			২৩০	১১৭	১১২
ব্যাংকিং ও বীমা	৭.৭			৮৩	৬.৬	৭৬.৪
মোট	২৪৫০	১৩১৩	১১৮৩	৫৪২৭	২২৩৮	৩১৮৮
জনসংখ্যা	৭.৯	৪.৩	৩.৬	১২.৮	৭.৩	৫.৫
জনপ্রতি আয়	৩১১	৩০৫	৩৩০		৩০৮	৪৯৮

মন্তব্য : ১৯৪৯-৫০ সালের আগের পরিসংখ্যান খুবই জটিল এবং তার নির্ভরযোগ্যতা খুব কম। বিভাগকালে হয়তো পূর্ব বাংলার সার্বিক অবস্থা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক ভালো ছিল। তবে এখানে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তাই সচরাচর মেনে চলা হয়।

দুই অংশের মধ্যে জাতীয় আয়ের বিভাজন পাপানেকের বই থেকে নেয়া। তবে পাপানেক ১৯৪৯-৫০ সালে জনপ্রতি জাতীয় আয় হিসাব করেছেন ৩১৬, যদিও সরকারি সূত্রে তা হলো ৩১১ টাকা।

পরিবহন সমীক্ষা, ব্যাংকিং ও বীমার হিস্যা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে ০.৩ অংশ ধার্য করে।

উৎস

১. কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর : *Twenty Years of Pakistan in Statistics* ১৯৪৭-৬৯। পাকিস্তান সরকার, করাচি, ১৯৬৮, পৃ. ৪-৫।

২. পূর্ব পাকিস্তান সরকার : *Economic Survey of East Pakistan 1969-70.* পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ১০২-১০৩।

৩. মার্কিন আর্মি কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স : *Transportation Survey of East Pakistan.* দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬১, ঢাকা, পৃ. ১৯।

৪. জি.এফ. পাপানেক : *Pakistan's Development. Social Goals and Private Incentive.* কেমব্রিজ, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭, পৃ. ২৭৬-২৭৮, ৩১৬-৩১৯।

পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড় সম্পদ ছিল সেখানকার ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা। অবশ্য এসব নিয়ে প্রথম দিকে কিছু সমস্যা ছিল; কারণ এদের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল প্রায়শই ভারত এলাকায়। ১৯৬০ সালে সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির মাধ্যমে এই জটিলাবস্থার সমাধান হয়। পশ্চিমে নগরায়ণ ছিল অনেক বিস্তৃত। পূর্ব বাংলায় জনগণের মাত্র ৪ শতাংশ ছিল নগরবাসী, কিন্তু পশ্চিমে ছিল ২০ শতাংশ।[২] বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল উচ্চে এবং রাজনৈতিক সংগঠন ছিল অধিকতর পরিপক্ব। পশ্চিমে শরণার্থী সমস্যা সামাজিক ভারসাম্যকে যেভাবে ব্যাহত করে পূর্বে সেরকম কিছু ছিল না। পশ্চিমে শরণার্থীদের ভিড়ের কিন্তু একটি ভালো দিকও ছিল। ভারতের উদ্যোগী মুসলমান গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ শরণার্থী হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। পশ্চিমের ভৌত অবকাঠামোও ছিল বেশ উন্নত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ছিল অনেক উন্নত। তবে তার সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসকদের উপস্থিতি। পূর্ব বাংলায় এই গোষ্ঠী মোটেই ছিল না।[৩] কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। তার বাজার ছিল অনেক বৃহৎ এবং চাহিদাও ছিল বৃহত্তর। বাংলাদেশে সবসময়ই মূলধনের উৎপাদী ক্ষমতা ছিল খুবই সুবিধাজনক।[৪] সেখানে সঞ্চয়ের হারও সবসময় ছিল উচ্চ।[৫]

কিন্তু পাকিস্তানের তেইশ বছরে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কখনো অর্জিত হলো না। বিভাগ-পরবর্তীকালে প্রবৃদ্ধি বন্ধ্যাত্ব পেল এবং তারপর শুরু হলো তার নিম্নমুখী গতি। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপারটি ছিল অন্যরকম। ১৯৫৪-৫৫ সালে পশ্চিমের জাতীয় আয় পূর্বের সঙ্গে সমতায় পৌছলো। যেখানে পূর্বে জনপ্রতি আয় ২ শতাংশ হারে কমলো, সেখানে পশ্চিমে তা ৮ শতাংশ হারে বাড়লো। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আরো খারাপ হলো। অন্যদিকে পশ্চিমের উন্নয়নে জোয়ার এলো।[৬] তেইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আয় হলো পাকিস্তানের ৪১.২ শতাংশ এবং জনপ্রতি আয়ে বৈষম্য বেড়ে হলো ৬২ শতাংশ। কীভাবে সম্ভাবনাময় একটি এলাকায় বিপর্যয় ঘটলো তারই ইতিবৃত্ত এখানে দেখা যাবে। একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব যে কত বিনিশ্চায়ক হতে পারে তারই প্রমাণ মিলবে এই ইতিবৃত্তে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বিভাজন

পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল সব ক্ষমতা। প্রদেশগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বাস্তবায়ন সংস্থা বিশেষ। এক সময় স্বায়ত্তশাসনে আগ্রহ দেখালেও বাস্তবে পাকিস্তানে কোনো ফেডারেল সরকার গড়ে ওঠে নি। তদুপরি শুরুতে শিশু রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে একটি শক্তিশালী ইউনিটারি সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও পাকিস্তানের দুটি এলাকা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং নানাভাবে ভিন্ন, তবুও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সারা দেশকে এক অবিচ্ছেদ্য ও একগোত্রীয় অর্থনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমুদয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অকুস্থল হয় পশ্চিম পাকিস্তান। বলা

হয় যে, এক এলাকায় যে খরচ বা বিনিয়োগ হবে, অর্থনীতিটি অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় তার সুফল দুইটি এলাকাতেই সমভাবে উপভোগ করা যাবে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে অনবরত সম্পদ পাচার প্রক্রিয়া বহাল থাকে। পশ্চিমে তাই হয় সমুদয় বিনিয়োগ এবং সেখানে সরকারি খরচ প্রায় পুরোপুরি নিবদ্ধ হয়। ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রামে একটি নিখিল পাকিস্তান অর্থনীতি সম্মেলনে এই তত্ত্ব নিয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু হয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মজহারুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আবু সাদেক (পূর্ব বাংলা পরিসংখ্যান সংস্থা) এবং ড. মির্জা নুরুল হুদা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এই যুক্তিগুলোকে অসার প্রমাণিত করেন। দুই অর্থনীতি তত্ত্বের মূল চিন্তাবিদ ছিলেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক (জাতীয় অধ্যাপক) এবং এর বহুল প্রচার আর সর্বজনীন স্বীকৃতি হয় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ) নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ অবস্থানের ফলে। ড. সাদেক এই বিতর্কের অঙ্গ হিসেবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এক সমালোচনা ও বিকল্প পরিসংখ্যান সংস্থার তরফ থেকে প্রকাশই করে বসলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার দেশদ্রোহিতার জুজু আবিষ্কার করে এবং ড. সাদেকের বই বাজেয়াপ্ত করে অঙ্কুরে এই চিন্তা বিনষ্ট করতে চাইলো।[৭] পাকিস্তানের মূল ব্যবস্থাই ছিল সমুদয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পশ্চিমে সম্পন্ন করা এবং সে-জন্য পূর্ব এলাকা থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা।

সামরিক শাসনের শুরুতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে খুব ঢাকঢোল বাজানো হলো। পূর্ব পাকিস্তানেও বাজেট বাস্তবায়নে জোর দেয়া হলো। কিন্তু যে-কোনো উপায়ে পশ্চিমের উন্নয়ন ঘটানোর নীতি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থানকে খুবই বিপর্যস্ত করে ফেলে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণেও দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি আইউব খান দুই প্রদেশের মধ্যে সম্পদ বিভাজনের বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য একটি ফাইনান্স কমিশন গঠন করলেন। কেন্দ্রীয় ও দুই প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সম্পদ কিভাবে ভাগ করা হবে এবং কি উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যাবে এই ছিল এই কমিশনের বিবেচ্য বিষয়। এই কমিশনে পাঁচজন করে সদস্য দুই প্রদেশ থেকে নেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশ প্রশাসক ডেভিড খালেদ পাওয়ার (তদানীন্তন প্রাদেশিক অতিরিক্ত মুখ্য সচিব), কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম সচিব ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়ন কমিশনের সৈয়দ এ.এফ.এম আবদুস সোবহান, প্রাদেশিক অর্থ সচিব সৈয়দ আবুল খায়ের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম এবং কমিশনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম (তদানীন্তন প্রাদেশিক যুগ্ম সচিব)। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আজম খানের সমর্থনে এবং খালেদ পাওয়ারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের সব সদস্য তাঁদের নিজস্ব অভিমতে অটুট থাকেন। তাঁদের মূল সুপারিশ ছিল যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে অংশ প্রদেশে বিভাজন করা হবে তার সিংহভাগ পাবে পূর্ব পাকিস্তান। এই বিভাজন হবে জনসংখ্যার অনুপাতকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনুপাত দিয়ে গুরুত্ব প্রদান করে। এছাড়া তাঁরা আরো বলেন যে, বিভাগ-

পূর্বকালের প্রাদেশিক ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখতে হবে, বিভাগোত্তর কালের ঋণের অর্ধেক মাফ করতে হবে এবং ভবিষ্যতেও এইরকম রেয়াতির বিষয় বিবেচনা করতে হবে।[৮] চারজন পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য এই সুপারিশের বিরোধিতা করে আর একটি প্রতিবেদন দিলেন এবং কমিশনের সভাপতি পাকিস্তানের অর্থসচিব হাফেজ মজিদ দিলেন চেয়ারম্যানের একক প্রতিবেদন। বাঙালিদের ন্যায্য ও সুচিন্তিত সুপারিশ মানা হলো না। প্রচলিত বিভাজনে জনসংখ্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে যৎকিঞ্চিত পরিবর্তন সাধন করা হলো এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্ত ঋণের বোঝা খানিকটা কমানো হলো।[৯] পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হিস্যা সামান্য বাড়লো কিন্তু ঋণ রেয়াতিতে সুবিধা হলো না।

পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানে সরকারি খাতে যে উন্নয়ন ব্যয় হয় তার মাত্র ২৪ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। তাই ঋণ রেয়াতিতে এই প্রদেশের খুব বেশি লাভ হলো না। তবে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা হয় ৩৪ শতাংশ।[১০] কিন্তু বাষট্টি সালের পর আর কোনো ঋণ রেয়াতি না দেয়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে ঋণের ভারি বোঝা বইতে হয়।[১১] সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় সম্পূর্ণ বরাদ্দই ঋণ হিসেবে দেয়া হতো। কিন্তু পশ্চিমের উন্নয়ন ব্যয়ের বিরাট অংশ অনুদান বা বিনাসুদে ঋণ হিসেবে দেয়া হতো। পাকিস্তানের তেইশ বছরে উন্নয়ন বাজেটের ৬৮ শতাংশ পশ্চিমে খরচ করা হয়।[১২] কিন্তু সহজ শর্তে সম্পদ পেত বলে ১৯৬২ সালের পর পশ্চিমের ঋণের বোঝা সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে কম ছিল।[১৩]

১৯৬০ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা খানিকটা কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। কোনো কোনো বিষয়ে ক্ষমতা ও সুযোগ পূর্ব পাকিস্তানে ন্যস্ত করার উদ্যোগ চলে। এতেও অনন্য অবদান ছিল গভর্নর জেনারেল আজম খানের এবং তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি ডেভিড খালেদ পাওয়ারের। পিআইডিসি (পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা) এবং রেলওয়ে ভাগ হয়ে প্রদেশের কর্তৃত্বে এলো। পরবর্তীকালে আইডিবিপি (পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক) এবং এইচবিএফসির (গৃহনির্মাণ অর্থ সংস্থা) সদর দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হলো। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার পশ্চিমকে হার মানিয়েছিল, সারা দেশের ৮.৩ শতাংশের বিপরীতে পূর্বে ১০.৭ শতাংশ। এই সাফল্যের বিশেষ কারণ ছিল ঐ বছরের অতি উত্তম ধানের ফলন।[১৪] মনে হলো পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন। কিন্তু এই সুন্দর স্বপ্ন রূঢ়ভাবে ব্যর্থ হলো এবং নিতান্তই আকস্মিকভাবে। অবশেষে যখন সম্পদ প্রবাহ পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে যাবে মনে হলো, তখনই লেগে গেল সর্বনাশা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। সামরিক হঠকারিতার ফলে আবার প্রতিরক্ষা খাতে সম্পদের অপচয় হতে থাকলো। যুদ্ধবাজির ফলে বৈদেশিক সাহায্য পেতেও বাধা এলো। উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য অর্থাভাব হলো প্রকট। তাই চলতি প্রকল্পের দিকেই নজর দেয়া হলো আর এতে পূর্ব পাকিস্তান খুব মার খেল; নতুন প্রকল্প আর হাতে নেয়া হবে না। প্রতিরক্ষা হলো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। তারপরই ছিল সিন্ধু অববাহিকার উন্নয়ন প্রকল্প। ১৯৬০

সালে ভারত-পাকিস্তান সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির অধীনে অনেক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। সেগুলোর জন্য সব ঢেলে দিতে হলো। সম্পদের তৃতীয় দাবিদার হলো অন্যান্য চলতি প্রকল্প, যার খুব কমই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মহান ব্রত এবং পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করবার সব অঙ্গীকার হলো পরিত্যক্ত। সারণি ৪.২-এ অঙ্গীকার ও বাস্তবায়নের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৪.২

পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

(মিলিয়ন টাকার হিসেবে)

পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
সরকারি খাতে বিনিয়োগ	১৬,০০০	১৪০০০
বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ	১১,০০০	১১,০০০
প্রকৃত অর্জন		
সরকারি খাত	১১,০০০	১৩,৭০০
বেসরকারি খাত	৫,৫০০	১৬,০০০

উৎস

১. পরিকল্পনা কমিশন : *The Third Five Year Plan.* করাচি, পাকিস্তান সরকার, ১৯৬৫, পৃ. ৪২, সারণি ২।

২. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists.* ইসলামাবাদ, ১৯৯০, পৃ. ৬, সারণি ২।

পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের প্রক্রিয়া

পাকিস্তানের তেইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে শোষিত হয় এবং নানা ছুতোয়, নানা ধারায় এই শোষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। রাজস্ব সূত্রের সব স্থিতিস্থাপক উৎসগুলো ক্রমে ক্রমে প্রদেশের এখতিয়ার থেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে গ্রহণ করা হলো। শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার যুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত সম্পদের ওপর ভাগ বসালো। একেবারে শুরুতেই আমদানি শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে গেল। তারপর বিক্রয় করের অর্ধেকের ওপর কেন্দ্র ভাগ বসালো। পাট রফতানির শুল্কও কেন্দ্রীয় সরকার চেয়ে নিল। আয়করের ওপর চিরাচরিত প্রাদেশিক হিস্যা প্রদান বন্ধ হলো। তদুপরি কৃষি জমির ওপর শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করলো।[১৫] সব প্রদেশেরই ক্ষতি হলো কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতির কোনো তুলনা ছিল না। পশ্চিমে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান, সব সরকারি দফতরের

পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে পশ্চিমের অধিবাসীদের কর্তৃত্বের ফলে পশ্চিমের প্রদেশগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের বৃহদংশ কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি ব্যয়ে ব্যবহৃত হওয়ায় পশ্চিমের অর্থনীতিই লাভবান হয়। পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বরাদ্দ সবসময়ই খুব কম ছিল। কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য (ঋণ ও অনুদান) সবসময় পশ্চিমের তুলনায় কম ছিল।[১৬] মোদ্দা কথা রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের ব্যবস্থাটিই ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচারের একটি প্রকৃষ্ট উদ্যোগ।

একইভাবে উন্নয়ন ব্যয় মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে উন্নয়ন বাজেটের জন্য সম্পদ বিভাজন করতো তাতে সিংহভাগ পশ্চিমেই যেত। পূর্ব পাকিস্তানে ভৌত অবকাঠামো ছিল দুর্বল কিন্তু তার উন্নয়নের ব্যবস্থা ছিল আরো দুর্বল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থের অবমুক্তি সবসময়ই বিলম্বিত হতো। প্রকল্প অনুমোদন পেতেও সময় লাগতো। তাই প্রকল্প বাস্তবায়ন আটকে থাকতো এবং অর্থ বরাদ্দ বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয়ে যেত। নানা ছুতোয় বরাদ্দই করা হতো অতি নিচু স্তরে। সুপরিকল্পিতভাবে বৈদেশিক সাহায্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি সীমিত রেখে সেখানে পশ্চিমের চড়া মূল্যের দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও সমুদয় বাণিজ্য ও মুদ্রা ব্যবস্থার সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি এবং কৃষি খাত থেকে সম্পদ পশ্চিমে পাচার করা হতো।

সরাসরি সরকারি পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত হয় স্পষ্ট নীতিমালা, যার সুযোগ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতো। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ সুবিধার উদ্দেশ্যই ছিল পশ্চিমের মূলধনের গোটা বাজার দখল। বিলাতি শাসকরা বাগান প্রতিষ্ঠা করে দেশি শ্রমিকের ওপর শোষণ চালাতো, নিজেদের জন্য ভালো চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতো, উৎপাদনকে বাজারজাত করে মুনাফা লুটতো। পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক মনিবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারাও পূর্বের কাঁচামাল পশ্চিমে প্রক্রিয়াজাতকরণের বা ব্যবহারের জন্য চালান দিত। তারাও নিজেদের এলাকা থেকে লোক নিয়ে যেত উপনিবেশে ব্যবসা পরিচালনার জন্য। তাদেরও লক্ষ্য ছিল চটজলদি উচ্চ হারে লাভ করা ও পুঁজি প্রত্যাহার। এই সূত্রেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচারের ব্যবস্থা হয়।

রাজস্ব আদায় ও ব্যয়

পশ্চিম পাকিস্তানের একটি যুক্তি ছিল যে, কেন্দ্রীয় রাজস্বের খুব কম হিস্যাই পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত। তাই পশ্চিমে যদি বেশি রাজস্ব ব্যয় হয় তাতে পূর্ব পাকিস্তানিদের আপত্তির কারণ নেই। আরো বলা হতো যে, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ এসব বিষয়ে যে ব্যয় হয় তাতে দুই অঞ্চলেরই সমান মঙ্গল সাধিত হয়। এই দুটি যুক্তিই বিবেচনা করে দেখা যায়। দুই অঞ্চলের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিরাজ করতো তা এই বিশ্লেষণে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয় ও ব্যয়ে দুই প্রদেশের অবদান নিয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর এই প্রতিবেদনে (Report on the Economic Relations between East & West Pakistan) বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা মাত্র ২২ শতাংশ এবং চলতি ব্যয়ে সেই হিস্যা হলো ১২ শতাংশ। তবে আয়ের ৭ শতাংশ এবং ব্যয়ের ৪৩ শতাংশ দুই প্রদেশে ভাগ করা যায় না।[১৭] এই সমীক্ষা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে এই মন্ত্রণালয় আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদন ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্বের বরাদ্দ ও বিভাজন (Report on the Allocation & Approtionment of Resource between the Centre and the Provinces)। এতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা দেখানো হয় যথাক্রমে ২৫ ও ৩৪ শতাংশ।[১৮] তৃতীয় একটি হিসাব জাতীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৯৬৯ সালে উপস্থাপন করা হয়। এতে তিন বছরের কেন্দ্রীয় রাজস্ব আদায়ের হিসাব দেয়া হয়। সারণি ৪.৩-এ এই হিসাবটি প্রদত্ত হলো। চলতি ব্যয়ের বিভাজনের ওপর ১৯৭০ সালে অর্থনীতিবিদদের প্যানেল একটি সামগ্রিক হিসাব প্রদান করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের পুরো সময়ে কেন্দ্রীয় রাজস্বের মাত্র ২৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে বলে তাঁরা অভিমত দেন। তাঁদের হিসাবও সারণি ৪.৪-এ দেয়া হলো।

সারণি ৪.৩

কেন্দ্রীয় রাজস্বের আঞ্চলিক উৎস ১৯৬৫-৬৮ (মিলিয়ন টাকার হিসেবে)

	১৯৬৫-৬৬		১৯৬৬-৬৭		১৯৬৭-৬৮	
	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
আমদানি শুল্ক	৩৭৮	৭০৩	৪৬৭	৮১৩	৪৯৮	৭৮৪
	৩৪.৯%	৬৫.১%	৩৬.৫	৬৩.৫%	৩৮.৮%	৬১.২%
আবগারি শুল্ক	১৯৮	৭৮৭%	৩০৫	১১৮৭	৪০২	১৪০০
	২০.১%	৭৯.৯%	২০.৪%	৭৯.৬%	২২.৩%	৭৭.৭%
আয়কর	১৪৪	৫৭১	১৫৫	৬০৩	১৬২	৬২৮
	২০.১%	৭৯.৯%	২০.৫%	৭৯.৫%	২০.৫%	৭৯.৫%
বিক্রয় কর	২৩১	৬০৬	২৩৪	৬৮৪	১৭০	৪০১
	২৬%	৭৪%	২৫.৫%	৭৪.৫%	২৯.৮%	৭০.২%

উৎস : পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ : *Questions for Oral Answar & Thier Replies.* ঢাকা ৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. ১৯-২০, প্রশ্ন ২৫৩।

সারণি ৪.৪

পাকিস্তানে রাজস্ব ব্যয় ১৯৫০-৭০ (মিলিয়ন টাকার হিসেবে)

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০-৫৫	১৭১০	৭২০০
১৯৫৫-৬০	২৫৪০	৮৯৮০
১৯৬০-৬৫	৪৩৪০	১২৮৪০
১৯৬৫-৭০	৬৪৮০	২২২৩০
১৯৫০-৭০	১৫০৭০	৫১২৫০

উৎস : পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan.* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৬, সারণি-২।

এই সব প্রতিবেদন থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আদায় হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই হিসাবটি টিকে না। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে আদায়কৃত আয়করের হিস্যা হলো এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু অনেক করদাতা বিশেষ করে কোম্পানি যারা পশ্চিম পাকিস্তানে আয়কর দিত তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অনেক ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা বা উৎপাদন করতো; কিন্তু তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দফতর থেকে আয়কর প্রদান করা হতো। সম্ভবত এই খাতে আরো দশ শতাংশ রাজস্ব পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্ভূত হতো। একইভাবে আমদানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক যা পশ্চিমে আদায় হতো তার প্রকৃত বোঝা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ন্যস্ত হতো। পশ্চিমে বোনা কাপড় পূর্বে বিক্রয় হতো। পশ্চিমে আমদানিকৃত স্টিল বিলেট রডে রূপান্তরিত হয়ে পূর্বে বিক্রয় হতো। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে এই খাতেও পূর্ব পাকিস্তান হয়তো ৩৩ শতাংশ রাজস্ব প্রদান করতো।

চলতি ব্যয় পূর্ব পাকিস্তানে সবসময়ই খুব কম ছিল। কতগুলো কেন্দ্রীয় ব্যয়কে বলা হতো এজমালি স্বার্থে নিবেদিত। কিন্তু বাস্তবে এই সব খরচের কোনো সুফল পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছতে পারতো না। ভৌগোলিক বিচ্ছেদ তো ছিলই। এ ছাড়াও উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সহজে এক এলাকা থেকে অন্যত্র যেতে পারতো না। আবার সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অতি স্বল্পসংখ্যক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। তাই রাজস্ব ব্যয়ের খুব কমই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বা জনসাধারণের আয়ে কোনো রকম ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারতো। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র খাতে কেন্দ্রীয় খরচ বস্তুতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে ব্যাহত করতো এবং এর প্রভাব ছিল নিতান্তই নেতিবাচক। পররাষ্ট্র নীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বার্থের কোনো মূল্যই ছিল না, বরং এমন সব বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করা হতো, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকারক। ভারতে রফতানির সুযোগ পাকিস্তানি পররাষ্ট্র নীতির জন্যই পূর্ব পাকিস্তানকে পরিহার করতে হতো। আবার ভারতে সহজলভ্য দ্রব্যাদি

যেমন কয়লা, চিনি, পাথর বা সিমেন্ট পূর্ব পাকিস্তানকে বেশি খরচে অনেক দূর দেশ থেকে আমদানি করতে হতো। ভারতে পর্যাপ্ত কাঁচামাল বা রসদ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের জন্য ব্যয়বহুল বিনিয়োগের আশ্রয় নিতে হতো। সীমান্তের ওপারে চুনাপাথরের বিস্তীর্ণ পাহাড় থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে সিমেন্ট কারখানার জন্য বিদেশ থেকে ক্লিংকার আনতে হয় এবং তা গুঁড়ো করবার জন্য কারখানা স্থাপন করতে হয় অথবা পানির নিচ থেকে অনেক খরচে চুনাপাথর সংগ্রহ করতে হয়।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সচরাচর পশ্চিম পাকিস্তানেই মোতায়েন হতো। এর পেছনে ছিল একটি অসার যুক্তি যে, পশ্চিমের আগ্রাসনের ক্ষমতা থাকলে পূর্ব এলাকা তাতেই নিরাপদ থাকবে। এই যুক্তিতে সমুদয় প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানে করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে আধাডজন ছাউনিতে যৎসামান্য সৈন্য মোতায়েন করা হয়, যাদের প্রধান কর্তব্য ছিল বিপদেআপদে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য দান করা। বস্তুতপক্ষে সেনাবাহিনীকে সাধারণত ন্যায্য গণবিক্ষোভ দমনে ডাকা হতো এবং সবসময়ই তাদের নির্যাতন হতো ব্যাপক এবং কিছু জীবন খসে যেত। তাই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কখনো পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত হয় নি, বরং সময়ে সময়ে তাদের উদ্যম দেশে জানমালের ক্ষতিসাধন করে। তাই এজমালি খরচে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব হিস্যা মোটেই ছিল না এবং সেই বিবেচনায় পাকিস্তানে রাজস্ব খরচের এক-পঞ্চমাংশের বেশি পূর্ব পাকিস্তানে কখনো ব্যয় হয় নি। রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমে যথেষ্ট সম্পদ পাচার করে। সোজা হিসেবে আয়ের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তান ব্যয়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশের উপকার লাভ করে।

বৈদেশিক সাহায্যের বিভাজন ও ব্যবহার

পাকিস্তানের তেইশ বছরে জাতি প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। এই সাহায্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং দাতাদেশ থেকে আসে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ যেমন সাহায্য দেয়, পূর্ব ইউরোপ ও চীনের সমাজতান্ত্রিক দেশও তেমনি সহায়তা করে। এই সম্পদ প্রবাহের যুক্তি ছিল পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণের দুর্দশা লাঘব। পাকিস্তানে বাঙালিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত গরিব। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তারাই এই বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বয়ম্ভর অর্থনীতি প্যানেলের জন্য অর্থনৈতিক বিষয়াবলি বিভাগ (Economic Affairs Division) বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের একটি আঞ্চলিক হিসাব প্রদান করে। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক সাহায্য মিলে তার গোটা হিসাব সারণি ৪.৫-এ তুলে ধরা হয়েছে। এই হিসাবে বেশ ক'টি গলদ রয়েছে। অপ্রকল্প সাহায্যকে ৩০ : ৭০ অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে ১৯৬০ সালে গৃহীত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তখন বাণিজ্য মন্ত্রী হাফিজুর রহমান নির্দেশ দেন

যে, এই অনুপাতে সমুদয় অপ্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হবে। পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র কখনোই সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হুবহু মেনে চলে নি এবং এই ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। বাস্তবে পূর্ব পাকিস্তান কখনো ৩০ শতাংশ অপ্রকল্প সাহায্য ব্যবহার করে নি। এই হিসেবের আর এক ভিত্তি হলো পিআইএ এবং এনএসসি যে সব ঋণ গ্রহণ করে সেগুলোকে সমান ভাগে দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। কল্পনার ফানুসকে সর্বোচ্চ চড়িয়েও কখনো বলা যাবে না এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বা সেবা পূর্ব পাকিস্তান সমানভাবে পেয়েছে। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পরেও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সম্পদ বাংলাদেশ পায় নি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় খরচের প্রায় সবটুকুই হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এই হিসাবে ধরা হয়েছে যে, তারও এক-তৃতীয়াংশের উপকার পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে। তাই এই হিসাবটিতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা যা দেখানো হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা আরো অনেক কম।

সারণি ৪.৫

পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার ১৯৪৭-৪৮—১৯৬৯-৭০

মিলিয়ন মার্কিন ডলারের হিসাবে

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	কেন্দ্রীয় সরকার	
প্রকল্প সাহায্য	৪১৭	৬০৮	১০৮	১১৩৩
অপ্রকল্প সাহায্য	৪০৮	৬৭৩	৫৩	১১৩৪
পিএল ৪৮০ খাদ্য	৪৪৫	৭৯১	৫	১২৪১
গ্যারান্টি প্রদত্ত ঋণ	৩৫২	৬২৩	১১	৯৮৬
প্রকল্প অনুদান ও কারিগরি সাহায্য	৫৬	১৪০	২০০	৩৯৬
দ্রব্য অনুদান	২৬৩	৫৭৫	১৫	৭৯৩
সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রম	-	৭৫৬	-	৭৫৬
মোট	১৯৪১	৪১০৬	৩৯২	৬৪৩৯

উৎস : পরিকল্পনা কমিশন : *Reports of Advisary Panels for the Fourth Five Year Plan,* Vol 1, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ২৭৯, সারণি ৩।

একটি বিশ্বাসযোগ্য হিসাবের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করা যায়। 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিবেদন' ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যত সাহায্য পাওয়া যায় তার আঞ্চলিক বিভাজনের হিসাব দিয়েছে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা ছিল ৪৮২ মিলিয়ন ডলার, পশ্চিম পাকিস্তানের ১২৭৯ মিলিয়ন আর এজমালি ২৯৭ মিলিয়ন ডলার।[১৯] এই এজমালি বরাদ্দকে ২০:৮০ অনুপাতে ভাগ করা সমীচীন হবে। ১৯৬০-৬৫ কালে পাকিস্তানের মোট বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ছিল ২৩৫১ মিলিয়ন ডলার।[২০] এর মধ্যে ৬১২ মিলিয়ন ছিল অপ্রকল্প সাহায্য।[২১] ১৯৬৫-৭০ কালে অতিরিক্ত ৩২৩১ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য মিলে এবং এর ১৩২০ মিলিয়ন ছিল অপ্রকল্প সাহায্য।[২২] ষাটের দশকে অপ্রকল্প সাহায্যের আঞ্চলিক বিভাজন ৩০:৭০ অনুপাতে

ধরা যায়। প্রকল্প সাহায্যের ১০৭০ মিলিয়ন ডলার ছিল সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রমের জন্য (তারবেলাও অন্তর্ভুক্ত)।[২৩] অন্য প্রকল্পগুলোকে বিচার করলে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অবশিষ্ট প্রকল্প সাহায্যের ৩৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়।[২৪] তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বরাদ্দের হিসাব সারণি ৪.৬-এ তুলে ধরা হলো। ১৯৭০ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আরো সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৩২৩ মিলিয়ন ডলার আর এতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা ছিল ১৫৫ মিলিয়ন, যার বৃহদাংশ ছিল খাদ্য সাহায্য।[২৫] এ সময়ে চীন পাকিস্তানকে ২০০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য দেয়, যার সিংহভাগ অব্যবহৃত থাকে।

সারণি ৪.৬

পাকিস্তানের প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বরাদ্দ ১৯৪৭-৭০

মিলিয়ন ডলারের হিসাবে

	সাহায্যের প্রকার	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
১৯৪৭-৬০	দ্রব্য সাহায্য (খাদ্য অন্তর্ভুক্ত)	২৮৮	৬১২	৯৮০
	প্রকল্প ও কারিগরি সাহায্য	২৫৪	৯০৬	১১৫৮
১৯৬০-৭০	দ্রব্য সাহায্য	৫৭৯	১১৫৩	১৯৩২
	প্রকল্প ও কারিগরি সাহায্য	৯০৩	১৬৭৭	২৫৮০
	সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রম	০	১০৭০	১০৭০
	মোট	২০২৪	৫৬১৬	৭৬৪০
১৯৫৪-৬৫	সামঞ্জস্য বিধান	-১২০	+১২০	
	সর্বমোট	১৯০৪	৫৭৩৬	৭৬৪০

ব্যাখ্যা

১. ১৯৪৭-৬০-এর হিসাবের সূত্র : *Report on Economic Relations Between East & West Pakistan.* করাচি ১৯৬১, পৃ. ৪৮-৫০, এজমালি হিসাবকে ২০:৮০ অনুপাতে ভাগ করা হয়েছে

২. ১৯৬০-৭০-এর হিসাবের সূত্র : *Budget in Brief 1968-69.* ইসলামাবাদ ১৯৬৮, পৃ. ৫৮-৬১। *Report of the Working Group on Debt Burden*, ইসলামাবাদ, ১৯৬৮, পৃ. ১০,৯৯-১৫১। *Fourth Five Year Plan.* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৬৫। *Report of Advisory Panels for the 4th Five Year Plan.* Vol 1, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৬৫। *Memorandum for the Pakistan Consortium*, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৮৫-১৩৭।

৩. ১৯৫৪-৬৫ সালে পাকিস্তান প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য পায় নিরাপত্তা সাহায্য হিসেবে এবং এর অধীনে সমুদয় আমদানি হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। দ্রব্য সাহায্যের হিসাবে এই ৪০০ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়।

তাই তেইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্যের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২০৫৯ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২৩ শতাংশ। এই বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অব্যবহৃত সাহায্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের খাতায় ৪১২ মিলিয়ন ডলার আর পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে ৫৬৮ মিলিয়ন ডলার।[২৬] তুলনামূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের হিসাবে অব্যবহৃত সম্পদ ছিল বেশি, পাকিস্তানের প্রায় ৪৩ শতাংশ। ষাটের দশকের শেষভাগে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকতর সাহায্য বরাদ্দ হচ্ছিল বলেই অব্যবহৃত সাহায্যের কলেবর এত বড় ছিল। তাই পাকিস্তানের ২৩ বছরে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ২৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহৃত সাহায্যের হিস্যা ছিল ২১ শতাংশ।

যদি মানুষের কল্যাণ হয় বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য তা হলে পাকিস্তান যে সাহায্য পায় তার অন্তত ৫৬ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান তুলনামূলকভাবে যে পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল এবং দারিদ্র্য সেখানে যেমন প্রকট ছিল তাতে পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্যপ্রাপ্তির কলেবর আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। তাই বলা চলে যে, পূর্ব পাকিস্তানের নামে পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় ২৫০০ মিলিয়ন ডলার আহরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহার করে। বৈদেশিক সাহায্যের বৈশিষ্ট্য হলো যে উন্নয়নে এর প্রভাব বিনিশ্চায়ক। বৈদেশিক মুদ্রা বা বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ অভাব মিটিয়ে বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখে। পাকিস্তানের দৌরাত্ম্যে পূর্ব পাকিস্তান এই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

আমদানি-রফতানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ

পাকিস্তানে বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। দুই অঞ্চলের আমদানি-রফতানি পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত দফতর থেকে পরিচালিত হতো। পঞ্চাশ দশকের শেষদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু দফতর পূর্বাঞ্চলে স্থাপিত হয়। তবে সাধারণত এগুলো হয় সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। আমদানি ব্যবসার জন্য একটি বিস্তৃত লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু ছিল। রফতানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ হতো শুল্ক বহাল করে অথবা বিশেষ উৎসাহী ব্যবস্থা চালু করে। তার ফলে যদিও বহির্বাণিজ্য পুরোপুরি ব্যক্তিমালিকানা খাতেই অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু কি ধরনের দ্রব্যাদি বাণিজ্যে ভূমিকা রাখবে তা মোটামুটিভাবে সরকারই নির্ধারণ করে দিত।

পাকিস্তানের শুরুতে রফতানি বলতে শুধু কাঁচামালের রফতানিই ছিল, যেমন পাট, চা, তুলা, উল বা চামড়া। শিল্পায়নে সামান্য অগ্রগতি হলেই প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদির রফতানি শুরু হয়, বিশেষ করে সুতা ও কাপড় এবং পাটজাত দ্রব্য। ষাটের দশকে অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত সামগ্রীর রফতানিও শুরু হয়। যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রফতানি চলে। সারণি ৪.৭-এ পাকিস্তানের রফতানি আয়ের হিসাব দেয়া হয়েছে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সারা দেশের আয়ের ৬০ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের,

কেবল ১৯৬৬-৬৭ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানি আয় পূর্ব পাকিস্তানের সমান হতে থাকে এবং মাঝে মাঝে বেশিও হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়াটিই এমন যে তাতে কাঁচামালের রফতানি ক্রমেই কমতে থাকে আর প্রক্রিয়াজাত শিল্পদ্রব্য রফতানির কলেবর বাড়তে থাকে। প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ দরকার হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে তারই ছিল দারুণ ঘাটতি। পূর্ব পাকিস্তান যে তবুও রফতানি ব্যবসায় অধিকতর আয় করে তা বস্তুতই অত্যাশ্চর্য বিষয়। ষাটের দশকের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয়ের অর্ধেক ছিল প্রক্রিয়াজাত পাটজাত দ্রব্য থেকে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানি আয়ের ৯৭ শতাংশ ছিল প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন হয় বিভিন্ন উপখাতে, পূর্ব পাকিস্তানে শুধু পাটকলই প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমের প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য রফতানি করার জন্য বিশেষ উদ্যোগও নেয়া হয়। বোনাস ও রেয়াতির একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে রফতানিকারকদের উৎসাহ প্রদান করা হতো। ১৯৫৮ সালে একটি বোনাস ভাউচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১০০ ডলারের রফতানির জন্য ১০০ ডলার দাম সরাসরি দিয়ে বাকি ৪০ ডলারের একটি ভাউচার দেয়া হতো। এই ভাউচারের বদলে অধিক হারে দেশি মুদ্রা পাওয়া যেত, অধিক হারটি সচরাচর দশ থেকে পঁচিশ শতাংশ ছিল। এক কথায় শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রে এক হিসেবে মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন করা হয়। শেষের দিকে কাঁচামালের কোনো কোনোটির জন্যও ভাউচার দেয়ার প্রচলন হয়। এই ব্যবস্থায় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ এবং শিল্পের জন্য রসদ অল্প ব্যয়ে আমদানি করা চলতো, অথচ বেশি দামে উৎপাদিত দ্রব্য রফতানি করা যেত। শিল্প দ্রব্যের রফতানি বৃদ্ধির স্বার্থে যে সব দ্রব্য রফতানি হতো তার জন্য আবগারি বা বিক্রয় শুল্ক রেয়াতির ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও যে শিল্প প্রতিষ্ঠান রফতানি করতো সে তার প্রয়োজনীয় রসদ আমদানির জন্য বিশেষ লাইসেন্স পেত এবং বর্ধিত হারে আমদানি করতে পারতো। এই সব ব্যবস্থা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের মঙ্গলেই আসে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব কাঁচামাল রফতানি হতো তারা এই সব বিশেষ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত ছিল এবং পাটজাত দ্রব্য অনেককাল কোনো ভাউচার পেত না এবং পরবর্তীকালে অত্যন্ত নিম্ন হারে ভাউচার পেত। তাই রফতানি প্রসারের সমুদয় পদক্ষেপই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী এবং নিতান্তই বৈষম্যমূলক। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের তেইশ বছরে মোট রফতানি আয়ের ৫৪.৭ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানই অর্জন করে।

সারণি ৪.৭

পাকিস্তানের রফতানি আয় (মিলিয়ন টাকার হিসাবে)

	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৭-৪৮	২৭২	৪৪৪
১৯৪৮-৪৯	১০২৮	৫৪২
১৯৪৯-৫০	৬৮৩	৫৩৫
১৯৫০-৫১	১২১১	১০৪২
১৯৫১-৫২	১০৮৭	৯২২
১৯৫২-৫৩	৬৪২	৮৬৭
১৯৫৩-৫৪	৬৪৫	৬৪১
১৯৫৪-৫৫	৭০২	৪৯১
১৯৫৫-৫৬	১০৪১	৭৪২
১৯৫৬-৫৭	৯০৯	৬৯৮
১৯৫৭-৫৮	৯৮৮	৪০৪
১৯৫৮-৫৯	৮৮১	৪৪৪
১৯৫৯-৬০	১০৮০	৭৬৩
১৯৬০-৬১	১২৫৯	৫৪০
১৯৬১-৬২	১৩০০	৫৪২
১৯৬২-৬৩	১২৪৯	৯৯৮
১৯৬৩-৬৪	১২২৮	১০৭৫
১৯৬৪-৬৫	১২৬৮	১১৪০
১৯৬৫-৬৬	১৫১৪	১২০৪
১৯৬৬-৬৭	১৫৭৯	১৩৩৮
১৯৬৭-৬৮	১৪৮০	১৮৬৪
১৯৬৮-৬৯	১৫৪০	১৭৬৩
১৯৬৯-৭০	১৬৬৩	১৬০৮
মোট	২৫৫৫৯	২১১৩৭
	(৫৩৭০ মি. ডলার)	(৪৪৪০ মি. ডলার)
	৫৪.৭%	

সূত্র : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর, পাকিস্তান সরকার : *Monthly Foreign Trade Statistics*, June 1970. করাচি, ১৯৭০, পৃ. ১।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা ছিল একটি দুষ্প্রাপ্য সম্পদ। পাকিস্তানে এই দুষ্প্রাপ্য সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়, যদিও তার সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করে। পাকিস্তানের তেইশ বছরে বৈদেশিক সাহায্য মিলে মোট ১০ হাজার মিলিয়ন ডলার, যার প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন ছিল সামরিক সাহায্য। পাকিস্তানের রফতানি আয় ছিল ৯৮০০ মিলিয়ন ডলার। এই ১৯৮০০ মিলিয়ন

ডলারের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে কি পরিমাণ সম্পদ পাচার পূর্ব থেকে পশ্চিমে হয় এবং কি রকম বঞ্চনা পূর্ব পাকিস্তানকে ভোগ করতে হয়। আমরা সারণি ৪.৭-এ দেখেছি রফতানি আয়ের বিভাজন, এবারে ৪.৮-এ দেখা যাক আমদানি ব্যয়ের বিভাজন।

সারণি ৪.৮

পাকিস্তানের আমদানি ব্যয় (অস্ত্রসম্ভার বাদে) মিলিয়ন টাকা

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	৪০	৩১৮
১৯৪৮-৪৯	২৮২	১১৭৭
১৯৪৯-৫০	৩৮৫	৯১২
১৯৫০-৫১	৪৫৩	১১৬৭
১৯৫১-৫২	৭৬৩	১৪৭৪
১৯৫২-৫৩	৩৬৬	১০১৭
১৯৫৩-৫৪	২৯৪	৮২৪
১৯৫৪-৫৫	৩২০	৭৮৩
১৯৫৫-৫৬	৩৬১	৯৬৪
১৯৫৬-৫৭	৮১৮	১৫১৬
১৯৫৭-৫৮	৭৩৫	১৩১৪
১৯৫৮-৫৯	৫৫৪	১০২৫
১৯৫৯-৬০	৬৫৫	১৮০৬
১৯৬০-৬১	১০১৪	২১৭৩
১৯৬১-৬২	৮৭৩	২২৩৬
১৯৬২-৬৩	১০১৯	২৮০১
১৯৬৩-৬৪	১৪৪৯	২৯৮১
১৯৬৪-৬৫	১৭০২	৩৬৭২
১৯৬৫-৬৬	১০২৮	২৮৮০
১৯৬৬-৬৭	১৫৬৭	৩৬২৫
১৯৬৭-৬৮	১৩২৭	৩৩২৭
১৯৬৮-৬৯	১৮৫০	৩০৪৬
১৯৬৯-৭০	১৮১৩	৩২৮৫
মোট	২০,০৬৭ (৪২১৬ মি. ডলার) ৩১.১%	৪৪,৩২৫ (৯৩১২ মি.ডলার)

উৎস : পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর : *Monthly Foreign Trade Statistics,* June 1970. করাচি, পৃ. ১।

পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয় ছিল ৫৩৭০ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া সেখানে বৈদেশিক সম্পদ প্রবাহ ছিল প্রায় ১৬০০ মিলিয়ন ডলার; কিন্তু মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৪২১৬ মিলিয়ন ডলার। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয়ের ২৭৫৪ মিলিয়ন ডলার প্রকৃত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার হাতিয়ে নিত এবং এর অধিকাংশ পশ্চিমের জন্য ব্যয় হতো। তাই পশ্চিম পাকিস্তান একদিকে যেমন বৈদেশিক সম্পদের সিংহভাগ ব্যবহার করে, অন্যদিকে দেশের রফতানি আয়েরও সিংহভাগ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। পাকিস্তানের তেইশ বছরের লেনদেনের একটি হিসাব সারণি ৪.৯-এ প্রস্তুত করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারকে অপরিবর্তিত বিবেচনা করে এই ছকটি রচনা করা হয়।

সারণি ৪.৯

পাকিস্তানের তেইশ বছরের বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব

১৯৪৭-৭০ মিলিয়ন ডলারের হিসাবে

	আদায়		ব্যয়
দ্রব্য রফতানি	৯৮০০	দ্রব্য আমদানি	১৩৫০০
বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য	৭০০০	ঋণ পরিশোধ	১০০০
সামরিক সাহায্য	৩০০০	অদৃশ্যমান খাতে	১১০০
	মোট = ১৯৮০০		নিট খরচ = ১৯৮০০

ব্যাখ্যা

১. দ্রব্য রফতানি আয় ও আমদানি খরচ সারণি ৪.৭ ও ৪.৮ হতে নেয়া।

২. অর্থনৈতিক সাহায্য সারণি ৪.৬ থেকে নেয়া, অব্যবহৃত সম্পদ বাদ দেয়া হয়েছে।

৩. সামরিক সাহায্যপ্রাপ্তির হিসাব : আমেরিকা ২৫০০ মিলিয়ন, চীন ও অন্যান্য (রাষ্ট্রসহ) ৫০০ মিলিয়ন ডলার।

৪. ঋণ পরিশোধের হিসাব *Budget in Brief 1971-72,* ইসলামাবাদ, পৃ. ৬৭ থেকে।

৫. নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে কিছু অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করা হয়। ১২০০ মিলিয়ন ডলারের হিসাব লেখক পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা সচিবালয়ের উপসচিব হিসেবে যে বিভিন্ন হিসাব দেখার সুযোগ পান তার ভিত্তিতে তৈরি।

৬. অদৃশ্যমান খাতের হিসাব কয়েক বছরের বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব দেখে বানানো হয়। মোটামুটিভাবে রফতানি আয়ের ৩০ শতাংশ ছিল এই খাতে আয় আর ব্যয় ছিল আমদানি ব্যয়ের ৩০ শতাংশ।

এই হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বৈদেশিক লেনদেনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ পরিশোধ এবং অদৃশ্যমান খাতের নিট খরচ বহন করে এবং এই দুটি খাতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্য পায় খুবই সামান্য এবং তাও ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই। তাই ঋণ পরিশোধে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা বড় জোর এক-চতুর্থাংশ হতে

পারে। পূর্ব পাকিস্তানের বহির্বাণিজ্যের কলেবর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধেক ছিল। তাই অদৃশ্যমান খাতের নিট খরচের মাত্র এক-তৃতীয়াংশই পূর্বাঞ্চলের ভাগে বিবেচনা করা যায়। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয়ের অন্তত ২০০০ মিলিয়ন ডলার পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়। পাকিস্তানি মুদ্রামানের বিকৃতি-বিচ্যুতি হিসাবে নিলে সম্পদ পাচারের কলেবর সহজেই দেড়গুণ বিবেচনা করা যায়।

সারণি ৪.১০

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ১৯৪৭-৬৯ (মিলিয়ন টাকায়)

	পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি	পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি
১৯৪৭-৪৮	১৯	১৪০
১৯৪৮-৪৯	৫০	২৩৫
১৯৪৯-৫০	৬২	২৭২
১৯৫০-৫১	হিসাব নেই	হিসাব নেই
১৯৫১-৫২	১৪৯	২১৮
১৯৫২-৫৩	১৫১	৩৮৭
১৯৫৩-৫৪	১৯৮	৩০৫
১৯৫৪-৫৫	২১৮	৩৩৪
১৯৫৫-৫৬	২৪৪	৫৩২
১৯৫৬-৫৭	২৬৯	৭০১
১৯৫৭-৫৮	২৮৯	৬৮৬
১৯৫৮-৫৯	৩৬২	৫৬৯
১৯৫৯-৬০	৩৬৩	৮২৬
১৯৬০-৬১	৪০২	৮৫৫
১৯৬১-৬২	৪৭১	৯৫৭
১৯৬২-৬৩	৫৯১	৮৯৫
১৯৬৩-৬৪	৫৪৪	৮৭৫
১৯৬৪-৬৫	৬৫৫	১২০৯
১৯৬৫-৬৬	৭৩৯	১৩২৫
১৯৬৬-৬৭	৭৮৫	১২৩৩
১৯৬৭-৬৮	৮৭১	১৩৮৫
১৯৬৮-৬৯	৯৬৬	১৮০০
	৮২৩৮ (১৭৩৭ মি. ডলার)	১৫৭৩৯ (৩৩০৯ মি. ডলার)

টীকা : ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল ১৮৮ মিলিয়ন টাকা।

উৎস : পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর :

১. *Pakistan Statistical Yearbook 1968.* করাচি, পৃ. ২৮৯।

২. *Twenty Years of Pakistan,* 1968, পৃ. ২৯৫।

৩. পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগ : *Economic Survey of East Pakistan 1969-70,* ঢাকা, পৃ. ২২।

অনেক পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ বলতেন যে, সম্পদ পাচারের বিষয়টি অতিরঞ্জিত এবং এই দুই এলাকার মধ্যে যে বাণিজ্য বহাল ছিল তার মাধ্যমে সম্পদ বিভাজনে প্রায় সমতা বজায় থাকে।[২৭] সারণি ৪.১০-এ দুই অঞ্চলের বাণিজ্যের একটি হিসাব দেয়া হলো। এই হিসাবে দেখা যায় যে, ২৩ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রফতানি করা দ্রব্যাদি পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের আমদানির তুলনায় মোট ১৬১৮ মিলিয়ন ডলার বেশি ছিল। পশ্চিমের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের হিসাবটি কিন্তু সাবধানে বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ বেশির ভাগ রফতানিই একটি বন্দি বাজারে চড়া দামে করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানির মধ্যে ছিল খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, তুলা ও কাপড়, সিমেন্ট ও যন্ত্রপাতি। পূর্ব পাকিস্তান রফতানি করতো চা, পাটজাত দ্রব্য, দিয়াশলাই, কাগজ এবং চামড়া। চা, পাটজাত দ্রব্য এবং চামড়া পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানি করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বিশ্ববাজারে তাদের হিস্যা কমাতে বাধ্য হয়। বস্তুতপক্ষে ১৯৫৯-৬০ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চা পান এত বেড়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান এই দ্রব্যটি বিশ্ববাজারে রফতানি পুরোপুরি বন্ধ করে ফেলে। চা, দিয়াশলাই এবং কাগজের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মূল্যের চেয়ে খানিকটা বেশি দাম দেয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য আন্তর্জাতিক মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ দামে কেনে। পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানিকারকরা হয় অদক্ষ উৎপাদক ছিল নয় খুব চড়া হারে মুনাফা আদায় করতো। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার আর একটি দিক ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের রফতানিকৃত দ্রব্যাদি পশ্চিমে সমান দামে বিক্রয় হতো; কিন্তু পূর্বে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি বেশি দামে বিক্রয় হতো। যেমন কাগজের দাম পূর্ব ও পশ্চিমে একই ছিল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানি উৎপাদকদের কম দামে রফতানি করতে হতো। কিন্তু পশ্চিম থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের দাম পূর্ব পাকিস্তানে সবসময়ই অনেক বেশি ছিল, সেখানে পশ্চিমের উৎপাদকদের কোনো খেসারত দিতে হতো না। সিমেন্টের দাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান খুব সরব হয়ে ওঠে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে যে সিমেন্ট উৎপাদন হতো তার দাম ছিল কম এবং ভিন দেশ থেকে আমদানি করলেও দাম হতো কম। এই একটি দ্রব্যের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি উৎপাদকদের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বে রফতানির জন্য ভরতুকি দিতে শুরু করে। তাই আন্তর্জাতিক মানে যদি দুই অঞ্চলের মধ্যকার বাণিজ্যের দাম নিরূপণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে পশ্চিমের বাণিজ্যে সত্যিকার উদ্বৃত্ত ছিল খুবই সামান্য। তাই এই যুক্তি দিয়ে সম্পদ পাচারের বিষয়টি নাকচ করা মোটেই যায় না। দ্বিতীয় যুক্তি দাবি করে যে, প্রতিরক্ষার জন্য যে খরচ হয় সে জন্য পূর্ব পাকিস্তানের দেনার জন্য কেন্দ্রীয় খাতে সম্পদ গ্রহণ করতে হয়। আর তৃতীয় যুক্তি ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব এতো কম আদায় হতো যে, অন্য সূত্রে (বৈদেশিক বাণিজ্য) সেই অঞ্চলের সম্পদ কেন্দ্রীয় সরকারকে আহরণ করতে হয়। এই দুটি যুক্তিই যে অসার ও ভিত্তিহীন তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরো দুটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানে যে বিনিয়োগ করে তাতে কিছু সম্পদ পূর্বে প্রত্যাবর্তন করে। এই ব্যাপারে পরে বিশদ বিশ্লেষণ করা

হবে। সর্বশেষ যুক্তি ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচার হলে পূর্বাঞ্চলে মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে যেত এবং দাবি করা হতো যে, তেমনটি তো হয় নি। এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এবং পরে তা বিবেচনা করা হয়েছে।

বাণিজ্য নীতি বস্তুতপক্ষে দুই অঞ্চলের সম্পর্কটিকে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক রূপ দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামালের আমদানি। বৈদেশিক সাহায্য এবং নিজস্ব রফতানি আয় দিয়ে এই প্রয়োজন মেটাতে হয়। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য বাজার খুঁজতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বানানো হয় একটি বন্দি বাজার এবং সেখানে চড়া দামে এই সব দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। বৃটিশ আমলে যেমন চামড়া বিলেতে নিয়ে গিয়ে তা ফেরত পাঠানো হতো জুতো হিসেবে, পাকিস্তান যুগে চামড়া একইভাবে রফতানি হতে থাকে, তবে এবেলা জুতো আসতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের বাজার এবং রফতানি আয় দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন সাধন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করে, কম দামে কৃষি সামগ্রী খরিদ করে নিয়ে গিয়ে এবং চড়া দামে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি বাজারে ছেড়ে সার্বিক চাহিদাকে নিম্নমুখী করে রাখা হয়। তার ফলে ভোগ্য দ্রব্যও বেশি করে আমদানির সুযোগ রহিত করে পশ্চিমের উন্নত মানের জীবনের চাহিদা মেটানো হয়। তদুপরি পূর্ব পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি ঘটিয়ে সেখানকার মানুষকে আরো বঞ্চিত করা হয়। শুধু বাণিজ্য সূত্রে ফি বছর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে অনুদান করে দেড়শো মিলিয়ন ডলার। এই ছিল উপনিবেশের মাতৃভূমিতে পাঠানো ভেট।

মুনাফা ও মূলধন আহরণের মাধ্যমে শোষণ

বৈদেশিক মূলধন একটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে, তাকে গ্রহণ করা হয় অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে। বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের অভাব মোচন করে এবং লভ্যাংশের পুনর্বিনিয়োগ আরো বিনিয়োগ বাড়ায়। বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে আসে প্রযুক্তির হস্তান্তর, স্থানীয় শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা মহলে নব নব কৌশল ও দক্ষতা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনার সুযোগ। বৈদেশিক বিনিয়োগের আর একটি অবদান হয় নানা স্তরে কর্মসংস্থান। কৃষি খামার বা বাগান স্থাপন করে ঔপনিবেশিক শক্তি বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করতো কিন্তু এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে শোষণ বেশি হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজি বাংলাদেশে এই ঔপনিবেশিক কায়দায়ই প্রবাহিত হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তারা একত্রে একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করে। তাই পশ্চিমের পুঁজি পূর্বে নিয়োজিত হতো, পশ্চিমের কর্মচারী পূর্বে কর্মরত থাকতো—এ ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ ছিল না। পশ্চিমের পুঁজি পূর্ব পাকিস্তানে শুধু লভ্যাংশের সন্ধানে থাকতো এবং সচরাচর তাদের লাভ পশ্চিমে স্থানান্তরিত হতো; পুনর্বিনিয়োগের হার ছিল খুব কম। আদমজি চটকল সম্বন্ধে ধারণা

ছিল যে, তাদের সমুদয় বিনিয়োগ তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে তারা উসুল করে নেয়। পশ্চিমের পুঁজি সাধারণত পূর্বে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণে লিপ্ত হতো এবং তা পশ্চিমে পাঠাতো শিল্পজাত দ্রব্যে রপ্তানিকরণের জন্য। যেমন পশ্চিমের পুঁজি পূর্বে চামড়ার কারখানা স্থাপন করলো, প্রক্রিয়াজাত চামড়া তারপরে বিদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানে গেল। পশ্চিমে এই চামড়া দিয়ে তারা জুতো, স্যান্ডেল এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করলো। এইসব ভোগ্যপণ্য আবার পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি হলো। দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পর্কের এই দিকটি বৃটিশ আমলের কথাই মনে করিয়ে দিত। ভারতের কাঁচামাল বৃটেনে শিল্প দ্রব্যে পরিণত হয়ে আবার এসে ভারতে বিক্রয় হতো। এই ঔপনিবেশিক সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন পূর্ব পাকিস্তানে দেখা গেল না।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশের মোট শিল্প খাতে স্থির সম্পদ ছিল মার্কিন ডলার ৬৯০ মিলিয়ন। এর প্রায় অর্ধেক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের মালিকানায়।[২৮] পশ্চিম পাকিস্তানি এই পুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ হয় পাকিস্তান সরকারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি খাতে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সস্তা দামে তা পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতির হাতে তুলে দেয়া হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো কর্ণফুলি কাগজ কল। পিআইডিসি এই কারখানাকে দাউদ গ্রুপের কাছে সামান্য দামে বিক্রয় করে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই কারখানা ব্যক্তিমালিকানা খাতে হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কারখানাটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এই লাভে চন্দ্রঘোনায় রেয়ন মিল স্থাপিত হয়। আর এক উপায়ে পশ্চিমের পুঁজিকে উৎসাহ দেয়া হয়। আর্থিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান থেকে পশ্চিমের পুঁজিপতিদের ঋণ দিয়ে তাদের পূর্বে পাঠানো হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান আইডিবিপি (পাকিস্তান শিল্প ব্যাঙ্ক) এবং আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান পিকিক (পাকিস্তান শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা) এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। তবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, যার প্রায় সবগুলোই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠান, তারাও কম যায় নি। প্রায়শই দেখা যেত যে, মাত্র দশ শতাংশ নিজ সম্পদ বিনিয়োগ করে পশ্চিমি পুঁজিপতিরা সহজেই ৯০ শতাংশ ঋণ নিয়ে কারখানা স্থাপন করতে পারতো। এই সুযোগ কিন্তু বাঙালিদের সচরাচর দেয়া হতো না।

সরকারের সহায়তায় এবং করুণায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্বে এসে কারখানা গড়তো। কিন্তু যেই তারা লাভের মুখ দেখতো তখনই শুরু হতো পশ্চিমে সম্পদ পাচার। আদমজি গোষ্ঠী তাদের সব সম্পত্তি গড়ে তুলে চটকলের ব্যবসা করে। কিন্তু ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিমেই ছিল তাদের বিনিয়োগের সিংহভাগ এবং সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ বীমা কোম্পানি ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি সুবিধা লুটবার মানসে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নামমাত্র সদর দফতর স্থাপন করে; কিন্তু কোম্পানি পরিচালনা হতো করাচি থেকে এবং কোম্পানির ব্যবসা ছিল মূলত পশ্চিমে। প্রগ্রেসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ তার সব পুঁজি বানায় সিলেটের ফল চাষ ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানায়। কিন্তু পাকিস্তান ভাগের সময় তাদের প্রধান ও বেশি বিনিয়োগ ছিল করাচিতে। এই ধরনের ভূরি ভূরি কাহিনী রয়েছে। এতো সব

কাহিনীর মোদ্দা কথাটি হলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের একটি উপনিবেশ হিসেবেই বিবেচনা ও ব্যবহার করে।

উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শোষণ

আমরা দেখেছি যে, সরকারি নীতি ও উদ্যোগ বিভিন্ন সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে। চলতি ব্যয়ের ধারা, বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের কায়দা এবং পুঁজির বিকাশে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা একটি দুরভিসন্ধিমূলক চরিত্রের পরিচয় দেয়। বস্তুতপক্ষে সকল অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য ছিল একটি। মুদ্রানীতি ও সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি। ছয়সালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ ছিল তার মূলনীতি। সঙ্কীর্ণমনা আমলাতন্ত্র ও বিশেষজ্ঞরা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের উপায় হিসেবেই বিবেচনা করে। পাকিস্তানের প্রায় বিশ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের চরিত্রটি সারণি ৪.১১-তে তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তান দাবি করতো যে, পূর্ব পাকিস্তানে দক্ষতার অভাব ছিল, বৃহত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষমতা ছিল না, উন্নয়ন আত্তীকরণ দক্ষতা ছিল না। তারা আরো বলতো যে, পূর্বে কোনো গতিশীল ব্যক্তিমালিকানা খাত না থাকায় বিনিয়োগে জোর আসে নি।

সারণি ৪.১১

পাকিস্তানে উন্নয়ন ১৯৫০-৭০ (মিলিয়ন টাকার হিসাবে)

কাল	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
	সরকারি খাত পরিকল্পনা	পরিকল্পনা বহির্ভূত	বেসরকারি খাত	সরকারি খাত পরিকল্পনা	পরিকল্পনা বহির্ভূত	বেসরকারি খাত
১৯৫০-৫৫	৭০০	০	৩০০	২০০০	০	২০০০
১৯৫৫-৬০	১৯৭০	০	৭৩০	৪৬৪০	০	২৯৩০
১৯৬০-৬৫	৬২৫০	৪৫০	৩০০০	৭৭০০	২৩১০	১০৭০০
১৯৬৫-৭০	১১০৬০	০	৩০০০	১৯১০০	৩৬০০	১৬০০০
মোট ১৯৫০-৭০	১৯৯৮০	৪৫০	৯৫৩০	২৪৪৪০	৫৯১০	৩১৬৩০

উৎস : পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan.* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৬।

কেন পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন আত্তীকরণ দুর্বল ছিল আর কেনই-বা এখানে ব্যক্তিমালিকানা খাতে পুঁজিপতিদের বিকাশ হলো না তা বিশ্লেষণ করা দরকার। উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবস্থাটিই ছিল এমন যে, পূর্ব পাকিস্তান কোনো মতেই তার ন্যায্য হিস্যা পেতে পারতো না। কেন্দ্রীয় সরকারের সমুদয় কার্যক্রম ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে অবস্থিত ছিল এবং তাদের সমস্যা তারা সহজে দেখতে পেত এবং উপলব্ধিও করতে পারতো। প্রাদেশিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে যে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য পোহাতে হতো তার মোকাবিলা করা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল দুরূহ, শুধু দূরত্বের কারণেই অনেকটা বিঘ্নিত হতো। তার উপরে ছিল কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য। তারা পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতো না এবং নিজের অঞ্চলের স্বার্থটা ভালো বুঝতো। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ হতো প্রায়ই দেখা যেত তা খরচ হতো না। আশ্চর্যজনকভাবে যখন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি হলো এবং প্রাদেশিক সরকারের উচ্চ পদে বাঙালি কর্মকর্তারা আসীন হতে থাকলো তখনই কিন্তু তহবিলের ব্যবহার শনৈ শনৈ করে বেড়ে গেল। ১৯৫৫-৫৬ সালে বাস্তবায়নের হার ছিল ৪৮ শতাংশ অথচ ১৯৫৭-৫৮ সালে তা বেড়ে হলো ৮১ শতাংশ এবং পরবর্তী বছরে হলো ৯৩ শতাংশ।[২৯]

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত করে। যথাসময়ে তহবিল অবমুক্তি রোধ করে আর বিনিশ্চায়ক উপাদান যথা বৈদেশিক মুদ্রা বা নির্মাণ যন্ত্র বা নির্মাণসামগ্রী (সিমেন্ট আর ইস্পাত) যথাসময়ে পেতে না দিয়ে উন্নয়ন বাস্তবায়নকে অসম্ভব করে তোলা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে একটি সুবিধাজনক নির্মাণ ঋতু রয়েছে, বেশি বৃষ্টিতে নির্মাণ কাজ ততো উত্তম নয়। এই উপলব্ধি কখনো সরকারের বা সরকারি বড় সাহেবদের মনে জাগে নি। বড় কর্তাদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা উপলব্ধির অভাব এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিতে দরদের অভাব এদেশে উন্নয়ন বাস্তবায়নের দক্ষতাকে পঙ্গু করে রাখে। পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক বিনিয়োগও পুরোপুরি অবহেলিত হয়, যার ফলে এই দক্ষতা অর্জনে বাদ সাধে। তাই উন্নয়ন আত্তীকরণে অসামর্থ্য বস্তুতই ছিল পাকিস্তানের উন্নয়ন নীতিমালা ও কার্যক্রমে এবং আমলাতন্ত্রে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতার ফসল। এটা বাস্তবিকই ছিল একটি মিথ্যা অজুহাত এবং প্রকৃত উদ্যোগে অনীহা।

একটি গতিশীল পুঁজিবাদ পূর্ব পাকিস্তানে তেইশ বছরেও দানা বাঁধতে পারলো না। ব্যক্তিমালিকানা খাতের প্রসার ছিল লজ্জাকর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পাকিস্তানে সরকার এতো ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রভাবিত করতো যে, সেখানে ব্যক্তিমালিকানা খাতের বিকাশের জন্য সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপরিহার্য। আমদানি লাইসেন্সের মাধ্যমেই প্রথম কাতারের পুঁজিপতিদের সৃষ্টি করা হয়। আমদানিতে পরিমাণগত বিধিনিষেধ এবং শুল্কের বৈষম্যমূলক উচ্চ হার আমদানিকারকদের উচ্চ হারে লাভের সুযোগ করে দেয়। আমদানিকৃত দ্রব্যাদি ষাটের দশকের মধ্যভাগে শুল্ক প্রদত্ত মূল্যের প্রায় অর্ধেকের বেশি দামে বিক্রয় হয়।[৩০] যে বৈদেশিক মুদ্রা স্টার্লিং ডিপোজিট হিসেবে পাওয়া যায় এবং কোরিয়ান উঠতি বাজারে আয় হয় তারই বরাদ্দের মাহাত্ম্যে নব্য পুঁজিপতিদের উদ্ভব হয়। পি আই ডি সি নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে; বিশেষ করে যেখানে পুঁজিপতিরা ঝুঁকি নিতে ভয় পেত, সেখানে পি আই ডি সি এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

পুঁজিবাদের বিকাশে অবদান রাখে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল পাকিস্তান শিল্প অর্থায়ন সংস্থা (পিফকো যার নতুন নামকরণ হয় আইডিবিপি), গৃহনির্মাণ অর্থায়ন সংস্থা (এইচবিএফসি), পাকিস্তান শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা (পিকিক), কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এডিবিপি, যার পূর্বসূরি ছিল দুটি প্রতিষ্ঠান এডিএফসি কৃষি উন্নয়ন অর্থায়ন সংস্থা এবং এবি বা কৃষি ব্যাঙ্ক), পাকিস্তান শরণার্থী পুনর্বাসন অর্থায়ন সংস্থা (পিআরআরএফসি), পাকিস্তান বিনিয়োগ সংস্থা (আইসিপি) এবং জাতীয় ইউনিট ট্রাস্ট (এনআইটি)।

এই সব অর্থায়ন সংস্থা ছিল ব্যক্তিমালিকানা খাতে উন্নয়ন বেগ বৃদ্ধিতে সার্থক প্রতিষ্ঠান। এগুলো পুরোপুরিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের দখলে ছিল, এগুলো সবই ছিল পশ্চিমে অবস্থিত এবং এদের কর্মকাণ্ড মোটামুটিভাবে করাচি ও পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে একে তো ভৌত অবকাঠামো ছিল দুর্বল, তার ওপরে শিল্পায়নে কোনো অগ্রগামী উদ্যোগ ছিল না এবং প্রতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ছিল প্রায় অনুপস্থিত। কতিপয় সংস্থার কার্যাবলির প্রতি নজর দিলেই দেখা যাবে যে, তারা কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে। পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পখাত ছিল পশ্চাৎপদ, সুতরাং সেখানে বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন ছিল অথচ তার ভাগ্যে ছিল অবহেলা এবং ন্যায্য পাওনা থেকেও বঞ্চনা। সারণি ৪.১২-তে উন্নয়ন অর্থায়নের দুরবস্থা দেখা যাবে।

সারণি ৪.১২

১৯৭০-এর মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রদত্ত ঋণ (মিলিয়ন টাকায়)

	এইচবিএফসি	এডিবিপি	আইডিবিপি	পিকিক
পূর্ব পাকিস্তান	২২৬	৫০৮	৯২২	৮৪০
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৩১	৬৬২	১০৩৪	১৭৯৮

উৎস : পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Pakistan Economic Survey 1969-70,* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৭৬,৭৮,৮১,৮৫।

বহুদূরের রাজধানীতে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানা খাতের বিকাশের প্রধান বাধা। করাচি, পিন্ডি বা ইসলামাবাদে লাইসেন্স বা পারমিট অথবা ঋণ লাইনের জন্য তদবির করা বাঙালিদের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। দূরত্ব ছাড়াও ছিল অপরিচিত বিদেশি আমলাতন্ত্র। পশ্চিমের একজন পুঁজিপতি অতি সহজে বস্ত্রশিল্পের জন্য জাপানি ঋণ যোগাড় করতে পারতো। একই বিনিয়োগের জন্য বাঙালির ভাগ্যে যদি রাশিয়ান ঋণ জুটতো তাই ছিল ভাগ্যের বিষয়। কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিনিয়োগ প্রসার ব্যুরো থেকে বা মূলধন ইস্যুর নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন পেতে বাঙালি পুঁজিপতিকে হিমশিম খেতে হতো। সব বৈদেশিক দূতাবাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তাদের সঙ্গে দরবার করে সাহায্য বা ঋণ পাওয়া এবং সরবরাহকারীর

সঙ্গে যোগাযোগ করা বাঙালিদের জন্য দারুণ কষ্টসাধ্য ছিল। সরকারের নানা দফতরের অনুমোদন বা সমর্থন লাভ করা ছিল আরো সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। পাকিস্তানের মুদ্রা বাজার ছিল করাচিতে, যেখানে বাঙালিরা ছিল প্রায়-বিদেশি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য লাভ বাঙালি উদ্যোক্তাদের খুব সহজে হতো না। এতো সব অসুবিধার মোকাবিলা করে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানা খাতে পুঁজির বিকাশ হয় নি।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন কৌশলই শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিকূলে ছিল না, সঙ্কীর্ণমনা ও প্রাদেশিকতায় নিমজ্জিত আমলাতন্ত্র অবস্থার উন্নতি বিধানের সব উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিত। পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতির জন্য প্রয়োজন ছিল বিশেষ সুযোগ-সুবিধার, যাতে দেরিতে শুরু করা উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র বা নীতি-নির্ধারকরা তা হতে দেয় নি। তারা দুই অঞ্চলকে সমতুল্য বিবেচনা করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সুবিধা দিতে নারাজ হয়। তারা পূর্ব পাকিস্তানে অতিরিক্ত হারে কৃষি ভরতুকি, উঁচু হারের আমদানি শুল্ক অথবা লম্বা সময়ের জন্য কর অব্যাহতিতে আপত্তি তোলে। পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল পশ্চাৎপদ, তাই তার বিশেষ সুযোগের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এই উপলব্ধি পশ্চিমে মোটেই ছিল না। সমমানের অর্থনৈতিক অবস্থানে তারা যে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল তা তারা বেমালুম ভুলে যায়। পশ্চিমে যখন উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন মূলধন আমদানিতে কোনো শুল্ক ছিল না, কৃষি উপাত্তের দাম ছিল যৎসামান্য এবং সবরকম কর প্রদান থেকে অব্যাহতি ছিল। পূর্বে দেরিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এইসব সুযোগ তারা মোটেও পেল না।

বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক ও আমলা নেতৃত্বের দুরভিসন্ধি এবং খামখেয়ালি সবচেয়ে প্রকট আকারে প্রকাশ পেত। কোনো-না-কোনো অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম হতো সীমিত। চলতি প্রকল্পকে প্রাধান্য প্রদানের অজুহাতে, কেন্দ্রীয় কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তিতে অথবা বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তার ধুয়া তুলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে সবসময়ই স্বল্প কলেবরে প্রণয়ন করা হতো। পাঁচসালা পরিকল্পনায় যতই সুষম বরাদ্দ রাখা হোক না কেন বাস্তবে বার্ষিক কার্যক্রমে তা কখনো মানা হতো না। আবার যে বরাদ্দ নির্ধারিত হতো তাকেও বাস্তবে বানচাল করার কোনো প্রচেষ্টা বাদ পড়তো না। যেমন বরাদ্দের অবমুক্তি দিতে দেরি করা হতো, আমদানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো এবং প্রকল্প অনুমোদন নামমাত্র কারণে বিলম্বিত হতো। ১৯৬৭-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে একটি 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান শুরু হয় এবং তার জন্য কিছু পাম্প এবং ডিজেল ইঞ্জিন বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭০-৭১ সালেও সেই বরাদ্দ আর বাস্তবায়িত হলো না। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল পাকিস্তানে প্রকল্প অনুমোদনের উচ্চতম প্রতিষ্ঠান। এতে সভাপতিত্ব করতেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং প্রাদেশিক গভর্নররাও উপস্থিত থাকতেন। ১৯৬৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরে রূপপুর

আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প অনুমোদিত হয়, এরপর ১৯৬৪ সালের ১৫ জানুয়ারিতে করাচি আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। করাচি প্রকল্পে কাজ আরম্ভ হয়ে ১৯৭০-এর আগেই উৎপাদন শুরু হয়; কিন্তু ততদিনে রূপপুরের জন্য কোনো ঋণ বা সাহায্য যোগাড় করা গেল না। এই কমিটির অন্য এক সভায় একই সঙ্গে করাচি এবং টঙ্গিতে দুটো মেশিন টুল কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রকল্প সামান্য অজুহাতে তিন তিনবার ফেরত পাঠানো হয়। ১৯৬৭ সালের মে মাসে অবশেষে এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়। কিন্তু এবারও প্রস্তাবটি ফেরত পাঠানোর পাঁয়তারা চলে, তবে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এতে নিদারুণ ক্রুদ্ধ হলে এবং সংবাদ মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের বিরূপ সমালোচনার ভয় দেখালে পরেই প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে।[৩১] পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ পাকিস্তান সরকার সবসময়ই গ্রহণ করতো।

উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্থায়ন ব্যবস্থাটিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী। প্রদেশগুলোর রাজস্ব ক্ষমতা ছিল সীমিত, তাই নিজস্ব রাজস্ব আয় থেকে তাদের খরচই যোগাতো না। কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে হিস্যা তারা পেত তার ফলে তাদের সামান্য উদ্বৃত্ত হতো। কেন্দ্রীয় রাজস্বের বন্টনে পূর্ব পাকিস্তান কখনো সুবিচার পায় নি, তা আগেই বিবৃত হয়েছে। রাজস্ব উদ্বৃত্তের সিংহভাগই হতো কেন্দ্রে। ১৯৬৮-৬৯ সালে যেমন মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল ২৩১৪ মিলিয়ন টাকা, পূর্ব পাকিস্তানের ১৭৮ মিলিয়ন, পশ্চিমের ৪১২ মিলিয়ন আর কেন্দ্রের ১৪১০ মিলিয়ন।[৩২] কেন্দ্র দুই প্রদেশকে উন্নয়ন অনুদান ও ঋণ প্রদান করতো এবং তা থেকেই প্রাদেশিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন হতো। এ ছাড়া প্রদেশগুলো বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পেত। ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসাবটিই দেখা যাক। কেন্দ্র দুই প্রদেশে অনুদান ও ঋণ দেয় ২৯১২ মিলিয়ন টাকা আর মোট বৈদেশিক সাহায্য মিলে ২৭২৯ মিলিয়ন টাকা।[৩৩] অবশ্য বৈদেশিক সাহায্যের কিয়দংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহার করে। সরকারি খাতে ১৯৬৮-৬৯ সালে উন্নয়ন কার্যক্রম ছিল নিম্নোক্ত :

সারণি ৪.১৩

১৯৬৮-৬৯ সালের উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকারি খাত	
কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব	১৬৫১ মিলিয়ন টাকা(১)
পূর্ব পাকিস্তান	২৩৬০ মিলিয়ন(২)
পশ্চিম পাকিস্তান	১৮৫৯ মিলিয়ন(৩)
বেসরকারি খাত	
মোট	৪২৪০ মিলিয়ন(৪)
পূর্ব পাকিস্তান	৯৫৪ মিলিয়ন(৫)

সূত্র : পাকিস্তান সরকার : *Pakistan Budget 1969-70*, ইসলামাবাদ, ১৯৬৯।

১. পৃ. ১৯

২. পৃ. ৫৯

৩. পৃ. ৭৫

৪. পাকিস্তানি পরিকল্পনা কমিশন : *Memorandum for Pakistan Consortium Meeting 1970-71*, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৬।

৫. পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগ : *Economic Survey of East Pakistan 1969-70*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৪।

পাকিস্তানের তেইশটি বছরই উন্নয়ন কার্যক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ন্যায্য হিস্যা পেল না। কেন্দ্রীয় কার্যক্রমে বেশির ভাগই ছিল পশ্চিমে অবস্থিত প্রকল্প। এছাড়াও পরিকল্পনা বহির্ভূত প্রকল্পে (বিশেষ করে সিন্ধু অববাহিকা কার্যক্রমে) দেদার খরচ হতো। তেইশ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ হয় ১৩৩২৬ মিলিয়ন টাকা।[৩৪] পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় অনুদান ও ঋণ ছিল ১২১১৭ মিলিয়ন টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১২৭৩৬ মিলিয়ন টাকা।[৩৫] বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা যে ছিল সীমিত তা আগেই আলোচিত হয়েছে। তাই উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধারায় পূর্ব পাকিস্তান সবদিক দিয়ে বঞ্চিত হতো এবং রীতিমতো মার খেতো। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সবসময়ই মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল বেশি। অনেকের মতে, বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য যে মুদ্রা ছাড়া হতো তার পুরো বোঝা পূর্ব পাকিস্তানকে বইতে হতো। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে এই উদ্দেশ্য সাধন করা হতো। তাই তেইশ বছরে দুই প্রদেশের জনপ্রতি আয়ে বৈষম্য ৬০ শতাংশ হলেও প্রকৃত হিসেবে তা ছিল প্রায় ১০০ শতাংশের বেশি।

পাকিস্তানের উন্নয়ন নীতিমালা, উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারা এবং উন্নয়ন বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্মিলিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিকাশে অশুভ প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রতিফল ছিল একটি, আর তা ছিল দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি।

উপসংহার

পূর্ব পাকিস্তান বৃটিশ আমলে ১৯০ বছর ছিল শোষণের শিকার। ঔপনিবেশিক শাসনকে বিদায় করে পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে যখন নতুন জীবন সূচিত হলো তখন আশা ছিল যে, এবার শোষণের অবসান হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা আর হলো না। বাঙালির পাকিস্তান নিয়ে যে ধ্যানধারণা ছিল এবং এর উন্নতির জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তান তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। পাকিস্তান-আদর্শের প্রতি বাঙালির নিষ্ঠা হলো পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গতির কারণ। বাঙালির রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্বের যে শূন্যতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান তারও সুযোগ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে একটি উদ্যোক্তা গোষ্ঠীর অভাব এবং বাঙালিদের তুলনামূলক পশ্চাৎপদ

অবস্থানও পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশায় অবদান রাখে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান প্রশাসনের ওপর তার কর্তৃত্বের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এরই ফলে অচিরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক হলো উপনিবেশের সঙ্গে মাতৃভূমির সম্পর্ক। এক ঔপনিবেশিক প্রভুকে বিদায় দিয়ে বাঙালিরা নতুন এক প্রভু পেল। পাকিস্তানের তেইশ বছরে বাঙালির অর্থনৈতিক অবস্থানের অবনতি হলো, একটি গরিব দেশ আরো গরিব ও শোষিত হলো।

যুদ্ধোত্তরকালে সারা পৃথিবীতে অধিকতর বিত্তশালী দেশ গরিব দেশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাকিস্তানে সেই নীতি কার্যকরী হলো না। পাকিস্তানে বরং গরিব অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত ধনী এলাকায় ঘটলো সম্পদ পাচার, প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান সবসময়ই পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায় যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল অর্থনৈতিক স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন। বাঙালিরা দাবি করলো যে, একটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দেশে একটি একীভূত অর্থনীতির ভ্রান্ত ধারণাকে বিসর্জন দিতে হবে। তাদের বিবেচনায় মুদ্রা ও রাজস্ব নীতিতে প্রদেশের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্য নীতি তারা দাবি করে বসলো। শুধু এই রকম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার না হলে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা যাবে না অথবা সম্পদ পাচার রোধ করা যাবে না। তেইশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ওপর সব ভরসার অবসান ডেকে নিয়ে আসে; তাদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উজ্জীবনের কোনো আশা তারা করতে পারলো না।

যদিও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য অনেক অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় কিন্তু তাতে আস্থা স্থাপনের কোনো আলামত বাঙালিদের নজরে এলো না। আইউবের শাসনতন্ত্র অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করে। প্রতি বছর এই বিষয়ে জাতির কাছে প্রতিবেদন পেশেরও ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ জন্য কোনো প্রয়োগবাদী পদক্ষেপের নিদর্শন মোটেই মিললো না। মুখে অনেকেই সম্পদ প্রবাহের ধারাকে পরিবর্তনের কথা বললেন, পশ্চিম থেকে পূর্বে সম্পদ প্রবাহের প্রয়োজন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা, প্রাদেশিকতায় নিমগ্ন, স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠী যে এই বিষয়ে তৎপর হয়ে বাস্তব ব্যবস্থা নেবেন সে বিশ্বাস উদ্রেকের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না। ঔপনিবেশিক সম্পর্কের পরিবর্তন সত্যি ছিল দুরাশা।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. পাকিস্তান সরকার, পরিকল্পনা বোর্ড : *First Five Year Plan,* করাচি, ১৯৫৭, পৃ. ৩৯৯-৪০০।

পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Report on Economic Relations between East & West Pakistan* : করাচি, ১৯৬১, পৃ. ২১।

এই দুই দলিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তিকালে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থানকে উন্নত দেখানোর জন্য মারদানের প্রিমিয়ার চিনিকল এবং অনেকগুলো বস্ত্রমিলকে প্রাক-স্বাধীনতাকালের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সব বস্ত্রমিল শুধু কল্পনার জগতে ছিল এবং চিনিকলের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল।

২. পাকিস্তান সরকার, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর : *Twenty Years of Statistics in Pakistan 1947-67,* করাচি, ১৯৬৮, পৃ. ২০।

৩. জি.এফ. পাপানেক : *Pakistan's Development-Social Goals and Private Incentives* : কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭, পৃ. ১৯।

৪. ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধনের উৎপাদনী হার ছিল ২.১, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২.২। পূর্ববর্তী সময়ে পূর্বের অনুপাত আরো সুবিধাজনক ছিল।

পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists on Fourth Five Year Plan,* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ২৫।

৫. দুই অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিল নিম্নরূপ

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০-৫৫	৬.০%	১.৭%
১৯৫৫-৬০	৭.৬%	৪.০%
১৯৬০-৬৫	৪.৩%	০.৯%

উৎস : *Forum* সাপ্তাহিকী, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, ঢাকা। রেহমান সোবহানের প্রবন্ধ Who pays for Development, পৃ. ৬-৭।

৬. দুই অঞ্চলের তুলনামূলক অবস্থান ছিল নিম্নরূপ :

(১৯৫৯-৬০ সালের স্থিরমূল্যের হিসেবে মিলিয়ন টাকা)

	১৯৫৪-৫৫		১৯৫৯-৬০		১৯৬৪-৬৫	
	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
গ্রস প্রাদেশিক উৎপাদন	১৪৩২	১৪৩১	১৫৫৫	১৬৭৯	১৯৯৯	২৩৭৯
মাথাপিছু আয়	২৯৮	৩৫৬	২৮৮	৩৭৮	৩২৭	৪৬৪

উৎস : জি.এফ. পাপানেক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭।

৭. : ড. এ. সাদেক : *Pakistan's First Five Year Plan in Theory and Operation,* প্রাদেশিক পরিসংখ্যান বোর্ড, ঢাকা, ১৯৫৭/৫৮।

৮. পূর্ব পাকিস্তান সরকার : *Report of Five Members of the Finance Commission,* ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ১২, ২২-২৩।

৯. পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1970-71,* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ১০৭-১০৮।

অবস্থানও পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশায় অবদান রাখে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান প্রশাসনের ওপর তার কর্তৃত্বের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এরই ফলে অচিরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক হলো উপনিবেশের সঙ্গে মাতৃভূমির সম্পর্ক। এক ঔপনিবেশিক প্রভুকে বিদায় দিয়ে বাঙালিরা নতুন এক প্রভু পেল। পাকিস্তানের তেইশ বছরে বাঙালির অর্থনৈতিক অবস্থানের অবনতি হলো, একটি গরিব দেশ আরো গরিব ও শোষিত হলো।

যুদ্ধোত্তরকালে সারা পৃথিবীতে অধিকতর বিত্তশালী দেশ গরিব দেশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাকিস্তানে সেই নীতি কার্যকরী হলো না। পাকিস্তানে বরং গরিব অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত ধনী এলাকায় ঘটলো সম্পদ পাচার, প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান সবসময়ই পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায় যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল অর্থনৈতিক স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন। বাঙালিরা দাবি করলো যে, একটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দেশে একটি একীভূত অর্থনীতির ভ্রান্ত ধারণাকে বিসর্জন দিতে হবে। তাদের বিবেচনায় মুদ্রা ও রাজস্ব নীতিতে প্রদেশের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্য নীতি তারা দাবি করে বসলো। শুধু এই রকম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার না হলে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা যাবে না অথবা সম্পদ পাচার রোধ করা যাবে না। তেইশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ওপর সব ভরসার অবসান ডেকে নিয়ে আসে; তাদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উজ্জীবনের কোনো আশা তারা করতে পারলো না।

যদিও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য অনেক অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় কিন্তু তাতে আস্থা স্থাপনের কোনো আলামত বাঙালিদের নজরে এলো না। আইউবের শাসনতন্ত্র অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করে। প্রতি বছর এই বিষয়ে জাতির কাছে প্রতিবেদন পেশেরও ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ জন্য কোনো প্রয়োগবাদী পদক্ষেপের নিদর্শন মোটেই মিললো না। মুখে অনেকেই সম্পদ প্রবাহের ধারাকে পরিবর্তনের কথা বললেন, পশ্চিম থেকে পূর্বে সম্পদ প্রবাহের প্রয়োজন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা, প্রাদেশিকতায় নিমগ্ন, স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠী যে এই বিষয়ে তৎপর হয়ে বাস্তব ব্যবস্থা নেবেন সে বিশ্বাস উদ্রেকের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না। ঔপনিবেশিক সম্পর্কের পরিবর্তন সত্যি ছিল দুরাশা।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. পাকিস্তান সরকার, পরিকল্পনা বোর্ড : *First Five Year Plan,* করাচি, ১৯৫৭, পৃ. ৩৯৯-৪০০।
পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Report on Economic Relations between East & West Pakistan* : করাচি, ১৯৬১, পৃ. ২১।
এই দুই দলিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তিকালে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থানকে উন্নত দেখানোর জন্য মারদানের প্রিমিয়ার চিনিকল এবং অনেকগুলো বস্ত্রমিলকে প্রাক-স্বাধীনতাকালের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সব বস্ত্রমিল শুধু কল্পনার জগতে ছিল এবং চিনিকলের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল।

২. পাকিস্তান সরকার, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর : *Twenty Years of Statistics in Pakistan 1947-67,* করাচি, ১৯৬৮, পৃ. ২০।

৩. জি.এফ. পাপানেক : *Pakistan's Development-Social Goals and Private Incentives* : কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭, পৃ. ১৯।

৪. ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধনের উৎপাদনী হার ছিল ২.১, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২.২। পূর্ববর্তী সময়ে পূর্বের অনুপাত আরো সুবিধাজনক ছিল।
পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists on Fourth Five Year Plan,* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ২৫।

৫. দুই অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিল নিম্নরূপ

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০-৫৫	৬.০%	১.৭%
১৯৫৫-৬০	৭.৬%	৪.০%
১৯৬০-৬৫	৪.৩%	০.৯%

উৎস : *Forum* সাপ্তাহিকী, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, ঢাকা। রেহমান সোবহানের প্রবন্ধ Who pays for Development, পৃ. ৬-৭।

৬. দুই অঞ্চলের তুলনামূলক অবস্থান ছিল নিম্নরূপ :

(১৯৫৯-৬০ সালের স্থিরমূল্যের হিসেবে মিলিয়ন টাকা)

	১৯৫৪-৫৫		১৯৫৯-৬০		১৯৬৪-৬৫	
	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
গ্রস প্রাদেশিক উৎপাদন	১৪৩২	১৪৩১	১৫৫৫	১৬৭৯	১৯৯৯	২৩৭৯
মাথাপিছু আয়	২৯৮	৩৫৬	২৮৮	৩৭৮	৩২৭	৪৬৪

উৎস : জি.এফ. পাপানেক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭।

৭. : ড. এ. সাদেক : *Pakistan's First Five Year Plan in Theory and Operation,* প্রাদেশিক পরিসংখ্যান বোর্ড, ঢাকা, ১৯৫৭/৫৮।

৮. পূর্ব পাকিস্তান সরকার : *Report of Five Members of the Finance Commission,* ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ১২, ২২-২৩।

৯. পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1970-71,* ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ১০৭-১০৮।

১০. পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists on Fourth Five Year Plan*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১১. পাকিস্তান সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1970-71*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮।

১২. পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists*. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১৩. ঋণ পরিশোধ বাবদ দুই অঞ্চলের দেনা ছিল নিম্নরূপ : মিলিয়ন টাকা

	১৯৬২/৬৩	১৯৬৩/৬৪	১৯৬৪/৬৫	১৯৬৫/৬৬	১৯৬৬/৬৭	১৯৬৭/৬৮	১৯৬৮/৬৯
পূর্ব	৮২	২৩৩	২৩৪	২৬৫	৩২৪	৩৯৯	৪৮১
পশ্চিম	৬৮	২৪১	২০৭	৩১১	৩৭৪	৩৭৮	৪০৮

উৎস : পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1970-71*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩, ২৬১।

১৪. পরিকল্পনা বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান সরকার : *Economic Survey of East Pakistan 1969-70*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১০২-১০৩।

১৫. জি. ডব্লিউ চৌধুরী : *Constitutional Development in Pakistan*, ইউনিভার্সিটি অব বৃটিশ কলাম্বিয়া, ভানকুভার, ১৯৬৯, পৃ. ২২৪।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।

১৭. পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Report on Economic Relations*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

১৮. পাকিস্তান সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় : *Report on the Allocation and Apportionment of Revenues between the Centre and the Provinces*, করাচি, ১৯৬১, পৃ. ৪।

১৯. পাকিস্তান অর্থ মন্ত্রণালয় : *Report on Economic Relations*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫০।

২০. অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1968-69*, ইসলামাবাদ, ১৯৬৮, পৃ. ৫৮-৬১।

২১. পাকিস্তান সরকার : *Report of the Working Group on Debt Burden*, ইসলামাবাদ, ১৯৬৮, পৃ. ১০।

২২. পরিকল্পনা কমিশন : *Fourth Five Year Plan*, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৬৫।

২৩. পরিকল্পনা কমিশন : *Reports of Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan* প্রথম খণ্ড, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ২৭৮।

২৪. প্রকল্পের ফর্দ আছে : *Report of the Working Group on Debt Burden*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১৫১ এবং
পরিকল্পনা কমিশন : *Memorandum for the Pakistan Consortium 1970-71*, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ৮৫-১৩৭।

২৫. অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1971-72*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।
কেন্দ্রীয় প্রকল্প সাহায্য এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ ২০:৮০ অনুপাতে এবং অপ্রকল্প সাহায্য ৩০:৭০ অনুপাতে বিভাজিত।

২৭. পরিকল্পনা কমিশন : *Report of the Panel of Economists*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬-২৪১।

২৮. এই হিসেব লেখক ১৯৭২ সালের মার্চ-এপ্রিলে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন থেকে সংগ্রহ করেন।
পরবর্তীকালে এই তথ্য পাওয়া যায় :
রেহমান সোবহান ও মোজাফফর আহমদ : *Public Enterprise in an Intermediate Regime : A Study in Political Economy of Bangladesh*. BIDS, Dhaka,

1980, পৃ. ১০১। এবং

পরিকল্পনা কমিশন : *The First Five Year Plan 1973-78*, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ১৯৫।

২৯. কার্ল ভন ভরিস : *Political Development in Pakistan* : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫, পৃ. ১৮২।

৩০. স্টিফেন আর লুইস : *Economic Policy & Industrial Growth in Pakistan*, জর্জ এলেন অ্যান্ড আনউইন, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ৮২।

৩১. লেখকের নিজস্ব নথি থেকে। এছাড়াও নিম্নোক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য : মন্ত্রিসভা সচিবালয় :

ক. *Minutes & Decisions of the Executure Committee of the National Economic Council 1963*. ইসলামাবাদ, ১৯৬৫।

খ. *Minutes & Decisions of the ECNEC 1964*, পৃ. ৭-৯, ৭২, ৮৪। প্রকাশনা ১৯৬৬, পৃ. ১০৯-১০।

গ. *Minutes & Decisions of the ECNEC 1967*, ১৯৬৮, পৃ. ৪২-৪৫।

৩২. পূর্ব পাকিস্তানের হিসেব : পাকিস্তান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের *Pakistan Budgets 1969*, ইসলামাবাদ, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৯।

পশ্চিম পাকিস্তানের হিসেব : পাকিস্তান অর্থ মন্ত্রণালয়ের *Pakistan Budgets 1969-70*, ইসলামাবাদ, পৃ. ৭৫ এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব উপরোক্ত বইয়ের পৃ. ৪২।

৩৩. পাকিস্তান অর্থ মন্ত্রণালয় : *Pakistan Budgets 1969-70*, ইসলামাবাদ পৃ. ১৬৮।

৩৪. পাকিস্তান অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1970-71*, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৩৫. পাকিস্তান অর্থ মন্ত্রণালয় : *Budget in Brief 1970-71*, ইসলামাবাদ, ১৯৭০ পৃ. ২১২-২১৯।

ছয় দফার সাংবিধানিক সমাধান

নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও

ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের উদ্যোগের শুরুতেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পুরোভাগে এসে পড়লো। প্রদেশে যদি অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়, তাহলে দেশি মন্ত্রী ও আইন প্রণেতার প্রশিক্ষণ অনেক সহজে হবে। মহামতি গোখেলে ছিলেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের একজন প্রধান প্রবক্তা। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর মরণোত্তর গ্রন্থ *পলিটিক্যাল টেস্টামেন্ট*-এ তিনি বলেন, "যুদ্ধ শেষে ভারতীয়দের কাছে একটি উপযুক্ত উপহার হবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।"[১] ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুযায়ী মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মিলিত দাবি হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড সংস্কার আইনে এই দাবি পুরোপুরি গ্রহণ করা হলো না। পরিবর্তে একটি দ্বৈতশাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হলো। এতে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গভর্নর ক্ষমতা তাঁদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। 'হস্তান্তরিত বিষয়' যথা কৃষি অথবা শিক্ষা খাতে প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ হলেন। কিন্তু 'সংরক্ষিত বিষয়', যথা, অর্থ, আইন বা স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীবর্গ গভর্নরের কাছে দায়বদ্ধ থাকলেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে, প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদ।

ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি

মুসলমান সম্প্রদায় খুব জোরশোরেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় তারা আশা করে যে, সেখানে তারা নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু এই সুযোগ তারা কেন্দ্রে পাবে বলে নিশ্চিত ছিল না। তাই ভারত ফেডারেশনে মুসলমানরা সবসময়ই ব্যাপক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের

দাবি জানিয়ে চলে। ভারতের অন্যান্য গোষ্ঠীও এই দাবির মধ্যে যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। ভারতের মতো একটি বহুজাতিক দেশে ফেডারেশনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়নের পক্ষেই গড়ে ওঠে ব্যাপক জনমত।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বৈত-শাসন বিসর্জন দিয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু যেহেতু প্রাদেশিক গভর্নরগণ নানা বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের হুকুম মানতে বাধ্য ছিলেন, সে জন্য স্বায়ত্তশাসনের পরিধি ছিল গণ্ডীবদ্ধ। সামগ্রিক বিচারে ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার না থাকায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতাই ছিল একচ্ছত্র। মুসলমান রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদেরা ১৯৩০ সাল থেকেই স্বাধীন ভারতের জন্য নানা ধরনের সাংবিধানিক প্রস্তাব উত্থাপন করে। এইসব প্রস্তাবেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯৩৯ সালে কেফায়েত আলী 'পাঞ্জাবি স্কিম' নামে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এতে ভারতবর্ষে ৫টি ফেডারেশন নিয়ে একটি কনফেডারেশনের চিন্তা করা হয়। এই কনফেডারেশন যেসব বিষয়ে দায়িত্বশীল থাকবে সেগুলো ছিল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অভিন্ন উৎস থেকে প্রবাহিত নদীনালা এবং কনফেডারেশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ফেডারেশনের কাছ থেকে রাজস্ব-সূত্র।[২] পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকান্দার হায়াত খান ঐ বছরেই ভারত ফেডারেশন সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্তির প্রস্তাব দেন। তাঁর ঐ প্রস্তাবে ফেডারেল বিষয় ছিল ৫টি, যথা: প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শুল্ক এবং মুদ্রা।[৩] ১৯৩৯ সালে এ-দেশের আরেকটি প্রস্তাব ছিল 'আলীগড় স্কিম' এবং এতে তিনটি রাজ্য নিয়ে ভারত ফেডারেশনের চিন্তা করা হয়। এই তিনটি রাজ্য ছিল সমগ্র পাঞ্জাবসহ বর্তমানের পাকিস্তান, বাংলা প্রেসিডেন্সি এবং ভারতের বাদবাকি এলাকা। এই প্রস্তাবে এই তিনটি রাজ্য শুধু একটি নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করবে।[৪] জামায়াতে ইসলামী নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদী ১৯৩৮-৩৯ সালে আরেকটি ভারতীয় কনফেডারেশনের প্রস্তাব দেন। এতে ভারতীয় হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলো মিলে হবে একটি ফেডারেশন এবং মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলো মিলে হবে আরেকটি ফেডারেশন। এই প্রস্তাবে কনফেডারেশনের দায়িত্ব ছিল তিনটি বিষয়ে, যথা, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বাণিজ্য।[৫] ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে দুটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দুই দল যে কেবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে, তাতে ভারতে একটি তিন রাষ্ট্রের কনফেডারেশনের কথা বলা হয়। এই কনফেডারেশনের দায়িত্ব চারটি, যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ এবং কনফেডারেশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত কর ক্ষমতা।

স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও পাকিস্তান

স্বায়ত্তশাসনের জন্য মুসলমানরা দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রাম করে এলেও, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একে তেমন আমলই দিলেন না। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ১৯৩৫

সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনে বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা ভারত ও পাকিস্তানের দুটি গণপরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ১৯৩৫ সালের আইনই ছিল দেশের মৌলিক আইন। এই আইনে গভর্নর জেনারেল ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির কারণে নানাভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরো কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। শরণার্থী সমস্যা, নতুন রাজধানী স্থাপন, প্রশাসনে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাবের মতো অসুবিধার সঙ্গে যুক্ত হয় একটি নতুন দেশ গঠনের জাতীয়তাবাদী প্রেরণা। কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা এবং প্রাদেশিক সরকারগুলো হয়ে পড়ে তার বিকেন্দ্রীকৃত অঙ্গবিশেষ। এই প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী হয় রাষ্ট্রের সর্বত্র একটি মাত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে। ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত একটি দেশের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দুই অংশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকারে একটি বিশেষ এলাকা প্রভাবিত আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য এই ফাটলকে আরো বিস্তৃত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি নেতৃবৃন্দ সমতা ও সুবিচারের ক্ষীণ আশা দেখতে পেলেন। তাদের একমাত্র বিকল্প হলো অধিকতর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

পাকিস্তান গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির প্রথম প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হলো, তখন থেকেই শুরু হয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন। এই প্রতিবেদনের প্রস্তাবাবলি বিবেচনা করার জন্য ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মুসলিম লীগ বিরোধী বাঙালি নেতৃবৃন্দ একটি সর্বদলীয় মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। এই মহাসম্মেলনে ফেডারেল সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং এই দুইটি দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব ক্ষমতা তুলে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।[৬] পাকিস্তানের ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং জনসংখ্যার বিভাজনের বিষয়টি বিবেচনা করে কিছু কিছু চিন্তাবিদ পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন ধরনের ফেডারেল সরকারের চিন্তা করছিলেন। একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান ফেডারেশনের সরকারের দায়িত্ব সংক্রান্ত তিনটি স্তর থাকবে—একটি হবে রাজ্যের দায়িত্ব, একটি হবে ফেডারেশনের দায়িত্ব এবং অন্যটি হবে উপ-ফেডারেশনের দায়িত্ব। পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলো প্রদেশ নিয়ে হবে একটি উপ-ফেডারেশন এবং পূর্ব বাংলায় উপ-ফেডারেশন হবে তিন-চারটি রাজ্য নিয়ে। প্রয়োজনবোধে পূর্ব বাংলায় একটি সরকারই উপফেডারেশন এবং রাজ্যের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবে।[৭] ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জনগণের ম্যান্ডেটে পরিণত হয়। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফাতে মাত্র তিনটি বিষয়ে ফেডারেল সরকারকে দায়িত্ব দেয়া হয়, যথা, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা। স্বায়ত্তশাসনের এই ম্যান্ডেট তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল আইউব খান পুরোপুরি সমর্থন করেন। ১৯৫৪ সালের ৪ অক্টোবর তিনি দেশের সংবিধান বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন এবং তাতে এই তিনটি বিষয় ছাড়া শুধু আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগকে ফেডারেল সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন।[৮] আইউব যখন দেশে

সামরিক একনায়ক হলেন, তখন কিন্তু তাঁর নিজের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু তাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ততোটা প্রদান করা হয় নি। দুর্ভাগ্যবশত সেই সীমিত স্বায়ত্তশাসনও কখনো বাস্তব রূপলাভ করে নি। সংবিধান মাত্র ২০ মাস পর্যন্ত বহাল ছিল। এবং এর পরেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়। আইউব ফেডারেল সরকারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন এবং প্রাদেশিক সরকারকে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। বাঙালি অসন্তোষকে প্রশমন করার জন্য আইউব একই সঙ্গে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং পাকিস্তান রেলওয়েকে ভাগ করে দুই প্রদেশে হস্তান্তর করেন। দুইটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যথা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান এবং হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় দফতর ঢাকায় স্থানান্তর করেন। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স্‌ও করাচি থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। আইউবের শাসনতান্ত্রিক স্বৈরাচারে কিন্তু দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাঙালিদের অংশগ্রহণের আর কোনো সুযোগ থাকলো না। আইউব তাঁর দশ বছরের শাসনক্ষমতার অবসানের সময় এই সত্য স্বীকার করেন।

ছয় দফার জন্মবৃত্তান্ত ও উদ্ভব

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধই অবশেষে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে প্রাণসঞ্চার করলো। বাংলাদেশকে পুরোপুরি অরক্ষিত রেখে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কাশ্মিরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে মেতে উঠলো। ২০ লাখ মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে ৭ কোটি বাঙালির জীবনে নেমে এলো অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা। পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিলো না। ১৭টি দিন এ-দেশের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনযাপন করে। ঠিক এই ঘটনার ছয় মাস পরে ১৯৬৬ সালের ১৫ মার্চ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো সর্বপ্রথম জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা দুটি পরাশক্তির আলোচনার বিষয় ছিল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বাঙালি সাংসদরা প্রশ্ন তুললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। তাঁর এই জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো জানালেন যে, সেপ্টেম্বরের যুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কূটনীতিবিদরা পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারসোতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৯] বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ ছিল পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে। তারই ফলে এই যুদ্ধের সময় দেশটি প্রায় এক মাসের মতো সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাণিজ্যের ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধের সময় এই জন্য ভোগ্যপণ্যের প্রবল ঘাটতি দেখা দেয়। দেশের দুই অংশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নতুন একটা মাত্রা বা চিন্তা-চেতনার

প্রয়োজন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকলো না।

রাজনৈতিকভাবেও পূর্ব পাকিস্তানে এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রদেশের সম্পর্ক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর। অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে দেশটি ছিল সোচ্চার। একমাত্র ধর্ম ছাড়া সামাজিক কোনো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো মিল ছিল না। ব্যালটের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো আশা বা উপায় বাঙালিদের ছিল না। তাই 'তুমিও বাঁচো, আমাকেও বাঁচতে দাও' বাঙালিরা এই নীতি গ্রহণ করলেন। সামরিক বাহিনীর জন্য কিছু খেসারত প্রদান করে এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে এক নীতি অবলম্বন করে, পূর্ব পাকিস্তান তার নিজের ভৌগোলিক সীমায় স্বয়ম্ভর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক যতো কম হবে, ঝগড়া-ফ্যাসাদের সুযোগও ততোই কমে যাবে।

ছয় দফার জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। অনেকে বলতেন এই কার্যক্রম আইউব খানের সহযোগীরা প্রণয়ন করেন এবং তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেক দলের অভিমত ছিল যে, এটি আমেরিকার আশীর্বাদপুষ্ট এবং সিআইএ-কে ছয় দফা প্রণয়নের কৃতিত্ব দেয়া হয়। আবার কারো কারো মতে মস্কো সমর্থক কমিউনিস্টরাই এটি প্রণয়নের মূল হোতা। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কাহিনী ছিল কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালি আমলা এটি প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশের প্রথম মহাসচিব প্রয়াত রুহুল কুদ্দুস ও তাঁর দু'জন সহযোগী প্রয়াত আহমদ ফজলুর রহমান এবং খান মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে এজন্য কৃতিত্ব দেয়া হয়। শেখ মুজিব যখন এই কার্যক্রম লাহোরে ঘোষণা করেন, তখন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। শুধু তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এই কার্যক্রম প্রণয়নে তিনি অনেকের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব কোরবান আলীর নেতৃত্বে শেখ মুজিবের কয়েকজন সহযোগী ছয় দফার চূড়ান্ত রূপ দেন।

ছয় দফা কার্যক্রম

তাসখন্দ চুক্তি সই করে আইউব খান পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয় এবং মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে মতবিরোধ তাঁর অবস্থানকে বেশ নাজুক করে তোলে। তিনি তখন তাসখন্দ চুক্তি সমর্থনের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুয়ারে হাজির হলেন। এনডিএফ আইউবের এই কাজটির প্রতি সমর্থন জানালো। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এই বিষয়ে একটি উদ্যোগ নিয়ে লাহোরে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করলেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার

বিবেচনার বিষয় ছিল কাশ্মির সমস্যা এবং আইউবী স্বৈরতন্ত্র। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে শেখ মুজিব এই সভায় যান। ইতোমধ্যে ছয় দফা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর কপি পশ্চিম পাকিস্তানেও সরবরাহ করা হয়েছে। এই সভায় শেখ সাহেব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিবেচনার জন্য আবেদন করেন এবং ৫ ফেব্রুয়ারি প্রস্তুতি পর্যায়ে দাবি করেন যে, সভায় তৃতীয় বিষয় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আলোচিত না হলে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের যোগদানের কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না। কিন্তু পশ্চিমের কোনো দলই এই বিষয়ে আলোচনায় রাজি হলো না। স্বায়ত্তশাসনের অভাবে প্রদেশে যে কি অবস্থা হয়েছিল তাতে তাদের কোনোই আগ্রহ ছিল না। ভাসানী ন্যাপ এই সম্মেলনে যায় নি; কারণ ভাসানী তখন আইউব খানের বিশ্বাসভাজন সমর্থক এবং ইতোমধ্যে আইউবের পৃষ্ঠপোষকতায় কারামুক্তির পর চীনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। সুতরাং এই সম্মেলনে আইউববিরোধী গোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন মুজিব। তিনি সম্মেলন বর্জন করে লাহোরেই এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফার ঘোষণা দিলেন। তাঁর কথা হলো ছয় দফা বাঙালির বেঁচে থাকার নীলনকশা।[১০] মোটামুটিভাবে ছয় দফা হচ্ছে :

১. প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ফেডারেল সংসদীয় সরকার।
২. শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় দুটো হবে ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব।
৩. মূলধন পাচারের পথ বন্ধ করতে পারলে সারা দেশে একই অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, অন্যথায় দুইটি এলাকার জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।
৪. রাজস্ব নীতি ও কর প্রয়োগের ক্ষমতা হবে অঙ্গরাজ্যের, তবে ফেডারেশনের খরচের জন্য পূর্ব নির্ধারিত হিসেবে অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের রাজস্বের একাংশ প্রদান করবে।
৫. অঙ্গরাজ্যগুলো বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসেব রাখবে এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিজেরা নির্ধারণ করবে। নির্দিষ্ট হিসেবে ফেডারেশনের চাহিদা তারাই মেটাবে।
৬. নিজস্ব দেশরক্ষা ক্ষমতা আহরণের জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী বা প্যারা সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা থাকবে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের।

১৯৭০ সালে যখন পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের জায়গায় চার প্রদেশ গঠিত হলো, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ছয় দফা কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস সেসব ইউনিটের হাতে অর্পণ করা হয়। পশ্চিমে একটি সাব-ফেডারেশনের ধারণা এই পরিপ্রেক্ষিতে জোর পায়।

ছয় দফা যখন প্রণীত হয় তখন কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস ও পরিবর্তে ফেডারেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধির ধারা চলছে। এই ধারা বলবৎ হয় জনহিতে নিবেদিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। সামাজিক আইন প্রয়োগে ফেডারেশনের ক্ষমতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যেমন বেকারভাতার দায়িত্ব যদি সবগুলো অঙ্গরাজ্যের হয় তাহলে পশ্চাৎপদ অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীদের দুরবস্থা বাড়বে এবং অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অঙ্গরাজ্যকে পশ্চাৎপদদের সাহায্যে আসতে

হবে না। ফেডারেশনের জনগোষ্ঠীর সার্বিক মঙ্গলের স্বার্থে এবং নাগরিকদের সমতার খাতিরে ফেডারেশনের ক্ষমতা বাড়ে। ফেডারেশনের হস্তক্ষেপ ছাড়া গরিব অঙ্গরাজ্যে শিক্ষা প্রসারের সুযোগ থাকতো সীমিত অথবা বর্ণবাদী অঙ্গরাজ্যে বর্ণসাম্য প্রতিষ্ঠা পিছিয়ে থাকতো। কিন্তু পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এলাকা ফেডারেশনের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে পশ্চাৎপদ এলাকাকে শোষণ করেই চলছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব ক্ষমতা ও ব্যয়-নীতি পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ-সুবিধা উপেক্ষা করে তাকে পশ্চিমের বাজারে পরিণত করলো। তদুপরি দেশরক্ষা খাতে অনর্থক সম্পদ ব্যয় করে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ ব্যর্থ হলো। সর্বোপরি গরিবের নামে বৈদেশিক সাহায্য আদায় করে তার সিংহভাগ খেয়ে নিল অগ্রসর পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানে ফেডারেশনের সুযোগ-সুবিধা সমভাবে বিতরণের প্রধান অন্তরায় হলো ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা। দুই এলাকার শ্রমিক রইলো বিচ্ছিন্ন, ব্যবস্থাপনা বা মূলধনের ছিল না কোনো গতিময়তা। তাই এক এলাকায় বিনিয়োগ বা ব্যয় অন্য এলাকার কোনোই উপকারে এলো না। এই অবস্থায় পাকিস্তানের জন্য অন্য মাত্রায় চিন্তাভাবনার প্রয়োজন পড়ে। তথ্য প্রবাহের যুগে এবং অর্থনীতির ভূমণ্ডলায়নে বর্তমানে হয়তো অন্য চিন্তাও করা যেত, কিন্তু ১৯৭০ সালে সেই অবস্থা ছিল না।

ছয় দফার প্রতিটি দফা খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রণয়ন করা হয়। একটি বিভক্ত দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভাজনের জন্য সংসদীয় পদ্ধতির কোনো বিকল্প ছিল না। আইউব নিজে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু দশ বছর রাজত্ব করে তিনিও অনুভব করেন যে তাঁর ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ ছিল না।[১১] ফেডারেশনের জন্য সীমিত ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল দুই দেশের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতার জন্য। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর একচ্ছত্র শাসনের একমাত্র বিকল্প ছিল যে বিষয়ে সম্ভব সেই বিষয়েই প্রাদেশিক অধিকার। আমরা পূর্বতন অধ্যায়ে দেখেছি এক রাজস্ব নীতি, এক মুদ্রা নীতি, এক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, এক বাণিজ্য ও শিল্প নীতি এবং বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কীভাবে বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তানে একটি শোষক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে এবং কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিমে পাচার হয় ও জনগণের দারিদ্র্য বেড়েই চলে। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ক দফাগুলো রচিত হয়। মূলত পাকিস্তানে দুটি স্বয়ম্ভর অর্থনীতি বিরাজমান ছিল এবং ঔপনিবেশিক সম্পর্কের ফলে তাদের পারস্পরিক বিকাশের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই বাস্তবতার তাগিদে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তুলে ধরা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি আহরণের প্রস্তাব ছিল নিতান্তই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সার্বিক বিচারে এটাই প্রতিভাত হয় যে, দুই এলাকার মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগ যত কমানো যায় শুভেচ্ছার সম্ভাবনা ততো বাড়ানো যাবে। ছয় দফার উদ্দেশ্য

ছিল এই সজ্ঘাতের এলাকা সীমিত করা—তুমি তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করো, সুখে থাকো এবং আমার ব্যাপারে মাথা গলাতে এসো না।

ছয় দফা কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ ও আকর্ষণ

ছয় দফা প্রচারিত হতে না হতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আপত্তির জোয়ার উঠলো। পূর্ব পাকিস্তানেও প্রথমে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শেখ মুজিব যখন ছয় দফা ঘোষণা করেন তখনও আওয়ামী লীগ বিধিসম্মতভাবে এই নীতিমালা গ্রহণ করে নি। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটি ছয় দফা অনুমোদন করে এবং ১৮ ও ১৯ মার্চে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় তা গৃহীত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ কতিপয় আওয়ামী লীগ সদস্য এতে দলের কাজে নিস্পৃহ হয়ে যান। এই কাউন্সিলে নতুন কমিটিও গঠিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান হন সভাপতি, তাতেও কিছু পুরনো সদস্য ব্যথিত হন। ছয় দফার প্রচারে আওয়ামী লীগ যেমন ভূমিকা পালন করে তার চেয়ে উত্তম ভূমিকা পালন করেন প্রেসিডেন্ট আইউব। তাঁর আক্রমণ শুরু হয় ঢাকায় ১২ মার্চে এবং পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে প্রতিদিনই তিনি ছয় দফার ওপর বক্তব্য রাখেন। চট্টগ্রামে এক জনসভায় ১৫ মার্চ তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার অজুহাত হলো ছয় দফা। তিনি আরো বলেন যে, এটি একটি বীভৎস স্বপ্ন এবং যুক্তবাংলার পক্ষে একটি অবাস্তব কল্পনাবিলাস। তাঁর মতে, পাকিস্তান বা ভারত কেউই স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইবে না। স্বাধীন বাংলা কোনোমতেই টিকে থাকতে পারবে না। পাকিস্তান এই কার্যক্রমের মোকাবিলা করবে অস্ত্রের ভাষায়। ছয় দফায় তিনি এতোই বেকায়দায় পড়েন যে, তিনি একে প্রতিহত করার জন্য তার শাগরেদদের হুকুম দেন। এই সময়ে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের এক নৈশ ভোজেও আইউব ছয় দফা নিয়ে আলোচনা করেন। এটি একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং যারা এই কার্যক্রম দিয়েছে তারা দেশের ধ্বংস কামনা করে। এতে ভারতকে পূর্ব পাকিস্তান দখলে আহ্বান করা হয়েছে এবং এই ধারণাটির জন্মদাতা হচ্ছে ভারতীয় ও হিন্দু স্বার্থ। আইউবের মনকে ছয় দফা যেভাবে আবিষ্ট করে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তিনি এই উপলক্ষে গৃহযুদ্ধের ঘোষণা দেন।[১২] আইউব কি সত্যি সত্যি এই কার্যক্রমের জনপ্রিয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন? না কি তিনি তাঁর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভিত্তি রচনা করছিলেন?

আইউবের এই আবিষ্টতা কিন্তু সারা বছরব্যাপী অব্যাহত থাকে। রাওয়ালপিন্ডিতে ৫ এপ্রিল তিনি বলেন যে, এটি হলো সামান্য ক'জনের একটি উদ্ভট পরিকল্পনা।[১৩] আইউবের অতি প্রিয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা দিলেন যে, তিনি ছয় দফা নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চান। শেখ মুজিব সহজেই রাজি হলেন, তবে তাঁকে সেই সুযোগ আইউব আর দিলেন না। মে মাসের নয় তারিখে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো। ২০ মার্চ শেখ মুজিব ঢাকায় ছয় দফা নিয়ে প্রথম সভা করেন এবং বলেন যে ছয় দফা নতুন কিছু নয়, যুক্তফ্রন্টের একুশ

দফা (১৯৫৩) এবং আওয়ামী লীগের এগারো দফা (১৯৬৫), তার ওপর ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে ছয় দফা প্রণীত হয়েছে। এইটিই হলো পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ। পরবর্তী দেড় মাস তিনি সর্বত্র প্রচার করে বেড়ান। আর ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয় পুলিশি হয়রানি। এক শহর থেকে আর এক শহরে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করা হয় এবং জামিনের আবেদন ও আদালতে হাজিরা দিয়েই তাঁর কাটে বাকি বিশ দিন। অবশেষে তিনি এবং আরো অনেক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী বন্দি হলেন। কানাঘুষায় প্রকাশ পেল যে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। এই সময়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় তরুণ সম্প্রদায়। তারা হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার। বিচারপতি রহমানের এই কমিশন গঠন করা হয় শরীফ কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে। কিন্তু হামুদুর রহমান সুপারিশও ততো গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগই এতে ছিল না। মূলত ছাত্রদের উদ্যোগে ছয় দফার জন্য ১৯৬৬ সালের ৭ জুন হলো ঢাকায় গণবিক্ষোভ। এদিনে পুলিশি জুলুমের শিকার হলো ছাত্র শ্রমিক জনতা। প্রায় ৪১ জন মৃত্যুবরণ করে এবং সারাদেশে প্রায় এক হাজার ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফাকে বানচাল করা। তাতে সহায়তা করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এন.ডি.এফ এবং ভাসানী ন্যাপ। কিন্তু হিতে বিপরীত হওয়ার ফলে সরকারি জুলুম, আইউবের আস্ফালন এবং মোনেম খানের অত্যাচারই ছয় দফাকে জনপ্রিয় করে তোলে। পরবর্তীকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছয় দফার জনপ্রিয়তাকে আরো সুদূরপ্রসারী করে।

পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থ ছয় দফায় নিতান্তই ভয় পেয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি আয় আর থাকবে না। এমন কি একটি নিশ্চিত বন্দি বাজারও আর পাওয়া যাবে না। প্রশাসন বা ব্যবসা-বাণিজ্যে এতো বড় একটি উপনিবেশ আর শোষণ করা যাবে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক যে ইঙ্গিত পাওয়া গেল তা হলো অতিকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অপচয় আর চালানো যাবে না। পাকিস্তানে ক্ষমতার বিভাজনের একটি নতুন ব্যবস্থার আশঙ্কা হয়ে ওঠে অসহনীয়। যেভাবে হোক তাকে রুখতে হবে। কিন্তু ওখানেই হলো সমূহ ভুল। আওয়ামী লীগকে তারা যতো দমন করতে গেল ততোই তাদের কার্যক্রমকে আরো জনপ্রিয় করে তুললো। তারপর যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা অপবাদ চাপানো হলো দেশে যেন ঘটলো বিস্ফোরণ। বক্তব্য-সাক্ষ্যাতে বেরিয়ে এলো শোষণ ও অত্যাচারের ঘৃণ্য কাহিনী। আসামিদের জবানবন্দি হলো বাঙালির মুক্তির দাবিতে সোচ্চার। আইউবের পতন সত্যি হলো, কিন্তু ছয় দফা সফল হলো না। ১৯৭০-এর অবাধ নির্বাচনে ছয় দফা হলো বাংলাদেশের মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা। নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে পাকিস্তানি অনাগ্রহ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোককে সাহায্য করতে অনীহা আরো বুঝিয়ে দিল যে, বাঙালির সঙ্গে চলবার জন্য যে সহমর্মিতার প্রয়োজন পশ্চিম পাকিস্তানে তা মোটেই নেই। ১৯৭০-৭১-এর সাধারণ নির্বাচনে তাই ছয় দফা পেল ভোটদাতাদের ৮০ শতাংশের সমর্থন।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : *A History of the Freedom Movement,* Vol III-তে উদ্ধৃত, করাচি, ১৯৬১, পৃ. ১২৯।

২. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা : *Evolution of Pakistan,* নিখিল পাকিস্তান আইন সিদ্ধান্তাবলি ১৯৬৩, লাহোর, পৃ. ১৭০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।

৬. ১৯৫০ সালের মহাজাতীয় সম্মেলন ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে ৪-৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে লেখক সিলেট জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি (পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী) আতাউর রহমান খান। এই কনভেনশনের শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবাবলি দেখা যাবে : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড,* ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬৭।

৭. এ.কে. সেন : The Islamic State and other Political Grays । থেকার স্পিংক, কলকাতা, ১৯৫০। প্রবন্ধটি হচ্ছে 'The Unity of Federal Pakistan', পৃ. ২৩-২৬।

৮. এই প্রতিবেদন তিনি মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য পেশ করেন। জেনারেল আইউব খান এই মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থ *Friends Not Masters,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৬৭-তে এটি প্রকাশিত হয়, পৃ. ১৯।

৯. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিতর্ক-বিবরণী। *Official Reports,* ১৫ মার্চ, ১৯৬৬, করাচি, ১৯৬৬, পৃ. ৪৯৯।

১০. শেখ মুজিবুর রহমান : *Six Point Programme—Our Right to Live,* মুজিবনগর পুনর্মুদ্রিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১।

১১. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে আইউব ঘোষণা করেন, তিনি অবসর নেবেন এবং নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এই বক্তৃতায় তিনি এই স্বীকৃতিও প্রকাশ করেন। *পাকিস্তান অবজারভার,* ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

১২. এইসব অনেক সভায় যেখানে আইউব তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন সেখানে লেখক উপস্থিত ছিলেন এবং তেরো থেকে বাইশ মার্চের *পাকিস্তান অবজারভারে* এই সব উক্তি প্রকাশিত হয়।

১৩. *পাকিস্তান অবজারভার,* ৫ এপ্রিল ১৯৬৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইউবের সামরিক শাসন ও মহাপ্রলয়

পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হয় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার ষড়যন্ত্র। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা স্বাধীনচেতা বাঙালিদের সুচতুরভাবে দেশ-শাসন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখলেন। পাকিস্তান অর্জনে যে সোহরাওয়ার্দির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে বাদ দিয়ে নমনীয় খাজা নাজিমউদ্দিনকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হলো। সোহরাওয়ার্দিকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিবর্তে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা নেভাতে ব্রতী হলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক আগেই মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। দেশ-বিভাগকালে মুসলিম স্বার্থে তাঁর ব্যক্তিগত অবদান স্বীকৃত হলো না। তিনিও কিছুদিন কলকাতায় রয়ে গেলেন এবং পরে ঢাকায় এসে ওকালতি ব্যবসায় রত রইলেন। লিয়াকত আলীর প্রথম মন্ত্রিসভার নয়জন সদস্যের মধ্যে শুধু দু'জন ছিলেন বাঙালি। প্রশাসনে এবং দেশরক্ষায় বাঙালিরা তো এমনি কম ছিলেন উপরন্তু নতুন নিযুক্তিতে তারা কোনো অগ্রাধিকার পেলেন না।

ভারতীয় অনুপ্রবেশ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের আশঙ্কা

বাঙালিদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখবার জন্য পাকিস্তানিরা একটি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করলেন, বাঙালিরা সাদাসিধা এবং সহজেই হিন্দু ও কমিউনিস্ট প্রভাবের শিকার। সোহরাওয়ার্দির দোষ হলো তিনি যুক্ত বাংলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দি এবং কংগ্রেস নেতা শরৎ বোস যুক্ত বাংলার জন্য উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগ কংগ্রেস নেতা গান্ধী ও লীগ নেতা জিন্নাহ দু'জনেই অনুমোদন করেন। জিন্নাহর শর্ত ছিল, এই যুক্ত বাংলা ভারতের রাজ্য হতে পারবে না। শরৎ বোস অবশেষে কংগ্রেস দল ও মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন হারালেন। কিন্তু তাঁরা দুই নেতাই জোর প্রচেষ্টা

চালিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের মত পরিবর্তন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হিন্দু মহাসভার আপত্তির মুখে হিন্দু সমাজ যুক্ত বাংলার উদ্যোগকে ব্যাহত করলো।[১] মুসলিম সমাজের অবস্থান ছিল ভিন্ন। যুক্ত বাংলার উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও তারা বাংলা বিভাগে রাজি ছিল না। প্রাদেশিক পরিষদে যখন বাংলার ভাগ্য নির্ধারণের সময় এলো, তখন ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই ১০৬-৩৫ ভোটে মুসলমান প্রতিনিধিরা বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন। কিন্তু হিন্দু প্রতিনিধিরা বিভাগের পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। তখন প্রশ্ন উঠলো, ভারত না পাকিস্তানে কোথায় বাংলা যাবে। এবারে মুসলমান প্রতিনিধিরা পাকিস্তানে যোগ দেয়ার জন্য দেশবিভাগে রাজি হলেন। তাই তারা বাধ্য হয়ে যুক্ত বাংলার দাবি পরিত্যাগ করলেন।[২] এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে দুটো সত্য প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এক পাকিস্তানের ধারণাটি ছিল মন্দের ভালো, স্বাধীন বাংলা না হলে এই পরীক্ষা চালানো যেত। দ্বিতীয়ত, ভারত নিয়ন্ত্রিত না হলে যুক্ত বাংলায় বাঙালি মুসলমানরা সন্তুষ্ট ছিল। যদিও বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল নামমাত্র এবং হিন্দুরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে ছিল। তবু মুসলমানরা বিশ্বাস করতো যে তারা মিলেমিশে থাকতে পারবে। বাঙালি মুসলমানদের উদারতা ও অসাম্প্রদায়িতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বোধগম্য ছিল না, যদিও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য তারা ততটা উদগ্রীব ছিলেন না। অবশ্য ভারত ছেড়ে যারা পশ্চিম পাকিস্তানে যায় তারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র খুব জোরেশোরে চাইতো।

১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন খুব জোরদার হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটি ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক। দেশের ৫৬ শতাংশের ভাষা যদি রাষ্ট্রভাষা না হয় তাহলে চলবে কি করে আর উর্দু তো ৫ শতাংশেরও মাতৃভাষা ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানিরা এই আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা দেখতে পেল না, পরিবর্তে তারা অপবাদ দিতে শুরু করলো, এই আন্দোলন হিন্দু ও কমিউনিস্টরা শুরু করেছে এবং চালাচ্ছে। এমন কি যুক্তিবাদী জিন্নাহ্ও এই ধারণায় অটল ছিলেন। পরে যখন ১৯৫২ সালে এই আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগলো আবারও সেই উদ্ভট অপবাদ সামনে এসে গেল। বাংলাকে শেষাবধি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হলো ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের দুটো সংবিধানেই তা স্বীকার করা হলো, তবু বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে পাকিস্তান বিরত থাকলো। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চললো এবং বাংলাকে জানা বা শেখার কোনো প্রচেষ্টাই পাকিস্তানে দেখা গেল না। বাংলাকে তারা সবসময়ই ভারতীয় অনুপ্রবেশের এক রাস্তা বলে মনে করতো।

১৯৫৪ সালে যখন পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনের অভিযান চলছে তখনও পাকিস্তানিরা ভারতীয় প্রভাবের ভূতের সন্ধান পেল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে বলা হয়, মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং যুক্তফ্রন্ট পুরোপুরি হিন্দুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের অসংখ্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই একই শিবের গীত গাওয়া হয়।[৩] পাকিস্তানের এই মনগড়া ধারণা এবং অনমনীয় মনোভাবের ফলে বাঙালিদের প্রতি অন্যায় আচরণ এবং বঞ্চনার নীতি তাদের কাছে শুধু নির্দোষ ছিল না, বরং ছিল প্রয়োজনীয়।

আইউবের সামরিক শাসন

গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবরেই এক ধরনের সামরিক বা সংবিধান-বহির্ভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তবুও ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর যখন ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন ঘোষণা করলেন তা ছিল একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। আইউব খান অনেকদিন ধরেই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে এজন্য তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি গভীরভাবে পড়াশোনা করতেন, দেশের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনা করতেন। শাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজস্ব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। ২৭ অক্টোবর মির্জাকে বিতাড়ন করে তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সাড়ে তিন বছর একজন সদাশয় একনায়ক হিসেবে রাজত্ব করেন। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ করেন। উন্নয়নের স্বার্থে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের উপদেশে তিনি অনেকগুলো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্থাপন করেন। কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক পরিবহন সংস্থা, অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল সংস্থা এগুলো তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জেলা প্রশাসনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জোর দেন। ১৯৬০ সালে তিনি ভারতের সঙ্গে বিরোধিতা মিটিয়ে সিন্ধু পানি চুক্তি সম্পাদন করে বিকল্প বাঁধ ও খাল খননের কাজ শুরু করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমে ও পরে পশ্চিমে গ্রামীণ পূর্তকর্ম কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সীমিতভাবে ভূমি পুনর্বণ্টনেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি পাকিস্তানের জন্য ইসলামাবাদে নতুন রাজধানী শহর স্থাপনের কাজ শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; এতে পূর্ব পাকিস্তানের সনাতনী ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সঙ্গে আরো কিছু স্থানীয় শাসনের স্তর যুক্ত হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে এতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৬১ সালে তিনি মুসলিম পরিবার আইন প্রবর্তন করে ব্যক্তি আইনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন।

মৌলিক গণতন্ত্রে কেবল ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল, অন্যান্য স্তরে শুধু মনোনয়ন ছিল। দুই প্রদেশে ৪০,০০০ করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আইউব তাঁর একনায়কত্বে বৈধতা লাভের উদ্দেশ্যে গণভোটের ব্যবস্থা করেন। সম্রাট লুই তৃতীয় নেপোলিয়ন এই শঠতার মাধ্যমে ১৮৫২ সালে ফ্রান্সে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আইউবের ভোটদাতা হলেন ৮০,০০০ ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য এবং তাঁদের ৭৮,৭২০ জন ভোট প্রদান করেন। আইউব এই গণভোটে পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হতে চান এবং তাঁর কার্যক্রমে জনসমর্থন চান। ৭৫,২৮৩ ভোট পেয়ে আইউব পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি হলেন এবং রাজকীয় কায়দায় দেশকে সংবিধান উপহারের ম্যান্ডেট পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উপদেশ দেয়ার জন্য একটি সংবিধান কমিশন গঠন করেন। তবে সংবিধান প্রণয়নে তিনি কমিশনের সুপারিশ বা তাঁর আইন মন্ত্রীর উপদেশ নিলেন না। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ছিলেন কমিশনের সভাপতি এবং বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ছিলেন তখনকার আইন

মন্ত্রী। পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রসিদ্ধ আইনবিদ মনজুর কাদের প্রভুর হুকুমে তাঁর মনোমত সংবিধান রচনা করলেন এবং আইউব ১৯৬২ সালের মার্চে এই সংবিধান বলবৎ করলেন। তাতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন রহিত হলো, সংসদীয় গণতন্ত্র পরিত্যক্ত হলো এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বানচাল হলো। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ৮০,০০০ সদস্য হলেন প্রাদেশিক পরিষদ, জাতীয় পরিষদ এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটদাতা, রাষ্ট্রপতি হলেন সব ক্ষমতার উৎস, তিনি তাঁর ইচ্ছায় প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করবেন এবং গভর্নরের মন্ত্রিসভা অনুমোদন করবেন, তিনি একই সঙ্গে তাঁর নিজের মন্ত্রিসভাও গঠন করবেন। একনায়কত্বকে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়ার এই উদ্যোগ সহজে গৃহীত হলো না। আইউবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বেলুচিরা আগেই যুদ্ধ করেছে এবং নির্দয়ভাবে অবদমিত হয়েছে। এবারে প্রতিবাদ এলো মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। আইউব চীনের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোতে বামপন্থীরা কিন্তু তাঁর বিরোধিতায় বিরত থাকলো। মুসলিম লীগের সব গোষ্ঠীই আইউবকে লুফে নেয়ার জন্য বসে রয়েছিল। সুতরাং প্রতিবাদ এলো আওয়ামী লীগ থেকে এবং আইউব ৩০ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে গ্রেফতার করলেন। অভিযোগ হলো সেই পুরনো অপবাদ : দেশশত্রু (ভারত ও হিন্দু)-দের সঙ্গে দহরম-মহরম বা ষড়যন্ত্র।[৪] ঢাকা প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। ছাত্রমহলে আইউবের মন্ত্রী মনজুর কাদের এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো খুব নাজেহাল হলেন। আইউবের গভর্নর জেনারেল আজম খানও আইউবের ওপর বিরূপ হয়ে পদত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর আইনমন্ত্রী বিচারপতি ইব্রাহিম, যিনি সংবিধান রচনায় অসহযোগিতা করেন, তিনিও পদত্যাগ করলেন। আইউব পুলিশি জুলুম চালিয়ে এবং সুবিধাবাদীদের জোট গঠন করে পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করলেন। ৮০,০০০ প্রতিনিধিদের দিয়ে মনোনীত প্রার্থী নির্বাচন করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। পরিষদ ডেকে ১৯৬২ সালের ৮ জুনে আইউব সামরিক শাসন তুলে দিয়ে সাংবিধানিক শাসন বহাল করলেন। জাতীয় সংসদের বাঙালি সদস্যরা শুরুতে সংবিধানের খানিকটা গণতন্ত্রায়ণে জোর দেন; কিন্তু ধীরে ধীরে আইউব ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের বিরোধিতা কাটিয়ে ওঠেন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, যিনি সবসময়ই স্বেচ্ছাচারের দোসর ছিলেন, এবারেও হলেন আইউবের দালাল। তাঁরা মন্ত্রিসভা গঠন করলেন এবং কনভেনশনপন্থী হিসেবে মুসলিম লীগকে পুনর্গঠন করলেন। আইউব হলেন এই দলের নেতা।

আইউবের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিলেন সোহরাওয়ার্দি। তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই বিরোধী মোর্চা গঠনে ব্রতী হলেন। তিনি অভিমত দিলেন যে, ন্যূনতম দাবি নিয়ে মোর্চা গঠন করে ঐক্য বজায় রাখা প্রয়োজন। তাই কোনো দল পুনর্গঠন না করে তিনি গড়লেন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ। তাদের দাবি হলো গণতন্ত্রায়ণ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। তার অবশ্য আনুষঙ্গিক কারণও ছিল। একই সময়ে শরিফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিয়ে নানা

সমস্যা দেখা দেয়। শরিফ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে, স্নাতক শিক্ষাকাল দীর্ঘায়িত করে এবং পরীক্ষার মান কঠোর করে। সবচেয়ে আপত্তিকর ছিল ১৯৬২ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশ বছরের ঐতিহ্যে শক্ত আঘাত লাগে। শিক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্র এবং নেপথ্যে শিক্ষকরা সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এনডিএফ-এর গণতন্ত্রায়ণ আন্দোলন আর ছাত্রদের কালাকানুন-বিরোধী আন্দোলন যৌথভাবে এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করে। আজম খান গভর্নর পদ ছেড়ে দিলে সেখানে স্থলাভিষিক্ত হন গোলাম ফারুক। পাঠান এই কৃতিৎকর্মা ব্যক্তি রেলওয়ের একজন সফল কর্মকর্তা হিসেবে নাম করেন। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার প্রধান হিসেবে বেশ কৃতিত্ব ও সম্পদের অধিকারী হন। সোহরাওয়ার্দি পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে সমঝোতার একটি প্রচেষ্টা নেন, কিন্তু তাঁর সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দ হলো না। গোলাম ফারুক রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে অক্টোবর মাসে পদত্যাগ করেন। এবারে আইউব একজন জেলা পর্যায়ের নেতা, যিনি কূটবুদ্ধিতে খুবই পারদর্শী ছিলেন, তাঁকে গভর্নর মনোনীত করলেন। আবদুল মোনেম খান ছিলেন অত্যন্ত প্রভুভক্ত মানুষ। প্রলোভন দিয়ে, ভয় দেখিয়ে এবং যত্রতত্র কোন্দল সৃষ্টি করে তিনি কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রভাব বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। নিগ্রহ বলের প্রয়োগ এবং বিভিন্ন মহলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলে নিরলস উদ্যোগ চালিয়ে যান। আইউবের সৌভাগ্য যে তিনি এইরকম একজন প্রভুভক্ত সত্যিকার অর্থে গ্রাম্য মোড়লের সেবা লাভ করেন। তবে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য ছিল ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির হৃদরোগ। প্রায় সারা বছরই তিনি অসুস্থ থাকেন এবং ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। সোহরাওয়ার্দির অনুপস্থিতি আইয়ুব-বিরোধী মোর্চাকে প্রথমে দুর্বল করে এবং তাঁর মৃত্যুর পর মোর্চাটি ভেঙে যায়।

মওলানা ভাসানী এনডিএফ-এর আন্দোলনের সমর্থনে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে মুক্তি পান। আইউবের চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের উদ্যোগে প্রীত হয়ে তিনি আইউবের সমর্থক এবং প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আইউব সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ১৯৬৩ সালের আগস্টে চীন ভ্রমণে যান। এনডিএফ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় মোনেম খান খালি মাঠে কনভেনশন লীগকে দুর্দমনীয় করে তুলতে প্রয়াস পান। এই সময় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলে। সোহরাওয়ার্দির মৃত্যুর পর এই বিষয়ে দলে কিছু দ্বিমত দেখা দেয়। বৃহত্তর অংশ ১৯৬৪ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ হন দলের সভাপতি। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এতে ক্ষুণ্ন হয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এনডিএফ-এ থেকে গেলেন। বিরোধী নেতৃবৃন্দের ওপর গভর্নর মোনেম খান জোরজুলুম বহাল রাখলেন। এই সময়ে এলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পালা। আইউবের বিরুদ্ধে সমবেত হলো সংযুক্ত বিরোধী দল কেপ বা Combined

Opposition Party) এবং তারা জিন্নাহ সাহেবের বোন ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনীত করে। পরোক্ষ নির্বাচনের সুযোগে ১৯৬৫ সালের ৭ জানুয়ারিতে আইউব নির্বাচিত হলেন। অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী (ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য) আইউব বিরোধিতার শপথ নিয়ে নির্বাচন বৈতরণী পার হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সরকারি উৎকোচ ও ভীতির মুখে সহজেই আইউবের পক্ষে ভোট দেন। তবুও আইউব সামান্য ব্যবধানে নির্বাচিত হন। ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে পান ১৮,৪৩৪ ভোট এবং আইউব ২১,০১৩ ভোট। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ফাতেমা জিন্নাহ পান মাত্র ১০,২৫৭ ভোট আর আইউব ২৮,৯৩৯ ভোট। এই নির্বাচনে বিরোধী গোষ্ঠী পরাজিত হবে বলে নিশ্চিত ছিল, তবে আইউবকে কাঁপিয়ে দেয়ায় তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর আইউব সহজেই তাঁর পাইক বরকন্দাজদের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পার পাইয়ে দেন। তাছাড়া বড় বড় বিরোধী নেতৃবৃন্দ বেশির ভাগই আইউবের এবডোতে (Elective Bodies Disqualification Ordinance) ঘায়েল হয়ে নির্বাচনী লড়াইতেই নামতে পারলেন না। আইউবের স্থিতিশীল শাসনের একটি প্রধান ভিত্তি ছিল বৈদেশিক সাহায্য। মার্কিন সামরিক সাহায্যে সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতার বাইরে রেখেও সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব হয়। মোটা দাগের অর্থনৈতিক সাহায্য অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন না করেই উন্নয়ন উদ্যোগ বলবৎ করতে সাহায্য করে। কিন্তু চীন-ভারত যুদ্ধ আইউবের আন্তর্জাতিক অবস্থানে পরিবর্তন নিয়ে এলো। সামরিক সাহায্যের জন্য ভারতের মার্কিন অনুগ্রহ লাভ আইউবকে খুব বিচলিত করে। আইউব এই যুদ্ধে কোনো পক্ষ না নিয়ে চীনের সঙ্গে পূর্বেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখেন। একই সময়ে ভারতের সঙ্গে কাশ্মির সমস্যা সমাধানেরও উদ্যোগ নেন। এই উপলক্ষে কাশ্মির বিভাগ, কনফেডারেশন, কোনো রকমের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান— এইসব নানা বিকল্প আলোচিত হলো। কাশ্মিরি নেতা শেখ আবদুল্লাহও পাকিস্তানে আলোচনার জন্য এলেন; কিন্তু ১৯৬৩ সালের মে মাসে পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যুতে কাশ্মির সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা তিরোহিত হলো। ১৯৬৪ সালে আইউব রাজনৈতিকভাবে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হন, তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জিতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। তিনি মার্চ মাসে চীনে গিয়ে সীমান্ত চুক্তি করে এলেন, এপ্রিল মাসে সোভিয়েত রাশিয়ায় গেলেন। রাশিয়ায় এই ছিল পাকিস্তানের কোনো রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের প্রথম সফর। এই সফরে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের শীতলতার অবসান হলো, তবে আমেরিকা অভিমান করে আইউবের আমেরিকা সফর পিছিয়ে দিল। এই সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টো ও সেনাধিনায়ক মুসার নির্বোধ উস্কানিতে আইউব মারাত্মক একটি ভুল করে বসলেন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে কচ্ছের রান এলাকায় পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের কোণঠাসা করে এবং এই মনোমালিন্যের সমাধান হয় জুলাই মাসে বৃটেনের মধ্যস্থতায়। ভারতীয়রা প্রতিশোধের অপেক্ষায় ছিল এবং পাকিস্তানিরা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এর মধ্যে নিহিত ছিল সেপ্টেম্বরের সতেরো দিনের পাক-ভারত কাশ্মির যুদ্ধের বীজ। পাকিস্তান কাশ্মিরে অভ্যুত্থানের জন্য গেরিলা প্রেরণ করে এবং

প্রয়োজনে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। গোটা পরিকল্পনা ছিল ভ্রান্ত কৌশল ও অহেতুক আত্মশ্লাঘার ওপর ভিত্তি করে। আগস্ট মাসেই তৎপরতা শুরু হয়, তবে যুদ্ধ বাধে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। ভুট্টোর ভুল হিসেব ও কৌশল এবং মুসার অপদার্থ পরিচালনায় পাকিস্তানের ভরাডুবি হয়। যুদ্ধ রসদ ও তেলের অভাবে মুসা এবং ভুট্টোর তাড়নায় আইউবকে অসম্মানজনক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে হলো। যুদ্ধ বাধলে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি পাকিস্তানের সাহায্যে আসতে রাজি হলো না। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সেনাপতিরা এবং ভুট্টো মিথ্যা প্রচারণা ও বাহাদুরি করে চললো।[৫] সব দোষ পড়লো আইউবের ওপর। সেনাবাহিনী তাঁর ওপর ক্ষুণ্ন, জনগণ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানে হলো অন্যরকম প্রতিক্রিয়া। সতেরো দিনের বিচ্ছিন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তা স্বায়ত্তশাসনের দাবি সামনে নিয়ে এলো। আইউব শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় রাজি হলেন, বৃটেন বা আমেরিকা কোনো ভূমিকা নিতে রাজি হলো না। তাসখন্দ চুক্তিতে দুই দেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হলো; কিন্তু কাশ্মির কোনো বিশেষ নজর আকর্ষণ করলো না। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে আইউবের আত্মবিশ্বাস তেমন ছিল না। তিনি তাসখন্দ চুক্তির মাহাত্ম্য প্রচারে নামলেন, বোঝাতে চাইলেন যে চিরস্থায়ী শান্তির জন্য এই চুক্তি দুই দেশে একটি প্রক্রিয়া চালু করবে। তিনি দেশব্যাপী জনসংযোগে বেরুলেন, একই সময় শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করলেন। ছয় দফা আক্রমণ হলো আইউবের হৃত সম্মান উদ্ধারের একটি উপায় বিশেষ। আইউবের প্রচার বেশ কার্যকরী হয়, তাসখন্দ চুক্তি মোটামুটিভাবে দেশব্যাপী গৃহীত হয়। শেখ মুজিবও তাসখন্দ চুক্তিকে গ্রহণ করলেন, তবে মন্তব্য করলেন যে, কাশ্মিরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বোকামির খেসারত হিসেবে তাসখন্দ চুক্তি ছিল অপরিহার্য।[৬] আইউব তাঁর অবস্থান দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ব্যর্থতার হোতা পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টোকে বরখাস্ত করেন। ভারসাম্য বজায়ের জন্য যুদ্ধে যারা সাহায্য করে নি সেই মার্কিন শক্তির মদদপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ শোয়েবকেও অব্যাহতি দেন। ১৯৬৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে আইউব তাঁর অবস্থান দৃঢ় করে পরবর্তী নির্বাচনের চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আইউব রাজনীতিবিদদের পছন্দ করতেন না, তিনি বস্তুতই একটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চান। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি বিশেষ বিরোধিতা আশা করেন নি। বেলুচিরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের কঠোর হাতে দমন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের দল আওয়ামী লীগ তাঁর খুবই অপছন্দ ছিল। ৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকশ' নেতাকে গ্রেফতার করা হয়, যাঁদের মধ্যে কিছু আমলাও ছিলেন। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবও গ্রেফতার হন ১২ অক্টোবর। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে মওলানা ভাসানীকে কারামুক্ত করে নজরবন্দি করা হয় এবং ১৯৬২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই ছিল তাঁর অবস্থান। এই সময়ে তিনি

আইউবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু তারপর শুরু হলো তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দিয়ে জুলুম। এক সময় আইউব তাঁর জীবিকা নির্বাহের পথও বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। শেখ মুজিব তখন আলফা বীমা কোম্পানিতে চাকরি করতেন; আইউবের ইঙ্গিতে এই কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলে। এ ক্ষেত্রে প্রদেশপাল জেনারেল আজমের স্বতোপ্রবৃত্ত হস্তক্ষেপে এই অনাচার বাধাপ্রাপ্ত হয়।[৭] ছয় দফা ঘোষণার পর আইউব শেখ মুজিবের পেছনে লাগেন এবং ১৯৬৬ সালের মে মাসে তাঁকে গ্রেফতার করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি আইউব সরকার নাটকীয় ঘোষণা দেয় যে, সরকার একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই ঘোষণায় বলা হয়, ভারতীয় সামরিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় কতিপয় বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর আগে পহেলা জানুয়ারিতে এক গুরুত্বহীন সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলার খাতিরে আটাশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ জানুয়ারির ঘোষণায় এই আটাশজনের নামও প্রকাশ করা হয়। এরা ছিলেন কতিপয় রাজনৈতিক কর্মী, দুইজন উর্ধ্বতন আমলা, কতিপয় সামরিক অফিসার ও অন্যান্য সৈনিক। ১৮ জানুয়ারি পরবর্তী ঘোষণায় এঁদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং তাঁদেরকে আর্মি, এয়ারফোর্স ও নেভি আইনে সামরিক হাজতে নেয়া হয়। এই দিনেই শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলায় জড়ানো হয়। স্মরণ করা যায় যে, তাঁকে ১৯৬৬ সালের ৯ মে-তে ডিফেন্স অব পাকিস্তান আইনে গ্রেফতার করা হয়। ষড়যন্ত্রের গল্পটি ছিল যে, ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একজন নেভি অফিসার লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ সাহেবের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছেদের কথা আলোচনা করেন। এই অফিসার এবং আরো কতিপয় ব্যক্তি ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে পিএন ওঝা নামের একজন কূটনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ষড়যন্ত্রকারীরা ভারতীয় সামরিক অফিসার লে. কর্নেল মিশ্র ও মেজর মেননের সঙ্গে ভারতের আগরতলায় দেখা করেন।[৮] গোটা গল্পের ভিত্তি ছিল এগারোজন রাজসাক্ষীর বয়ান এবং একজন রাজসাক্ষীর কাছে পাওয়া কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ব্যক্তিগত ডায়েরি। মজার ব্যাপার হলো যে, এই ডায়েরিতে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম নেতা সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখেন অথচ এই ডায়েরিটি ছিল একজন রাজসাক্ষীর হেফাজতে। আর একটি মজার ব্যাপার হলো, পুরো ষড়যন্ত্র ছিল নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে, যাঁদের অনেকেই ছিল অবসরপ্রাপ্ত। এতো বড় একটি অভ্যুত্থানের জন্য এতো নিম্নশ্রেণীর প্রস্তুতি! মামলাটি এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রধান কৌসুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল মনজুর কাদেরকে নাকি গোটা গল্প ও কৌশল বদলাতে হয়। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে এই বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়। প্রথমেই কতিপয় সামরিক ব্যক্তি ও দু'জন সিএসপি অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি তখন খুবই গোপনীয় ছিল এবং দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া আর কেউ কিছুই

জানতো না। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান ব্রিগেডিয়ার আকবর বিষয়টি অনুসন্ধান করেন ও মামলা তৈরি করেন। এই ব্রিগেডিয়ারই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে গণহত্যা বিষয়ে ইয়াহিয়ার শ্বেতপত্রের মিথ্যাচারের রচয়িতা ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আকবরের ষড়যন্ত্র মামলার কল্পকথাও ইয়াহিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় (তখন তিনি সেনাধিনায়ক) লালিত হয়। ইয়াহিয়া শুরুতেই শেখ মুজিবকে এই মামলায় জড়াতে চান। কিন্তু প্রথম যখন বিষয়টি উচ্চপর্যায়ে আলোচিত হয় তখন এই ধারণাটি বাদ দেয়া হয়।[৯] এই আলোচনায় অংশ নেন দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রিয়ার এডমিরাল এ. আর. খান, আইন মন্ত্রী এসএম জাফর, স্বরাষ্ট্র সচিব এবি আওয়াল, সেনাধিনায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, গোয়েন্দা প্রধান ব্রিগেডিয়ার আকবর, তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও তথ্যসচিব আলতাফ গওহর এবং প্রেসিডেন্ট আইউব ও তাঁর মুখ্যসচিব। মামলা সাজানোর পর বেসামরিক গোয়েন্দা প্রধান এন.এ. রাজভিকে মামলা পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা হয়। ডিসেম্বরে যেদিন প্রথম ধরপাকড় শুরু হয় সেদিন আইউব খান প্রদেশপাল মোনেম খানসহ দক্ষিণ বাংলায় হাওয়াই সফরে যান এবং এই সফরকালেই প্রেসিডেন্ট আইউব মোনেম খানকে এই বিষয়ে অবহিত করেন।[১০]

এই ব্যাপারটা নিয়ে শুরু থেকেই একটি গুমোট অবস্থা বিদ্যমান ছিল।[১১] রাজনীতিবিদ বা আমলারাও এ নিয়ে বিশেষ আলাপ-আলোচনা করতেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয় ১৯৬৮ সালের ২৬ জানুয়ারি, ততোক্ষণে দুটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়ে গেছে। আলোচনা ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। আইউব দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, এইরকম একটি ষড়যন্ত্র দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বেসামরিক-সরকারি কর্মকর্তাদের এতে সম্পৃক্তি তাঁকে খুব পীড়িত করেছে। তিনি দেশরক্ষা মন্ত্রীকে এ বিষয়ে আর একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিতে বললেন এবং এ ব্যাপারে আর বেশি কেঁচো না খুঁড়তে বললেন। মামলা কিছুদিন পরেই শুরু হলো। ২১ এপ্রিল গঠিত বিশেষ আইনে একটি বিশেষ আদালতে এই মামলা বিচারের ব্যবস্থা হলো। এই আইনের (Criminal Law Amendment Special Tribunal, Ordinance VI, 1968) কতগুলো বিশেষ ধারা ছিল নিম্নোক্ত : সাধারণ সাক্ষ্য আইনের সংশোধন করে বলা হয় যে, পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি আইনত সাবুদ হবে। আসামিদের কোনো জামিন দেয়া যাবে না এবং তাঁদেরকে সামরিক হেফাজতে রাখা হবে। বিশেষ আদালতের এখতিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। মনে হয় যে, এইসব বিশেষ বিধান না করলে মামলা টিকবে না বলেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিশেষ আদালতের সভাপতি হলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারক বিচারপতি এসএ রহমান এবং সদস্য হলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মকসুমুল হাকিম ও মুজিবুর রহমান খান। মামলা হলো ৩৫ জন আসামির বিরুদ্ধে, তিনজন সিএসপি অফিসার, মেজর ও নিম্ন পদাধিকারী নয়জন সামরিক অফিসার, কতিপয় রাজনৈতিক কর্মী এবং নিম্নপদের সামরিক কর্মচারী। তাঁদের ফর্দ পরিশিষ্ট ৫-এ দেয়া হলো।

এতে কোনো ভুল নেই যে বাঙালিরা পাকিস্তানের শুরু থেকেই শোষিত হয় এবং

তাই ক্রমে ক্রমে পাকিস্তান-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যেসব সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ করতো তাঁরা একটু বিশেষভাবে এই বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন হতো। সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য ছিল খুব বেশি এবং পাকিস্তানিরা নিম্নপদস্থ বাঙালিদের খুব হেনস্তা করতো। স্বাভাবিকভাবেই তাই যে-কোনোভাবে পাকিস্তানের কুক্ষি থেকে মুক্তির বাসনা বাঙালি সরকারি চাকুরে মহলে ছিল অত্যন্ত প্রকট; রাজনীতিবিদদের চেয়ে কয়েক ধাপ ওপরে। অবশ্য সামরিক অফিসার মহলে এইসব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ব্যক্তিরও কোনো অভাব ছিল না। অনেকেই দেশের রাজনীতি বা অর্থনীতির গতিবিধি নিয়ে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ ও নিরুৎসাহী। তবে কিছু বাঙালি সামরিক ব্যক্তি যে দেশ-বিভাগের জন্য উদগ্রীব ছিল তা অনস্বীকার্য। তাঁদের অনেকেই রাজনীতিবিদ বা আমলাদের কাছে যায় সমর্থন আদায় করে মানসিক শান্তি পেতে। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো আর এক ধাপ এগিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। তবে একটি রীতিমতো বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্র ছিল পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর বানোয়াট কাহিনী। দুই অঞ্চলের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হলে স্বভাবতই বিচ্ছেদের প্রশ্ন সামনে এসে পড়তো এবং এতে সচেতন খুব কম বাঙালিই সমর্থন দিতে বিরত থাকতো। কিন্তু এরকম আলোচনা এবং বস্তুত একটি সশস্ত্র বিপ্লবের নীলনকশার মধ্যে দূরত্ব ছিল বিরাট। কিন্তু সরকার-বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য উর্বর-মস্তিষ্ক পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী আগরতলা ষড়যন্ত্র বস্তুতই আবিষ্কার করে। সামরিক আইন জারি হওয়ার পরপর ভারতের সাহায্যে দেশ স্বাধীন করার কথা কোনো কোনো মহলে আলোচিত হয়। কিন্তু শেখ মুজিব তাতে সাড়া দিতে বিরত থাকেন। ১৯৬৩ সালে আবার যখন আইউব-বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে তখন নাকি শেখ মুজিব আগরতলা গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ঘটনার সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কোনো সংযোগ গোয়েন্দা বাহিনীও করে নি। মামলার আর একটি দুর্বলতা ছিল যে, ষড়যন্ত্রকালের পুরো সময়টিই শেখ মুজিব বন্দিশালায় ছিলেন বলে এর পরিচালনায় তাঁর অবদান প্রমাণ করা কষ্টকর হয়। সর্বোপরি পুরো মামলা ছিল ক্ষমাপ্রাপ্ত এগারোজন রাজসাক্ষীর বক্তব্যভিত্তিক। উন্মুক্ত আদালতে তাঁদের অনেকেই তাঁদের স্বীকারোক্তি জোর করে আদায় করা হয়েছে বলে দাবি করেন এবং একজন (কামালুদ্দিন) তো রীতিমতো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন। আদালত তাঁকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করে ও মুক্তি দেয়। এই ষড়যন্ত্র মামলার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির কাজ শুরু হয় ছয় দফা ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আইউব খান যেভাবে ছয় দফার পেছনে লাগেন তাতে তাঁকেই এই ষড়যন্ত্র মামলার হোতা বলে বিবেচনা করা যায়। ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে আইউব বলেন, বিদেশিদের প্রভাবে বাঙালি আমলারা সব বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে যাচ্ছে। এরই জের টেনে ১৯৬৭ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি বলেন, হিন্দুদের হাতে মুসলমানরা যেভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে সেই ইতিহাস ভালো করে সামনে নিয়ে আসা উচিত; তা হলে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারায় বাধা আসবে। ১৯৬৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় অর্থনৈতিক

কাউন্সিলের অধিবেশন হয়, ঐ সময়েই আগরতলা মামলার ধরপাকড় শুরু হয়। এই সভায় বৈষম্যের কথা ওঠায় আইউব অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং বলেন যে, বৈষম্যের কথা বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা প্রচার করা হয় এবং এটা কঠোরভাবে দমন করতে হবে। তিনি এতোই চটে গিয়ে বলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় নুরুল আমিন বা ড. মির্জা নুরুল হুদা সত্যিকারভাবে কি এক পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন। আইউব অনেক দিক দিয়ে অগ্রসর দেশনেতা ছিলেন কিন্তু বাঙালিদের সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা ছিল প্রচণ্ড এবং আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা ছিল তার পরিচয়-চিহ্ন। আগরতলা ষড়যন্ত্র যেদিন মন্ত্রিসভায় প্রথম আলোচিত হলো তার দু'একদিনের মধ্যেই আইউব অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদিও মার্চ মাসে তিনি সুস্থ হন কিন্তু রীতিমতো কাজ শুরু করতে এপ্রিল পেরিয়ে যায়। আগরতলা মামলা নিয়ে আইউব তাঁর বাঙালি মন্ত্রীদের ওপর খুব ক্ষুণ্ন ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, তাঁরা সাহস করে কেউ কিছু বলছেন না। তাঁদের অবশ্য দোষ বড় ছিল না, কারণ তাঁরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না। এই মামলা সম্বন্ধে একমাত্র সামরিক বাহিনীই ছিল খুব উৎফুল্ল। তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ অকাট্য, মামলায় সব আসামির শাস্তি হবে এবং রাজনৈতিকভাবে সরকারের বিরোধিতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মামলা ঘোষণার পর যে থমথমে ভাব ও ভীতির সঞ্চার হয় তাতে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিবাদ গড়ে উঠলো না। প্রথম প্রতিবাদ উঠলো প্রবাসী বাঙালি মহলে যুক্তরাজ্যে এবং তারপর ছাত্রমহলে এবং প্রকাশ্য বিচারের দাবি উঠলো। প্রকাশ্য বিচার সরকারও চায়, কারণ তারা মনে করে এতেই বিরোধী দলকে ভালো করে ঘায়েল করা যাবে।

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকার সেনাছাউনিতে মামলা শুরু হলো, প্রচারের জন্য বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমকে দাওয়াত করা হলো। সূচনা বক্তব্য হলো বিস্তৃত। সরকার মনে করে যে, এমন বিবৃতি জনগণকে বিরোধী শক্তির শত্রুতে পরিণত করবে, ষড়যন্ত্রকারীদের তারা ঘৃণা করবে। সামান্য বিরতির পর শুরু হলো সরকারি সাক্ষীদের পরীক্ষা। রাজসাক্ষীরা যখন বৈরী হতে থাকলো তখন কিন্তু প্রতিবাদ সোচ্চার হতে থাকলো। মওলানা ভাসানীও প্রতিবাদে শামিল হলেন। প্রচার বস্তুতপক্ষে সরকারের উল্টোদিকে গেল। আইউবের মন্ত্রী খান আবদুস সবুর একদিন ব্যক্তিগত পর্যায়ে মন্তব্য করেন, 'প্রকাশ্য বিচার বস্তুতই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচার করছে।' প্রথমদিকে বিবাদি পক্ষে উকিল পাওয়াই মুশকিল ছিল, কিন্তু ক্রমে সবাই সাহস সঞ্চয় করেন এবং এই সাহস সঞ্চারে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা রাখে শেখ মুজিবের বীরোচিত ব্যবহার, নির্লিপ্ত উপস্থিতি এবং সবসময়ে সাহসিকতার নিদর্শন। ২২ আগস্ট ও ২৬ নভেম্বর মামলাটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়। প্রধান সরকারি কৌসুলি মনে করেন যে, অর্ধেক আসামি শাস্তি পাবে, তবে শেখ মুজিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের সংযোগ সাধনে বেগ পেতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা যে চাপা পড়বে এবং আওয়ামী লীগ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। ধারণা করা হয় যে, ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাসেই মামলার নিষ্পত্তি হবে। সুতরাং ১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট

আইউবকে ঠেকানোর কোনো সুযোগই থাকবে না। সরকার পক্ষ দুশোর বেশি সাক্ষী হাজির করে এবং ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত করে। তারপরে শুরু হয় আসামিদের জবানবন্দি ও সওয়াল-জবাব। আসামিদের জবানবন্দি আরো শক্তভাবে ষড়যন্ত্র মামলার অসারতা জনসমক্ষে তোলে ধরে। এর মধ্যে অবশ্য রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম হয়ে ওঠে এবং বিশেষ আদালত প্রায় বাধ্য হয়েই ১৭ ফেব্রুয়ারিতে শুনানি মুলতবি করে। কয়েকদিন পরেই[২১] আইউব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ঘোষণা দেন এবং পরের দিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ হয়। অবশ্য ইতোমধ্যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় এবং আর একজন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে গুরুতরভাবে আহত করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল বাঙালি বিরোধিতাকে দমন করবার জন্য সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কিন্তু মামলাটি সামরিক সেনানায়কের ক্ষমতার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে ইন্ধন যোগায় এবং ছয় দফা কার্যক্রমকে বাংলাদেশের ম্যাগনাকার্টায় পরিণত করে। এই মামলা শেখ মুজিবকে এক বিরাট দলীয় নেতার আসন থেকে সারা দেশের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্দেশ্যটি কি ছিল? বামপন্থী লেখক তারেক আলীর মতে এই মামলাটি বানোয়াট এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ।[২২] পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভরাডুবি করা ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, বাঙালিদের সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়ন করে সামরিক বাহিনীতে নিরঙ্কুশ পাঞ্জাবি প্রাধান্য বজায় রাখা ছিল আর একটি লক্ষ্য। সর্বশেষে দুই অংশের জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতা ও বিভেদ রচনা করা ছিল অন্য উদ্দেশ্য। এই রকম পরিস্থিতিতে কায়েমি স্বার্থবাদ তার দখল বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সামরিক শক্তিকে নির্বিবাদে দেশ শাসনের সুযোগ করে দেয়াই ছিল এই মামলার উদ্দেশ্য, আইউব সম্ভবত তাতে একটি ঘুঁটি হিসেবে বিবেচিত হন।

আইউবের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানকে রীতিমতো উত্তপ্ত করে তোলে। তবে মামলা শেষ হওয়ার আগেই সারা দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থান ঘটে যায়। ১৯৬৮ সালের ৭ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় এই প্রতিবাদ এবং ৩০ জানুয়ারির মধ্যে এটি দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। পঁচিশ মার্চে ফিল্ড মার্শাল আইউব পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২'র শুরু পর্যন্ত আইউব যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে তিনি কৃতিত্বের ভূমিকা রাখেন। ১৯৬২ সালে রাজকীয় কায়দায় দেশকে সংবিধান উপহার দিতে গিয়ে এবং তাঁর নিজস্ব নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি প্রথম বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁরই পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরিষদ তাঁর ক্ষমতা খর্বের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রলোভন ও ভীতি এই অস্ত্র দুটি ব্যবহার করে তিনি যথেষ্টসংখ্যক সহযোগী

সৃষ্টিতে সক্ষম হন। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণতন্ত্রের শেষ পরীক্ষায় দেখা গেল যে, আইউব এবং তাঁর পদ্ধতিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরানো যাবে না। পরোক্ষ নির্বাচন, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা এবং অর্থ বিষয়ক দুর্নীতির চাপে জনমতের অবাধ প্রকাশ হলো দুঃসাধ্য। আইউবের দুর্ভাগ্য যে, কিছু হঠকারী রাজনীতিবিদ ও সেনাপতির কুহকে তিনি পাক-ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মর্যাদা হারালেন। এই যুদ্ধই তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার সম্মুখীন করে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে এলো তাঁর অসুস্থতা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় চার মাস তিনি ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁর অসুখের সময় সাংবিধানিক ধারা ব্যাহত হয়, স্পিকার কখনো ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান পেলেন না এবং সামরিক বাহিনীই রইলো দেশের নিয়ন্তা। আরোগ্য লাভের পর দেখা গেল যে, ক্ষমতা ছাড়ার তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই বরং পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধিতার টুঁটি চাপতে ষড়যন্ত্র মামলার ওপর জোর দেয়া হলো।

কি কারণে আকস্মিকভাবে আইউবের তাসের ঘর ধসে পড়লো—এই প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। দশ বছর ক্ষমতায় থেকে আইউব নিশ্চয়ই অনেক ভালো কাজ করেছেন। তাঁর পতন ছিল তার প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য। অনেকগুলো বিষয় সম্মিলিতভাবে তাঁর পতনের পথ প্রশস্ত করে। তাঁর পরিবারের লোভ ও দুর্নীতি তাঁর সুনামকে অনেকাংশে খর্ব করে। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা রাতারাতি বড়লোক বনে যান। অনেকে সন্দেহ করে যে, তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত ছিলেন। সোয়াতের মতো হাজারায় একটি ক্ষুদে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বেশ চালু হয়। প্রসঙ্গত সোয়াতে তাঁর দুই মেয়েরও বিয়ে হয়। তাঁর সহচরদের দুর্নীতি নিয়েও প্রচুর কানাঘুষা ছিল। অনেকগুলো অর্থনৈতিক দুর্যোগও অভ্যুত্থানের পক্ষে যায়। বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর দেশে সহসা সম্পদের টান পড়লে সরকার খুব বিপাকে পড়ে। পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং এজন্য মনে করা হতো যে, মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ থাকলে প্রবৃদ্ধির হার উঁচু হবে। সামাজিক সমতার প্রশ্ন সম্পদ বাড়লে পরে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু এই উন্নয়ন নীতির ফলে দেখা গেল যে, চাষী গরিব হচ্ছে আর শ্রমিক মালিক দ্বারা শোষিত হচ্ছে। উন্নয়ন কৌশলের দার্শনিক অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক জানালেন যে, শিল্প সম্পদের ৬৬ শতাংশ, ব্যাংক পুঁজির ৮০ শতাংশ এবং বীমা ব্যবসার ৯৭ শতাংশ মাত্র বাইশটি পরিবারের হাতে আছে।[২৩] শ্রমিকের বেতন বস্তুতপক্ষে কমে যায়। নগরবাসীর সংখ্যা বাড়ে কিন্তু নাগরিক সেবা সরবরাহ মারাত্মকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে কৃষি বিপ্লবের সুযোগ-সুবিধা সবই বড় জমিদার হাত করে নেয়। আখচাষীরা পয়সা পায় না কিন্তু চিনি উৎপাদক মন্ত্রীর মুনাফা বেড়েই চলে। এই যখন দুরবস্থা তখন সরকার খুব ঘটা করে উন্নয়ন দশক উৎসবে মাতোয়ারা। আইউবের মৌলিক গণতন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। গ্রামের সাধারণ মোড়ল সহসা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তার ভোটে শুধু পরিষদে প্রতিনিধি নন মায় রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত হন। তাঁর সঙ্গে জেলা শাসক তমিজের সঙ্গে ব্যবহার করেন। উজির-নাজির তাঁর খোঁজে আসেন। একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়

আর সচরাচর যাঁরা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা আর ততো ক্ষমতাশালী রইলেন না। মানুষের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায় এবং রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার সাহস তাঁরা সঞ্চয় করে। আইউব-বিরোধী আন্দোলন গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি আইউবের পদ্ধতিতে ভিন্নমতের সুযোগ ছিল না, এক ধরনের দমবদ্ধ করা আবহাওয়া ছিল সারা দেশে। বিশেষ করে পাক-ভারত যুদ্ধকালে যে ডিফেন্স অব পাকিস্তান আইন বলবৎ হয় তার আওতায় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা খুব বেড়ে যায়। ১৯৬৯-এ যখন গণআন্দোলন তুঙ্গে তখন এই আইনের কার্যকারিতা রহিত করা হয় জরুরি অবস্থার অবসান ঘোষণা করে। প্রেস ও পাবলিকেশনস অধ্যাদেশের বলে সংবাদ মাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরা হয় এবং সরকারি প্রেস ট্রাস্ট ছিল একুশটি সংবাদপত্র-নামধারী ক্রোড়পত্রের প্রকাশক। রাজনৈতিক বিরোধীদের যখন-তখন জেলে নেয়া হতো এবং আইনের শাসন বলে কিছুই ছিল না। সরকার-পুষ্ট সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক অঙ্গন, শ্রমিক মহল ও ছাত্র বলয়ে ছিল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন অধ্যাদেশ জারি করে সেখান থেকেও মুক্তচিন্তা বিতাড়ন করা হয় এবং বিদ্যাপীঠকে বশংবদ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রয়াস নেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গান-বাজনার চর্চা সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে একে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চলে এবং জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো তেমন কিছুই করতে সক্ষম হলেন না। পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় করে মোনেম খান বেশ জমিয়ে বসেছেন। ১৯৬৮ সালের প্রথম অর্ধেকে এই ছিল মোটামুটি অবস্থা। আগরতলা মামলার শুনানি আন্দোলনের প্রথম পদধ্বনি জাগালো। সাত নভেম্বর আগুন জ্বলে উঠলো সুপ্ত নগরী রাওয়ালপিন্ডিতে। গর্ডন কলেজের কতিপয় ছাত্র গিয়েছিল আফগান সীমান্তে এবং লান্ডিকোটালের শুল্কমুক্ত বাজারে তারা কিছু কেনাকাটা করে। ফিরতি পথে তাদের শুল্ক বিভাগ আটক করে ও তাদের ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করে। লান্ডিকোটালের বাজারে সাধারণত বড়লোক অথবা ক্ষমতাশালীরাই কেনাকাটা করতেন এবং শুল্ক বিভাগ এতে কোনো ওজর-আপত্তি করতো না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করে কলেজের ছেলেরা। একই দিনে পিন্ডি পলিটেকনিকের ছাত্ররা প্রতিবাদ করে তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। পুলিশ আর ছাত্রদের মধ্যে লেগে যায় খণ্ডযুদ্ধ, কিছু অগ্নিসংযোগ ও লুটের ঘটনাও ঘটে। ভুট্টো একেবারেই সহসা ঘোলা জলে মাছ শিকারে নামেন। পুলিশের গুলিতে একটি ছেলে প্রাণ দিল। আর যায় কোথায়, একেবারে এলাহি কাণ্ড। পুঞ্জীভূত ক্রোধ যেন ফেটে পড়েছে। সেনাবাহিনীর তলব হলো, কিন্তু তারা স্বগোত্রীয়দের গুলি করতে বিরত থাকলো। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে গোলমাল পেকে উঠলো। পেশওয়ারে ১০ নভেম্বরে এক জনসভায় আইউবের প্রতি গুলিবর্ষণ হলো। লাহোর আর করাচিতে ছাত্র এবং উকিলেরা মাঠে নেমে গেলেন। ১৩ তারিখে ভুট্টোকে গ্রেফতার করে বীরের আসনে বসিয়ে দেয়া হলো। লাহোর বার সমিতির সভাপতিকেও গ্রেফতার করা হলো। ১৭ নভেম্বর সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর

খান কঠোরভাবে আইউব সরকারের সমালোচনা করে বিবৃতি দিলেন। ২৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মহবুব মুরশেদ এই ধরনের আর একটি বিবৃতি দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। এরা মোটামুটিভাবে সম্মানিত ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

সরকার এই প্রতিবাদ যেন বুঝতেই পারলো না। আমলাদের কমিটি ছাত্র ও জনতার অভিযোগ নিরসনের জন্য মামুলি কিছু সুপারিশ হাজির করলো। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাস দেয়া হলো। ডিপ্লোমার কপির জন্য ফি কমানো হলো। কম নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। শিল্প কারখানায় ন্যায্যমূল্যের পণ্য দোকান স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হলো। নিম্নবেতনের সরকারি কর্মচারীদের ভাতা বাড়ানো হলো। শূন্য পদে জরুরি ভিত্তিতে নতুন নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হলো। গমের দাম নিয়ন্ত্রণ করা হলো। সমস্যাটি যে রাজনৈতিক সেই চিন্তাই কারো মাথায় এলো না। শুধু বিদেশি চক্রান্তের গন্ধ সর্বত্র পাওয়া গেল।[১৪] পূর্ব পাকিস্তানে আগরতলা মামলা-বিরোধী তৎপরতা শক্তিশালী হচ্ছে। এই সময়ে এলো পশ্চিম পাকিস্তানের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া। ৬ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী আইউবকে পরিত্যাগ করে সরকারকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানালেন। আইউবের শুভানুধ্যায়ী মওলানা মানুষের ভাবসাব ভালো বুঝতেন, তাই আইউবকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে তিনি কালক্ষেপণ করলেন না। ১৩ ডিসেম্বর হলো সাধারণ ধর্মঘট ও পুলিশের গোলাগুলি। এবারে সরকারের রাজনৈতিক চৈতন্যোদয় হলো। আইউব ঢাকায় সফরে ছিলেন। ৬ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি জরুরি অবস্থা অবসানের কথা বললেন। আইউবের প্রিয় সেনাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া কিন্তু অবস্থা বুঝে নড়াচড়া শুরু করলেন। সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর উপস্থিতি তিনি ঘোষণা করলেন।[১৫] পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা একটি ছাত্র কর্ম পরিষদ গঠন করলো এবং ৩১ ডিসেম্বর কালো দিবস পালন করলো।

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির আট দফা ও ছাত্রদের এগারো দফা

কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, এনডিএফ এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফা-বিরোধী গোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্বের খাতিরে একটি নির্বাচনী মোর্চা পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) গঠন করে। তাদের পেছনে কোনো জনসমর্থন ছিল না। তারা ৩ জানুয়ারিতে ঢাকায় একটি বৈঠক ঠিক করে রেখেছিলেন। ইত্যবসরে গণঅভ্যুত্থান শুরু হলে তারা হঠাৎ গুরুত্ব পেয়ে যান, ছাত্ররা বয়োজ্যষ্ঠদের কাছে দিকনির্দেশনা চাচ্ছিল। তারা বৈঠকে একটি অর্থহীন সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ৬ জানুয়ারি ঘোষণা করলেন যে তারা নির্বাচন বয়কট করবেন। তবে ৮ জানুয়ারিতে সব বদলে গেল। আওয়ামী লীগ (ছয় দফা গোষ্ঠী), ন্যাপ (মস্কোপন্থী) এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, পিডিএম-এর পাঁচ নামসর্বস্ব দলকে নিয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করলো। তারা আট দফা কার্যক্রম গ্রহণ করলো।[১৬] তাদের আট

দফা ছিল নিম্নোক্ত :

১. ফেডারেল প্রকৃতির সংসদীয় গণতন্ত্র।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।
৪. পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠা, সব কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিল।
৫. শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি ও রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার।
৬. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার।
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠা এবং
৮. প্রেস ও পাবলিকেশন্স অধ্যাদেশ বাতিল করা, সংবাদ প্রকাশে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, ইত্তেফাক, চাটান, প্রোগ্রেসিভ পেপারস ইত্যাদিকে তাদের পূর্বতন মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ।।

পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু নেতৃত্বের ভূমিকা নেয় ছাত্ররা এবং তাদেরই চাপে রাজনৈতিক দল তৎপর হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে তারা সর্বদলীয় স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি গঠন করে ১৪ জানুয়ারিতে। তাদের কার্যক্রমে ছিল এগারো দফা।[১৭]

প্রথম দফা

১. সচ্ছল কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণ করা চলবে না এবং যেগুলোকে করা হয়েছে তাদের পূর্বাবস্থায় ফেরত দান।
২. ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেজ স্থাপন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দান এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসারে প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
৩. কলেজগুলোতে নৈশ শিফট প্রচলন।
৪. ছাত্র বেতন ৫০ শতাংশ হ্রাসকরণ ও বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি।
৫. হল বা হোস্টেলের খরচের জন্য ৫০ শতাংশ সরকারি ভরতুকি।
৬. ছাত্রাবাস সমস্যার সমাধান।
৭. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার প্রসার।
৮. সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি।
৯. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ডেন্টাল কলেজের মর্যাদা বৃদ্ধি, মেডিকেল কাউন্সিল অধ্যাদেশ বাতিল।
১০. বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিল ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
১১. পলিটেকনিক ছাত্রদের কনডেন্সড্ কোর্সের সুযোগ দান ও পুরোপুরি সেমিস্টার পদ্ধতি গ্রহণ।
১২. প্রকৌশল শিক্ষার উন্নয়ন ও কালোবিধি বাতিল।

১৩. হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন বাতিল।
১৪. চাকরির নিশ্চয়তা বিধান।
১৫. ছাত্রদের জন্য ট্রেন, বাস বা জাহাজে ভাড়া কনসেশন।
১৬. বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বিষয়ক দাবি পূরণ।

দ্বিতীয় দফা : প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সংসদীয় গণতন্ত্র।

তৃতীয় দফা : ফেডারেল প্রকৃতির সরকার, যার দায়িত্ব হবে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রা, তবে নিম্নোক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

মুদ্রা পাচার বন্ধের ব্যবস্থা, বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব, আঞ্চলিক সরকারের সম্পূর্ণ কর ক্ষমতা, পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া গঠন, অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ সদর দফতর স্থাপন।

চতুর্থ দফা : পশ্চিম পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে সাব-ফেডারেশন গঠন।

পঞ্চম দফা : ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ।

ষষ্ঠ দফা : কৃষকের ওপর খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ ও আখের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ।

সপ্তম দফা : শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান। তাদের জন্য শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, কালাকানুন প্রত্যাহার, ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করবার অধিকার প্রদান।

অষ্টম দফা : পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার।

নবম দফা : জরুরি আইন, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার।

দশম দফা : জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ও সিটো, সেন্টো ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল।

একাদশ দফা : দেশের সব আটক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার, আগরতলা ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

ডাক ১৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে এবং দাবি দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। ঢাকায় পুলিশ ও সীমান্ত বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রজনতার খণ্ডযুদ্ধ হয়। প্রাদেশিক পরিষদের তখন অধিবেশন চলছিল কিন্তু সরকারের বিরোধিতার ফলে এই বিষয়ে আলোচনা করা গেল না। শঙ্কিত প্রদেশপাল ১৯ জানুয়ারি পরিষদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করলেন। প্রতিবাদ ও শোভাযাত্রা অনবরত চলতে থাকলো। ২০ জানুয়ারি ঢাকায় আসাদুজ্জামান নামের এক ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে ছাত্র বলে স্বীকার না করে বহিরাগত আখ্যা দেয়া হয়। এতে বারুদে যেন আগুন লাগলো, প্রায় লাখ খানেক লোক পরের দিন শোক মিছিল করলো, সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বইলো। পশ্চিম পাকিস্তানে ২২ জানুয়ারি হলো প্রতিবাদ দিবস এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ চলতেই থাকলো। ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় ও চট্টগ্রামে পুলিশ গুলি করলো। ঐ দিনই বসলো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন, কিন্তু

শোক প্রস্তাব তুলতে সরকারি দল আপত্তি করলো। বিরোধী দল ওয়াক আউট করলো। ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় ও পরবর্তীকালে অন্যান্য শহরেও সান্ধ্য আইন জারি হলো। করাচিতে ২৭ জানুয়ারি গুলি হলো। সর্বত্র গণগ্রেফতার চললো—বরিশাল, পেশওয়ার, কোথাও বাদ রইলো না। ঢাকায় ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত কারফিউ চললো এবং কারফিউ ভেঙে শত শত লোক প্রাণ দিল। পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে সৈন্যরা সগোত্রীয়দের ওপর গুলি করতে বিরত থাকে, পূর্ব পাকিস্তানে সেই রকম কোনো সংযমের সুযোগ ছিল না। বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমিন সাবধান করে দিলেন যে, জুলুম বন্ধ করতে হবে। গুলি আর বেয়নেট দিয়ে সরকার চালানো যায় না।[১৮]

গোল টেবিল বৈঠক

আইউব ঢাকা সফরের ব্যবস্থা করেন, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় হবে। ১ ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে তিনি ঘোষণা দেন যে, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি গোল টেবিল বৈঠক ডাকবেন। ডাকের চেয়ারম্যান নবাবজাদা নসরুল্লাহকে তিনি অন্য নেতৃবৃন্দসহ আলোচনার জন্য আহ্বান করলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করলেন যে, ১৭ ফেব্রুয়ারিতে বৈঠক হতে পারে। আইউব ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন এবং সেদিনই আইন মন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, ডিফেন্স অব পাকিস্তান আইনে আর কোনো ধরপাকড় বা মামলা হবে না এবং অতি সত্বর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অভিমত হলো যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং শেখ মুজিব ছাড়া কোনো গোল টেবিল আলোচনা নিরর্থক। আইউব এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারোলে শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক জায়গায় গুলি হলো এবং ভুট্টোর কারামুক্তি হলো। ১৬ ফেব্রুয়ারি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হলো। কিন্তু ১৭ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠক হতে পারলো না, শেখ সাহেব শেষ পর্যন্ত প্যারোলে যেতে রাজি হলেন না। ইতোমধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি দু'জন আগরতলা মামলার আসামিকে সান্ত্রীরা গুলি করে। তারা আসলে শেখ মুজিবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। সামনাসামনি গুলিতে সার্জেন্ট জহুরুল হক মারা যান কিন্তু ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক কোনোমতে বেঁচে যান। এর আগে ১১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে শান্তিরক্ষায় ব্যস্ত অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে সৈন্যরা গুলি করে এবং পরে বেয়নেটে খুঁচিয়ে হত্যা করে। আইউব ঘোষণা দিলেন যে তিনি আলোচনা করবেন, কিন্তু তাঁর বরকন্দাজরা বাঙালিদের হত্যা করেই চললো। ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা গর্জে উঠলো, মূলত ছাত্র ও ছিন্নমূল মানুষ কারফিউ ভেঙে সেনাবাহিনীর গুলির মুখোমুখি হলো। ভয় হলো তারা না ছাউনি আক্রমণ করে। স্থানীয় সেনাপতি তখন আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব সামরিক বাহিনীর তিন প্রধানকে সামরিক শাসন জারি করতে উপদেশ দিলেন। তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে, আইউবকে তাঁর সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। আইউব তখন অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর বন্ধুমহলের মতে, আইউব চান নি যে আবার সামরিক শাসন হোক, তিনি নিয়মতান্ত্রিক ধারা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আনুগত্য সম্বন্ধেও খুব নিশ্চিত ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিনের তৎপরতায় ছিল বিদ্রোহের ভাব, ছাউনি থেকে জনতা যেন শেখ মুজিবকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। পিন্ডিতে আইউব খান এই দিন এক যুগান্তকারী ঘোষণা দিলেন, শুধু খুব দেরিতে তাঁর বুদ্ধির উদ্রেক হলো। তিনি জানালেন যে, তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তিনি স্বীকার করলেন যে, তাঁর পদ্ধতিতে পূর্ব পাকিস্তানিরা বঞ্চিত হয়েছে। তাঁরা ক্ষমতায় অংশ নিতে পারে নি। তাঁর ব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবীরা অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সংসদ কার্যকরী হতে পারে নি। তিনি ছাত্রদের সমস্যা ও গরিবদের বঞ্চনা স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর ধ্যান-ধারণা ছিল মানুষের মঙ্গল কামনা কিন্ত তাঁর ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো বললেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে তিনি শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানে যে বাধাবিপত্তি আছে তা অতিক্রম করার ব্যবস্থা তিনি নেবেন।[১৯] আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের ইঙ্গিত এতে ছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি মামলা খারিজ হয়ে গেল। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো, "যেহেতু জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং মৌলিক অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেজন্য সংঘাত পরিহার করার উদ্দেশ্যে সরকার ক্রিমিন্যাল ল এমেন্ডমেন্ট (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ (১৯৬৮ সালের অধ্যাদেশ) বাতিল করা যথাযথ মনে করে। এই আইনের আওতায় শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের বিচার হচ্ছিল। তাই শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের খালাস দেয়া হয়েছে।"[২০] গুজবে প্রকাশ যে, দেশরক্ষা মন্ত্রী রিয়ার এডমিরাল এ. আর. খান মামলা প্রত্যাহারে আপত্তি করেন এবং আইন মন্ত্রী এস.এম. জাফরও এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন না। মন্ত্রিসভায় আলোচনাকালে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন এ জন্য জোর দেন এবং কৃষি মন্ত্রী এম শামসুদ্দোহা ও শিল্পমন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরী এর বিরোধিতা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে ছয় দফা ও ছাত্রদের এগারো দফা সমর্থন করেন এবং দশ লাখ জনতার এই সভায় তোফায়েল আহমদ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অবশেষে ২৮ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এতে ভুট্টোর পিপিপি ও ভাসানীর ন্যাপ অংশ নিল না। বাকি সব দল এবং তিনজন ব্যক্তিত্ব—জেনারেল আজম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি মুরশেদ—এতে হাজির থাকলেন। মাত্র চল্লিশ মিনিটে অধিবেশন শেষ হলো। সামনে ঈদ বলে স্থির হলো যে, ১০ মার্চে আবার অধিবেশন বসবে এবং ইতোমধ্যে ডাক একটি ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করবে। সারা দেশে যখন এই প্রত্যাশা তখনই কিন্তু চক্রান্তকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠলো। সামরিক বাহিনী ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, তারা ক্ষমতা গ্রহণ করবে। ভুট্টো এবং ভাসানী এই রকমই আশা করছিলেন। আইউবের মন্ত্রীরাও সামরিক বাহিনীর খেলায় মেতে উঠেন। দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্বত্র গোলমাল সৃষ্টির উদ্যোগ বহাল রাখলেন। দুই প্রদেশের দুইজন ঘৃণিত প্রদেশপাল

আইন-শৃঙ্খলাকে অস্থিতিশীল করে রাখলেন। যে-কোনোভাবেই তারা জনগণের বিজয় রোধ করবেই করবে। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তির দোসর তথাকথিত বিহারিরা গোলমাল সৃষ্টি করে চললো। তারা দাবি করলো যে, তাদের জন্য উর্দু মাধ্যম বিদ্যালয় দিতে হবে। মোনেম খানের অত্যাচারে বীতশ্রদ্ধ জনতা নিজেদের হাতে নানা জায়গায় আইন তুলে নিল এবং সমাজশত্রুদের নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে থাকলো। প্রতিদিন এই সব খবর ফলাও করে প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং। ৭ মার্চ ডাক লাহোরে আলোচনায় বসলো। বঙ্গবন্ধু পাঁচটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন : প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ফেডারেল প্রকৃতির সংসদীয় গণতন্ত্র, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট বাতিলকরণ। সব গোলমাল বাধলো এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে। মাত্র দুটি বিষয়ে হলো ঐকমত্য—ফেডারেল প্রকৃতির সংসদীয় গণতন্ত্র এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য দেবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে বড় আপত্তি ছিল দুটি কারণে—এক ব্যক্তি এক ভোটে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা ছাড়তে রাজি ছিল না আর স্বায়ত্তশাসনে তাদের ছিল দারুণ ভীতি। যেসব নেতা বহুদিন ধরে অবসরে ছিলেন যেমন মোশতাক গুরমানি, ফিরোজ খান নুন, বিচারপতি মুনির, এ কে ব্রোহি এঁরা সবাই জোরেশোরে এই দুই বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। কোনোমতেই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার দেবেন না। এ. আর. খান নানাভাবে বৈঠককে বানচাল করে দেয়ার প্রচেষ্টা নিলেন, আসগর খানের সঙ্গে অভদ্র ঝগড়ায় তিনি অবতীর্ণ হলেন।

গোল টেবিল বৈঠক কোনো সার্বিক সমাধানে পৌছতে পারলো না। আইউব সর্বসম্মত দুইটি দাবিই গ্রহণ করলেন। তিনি আরো বললেন যে, অন্য দল যদি কোনো সাংবিধানিক খসড়া দেয় তিনি তাও পরিষদে পেশ করবেন। কিন্তু তিনি ইতোমধ্যে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে বসেছেন, তাঁর সহযোগীরা তাঁদের আখেরাত গোছাতে অন্যত্র ধরনা দিচ্ছে। কেউ কেউ তাঁকে জাতীয় সরকার গঠনে উপদেশ দিলেন, শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দেয়ার প্রশ্নও উঠলো। কিন্তু সামরিক বাহিনীর তৎপরতা তেমন অবিদিত ছিল না, তাই এই দিকে কেউ পা বাড়ালেন না। তবে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি বিধানের জন্য প্রদেশপাল দুইজনকে বিদায় করা অপরিহার্য বিবেচিত হলো। অবশেষে আইউব ২০ মার্চে পশ্চিম পাকিস্তানে ইউসুফ হারুনকে নিয়ুক্তি দিলেন আর পূর্ব পাকিস্তানে ২১ মার্চে ড. মির্জা নুরুল হুদা দায়িত্ব পেলেন। গোল টেবিল বৈঠক ১৪ মার্চ শেষ হলো এবং যদিও সেখানে অর্জন তেমন ছিল না; কিন্তু সার্বিক পরিবেশে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। গভর্নরদ্বয়ের পরিবর্তনে অবস্থার দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হলো। পশ্চিম পাকিস্তানে জেনারেল মুসার অদক্ষ ও নির্বোধ শাসন এবং পূর্ব পাকিস্তানে মোনেম খানের অন্যায় ও নিষ্ঠুর শাসন জনগণকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাই অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে তারা আইন হাতে তুলে নেয় এবং অনেক জায়গায় হিংস্র কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই দুইজন অপসারিত হলে অবস্থা এমনিতেই স্বাভাবিক হতে

শুরু করে। কিন্তু ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে অটল রইলো। ১৯ ফেব্রুয়ারিতেই বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যায় এবং আইউবও তা আঁচ করতে পারেন। ইয়াহিয়ার অনুমোদন ছাড়া তিনি কোনো গভর্নরের নিযুক্তিও দেন নি, দুই গভর্নরই ইয়াহিয়ার আশীর্বাদ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেন। আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য যে কোনো সামরিক শাসনের প্রয়োজন ছিল না, সে সত্যটি ইয়াহিয়ার এক সময়ের প্রিয়পাত্র লে. জেনারেল গুল হাসান স্বীকার করেছেন।[২১] শুধু পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার উদ্ভট প্রস্তাব যে এসেছিল সেটাও এখন প্রকাশ পেয়েছে।[২২] উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা। কিন্তু তাদের ভয়ও ছিল যে, যদি সামরিক শাসন জনতা না মানে। তড়িঘড়ি করে তাই পূর্ব পাকিস্তানে এইবার সামরিক শক্তির সর্ববৃহৎ সমাহার হয়। তিন ডিভিশন সৈন্য এবং এক স্কোয়াড্রন বিমান বাহিনী এর আগে কোনো দিন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না।

আইউবের পতন

২৫ মার্চ ১৯৬৯ সাল। আইউবের ক্ষমতা গ্রহণের সাড়ে দশ বছর তখন পূর্ণ হয়েছে। ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে আইউবের তরফ থেকে যাঁরা ইস্কান্দার মির্জাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আগা ইয়াহিয়া খান। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে আইউব তাঁর হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করে সরে দাঁড়ালেন। আইউব তাঁকে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে আহ্বান করলেন; কিন্তু সংবিধানের কোথাও সেনাধিনায়কের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করবার কোনো বিধান ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া এই অবস্থা বিবেচনা করে সামরিক শাসন ঘোষণা করলেন এবং ত্বরিত সংবিধান বাতিল করলেন। আইউবের সমর্থকরা এ নিয়ে দুঃখ পেলেন কিন্তু সত্যিই কি অন্য কোনো উপায়ে ইয়াহিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন? তবে তাঁদের আসল দুঃখ ছিল অন্যত্র। ইয়াহিয়া আইউবের কতিপয় সহযোগীকে তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্তি দেন; কিন্তু অচিরেই তাঁদের বিদায় করে তাঁর নিজের লোককে ডেকে আনেন। এই নিজের লোকেরা ছিল তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী কতিপয় সেনাপতি বা সামরিক নেতা। এঁরাই পরবর্তী দুই বছরের বেশি সময় ছিল ইয়াহিয়া জান্তার কুলাঙ্গার। এঁদের দেশপ্রেমের সঙ্গে কোনো পরিচিতি ছিল না। ব্যক্তিস্বার্থ ছিল তাঁদের দেবতা এবং বিশেষত্ব ছিল চরিত্রহীনতা। আইউব সামরিক শাসন বা সংবিধান-বহির্ভূত যে রীতি প্রবর্তন করেন তাঁর উত্তরসূরি তারই পুনরাভিনয় করেন। সামরিক শাসক হিসেবে স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে আইউবের স্বপ্ন তাঁরই প্রিয়পাত্র ইয়াহিয়া ভেঙে খান খান করে দেন। আইউবের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের দশক শেষে তাই পাকিস্তান বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতনের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হলো। তারিক আলী সামরিক শক্তির পুনরায় ক্ষমতাগ্রহণ সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হয়তো তাতে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। "একটি জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতে যদি কোনো বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে তারা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে বলে সামরিক বাহিনী

শঙ্কিত ছিল। এছাড়াও একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাগ্রহণকারী বেসামরিক সরকার জাতীয় সম্পদের ওপর সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ অধিকার নিশ্চয়ই খর্ব করতো।"[২৩] কিন্তু এতেই কথা শেষ হয় না। অভ্যুত্থানের বিজয় নিশ্চিতভাবে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন করতো। পূর্ব পাকিস্তান প্রকৃতভাবেই ক্ষমতায় আসীন হতো। এই পরিবর্তন সামরিক বাহিনী সহ্য করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও আমলাদের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল তাদের পেছনে। পূর্ব পাকিস্তানকে যে ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অভ্যুত্থানকে বানচাল করে দিয়ে যে সময় পাওয়া যাবে তাতে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যেত। ইতোমধ্যেই তারা মওলানা ভাসানীকে যথেষ্ট নমনীয় করতে সক্ষম হয়। তবে আইউবের পরিণতি ইয়াহিয়াকে সতর্ক রাখবে বলে সকলেই আশা করেন। জনমতকে কিছু সময়ের জন্য অবজ্ঞা করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আইউবের পতন কিন্তু মাত্র পাঁচ মাসে ঘটে। হৃদরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আইউব তাঁর তৃতীয় মেয়াদের রাষ্ট্রপতি পরিকল্পনায় মশগুল হন। তাঁর মৌলিক গণতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা মনে হয় যেন স্থায়িত্ব আহরণ করেছে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সব ওলটপালট হয়ে গেল। পাকিস্তানের দুই অংশেই মহাপ্রলয় ঘটে গেল এবং ভবিষ্যৎ হলো পুরোপুরি অনিশ্চিত। স্যামুয়েল হান্টিংটন এক্ষেত্রেও মারাত্মক ভুল করে বসলেন তাঁর বিচারে। আইউবের দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের প্রশংসায় যখন তিনি পঞ্চমুখ, তখনই আইউবের ব্যবস্থা হলো মহাপ্রলয়ের শিকার। কোথায় সলোন আর লাইকারগাসের আইন আর প্লেটো ও রুশোর দর্শন আর কোথায় মোনেম খান ও মুসার দুরাচারের বিরুদ্ধে জনতার হিংস্র প্রতিক্রিয়া এবং ইয়াহিয়ার দুশ্চরিত্র সামরিক শাসন।[২৪]

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. এম.এইচ.আর. তালুকদার : *Memoirs of Husayn Shaheed Suhrawardy with a Brief Account of His Writing.* ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ২৭-৩১।

২. আই এইচ কুরেশি : *The Struggle for Pakistan,* করাচি ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৬৫, পৃ. ৩০৪।

৩. তৎকালীন মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী থেকে লেখক এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

৪. কার্ল ভন ভরিস : *Political Development in Pakistan.* প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫, পৃ. ৫৩-৫৪।

৫. আলতাফ গওহর : *Ayub Khan : Pakistan's First Military Ruler,* সাঙ্গ-এ মিল প্রকাশনা, লাহোর ১৯৯৩, পৃ. ৩০৭-৩৯১।

৬. আইউব সারা দেশে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এই ধরনের প্রথম সভায় শেখ মুজিব এই উক্তি করেন।

৭. লেখক গভর্নর আজম খানের ডেপুটি সচিব হিসেবে কর্মকালে (১৯৬১-৬২) এই তথ্য অবগত হন। আজম খান অবসর গ্রহণ করার পরে শেখ সাহেব সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে লাহোরে দেখা করে তাঁর এই অযাচিত উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৮. মামলার বিবরণ ১৯ জুনে (১৯৬৮) সরকারি কৌসুলির প্রারম্ভিক বক্তব্যে দেয়া হয়। *পাকিস্তান অবজারভার,* ঢাকা, ২০ জুন, ১৯৬৮।

৯. আলতাফ গওহর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২১।

১০. প্রেসিডেন্ট আইউবের এই সফরকালে লেখক ঢাকায় ছিলেন এবং প্রেসিডেন্টের হাওয়াই সফর শেষে প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রত্যাবর্তনের সময়ই খবরটি জানতে পারেন।
১১. ষড়যন্ত্র মামলা সম্বন্ধে বিবরণ সীমিত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ে বেসামরিক গোয়েন্দা প্রধান এন.এ. রাজভী লেখকের সঙ্গে যৎসামান্য মতবিনিময় করেন। লেখক দুইজন আসামি খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মেজর নুরুজ্জামানের সঙ্গে তাঁদের গ্রেফতারের আগে সামান্য আলোচনা করেন। খান শামসুর রহমানের সঙ্গে লেখক ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে ও ১৯৭২ সালে আবার মার্চে ঢাকায় বিস্তৃত আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমুদয় আলোচনার বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে আসামিদের কয়েকজনের সঙ্গে চেষ্টা করেও তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। আলতাফ গওহর এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, অনেকেই এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। অবশ্য লে. জে. গুল হাসান বলেছেন যে, শেখ মুজিব শুধু ষড়যন্ত্র করেন নি, তাঁকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয় (যদিও ট্রাইবুনাল রায় দেয়ার সময় পায় নি।) এ সম্বন্ধে দুইটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ফয়েজ আহমদের *আগরতলা মামলা শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* ১৯৯৪ সালে সাহিত্য প্রকাশ প্রকাশ করে। লে. কমান্ডার আবদুর রউফ লিখেছেন, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন*, ১৯৯২ সালে প্যাপিরাস প্রকাশনী বের করেছে।
১২. এম তারিক আলীর *Pakistan : Military Rule or People's* Power. ইউলিয়াম মারো, নিউইয়র্ক, ১৯৭০, পৃ. ১৮২।
১৩. এম তারিক আলী : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।
পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুবুল হক করাচিতে এক বক্তৃতায় সম্পদের এই বিভাজনের তথ্য দেন ১৯৬৭ সালে। অল্প বয়সে তিনি পাকিস্তানের উন্নয়ন কৌশলের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তাঁর বইয়ে : *The Strategy of Economic Planning : A Case Study of Pakistan.* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩, করাচি।
১৪. এই বিবরণ লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ডায়েরির আলোকে লেখা। লেখক তখন রাওয়ালপিন্ডির অধিবাসী ছিলেন এবং ডিসেম্বরের শুরুতে ঢাকায় অবস্থান করেন।
১৫. এই তথ্যটি করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে সর্বজনবিদিত ছিল এবং ১৯৬৮-৬৯-এর শীতকালীন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনকালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতম আমলা মহলে প্রায়ই আলোচিত হতো। লেখক এই সব আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।
১৬. আট দফার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়, *পাকিস্তান অবজারভার*, ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
১৭. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা : *২১ দফা থেকে ৫ দফা*, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৮-১৮৩।
১৮. এই বিবরণও লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ডায়েরির আলোকে লেখা। লেখক কার্যোপলক্ষে এই সময় ঢাকায় ছিলেন।
১৯. *Pakistan Observer,* ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
২০. পূর্বোক্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
২১. লে. জেনারেল গুল হাসান : *Memoirs,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯৩, পৃ. ২৮৮-২৮৯।
২২. রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided,* জাং প্রকাশনা, লাহোর, ১৯৯২, পৃ. ২৯।
২৩. এম তারিক আলী : পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।
২৪. স্যামুয়েল জি হান্টিংটন : *Political Order in Changing Society,* ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮, পৃ. ২৫০-৫১।

সপ্তম অধ্যায়

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের অগ্রগতি

একটি গণঅভ্যুত্থানের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসেন। পাঁচ মাস ধরে আইউব-বিরোধী বিক্ষোভ আইন-শৃঙ্খলার বেশ অবনতি ঘটায়। তবে আইউব যখন ঘোষণা দিলেন যে, তিনি আর নির্বাচন করবেন না এবং গোল টেবিল বৈঠকের শুরু হলো তখন থেকে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। তবুও পশ্চিম পাকিস্তানে জেনারেল মুসা ও পূর্ব পাকিস্তানে মোনেম খান গভর্নর পদ আঁকড়ে থাকায় বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকলো। এই দুই ঘৃণিত ব্যক্তিকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই অংশেই শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসতে থাকে। গোল টেবিল বৈঠকে অবশ্য সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান হলো না। দুইটি বিষয়ে ঐকমত্য হলেও আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অমীমাংসিত রইলো। ইয়াহিয়া অবশ্য ক্ষমতায় আসেন আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে। গণঅভ্যুত্থান ছিল একনায়কত্বের বিরুদ্ধে কিন্তু ইয়াহিয়া একনায়কত্বকেই বহাল রাখলেন, শুধু খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হলো। তবে তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে হয়।

ইয়াহিয়ার ক্ষমতাগ্রহণ

ইয়াহিয়া খুব সতর্কতার সঙ্গে ক্ষমতা নিলেন। প্রথমে তিনি আইউবের আহ্বানে ক্ষমতায় এলেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে নিজের অবস্থান নিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বললেন, "আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমার কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই, আমি শুধু একটি সাংবিধানিক সরকার গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য এবং অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে বিনা ঝামেলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত হলো একটি নির্ভরযোগ্য, পরিচ্ছন্ন ও সৎ প্রশাসন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

দায়িত্ব হবে দেশে একটি প্রয়োগবাদী সংবিধান করা এবং দেশে আলোড়নকারী সমুদয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলির সমাধান খুঁজে বের করা।"[১]

তাঁর নিজের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা তিনি ১০ এপ্রিল একটি সংবাদ সম্মেলনে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন, অধিকার ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করা এবং প্রশাসনকে সুসংহত করা।"[২] তিনি গণতন্ত্রের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করছেন না। তিনি চান প্রশাসনকে শুদ্ধ পথে চালাতে, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং অবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে।

গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে গণতন্ত্রের বিজয়কে বিলম্বিত করার কাজটি তিনি ভালোই সম্পাদন করেন। তিনি একদিকে যেমন প্রত্যাশার বিস্ফোরণ দমিয়ে রাখেন, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙেন নি। প্রথম দুই মাস তিনি প্রশাসনিক সংস্কারে ব্যস্ত থাকেন। উচ্চ পদে তিনি কতিপয় বাঙালি আমলা নিয়োগ করেন এবং অনেক উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেন। কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকজন বাঙালি সচিব (এ.কে.এম. আহসান, এম.এ.রব, সাদেক আহমদ চৌধুরী, সাইউদ আহমদ) নতুন নিযুক্তি পেলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিবের পদেও বাঙালি এস.এম. শফিউল আজম আসীন হলেন। তারপরে তৈরি হলো শ্রমনীতি এবং শিক্ষানীতি। একই সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ নিয়ে তদন্ত শুরু হলো, যার পরিণামে বছর শেষে ৩০৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী চাকরি খোয়ালেন। এ সবই হলো প্রশাসনকে সাদা করার উদ্দেশ্যে। ২৮ জুলাই ইয়াহিয়া সংবিধান রচনা ও নির্বাচনের দিকে নজর দিলেন। তিনি বললেন যে, তিনটি অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে এবং এইসব বিষয়ে রাজনীতিবিদদের অভিমত ও পরামর্শ তিনি চাইলেন। একই সঙ্গে তিনি প্রধান নির্বাচনী কমিশনার হিসেবে বিদায়ী সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নিয়োগ করলেন। তাঁর দায়িত্ব হলো ভোটার তালিকা তৈরি করা এবং নির্বাচনের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রথম চার মাস ইয়াহিয়া নির্বাহী ক্ষমতা কয়েকজন সামরিক কর্তাব্যক্তির হাতে রাখেন। তিনি প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক প্রশাসক এবং সর্বাধিনায়ক রইলেন। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল নুর খান, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এস.এম. আহসান এবং সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল হামিদ হলেন তিন উপ-প্রধান সামরিক প্রশাসক। তাঁরা চারজন সমুদয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকলেন। প্রেসিডেন্টের দফতরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.জি.এম. পীরজাদা এক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দুই প্রদেশে দুইজন সেনাপতি হলেন আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক এবং গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তানে মেজর জেনারেল মোজাফ্ফরউদ্দিন আর পশ্চিম পাকিস্তানে লে. জেনারেল আতিকুর রহমান। ইয়াহিয়ার শাসন শুরু থেকেই একটি জান্তার হাতে চলে যায়। ক্ষমতা গ্রহণ করে ইয়াহিয়া প্রাক্তন মন্ত্রিসভার তিন ব্যক্তিকে—এডমিরাল এ আর খান, ফিদা হাসান এবং মিয়া আরশাদ হোসেনকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। কিন্তু জেনারেল হামিদ, জেনারেল গুল হাসান এবং জেনারেল

পীরজাদা এই নির্দেশ নাকচ করে দেন।[৩] জেনারেল গুল হাসানের বিবরণে দেখা যায় যে, এই জান্তা কি রকম দুষ্ট, চক্রান্তকারী, আত্মঘাতী ছিল এবং এদের নেতা কি রকম পানাসক্ত ও অপদার্থ ছিল। আরো জানা যায় যে, তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতো না এবং একে অন্যের সর্বনাশে লিপ্ত থাকতো।

৪ আগস্টে ইয়াহিয়া একটি বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এয়ার মার্শাল নুর খান গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে গভর্নর হিসেবে আর এডমিরাল এসএম আহসান গেলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁরা দুইজনেই সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিলেন। মন্ত্রিসভা হলো দশজন সদস্যের, যার পাঁচজন ছিলেন বাঙালি যথা ডা. আবদুল মোতালেব মালিক, হাফিজুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, আহসানুল হক এবং ড. গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী। কয়েক মাস পরে এয়ার মার্শাল নুর খান পদত্যাগ করলেন আর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন জেনারেল আতিকুর রহমান। ডিসেম্বরে মন্ত্রী জেনারেল শের আলীও পদত্যাগ করলেন কিন্তু তাঁর জায়গায় আর কাউকে নেয়া হলো না। তবে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মির্জা মোজফফর আহমদ মন্ত্রীর পদমর্যাদায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জান্তার পরামর্শে ইয়াহিয়া এই মন্ত্রিসভাকে অব্যাহতি দেন। ডা. মালিক এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। কারণ তাঁর মনে হয় যে, এতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কোনো বাঙালির উপদেশ আর শুনতে পাবেন না। মুক্তিযুদ্ধকালে ইয়াহিয়ার আশপাশে কোনো বাঙালিই ছিলেন না। শেষের দিকে গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী উপদেষ্টার দায়িত্ব (খণ্ডকালীন) পালন করেন এবং গুজবে প্রকাশ যে ইয়াহিয়ার সংবিধান প্রণয়নে অবদান রাখেন।

আইনগত কাঠামো আদেশ ১৯৭০

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের নীলনকশা প্রদান করেন।[৪] তিনি বলেন যে, তাঁর সামনে চারটি বিকল্প রয়েছে। একটি সংবিধান কনভেনশন নির্বাচিত করে তাদের হাতে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া যায়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করে তদনুযায়ী দেশ শাসন করা যায়, নিয়মমাফিক এই সংবিধানের সংশোধনও করা যেতে পারে। তিনি নিজে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে তার ওপরে গণভোট নিতে পারেন। অথবা একটি সাময়িক আইনগত কাঠামো রচনা করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায় এবং নির্বাচিত পরিষদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন করতে পারে। ইয়াহিয়া জানালেন যে, তিনি চতুর্থ বিকল্প গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে একটি আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করবেন। অতঃপর তিনি অমীমাংসিত তিনটি বিষয়ের ওপর তাঁর বিশ্লেষণ ও অভিমত প্রদান করেন। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা ও মত বিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিশ্লেষণ তিনি তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে,

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুনর্প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি আরো জানালেন যে, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হলো। দুই অংশের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্ধারণ করবেন। তাঁর মতে, দুই এলাকার স্বায়ত্তশাসন ততটুকু হবে, যাতে জাতীয় অখণ্ডতা ও সংহতি বিঘ্নিত না হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের নাগরিকবর্গ তাদের এলাকার অর্থনৈতিক সম্পদ ও উন্নয়নের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে, শুধু নিশ্চিত করতে হবে যে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার যেন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। ইয়াহিয়ার এই জটিল বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ছিল নিতান্তই অস্বচ্ছ এবং মামুলি। ইয়াহিয়া বললেন যে, ভোটার তালিকা ১৯৭০ সালের জুনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে এবং ৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনও অব্যবহিত পরে সম্পন্ন হবে। সংবিধান রচনার জন্য তিনি পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ দিনের সময় ধার্য করে দেন। এই সময়ের মধ্যে কাজ সমাধা করতে না পারলে পরিষদ ভেঙে যাবে এবং নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরিষদ নিজেরা ঠিক করবে যে তারা কিভাবে ভোট দেবে; শুধু নিশ্চিত করতে হবে যে পাকিস্তানের সব এলাকার প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়। একই সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, সংবিধান রচনা এবং সংবিধানকে সত্যায়িতকরণ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে। নববর্ষের প্রথম দিন থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হওয়ার ঘোষণাও তিনি দেন। অবশ্য সে ব্যাপারে একটি আচরণবিধি ও দিকনির্দেশনা দেবার কথাও তিনি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি ছিল সমন্বিত ও সময়োপযোগী। প্রায় চার মাসের নীরবতা নানা ভাবনার জন্ম দেয় এবং ধৈর্য প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে যায়।

১৯৫৮ সালের পর, দীর্ঘ এক যুগ পরে, ১৯৭০ সালের নববর্ষে উন্মুক্ত রাজনৈতিক তৎপরতা হলো এক নতুন অভিজ্ঞতা, বস্তুত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। নির্বাচনী অভিযান শুরু হলো এবং কোনো কোনো জায়গায় কিছু সহিংসতা ঘটে। ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া অবস্থার বিশ্লেষণে এই সব ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং দলগুলোকে আরো দায়িত্বশীল ও সহনশীল হতে আবেদন করেন।[৫] তিনি আইনগত কাঠামো আদেশের কথা বললেন এবং জানালেন যে দুইদিন পরে তা প্রকাশিত হবে। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পুনরুজ্জীবিত প্রদেশগুলো ১৯৭০ সালের পয়লা জুলাইতে প্রতিষ্ঠিত হবে। ৩০ মার্চে প্রেসিডেন্টের দুইটি আদেশ বলবৎ হলো। ১৯৭০-এর পয়লা আদেশে পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি প্রদেশ গঠিত হলো এবং ইসলামাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসিত উপজাতি এলাকা হলো ফেডারেল এলাকা। ১৯৭০-এর দ্বিতীয় আদেশে আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেল।[৬] ১৩জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ হবে আর ৩১০ থেকে ৩২১ সদস্য নিয়ে হবে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ। আসনের বিভাজন সারণি ৭.১-এ দেয়া হলো। সাধারণ আসনে নির্বাচন হবে নির্বাচনী এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে, তবে মহিলা আসনে প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা সদস্য নির্বাচন করবেন। কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ৭ সদস্যের নির্বাচনবিধি

রাষ্ট্রপতি প্রণয়ন করবেন। ৫ অক্টোবরে জাতীয় পরিষদ ও ২২ অক্টোবরে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে। তবে সংবিধান সত্যায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদ কার্যকরী হবে না। সংবিধান বিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা অন্য কোন্ বিশেষ ব্যবস্থায় গৃহীত হবে, তা জাতীয় পরিষদ প্রথমেই স্থির করবে। রাষ্ট্রপতি যেদিন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন সেদিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। এই সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান বিল সত্যায়িত করতে হবে। রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি সত্যায়িত না করেন তাহলে পরিষদ ভেঙে যাবে। সংবিধান গৃহীত হলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ হবে নতুন সংবিধানের অধীনে প্রথম আইন পরিষদ।

সারণি ৭.১

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ আসন বিভাজন

	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫	১৮০	৬	১৮৬
সিন্ধু	২৭	১	২৮	৬০	২	৬২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৮	১	১৯	৪০	২	৪২
বেলুচিস্তান	৪	১	৫	২০	১	২১
কেন্দ্রীয় শাসিত এলাকা	৭	-	৭	-	-	-
মোট	৩০০	১৩	৩১৩	৬০০	২১	৬২১

আইনগত কাঠামো আদেশে ভবিষ্যতের সংবিধান সম্বন্ধে যথেষ্ট দিকনির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়। এই আদেশের ২০ ধারায় সংবিধানের মূল ছয়টি নীতি বেঁধে দেয়া হয়। এইসব নীতি ছিল : ১. ফেডারেল পদ্ধতির সরকার হবে, ২. ইসলামি আদর্শ হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি, ৩. প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন, ৪. মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, ৫. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করতে হবে এবং ৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো যে, অনেক খুঁটিনাটি এই আদেশে বর্ণিত হলো কিন্তু সংবিধান বিল কিভাবে গ্রহণ করা যাবে সে সিদ্ধান্ত পরিষদের হাতে ছেড়ে দেয়া হলো।

নির্বাচনী তৎপরতা

প্রথমদিকে কিছু সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও ধীরে ধীরে পরিবেশ শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু উৎসাহে কোনো ভাটা পড়ে নি।[৭] ডিসেম্বরে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তখন মোট

পঁচিশটি দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে ১৮৬৮ জন জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সারণি ৭.২-এ এই বিভাজন তুলে ধরা হলো। কতগুলো দল ছিল নিতান্তই এলাকাভিত্তিক, আবার কতগুলো ছিল নেতাকেন্দ্রিক। সুসংগঠিত দল ছিল মোট নয়টি। আওয়ামী লীগ আর জামায়াতে ইসলামী ছিল পুরনো দল এবং তাদের ছিল নিবেদিত কর্মী বাহিনী। পাকিস্তান পিপলস পার্টি ছিল নতুন দল কিন্তু উৎসাহী কর্মীর অভাব ছিল না। তিনটি মুসলিম লীগ দল—কাউন্সিল লীগ, কনভেনশন লীগ, কাইয়ুম লীগ এবং দুইটি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ওয়ালি ন্যাপ আর ভাসানী ন্যাপ বেশ ভালোভাবেই সংগঠিত ছিল। পিডিপি ছিল নামকরা নেতাদের দল, যাদের কোনো তৃণমূল সংগঠন বা সমর্থন ছিল না। সব দলই সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে তাদের বিস্তৃত ইশতেহার প্রস্তুত করে। শীর্ষ নেতারা রেডিও ও টেলিভিশনে তাঁদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনে এই প্রধান নয়টি দলের মধ্যে তেমন দূরত্ব ছিল না। সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, শ্রমিক বা চাষীর বঞ্চনা ও মনোপলি অধিকারের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার। ব্যাঙ্ক, বীমা, জন-উপযোগী এবং ভারি শিল্পের জাতীয়করণ সবাই দাবি করে। শিল্প ও বাণিজ্যে কতটুকু জাতীয়করণ হবে সে ব্যাপারে অবশ্য ভিন্নমতের অবকাশ ছিল। সকলেই জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ এবং দুইটি ন্যাপ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাশ্মির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চায়। পিপিপি অন্যদিকে শক্ত ভারতবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যান্য দল পাক-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কিছুই বললো না। সাংবিধানিক প্রশ্নে একটিই অমীমাংসিত বিষয় ছিল—স্বায়ত্তশাসনের কলেবর। শুধু কাইয়ুম মুসলিম লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করে। অন্যেরা ব্যাপক হারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চায়। পিপিপি এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য না করে মামুলি কথাবার্তা বলে। তারা ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের প্রীতিকর সম্পর্ক চায়। আওয়ামী লীগ ছয় দফার বাস্তবায়ন চায়। দুইটি ন্যাপ এই কার্যক্রম সমর্থন করে। পিডিপি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ চায় যে ছয় দফায় প্রদত্ত তিন বিষয় ছাড়াও আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সীমিত রাজস্ব ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের থাকবে। তারা বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে অধিকতর বাঙালি নিয়োগ, পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর বিনিয়োগ এবং কতিপয় কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর দাবি করে। জামায়াতে ইসলামী চায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন এবং তাতে কতিপয় সংশোধনী যথা এক ইউনিট ভঙ্গ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, উপজাতীয় এলাকাকে অন্যান্য জেলার সঙ্গে একীভূতকরণ এবং জাতীয় সংহতি রক্ষা করে অধিকতর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

সারণি ৭.২

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দল ও প্রার্থী (মহিলা আসন বাদ দিয়ে)

দল	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প. সীমান্ত	বেলুচিস্তান	মোট
মোট আসন	১৬২	৮২	২৭	২৫	৪	৩০০
আওয়ামী লীগ	১৬২	২	২	২	১	১৬৯
জামায়াতে ইসলামী	৬৯	৪৩	১৯	১৫	২	১৪৮
কাইয়ুম মুসলিম লীগ	৬৫	৩৪	১২	১৭	৪	১৩২
কনভেনশন মুসলিম লীগ	৯৩	২৪	৬	১	-	১২৪
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	৭৭	২৫	১৬	১	১১৯
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৫০	৫০	১২	৫	২	১১৯
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	৮১	২১	৩	২	১	১০৮
হাজবাড়ি জমিয়তই উলামা ইসলাম	১৩	৪৭	২০	১৯	৪	১০৩
ওয়ালি ন্যাপ	৩৬	-	৬	১৬	৩	৬১
থানভী মরকজি জামাতে ইসলাম নিজামী	৪৫	৪	১	২	-	৫২
জমিয়তে উলামা এ পাকিস্তান	-	৩৮	৮	১	-	৪৭
ভাসানী ন্যাপ	১৫	২	২	-	১	২০
পাকিস্তান ন্যাশনেল লীগ	১৩	-	-	-	-	১৩
সিন্দ করাচি মোহাজির পাঞ্জাবি পাঠান	-	১	৫	-	-	৬
ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি	৫	-	-	-	-	৫
জাতীয় গণমুখী দল	৪	-	১	-	-	৫
পাকিস্তান ন্যাশনেল কংগ্রেস	৪	-	-	-	-	৪
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৩	-	-	-	-	৩
মাসিহি লীগ	-	১	১	১	-	৩
খাকসার তেহরিক	-	২	-	-	-	২
জমিয়তে আহলে হাদিস	-	২	-	-	-	২
বেলুচিস্তান ইউনাইটেড ফ্রন্ট	-	-	-	-	১	১
পাখতুনিস্থান ন্যাপ	-	-	-	১	-	১
পাকিস্তান দরদী সংঘ	১	-	-	-	-	১
সিন্ধু ইউনাইটেড ফ্রন্ট	-	-	১	-	-	১
স্বতন্ত্র	১০৯	১১৪	৪৬	৪৫	৫	৩১৯
মোট দলীয় প্রার্থী	৮২১	৪৩০	১৫১	১২৩	২৪	১৫৪৯

উৎস : *The Dawn*, ২০ নভেম্বর ১৯৭০, করাচি, ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৬৯ লাখ।

নির্বাচনী তৎপরতা চলাকালে ইয়াহিয়া সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণে মনোনিবেশ করে। এ নিয়ে নানারকম আপত্তি ওঠে। একদলের অভিমত ছিল যে, তৃতীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দারুণভাবে ব্যাহত হওয়ার ফলে একে দুই বছরের জন্য বাড়িয়ে দেয়া যায়। আর এক অভিমত ছিল একটি বার্ষিক উন্নয়ন

কার্যক্রম তৈরি করে বাকি কাজ নতুন সরকারের জন্য রেখে দেয়া দরকার। আর এক অভিমত ছিল যে, স্বায়ত্তশাসনের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গতি নেই, তাই কাজটি স্থগিত রাখা দরকার। পাকিস্তানে যে দুটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট রয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিকল্পনা যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় তাতে কোনো দ্বিমত ছিল না। কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন সহযোগিতার ব্যাপারে পাকিস্তানের সনাতনী নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা ছিল, যেমন ভূমি ব্যবস্থা, শিল্প জাতীয়করণ, শ্রমনীতি, কৃষি উন্নয়ন কৌশল বা প্রশাসন ব্যবস্থা। এই সব কারণে পরিকল্পনার চূড়ান্তকরণ কেউই পছন্দ করে নি। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা বললেন যে, এর কাঠামো খুবই নমনীয় এবং সহজেই এর সংশোধন করা যাবে। কিন্তু আসলেই পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ হয় সনাতনী কায়দায়। যেমন কোনো দলই ব্যাঙ্ক ও বীমাকে ব্যক্তিমালিকানা খাতে দেখতে চায় নি কিন্তু পরিকল্পনায় এই সর্বসম্মত অভিমতের কোনো প্রতিফলন ছিল না। পাকিস্তানের দুই স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিটেরও কোনো স্বীকৃতি এতে ছিল না। শেখ মুজিব অধৈর্য হয়ে ঘোষণা করলেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই পরিকল্পনা প্রণয়নের কোনো অধিকার নেই এবং প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই পরিকল্পনা নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে।[৮]

জুলাই-আগস্টে পূর্ব পাকিস্তানে খুব বড় রকমের বন্যা হয়ে গেল। উনিশটি জেলার মধ্যে পনেরো জেলাতে প্লাবন হলো। ডানপন্থী দলগুলো এই সুযোগে নির্বাচন পেছানোর দাবি তুললো। তাদের ধারণা ছিল এ সময়ে তাদের সমর্থন বাড়তে পারে। চরম বামপন্থীরাও এতে সায় দিল, তারা অবশ্য কোনো নির্বাচনই মানতে রাজি ছিল না। ইয়াহিয়া প্রথমে এই দাবিতে কান দিলেন না কিন্তু ১৫ আগস্ট তিনি ঘোষণা করলেন যে, বন্যার কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হলো। আওয়ামী লীগ ও পিপিপি দুইটি দলই নির্বাচন পেছাতে চায় নি, তাই তাদের দাবি হলো আর যেন তারিখ পরিবর্তন না হয়। তাদের ভয় ছিল যে নির্বাচনটাই-না বানচাল হয়ে যায়। একদল আমলা ও সেনাপতি নির্বাচন বানচাল করার জন্য মন্ত্রী জেনারেল শের আলীর নেতৃত্বে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাও অবিদিত ছিল না। নির্বাচনকে যখন আর ঠেকানো গেল না তখন এই মন্ত্রী ১৪ ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন। নির্বাচন ঠেকানোর ইতিহাসটি ছিল খুবই কদর্য। ১৯৫৪ সালে বগুড়া-নিশতার সমঝোতায় যখন সংবিধান রচনা প্রায় সমাপ্ত এবং জাতীয় নির্বাচনের তারিখও ঠিক হয়ে গেছে, তখনই গণপরিষদ বাতিল হয়ে গেল। আবার ১৯৫৬-তে যখন সংবিধান প্রবর্তিত হলো এবং বারবার পরিবর্তন করে অবশেষে নির্বাচনের একটি তারিখ নির্ধারিত হলো তার ঠিক চার মাস আগে সামরিক আইন জারি হয়ে গেল। তাই ১৯৭০-এ যে নির্বাচন হবে তা নিয়ে অনেক সন্দেহ ছিল। ঢাকায় প্রকাশিত *ফোরাম* সাপ্তাহিকীতে এই আশঙ্কাটি যথার্থই বিবৃত হয়। "এমনিতেই শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনে নয়, সারা দেশে তথা সারা বিশ্বে, নির্বাচন সত্যি সত্যি যে অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে রয়েছে গভীর সন্দেহ।"[৯]

দ্বিতীয় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ব পাকিস্তানে তোলপাড় সৃষ্টি করলো ১৯৭০-এর ১২ নভেম্বর। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় সোয়া দুইশ' কিলোমিটার বেগে একটি ঘূর্ণিঝড় ৫৪০০ বর্গমাইলের (দেশের এক-দশমাংশ) বসতি, গাছপালা, পশুপাখি সব ধ্বংস করে দেয়। তিরিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় হাজার হাজার জনমানব। প্রায় অর্ধ কোটি জনতা হয় বিপর্যস্ত এবং প্রায় পাঁচ লাখ জীবনহানি ঘটে। দুর্যোগ যে কত মারাত্মক পাকিস্তান সরকার প্রথমে তা স্বীকারই করতে চাইলো না। ইয়াহিয়া চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৪ নভেম্বর ঢাকায় যান এবং উপকূলীয় এলাকা বিমানে দেখে আসেন। তিনি সামান্য অনুদান ঘোষণা করে ১৬ নভেম্বর পিন্ডি চলে গেলেন। ত্রাণ কাজে সহায়তার জন্য এগিয়ে এলো সারা বিশ্ব। বৃটিশ ও মার্কিন নৌবাহিনী মানুষকে উদ্ধার ও মৃত মানুষের দাফনে লিপ্ত হলো। কিন্তু পাকিস্তানিদের দেখা মিললো না। ঢাকায় ত্রাণসামগ্রী পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এসে স্তূপীকৃত হলো; কিন্তু তা বিতরণের জন্য পাকিস্তানি বিমান বা হেলিকপ্টার পাওয়া গেল না। মার্কিন ও সোভিয়েত হেলিকপ্টার হলো তৎপর কিন্তু পাকিস্তানের খবর নেই। ইরান জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করে তেহরান ও ঢাকার মধ্যে বিমান ফেরি শুরু করলো কিন্তু পাকিস্তানের তাতেও টনক নড়লো না। প্রাদেশিক সরকার অবস্থার মোকাবিলায় হিমশিম খেয়ে গেল। ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় সংবাদপত্র বলে চললো, 'সত্য গোপন করা কেন?' 'সামরিক বাহিনী কোথায়?' 'ট্রান্সপোর্ট প্লেন বা হেলিকপ্টারের কি হলো?' দশদিন পর ২১ নভেম্বর দুটো ট্রান্সপোর্ট প্লেন ও একটি হেলিকপ্টার পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকায় পাঠালেন। ২২ নভেম্বর দুইজন ব্রিগেডিয়ার মাইজদি ও পটুয়াখালিতে ক্যাম্প করলেন। বিশ্ব সংবাদ মাধ্যম ত্রাণ সাহায্যের জন্য আবেদন করলো, কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তেমন আবেদন জানানো হলো না। ২২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১১ জন নেতা প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া সরকারের ব্যর্থতার নিন্দা করলেন। পরের দিন মওলানা ভাসানীও তাঁর উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন যে, কোথায় রয়েছে জাতীয় সংহতি ও একাত্মতার প্রবক্তা পাকিস্তানিরা। ইয়াহিয়া অবশেষে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় এলেন এবং ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করে ত্রাণ কাজে দক্ষতা আনতে প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু খবরে প্রকাশ হলো যে, ৫ ডিসেম্বর প্রায় এক মাস পরেও অনেক এলাকায় কোনো ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে নি।[১০] এই দুর্যোগে সারা বিশ্ব আগ্রহ ভরে সাড়া দেয়। প্রায় সাড়ে সাত কোটি ডলারের সাহায্য এই উপলক্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাহায্যের ব্যবহার ততো দক্ষতার সঙ্গে হতে পারে নি। কি হারে বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় পরিবর্তন করা হবে তা নিয়ে গোলমাল বাধালো আমলাতন্ত্র। আবার ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নানা প্রকল্প অনুমোদনেও কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসি অর্থ সাহায্যের ব্যবহার বিঘ্নিত করলো।[১১]

দুর্যোগের সময় পাকিস্তানের আচরণ বাঙালিদের খুব ব্যথিত করে। দুর্যোগের ভয়াবহতা স্বীকারে সরকারের গড়িমসি, ত্রাণ কাজে এগিয়ে আসতে অনীহা, সামরিক বাহিনীর লোকজনের দুর্ব্যবহার এবং পদে পদে বাধাবিপত্তি বাঙালিদের খুব তিক্ত করে

তোলে। ২৬ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বললেন যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা ক্ষমার অযোগ্য। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করলেন যে, তারা বাঙালির দুর্দিনে সহানুভূতি দেখায় না, সাহায্য করা তো দূরের কথা। তিনি বলেন, এই অবস্থায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি বলেন, "জনগণকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে তা হতে পারে আর নির্বাচন যদি বানচাল হয়ে যায় তাহলে জাগ্রত জনতার শক্তি দিয়ে তা নিতে হবে। জনগণ তাদের সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে নিয়ে নিয়েছে। তাদের ভোট তারা এক হিসেবে দিয়েই দিয়েছে। 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের' অনেক হয়েছে। 'জাতীয় সংহতির' নামে অনেক অনাচার-অত্যাচার চলেছে। স্বায়ত্তশাসনের জন্য মানুষের দাবি আর অস্বীকার করা যাবে না। যেসব শাসক মনে করেন যে, জনতার ইচ্ছা অবজ্ঞা করা যাবে তাদের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। বাংলাদেশ এখন জাগ্রত। নির্বাচন ব্যাহত না হলে সেখানে তাদের রায় তারা দেবে। যদি নির্বাচন বানচাল হয় তাহলে শহীদের স্মৃতির খাতিরে বাংলাদেশকে আরো লাখ লাখ জীবন দিতে হবে; কিন্তু আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।" আশঙ্কা ছিল যে নির্বাচন হয়তো আরো পিছিয়ে যাবে। যাই হোক পরের দিনই ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, নির্বাচন ঠিক সময়ে (৭ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ নির্বাচন ১৯৭০-৭১

পাকিস্তানের তেইশ বছরে প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের আগে শুধু প্রাদেশিক নির্বাচন হয় এবং সামরিক শাসনের অধীনে সব নির্বাচন হয় পরোক্ষ ভোটে। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ২৯১টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর হয় প্রাদেশিক পরিষদের ২৭৯টি আসনে। ১৭ জানুয়ারিতে উপকূলীয় এলাকায় ৯টি জাতীয় পরিষদের ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে এনপিএল এবং ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেন। তারা বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এক পাকিস্তানের কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে দুইটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক সঙ্গে থাকার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রয়োজনীয়। ভোটদানে উৎসাহ ছিল প্রচুর। পূর্ব পাকিস্তানে ৫৭, পাঞ্জাবে ৬৯, সিন্ধুতে ৬০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৮ এবং বেলুচিস্তানে ৪০ শতাংশ ভোট প্রদত্ত হয় এবং ৩ শতাংশ ভোট বাতিল হয়ে যায়।[১২] শান্তিপ্রিয় পরিস্থিতিতে ভোট প্রদান সম্পন্ন হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে সরাসরি ছয় দফার সমর্থনে ভোট হয়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬০টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন লাভ করে। প্রদত্ত ভোটের ৮২ শতাংশ আওয়ামী লীগ পাওয়ায় বেশির ভাগ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

হয়। জাতীয় পরিষদে অন্য দুইজন সদস্য হন পিডিপির বর্ষীয়ান নেতা নুরুল আমিন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়। এঁরা দুইজনই পরবর্তীকালে পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না যে, বাঙালিরা নিজেদের দেশে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ চায় না। ছয় দফার সমর্থনে ছিল দ্ব্যর্থহীন ম্যান্ডেট। ৩ জানুয়ারি এক নির্বাচনী বিজয় সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, "সংবিধান রচনায় আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। কিন্তু মৌলিক নীতিতে কোনো ছাড় দেয়া যাবে না।" ছয় দফা নিয়ে আর দর কষাকষির কোনো সুযোগ রইলো না।[১৩] পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল ছিল ভিন্ন রকমের, কোনো দলই সেখানে ম্যান্ডেট পেল না। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দেখা দিল। ভুট্টোর ব্যক্তিগত আকর্ষণ, তাঁর ভারতবিদ্বেষী বিষোদ্গার এবং 'রুটি কাপড় মাকানে'র আহ্বান তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলো। ওয়ালি ন্যাপ বেলুচিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো আর সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালি ন্যাপ আর কাইয়ুম মুসলিম লীগ আসন ভাগ করে নিল। ডানপন্থী ধর্মীয় দল সবখানে ব্যর্থ হলো। জামায়াতে ইসলামী করাচির মোহাজের মহলে সমর্থন পেল কিন্তু তাদের প্রধান ঘাঁটি পাঞ্জাবে পরিত্যক্ত হলো। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে ব্যক্তিগত আকর্ষণই ছিল সাফল্যের নিয়ন্তা। ভুট্টো এগিয়ে এলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে। জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের ৮৩টি পায় তাঁর পিপিপি। পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদে হয় তাঁর বড় সাফল্য—১৮০ জনের মধ্যে ১১৩ জন, অথচ সিন্ধুতে তিনি কোনো মতে পার পান, ৬০ জনের মধ্যে ৩২ জন। সারণি ৭.৩-এ নির্বাচনী ফলাফল উপস্থাপন করা হলো।

নির্বাচনী ফলাফল ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

আওয়ামী লীগের জন্য দেশে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা রইলো না। ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদে তারা একাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৬৭ আসন)। এছাড়া তারা পিডিপি, ওয়ালি ন্যাপ এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থনে আরো ১৫ জন প্রতিনিধিকে দলে টানতে পারতো। পিপিপি জাতীয় পরিষদে বৃহত্তর বিরোধী দল হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের দুইটি প্রদেশে তাদের অস্তিত্বই প্রায় ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অতি সহজেই কেন্দ্রে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী এই ফলাফলে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। বাঙালিদের বিভেদ এবং ঐক্যের অভাব ছিল তাদের আধিপত্যের ভিত্তি, এবারে সে সুযোগ আর রইলো না। তারা কখনো ভাবে নি যে, আওয়ামী লীগ এত জনপ্রিয়। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে ইয়াহিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার আবদুর রশিদ মন্তব্য করেন যে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৬০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে।[১৪] সামরিক মহলে এবং বিদেশি কূটনৈতিক মহলেও এই ধারণা পোষণ করা হতো। নতুন অবস্থায় কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো। আওয়ামী লীগের ওপর শুরু হয় সাঁড়াশি আক্রমণ। বুদ্ধিজীবী মহল, সাংবাদিক বা আমলা সবাই বলতে শুরু করলেন যে তিনটি বিষয় নিয়ে কি করে একটি

জাতীয় সরকার চলতে পারে। সামরিক বাহিনী সক্রিয়ভাবে ছয় দফা প্রতিহতের প্রচেষ্টায় মেতে উঠলো। সব রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ এলো। সামরিক শক্তির প্রধান সহযোগী হলেন ক্ষমতালোলুপ ভুট্টো। তিনি গোপনে সামরিক নেতা পীরজাদা, গুল হাসান, হামিদ এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি আবদার করলেন যে, তিনি বিরোধী দল হিসেবে আসন নেবেন না, তিনি ক্ষমতার অংশীদার হবেন। তাঁর যুক্তি হলো যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাব হলো ক্ষমতার ঘাঁটি এবং এই দুই প্রদেশের নেতা হিসেবে ক্ষমতায় তাঁকে ভাগ দিতে হবে।[১৫] চারদিন পর তাঁর বক্তব্যের ধুয়ো ছিল একই কথা, তাঁকে ক্ষমতায় ভাগ দিতে হবে। এবারে তিনি এক উদ্ভট দাবি করে বসলেন যে, দেশে দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আছে এবং তাই ক্ষমতায় ভাগাভাগি হতে হবে।[১৬] ভুট্টো আসলে পাকিস্তানের বিভক্তি ততদিনে করে সেরেছেন। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তিনদিনব্যাপী আলোচনা শেষে ঘোষণা করলেন যে, সংবিধান রচনায় বিপত্তি অনতিক্রমনীয় নয়, তবে তাঁর সময়ের দরকার। আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট ছিল শক্তিশালী ও দ্ব্যর্থহীন কিন্তু তাঁর দলের তেমন কোনো অবস্থান নেই এবং ছয় দফার ব্যাপারে তাঁরা কোনো দ্ব্যর্থহীন অভিমতও দেন নি।[১৭] পশ্চিম পাকিস্তানি সব মহল থেকে প্রচার চললো যে, শেখ মুজিব ছয় দফার নিশ্চয়ই কিছু ছাড় দেবেন এবং সামরিক বাহিনীকে জাতীয় সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব কখনো না দিয়ে পারবেন না। কিন্তু এই প্রচারণার কোনো ভিত্তি একেবারেই ছিল না। কারণ শেখ মুজিবের প্রতিটি বিবৃতিতে ছয় দফা বারবার সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়।

সারণি ৭.৩ ক.

নির্বাচনে ফলাফল ১৯৭০-৭১ (জাতীয় পরিষদ)

দল	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	সীমান্ত	বেলুচিস্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০						৭	১৬৭
পিপিপি		৬৪	১৮	১			৫	৮৮
কাইয়ুম লীগ		১	১	৭				৯
কাউন্সিল লীগ		৭						৭
হাজারভী জমিয়ত				৬	১			৭
থানবী জামাত		৪	৩					৭
ওয়ালি ন্যাপ				৩	৩		১	৭
জামায়াতে ইসলামী		১	২	১				৪
কনভেনশন লীগ		২						২
পিডিপি	১							১
স্বতন্ত্র	১	৩	৩			৭		১৪
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

সারণি ৭.৩ খ.

নির্বাচনী ফলাফল ১৯৭০-৭১

প্রাদেশিক পরিষদের মহিলা আসনে নির্বাচন হয় নি

দল	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	সীমান্ত	বেলুচিস্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	২৮৮							২৮৮
পিডিপি	২	৪						৬
ওয়ালি ন্যাপ	১			১৩	৮			২২
জামায়াতে ইসলামী	১	১	১	১				৪
থানবী জামাত	১							১
পিডিপি		১১৩	৩২	৩				১৪৮
কাউন্সিল লীগ		১৫	৫	১				২১
কাইয়ুম লীগ		৬	৪	১০	৩			২৩
কনভেনশন লীগ		৬		২				৮
আহলে হাদিস		১						১
হাজারভী জমিয়ত		২	-	৪	২			৮
জমিয়তে আহলে সুন্না		৪	৭					১১
সিন্ধু এমপিপিএমএম			১					১
পাখতুনিস্তান ন্যাপ					১			১
বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট					১			১
স্বতন্ত্র	৭	২৮	১০	৬	৫			৫৬
মোট	৩০০	১৮০	৬০	৪০	২০			৬০০

সূত্র : পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডি.সি, *Pakistan Affairs* ১৫ জানুয়ারি ১৯৭১। ভারত সরকার, পররাষ্ট্র দফতর : *Bangladesh Documents,* প্রথম খণ্ড, নয়াদিল্লি, পৃ. ১৩০।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে নমনীয় করার জন্য দুমুখী অভিযান শুরু হলো। তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখানো হলো। আমলা ও অর্থনীতিবিদরা বলতে শুরু করলেন যে, এবারে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের পালা এবং এতে বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা জরুরি। একই সঙ্গে সামরিক বাহিনীর দাবি সম্বন্ধেও ভয় দেখানো হলো। সামরিক বাহিনী প্রদেশের বাজেট অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। সম্পদের ওপর তাদের নিজেদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের খাতিরে ফেডারেল সরকারের রাজস্ব ক্ষমতার প্রয়োজন। জেনারেল ইয়াহিয়া ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে এই দুইটি বিষয়েই তাঁকে সাবধান করে দেন। সাংবিধানিক সমঝোতার ব্যাপারে তিনি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ছাড়ার প্রাক্কালে তিনি জানান যে, তাঁর আলোচনা সন্তোষজনক এবং তিনি প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৮]

জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ জেনারেল ইয়াহিয়া ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে লারকানা গেলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন জেনারেল হামিদ এবং পীরজাদা। তারপরই ভুট্টো ঢাকায় বঙ্গবন্ধু সঙ্গে দেখা করেন এবং ছয় দফা বিবেচনার জন্য সময় চান। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সহসা সামরিক রসদ সংগ্রহে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে পাকিস্তান চীন ও ফ্রান্স থেকে যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করতে থাকে। সর্বশেষে রাশিয়ার সঙ্গেও রসদ সরবরাহের জন্য সমঝোতা হয়। কিন্তু ১৯৭০-৭১ সালে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে উদার হাতে সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ কেনা হয়। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল ৩২৩ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু ১৯৭১-এর মার্চে তা নেমে হয় ১৮৪ মিলিয়ন ডলারে। অথচ এই সময়ে রফতানি ও আমদানি দুই ক্ষেত্রেই ছিল মন্দা এবং সঞ্চয়ে যুক্ত হয় ৪২ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ সাহায্য এবং ৩৫ মিলিয়ন ডলারের এস.ডি.আর-এর হিস্যা।[১৯] ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি চলে। আগেই জানা গেছে যে, ১৯৬৯ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বৃহত্তম বিস্তারণ হয়। এই শক্তি ক্রমাগত বাড়ানো হতে থাকে। প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি মোকাবিলার জন্যই এই উদ্যোগ চলে। একই সঙ্গে দেশে একটি যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে। জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ দুইজন কাশ্মিরি মুসলমান একটি ভারতীয় ফকার বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে আসে। সেখানে ভুট্টোর মধ্যস্থতায় যাত্রী ও ক্রুদের মুক্ত করা হয় ৩১ জানুয়ারি; কিন্তু ছিনতাইকারীরা বিমান ছাড়তে রাজি হলো না। তাদেরকে বীর মোজাহিদ হিসেবে অভিনন্দন জানানো হলো এবং তারা খুব ঘটা করে ২ ফেব্রুয়ারি বিমানটি পুড়িয়ে দিল। ভারত ছিনতাইকারীদের নিতে চাইলে তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করা হলো। ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানের মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা, ছিনতাইকারীদের ফেরত ও বিমানের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করলো এবং ভারতের আকাশসীমায় পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বানচাল করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে এই ঘটনা নানা মহলে চিহ্নিত হলো। বঙ্গবন্ধু এই বিষয়ে অনুসন্ধান দাবি করলেন এবং পরিবেশকে ঘোলাটে করতে মানা করলেন।[২০] ইয়াহিয়া ৫ ফেব্রুয়ারি জানালেন যে, দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অজুহাতে সারা ফেব্রুয়ারি জুড়ে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও রসদের ফেরি চললো। মাস শেষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় সামরিক ঘাঁটি বসলো এবং যোগাযোগ ও সম্প্রচার কেন্দ্র সর্বত্র সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত হলো। সামরিক উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে নমনীয় করা। বিমান ছিনতাই ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক ঘাঁটি বানাতে সাহায্য করলো, কিন্তু জনমনে ভারত বিদ্বেষ বা যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি হলো না। তখন শুরু হলো ষড়যন্ত্রের এক বিকল্প ধারা। বীর মোজাহিদদের ছিনতাই হয়ে গেল আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় ভারতের একটি সঙ্কট

সৃষ্টির প্রয়াস। শেখ মুজিব বিষয়টির তদন্ত চেয়েছিলেন কিন্তু সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা এক বাক্যে তাঁর সমালোচনা করে। এখন সামরিক সরকারই তদন্ত শুরু করলো এবং তদন্তকারী হলেন জান্তার সদস্যবৃন্দ। এপ্রিলের মাঝামাঝি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় যে, ছিনতাই ভারতীয় অনুচররা সম্পন্ন করে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি সঙ্কট সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে বিদ্রোহ করতে সুযোগ দান। যাদের মোজাহিদ বলে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় এবং বীর হিসেবে সংবর্ধনা দেয়, তাদের সহজেই ইয়াহিয়া জান্তা ভারতীয় অনুচর বানিয়ে দিল, তবে তাদের কখনো ভারতের হাতে সমর্পণ করা হলো না বা কোনো শাস্তি দেয়া হলো না। পুরো তদন্ত ছিল শঠতাপূর্ণ এবং প্রতিবেদন ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট, তবে কল্পনার দৌড়টা হয়ে গিয়েছিল একেবারেই অবিশ্বাস্য।[২১]

জাতীয় সংসদের অধিবেশন নিয়ে জটিলতা

নির্বাচন সম্পন্ন হলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য জোর দেন। অন্যদিকে ভুট্টো অধিবেশনকে বিলম্বিত করবার কৌশল গ্রহণ করেন। জানুয়ারিতে নানা আলাপ-আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়ে সহজেই ছয় দফাভিত্তিক একটি সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হবে। ভুট্টোর সমস্যা হলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও তিনি তাতে প্রান্তিক ভূমিকায় নিক্ষিপ্ত হতে পারেন। ক্ষমতালোলুপ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভুট্টো এজন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল, চীনা সংযোগ এবং পাক-ভারত যুদ্ধে তাঁর দুমুখী ভূমিকা তাঁকে সেনাবাহিনীর অনেকের কাছেই খুব গ্রহণযোগ্য করে তোলে। জেনারেল ইয়াহিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন যে, মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর তৎপরতা দেখা গেল। তিনি অধিবেশন বয়কটের আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন যে, ছয় দফার দুর্বল ফেডারেল সরকার গ্রহণযোগ্য নয়; মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য এবং কর ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারভুক্ত হতে হবে। এইসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি না পেলে তিনি অধিবেশনে যাবেন না। অধিকন্তু ভারত-পাকিস্তানের তৎকালীন নাজুক সম্পর্ক বিবেচনা করে তিনি ঢাকায় যেতে পারবেন না। সেখানে গিয়ে তাঁর একদিকে ভারতের এবং অন্যদিকে আওয়ামী লীগের জিম্মি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একই সঙ্গে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য প্রতিনিধিদের হুমকি দিলেন যে, তাঁরা ঢাকায় যেতে পারেন; তবে তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে যে তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[২২] প্রকাশ্য পরিষদ অধিবেশনে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলবে না এবং ভুট্টো দর কষাকষি করতে পারবেন না—এই ছিল তাঁর প্রকৃত আশঙ্কা। ভুট্টোর আক্রমণ আরো তীব্র হতে থাকলো। ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকার পরিষদ অধিবেশনকে 'কসাইখানা' আখ্যায়িত করলেন।[২৩] পরবর্তী দিনে তিনি বললেন যে, দেশে তিনটি

শক্তি আছে— যথা আওয়ামী লীগ, পি.পি.পি ও সামরিক বাহিনী এবং শেখ মুজিবকে অন্য দুই শক্তির সঙ্গে সমঝোতায় পৌছতে হবে।[২৪] তাঁর মোক্ষম অস্ত্র তিনি নিক্ষেপ করেন ২৮ ফেব্রুয়ারি। তিনি বলেন যে, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা দিচ্ছেন না। ইয়াহিয়ার সামনে দুইটি বিকল্প রয়েছে, একটি হলো পরিষদ অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া আর অন্যটি হলো সংবিধান রচনায় ১২০ দিনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া।[২৫] ভুট্টোর এই হুঙ্কার কিন্তু অন্য কারো সমর্থন পেল না। নুরুল আমিন (পিডিপি) ভুট্টোর জিম্মি বিষয়ক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এটি অতি নিন্দনীয় বক্তব্য। জামায়াতে ইসলামীর মওলানা মওদুদি এবং পিডিপির নবাবজাদা নসরুল্লাহ পরিষদের বাইরে দর-কষাকষির প্রস্তাবকে ষড়যন্ত্রমূলক বলে বিবেচনা করেন।[২৬] শুধু কাইয়ুম মুসলিম লীগ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো দলই ভুট্টোর ডাকে সাড়া দিল না। মার্চের শুরুতে দেখা গেল প্রায় ৪০ জন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদানের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তবে জেনারেল উমর তাঁদেরকে এই উদ্যোগ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন।[২৭]

ইয়াহিয়া জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার পর লারকানায় ভুট্টোর আস্তানায় যান ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেখানে জমে শিকার এবং ভুট্টো ঐ আসরেই তাঁর খেলা নির্ধারণ করেন। আওয়ামী লীগ, পিপিপি আর সামরিক বাহিনী যে তিন দল সেই ধারণা সেখানেই দেয়া হয়। তিনি যে পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র নেতা সেই দাবি তিনি তখনই করেন। তাঁকে ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না তাও তিনি সেখানেই স্পষ্ট করেন। তাঁর কৌশল তিনি তখনই ঠিক করে নেন। ইয়াহিয়ার উপদেশে তিনি ঢাকায় যান এবং তখনই জানিয়ে দেন যে, ছয় দফা বিবেচনার জন্য তাঁর সময়ের প্রয়োজন। ফিরে এসে তিনি জনসভায় উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পান, এই কাজে তাঁর বিশেষ দক্ষতাও ছিল। একই সাথে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বস্তুত লারকানায় নির্ধারিত হয়ে যায়। ইয়াহিয়ার হয়তো তখনো ধারণা ছিল তিনি রেফারির আসনে আছেন যদিও তাঁর জান্তা ততদিনে ভুট্টোর সাথে হাত মিলিয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কথা বলে যান। ইয়াহিয়া তারপরেও ১৩ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের ঘোষণা দিলেন। ভুট্টো তখন সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ভুট্টোকে ডেকে পাঠালেন এবং তারপরেই ইয়াহিয়া রেফারির ভূমিকা ছেড়ে জান্তার নেতার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। পরদিন তিনি আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন করলেন ভুট্টোর সাথে। যে-কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রথম অধিবেশনের আগেই পদত্যাগ করতে পারেন। ভুট্টো তাঁর দলের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই সংশোধনটি চান। ২১ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভাকে বিদায় দিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি দুই অংশ থেকে তাঁর সব সহযোগীকে নিয়ে সম্মেলন করলেন এবং তিনি যে পরিষদ অধিবেশন পিছিয়ে দেবেন সেই সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।[২৮] বঙ্গবন্ধুর এই চক্রান্তের কথা জানার কোনো উপায় ছিল না। তিনি

২৪ ফেব্রুয়ারিতে সংসদ অধিবেশনের গুরুত্বের কথা বললেন। তিনি ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা বললেন। তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তান অন্যের ওপর সংবিধান জোর করে জারি করবে না, তবে মৌলিক নীতিতে ছাড় দেয়া যাবে না। তিনি ভুট্টোর চালিয়াতিতে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সাবধান করে দিলেন যে জনতা ধোঁকাবাজি সহ্য করবে না।[২৯] ঠিক এই সময়েই তড়িঘড়ি করে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ভুট্টো নাকি ইয়াহিয়াকে উপদেশ দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ঠাণ্ডা করবার জন্য একটি সামরিক অপারেশন দরকার।[৩০]

২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জানানো হলো যে, পরের দিন ইয়াহিয়া পরিষদ অধিবেশন পিছিয়ে দেবেন। তিনি এতে আপত্তি করেন এবং জানতে চান যে, পরিবর্তিত কোনো তারিখ ঘোষণা করা হবে কি না। ইয়াহিয়া ভালোভাবেই জানতেন যে অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতবি করা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না, কিন্তু সামরিক অপারেশনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাঁর এটা প্রয়োজন। ১ মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদ অধিবেশন পিছিয়ে দিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল দুইটি—প্রথমত, ভুট্টোর বয়কটের ঘোষণা এবং দ্বিতীয়ত, পাক-ভারত উত্তেজনা। একই সঙ্গে ইয়াহিয়া সামরিক শাসনের কড়াকড়ি প্রয়োগ করলেন। গভর্নর এডমিরাল আহসানকে অবসর দেয়া হলো। সংবাদ মাধ্যমের ওপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ হলো। সব প্রদেশেই সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা সামরিক প্রশাসকদের হাতে অর্পণ করা হলো। তিনি বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতিবিদদের সমঝোতায় পৌঁছবার সুযোগ করে দেয়া।[৩১] কিন্তু তিনি এই সমঝোতা প্রকাশ্য পরিষদ অধিবেশনে চান না, ভুট্টোর সুবিধার্থে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণা যখন প্রচারিত হলো তখন ঢাকায় পূর্বাণী হোটেলে পরিষদ অধিবেশনের প্রস্তুতি হিসেবে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভা চলছিল। খবর শুনেই হাজার হাজার জনতা হোটেলের চারপাশে জড়ো হতে থাকলো, তারা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে নির্দেশ চায়। সংসদীয় দলের সভা থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করলেন। তিনি ৩ মার্চ হরতাল ঘোষণা করলেন এবং জানালেন যে, ৭ মার্চে একটি জনসভায় তিনি পরবর্তী কার্যক্রম ঘোষণা করবেন।[৩২] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একদিকে ইয়াহিয়াকে শোধরানোর সময় দিলেন, অন্যদিকে নিজের রাস্তা ঠিক করবার জন্যও সময় নিলেন। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান ইয়াহিয়ার এই ঘোষণায় ক্ষোভ ও ক্রোধে ফেটে পড়লো। তাদের ধারণা হলো, ক্ষমতা হস্তান্তর রদ করার জন্য এই হলো পশ্চিম পাকিস্তানের, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী ও ভুট্টোর ষড়যন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার যেসব প্রতিনিধি ছিলেন তারা কিন্তু ২২ ফেব্রুয়ারিতেই এই ধরনের তীব্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ইয়াহিয়াকে অবহিত করেন এবং ইয়াহিয়া জান্তা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আমল দেন নি।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের কবর রচনা করলেন। বাঙালিরা মনে করলো, তাদের ক্ষমতালাভের শেষ সুযোগটি বানচাল হয়ে গেল। এই ঘোষণাটির পেছনে দুটি বিবেচনা কাজ করে। একটি

ছিল ভুট্টোর ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয়। ভুট্টোর প্রধান সমস্যা ছিল আওয়ামী লীগের অপ্রত্যাশিত বিজয় তাঁকে ক্ষমতার বলয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ। তিনি বঙ্গবন্ধুকে জানুয়ারি মাসে প্রস্তাব দেন, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে উপ-প্রধানমন্ত্রী করা হোক। আবার আগস্টে তিনি ইয়াহিয়ার হাত থেকে ক্ষমতাগ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।[৩৩] পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর এইসব চক্রান্ত করবার কোনো সুযোগ ছিল না, তাই তিনি অধিবেশনে যেতে চান নি। ইয়াহিয়া জান্তার উদ্দেশ্য ছিল যে করেই হোক পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষমতাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা। আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর থেকেই তাদের চক্রান্ত শুরু হয়। তারা প্রথমে শেখ মুজিবকে নমনীয় করবার চেষ্টা চালায়। সেই অভিযান ব্যর্থ হলে তারা সামরিক অপারেশনের পরিকল্পনা করে। এই অভিযান শুরু করার জন্য বাহানার প্রয়োজন পড়ে এবং তারা নিশ্চিত ছিল যে, অধিবেশন স্থগিত করলে যে প্রতিবাদ ও আক্রোশ ফেটে পড়বে তারই সুযোগ নিয়ে অপারেশন চালানো যাবে। তাদের হিসেবে একটিই ভুল ছিল। তারা ভাবে নি সামরিক অপারেশন একটি মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করবে। বাঙালিরা যে অস্ত্র ধরবে আত্মদর্পী ও উন্মত্ত ইয়াহিয়া জান্তা তা কল্পনাও করতে পারে নি।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. পাকিস্তান তথ্য মন্ত্রণালয় : *White Paper on the Crisis in East Pakistan,* ইসলামাবাদ, আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।

২. আমেরিকায় পাকিস্তানি দূতাবাস : *Federal Intervention in Pakistan : A President Explains,* ওয়াশিংটন ডিসি, জুলাই ১৯৭১, পৃ. ২।

৩. লে. জে. গুল হাসান : *Memoirs,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯৩, পৃ. ২৫০-২৭৭।

আলতাফ গওহর : *Ayub Khan* : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮১-৪৮২।

৪. ২৮ নভেম্বরের ইয়াহিয়া খানের Address to the Nation, *The Dawn.* করাচি, ২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯।

৫. ইয়াহিয়া খানের ২৮ মার্চের জাতির উদ্দেশে ভাষণ, *Morning News,* ঢাকা, ২৯ মার্চ, ১৯৭০।

৬. পাকিস্তান আইন মন্ত্রণালয় : *The Gazzette of Pakistan, Extraordinary,* ৩০ মার্চ, ১৯৭০, ইসলামাবাদ।

৭. ইয়াহিয়া খানের জাতির উদ্দেশে ভাষণ ২৮ জুলাই ১৯৭০, *The Dawn,* করাচি, ২৯ জুলাই, ১৯৭০।

৮. The Dawn, করাচি, ৮ জুন, ১৯৭০।

৯. *Forum* : A Step Backward, ২০ আগস্ট, ১৯৭০, প্রথম খণ্ড, ৪০ সংখ্যা, ঢাকা।

১০. *পাকিস্তান অবজারভার* এবং *মর্নিং নিউজ,* ঢাকা, ১৮-২০, ২২-২৪, ২৭ নভেম্বর এবং ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

১১. নিম্নোক্ত বৈদেশিক সাহায্য মিলে

আইডিএ = ২৫ মিলিয়ন ডলার (ব্যবহৃত হয় নি)

মার্কিন এইড = ৭.৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান (আংশিকভাবে ব্যবহৃত)

বিবিধ = ৪২ মিলিয়ন ডলার (ব্যয়ের কোনো হিসাব পাকিস্তান দেয় নি)
১৯৭১ সালের মার্চের পর আরো কিছু সাহায্য পাওয়া যায় কিন্তু তার হিসেব এখানে নেই। আইডিএর ঋণ বাংলাদেশে পরে ব্যবহৃত হয়।

১২. পাকিস্তান দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি : *Pakistan Affairs*, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭১।
১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তৃতা : *পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১।
১৪. আবুল মাল আবদুল মুহিত : *স্মৃতি অম্লান*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ১৮১৯।
১৫. *পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭০।
১৬. *The Dawn*, করাচি, ২৫ ডিসম্বর, ১৯৭০।
১৭. *Pakistan Times*, লাহোর, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭১।
১৮. পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭১।
১৯. সঞ্চয়ের হিসেব পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের *International Financial Statistics*, ২৪ খণ্ড, ৩ সংখ্যা। মার্চ মাসের হিসেব ১৯৭১ সাল। এসডিআর-এর বিভাজন শুরু হয় ১৯৭০ সালে, এর উদ্দেশ্য ছিল রিজার্ভ বৃদ্ধি। ৪২ মিলিয়ন ডলার ত্রাণ সাহায্যের হিসেব ১১নং টীকায় দেয়া হয়েছে।
২০. *পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
২১. এই উদ্ভট তদন্ত প্রতিবেদনটি পাওয়া যায় রাশব্রুক উইলিয়ামসের বই *The East Pakistan Tragedy*-তে। টম স্টেসি, লন্ডন, ১৯৭২, পৃ. ১২১-২৬।
২২. *The Dawn*, করাচি, ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৭১।
২৩. *The Dawn*, করাচি, ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৭১।
২৪. পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
২৫. *Pakistan Times*, লাহোর, ১ মার্চ, ১৯৭১।
২৬. *Pakistan Observer*, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
২৭. রেহমান সোবহান : Negotiating for Bangladesh, A Participant's View, *South Asia Review*, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, লন্ডন, জুলাই ১৯৭১, পৃ. ৩১৮।
২৮. ইয়াহিয়ার বঙ্গবন্ধু সঙ্গে আলোচনা, পরে লারকানায় শিকার সম্মেলন, ভুট্টোর, ঢাকা ভ্রমণ, পরবর্তী তৎপরতা এবং অধিবেশন পেছানোর বিবরণের জন্য : হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯৪, পৃ. ১৩২-১৪৯।
২৯. *Bangladesh Observer* : ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
৩০. লে. জেনারেল গুল হাসান : *Memoirs* : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬১, ২৭২।
৩১. *Morning News* : ঢাকা, ২ মার্চ, ১৯৭১।
৩২. *The People* : ঢাকা, ২ মার্চ, ১৯৭১।
৩৩. লে. জে. গুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮, ২৭৮-২৮০।

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়

অসহযোগ আন্দোলন : মার্চের গৌরবদীপ্ত পঁচিশ দিন

সূচনা

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম পঁচিশ দিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আওয়ামী লীগ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। সর্বস্তরের জনগণের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাবিল সমর্থন এই আন্দোলন লাভ করে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই নিতে হয়। সরকারি কাঠামো ভেঙে পড়ায় শুরুতে বেশ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং এক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বেধে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে একজন নেতার আহ্বানে সারাদেশ শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলার এক নজিরবিহীন উদাহরণ স্থাপন করে। আওয়ামী লীগের প্রতিদিনের ঘোষণা জনগণকে তাদের রাস্তা বাতলে দেয় এবং তারা সব বিধিনিষেধ বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়। ক্ষমতার উৎস সত্যিকারভাবে হয় জনগণের ইচ্ছা ও সমর্থন। স্বশাসনের এই অভিজ্ঞতা ছিল অভূতপূর্ব। এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের মঙ্গলে ক্ষমতার এই প্রয়োগকে বিঘ্নিত হতে দিতে তারা চায় নি। তাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যখনই বন্দুকের জোরে ক্ষমতা প্রয়োগে লিপ্ত হলো, তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই পঁচিশ দিনের আর একটি দিক ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে সহ-অবস্থানের জন্য বাংলাদেশের শেষ প্রচেষ্টা। গণতান্ত্রিক উপায়ে, আইনের বিধানে ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সাংবিধানিক সমঝোতায় আসতে চায়। নির্বোধ ইয়াহিয়া এবং ধুরন্ধর ভুট্টো কোনো মতেই তা হতে দিলো না। আর সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্র, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা এবং সেনানায়কদের ক্ষমতার লোভ নয় মাসের জন্য বাংলাদেশে এক ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। জনতার রুদ্ররোষে দস্যুদলের হয় উৎখাত এবং গর্বিত ও সুশৃঙ্খল পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'শর্তহীন আত্মসমর্পণে' বাধ্য হয় এবং দুই বছরের বেশি সময় যুদ্ধবন্দি হিসেবে থাকে। পঁচিশ দিনের স্বশাসনের অভিজ্ঞতা, পঁচিশ দিনের গণঐক্য এবং এই

পঁচিশ দিনের আত্মবিশ্বাস না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়তো-বা প্রশ্নবোধক হতে পারতো। এই আন্দোলন দেশ ও জাতিকে দেয় সংগ্রামের মানসিকতা এবং ত্যাগ স্বীকারে বাঙালিদের প্রস্তুত করে। একই সঙ্গে লক্ষ্যের স্বচ্ছতা এবং অঙ্গীকারের দৃঢ়তা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে। আন্দোলনটি ছিল সর্বজনীন ও স্বতঃস্ফূর্ত। তার ফলে রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা রাষ্ট্রপরিচালনার আস্বাদ পায়। বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের সংযম ও সহনশীলতার আদর্শ সমুন্নত করে। বস্তুতপক্ষে মার্চ মাসের প্রথম পঁচিশ দিনেই মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী কর্মসূচি, ধারা ও গতি নির্ধারিত হয়ে যায়।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলন

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ ছিল একটি অশনি সঙ্কেত। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন দেবে না। ভুট্টো ও সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্রের যেন বহিঃপ্রকাশ হলো এই অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদের অধিবেশন বানচাল করে দেয়ায়। যে হারে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সমাহার ঘটছিল তাতে এমনিতে সামরিক অভিযানের আশঙ্কা দানা বাঁধছিল, এবার আর সন্দেহ রইলো না। প্রদেশপাল অ্যাডমিরাল আহসান ক্ষমতাধরদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় ভালো অবদান রাখেন। তাঁকে যখন বরখাস্ত করা হলো তখন জনগণ ইয়াহিয়া জান্তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুধু সন্দিহান নয়, বরং দারুণভাবে রুষ্ট হলো। আইউবের পতন আন্দোলন থেকে যে বিরুদ্ধবাদিতা বাংলাদেশে দানা বাঁধছিল এখন তা আর বাধাবিপত্তি মানতে রাজি ছিল না। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব ছিল তাঁদের উদ্যোগকে অগ্রাহ্য করা। ১৯৭০ সালে যখন প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হলো, তারপর অবাধ নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ধাপে ধাপে পরিষদ অধিবেশনের দিকে অগ্রগতি বাঙালিদের দেয় গভীর আত্মবিশ্বাস। নিজেদের দাবির যৌক্তিকতাও তাদের এই আত্মবিশ্বাসে অবদান রাখে। তাই ইয়াহিয়ার ঘোষণা যখন প্রচারিত হলো তখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে ঢাকা হয়ে ওঠে মুখর। পয়লা মার্চে স্টেডিয়ামে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা ছিল, ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে খেলাটিকেও বাতিল করে দিতে হলো। সারা শহর নয় সারা দেশ হঠাৎ প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। মিছিল, স্লোগান আর বিক্ষোভ হলো জনতার প্রতিবাদের প্রকাশ। নগরগুলোতে গণজমায়েতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ হলো, সামরিক বাহিনী মাঠে নামলো, আবার কারফিউ জারি হলো। বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন ৩ মার্চের জন্য। কিন্তু ২ মার্চেই সারা দেশ হয়ে গেল বন্ধ। ৩ মার্চে তিনি দাবি করলেন যে, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে, তারা নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা ও নিষ্পেষণ করতে পারবে না, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে পরিষদে বসে, গণতান্ত্রিক কায়দায় সংবিধান রচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীলনক্শা ইয়াহিয়া জান্তা বানচাল করে দেয়ায় এছাড়া তাঁর অন্য কোনোরকম দাবি করার সুযোগ ছিল না।

গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদে অভ্যস্ত বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশেরই একটি অবদান। রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি অতি উত্তম পদ্ধতি। এই আন্দোলনের রূপকার ছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং এর সূচনা হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, যখন তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি এই আন্দোলনের একটি দার্শনিক ভিত্তি দাঁড় করান এবং আন্দোলনের প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপদান করেন। আমেরিকায় মার্টিন লুথার কিং আন্দোলনের এই রীতি গ্রহণ করেন এবং আফ্রো-মার্কিনদের মৌলিক অধিকার আদায়ে অস্ত্রটি মোক্ষম অবদান রাখে। গান্ধীর প্রথম অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ছিল ১৯২০ সালে খেলাফত অবসান এবং জালিওয়ানালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে।[১] ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসলো। গৃহিণীরা বৃটিশ পণ্যদ্রব্য ব্যবহার ও খরিদ করা ছেড়ে দিলেন। বৃটিশ আদালতে আর মামলা রুজু হয় না। সবই অহিংস পদক্ষেপ। দাবি হলো দুটো—খেলাফতকে বহাল রাখতে হবে এবং রাওলাট আইন বাতিল করতে হবে। দাবি না মানা পর্যন্ত চলবে অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২২ সালে এই আন্দোলনে ভাটা পড়ে, কিন্তু প্রতিবাদের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে তা প্রতিষ্ঠা পায়। গান্ধী ১৯৩০ সালে আবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এবারে তাঁর দাবি ছিল লবণ শুল্ক প্রত্যাহার এবং ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস এবং এই দাবির জন্য তিনি গোল টেবিল বৈঠক বয়কট করেন।[২] আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হয়। আরউইন-গান্ধী চুক্তির পরে গান্ধী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। আন্দোলন আবার চলে কিন্তু পুরোপুরি সার্থক হয় না। ১৯৪০ সালে গান্ধী আবার অসহযোগ আন্দোলন ডাকেন। এবারে দাবি ছিল যে, 'ভারতীয়রা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ না দিতে পারে এবং অন্যকে এই যুদ্ধে সাহায্য করতে মানা করতে পারে।' প্রথমে শুরু হয় ব্যক্তির সত্যাগ্রহ, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিরা বৃটিশ সরকারের কারাবরণ করে। পরে ব্যক্তির সত্যাগ্রহ দলের সত্যাগ্রহে পরিণত হয়। দলে দলে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা কারাবরণ করেন। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি প্রায় বিশ হাজার লোক গ্রেফতার হন এবং চৌদ্দ হাজার কারাবাসে ছিলেন। ১৯৪২ সালে এই আন্দোলনই ভারত ছাড়ো ('Quit India') নামে খ্যাতি লাভ করে। ক্রমে সহিংসতা যুক্ত হলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস ও তার সহযোগী সরকারের বিরুদ্ধে আসাম, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু নির্দিষ্ট দাবি ছিল এবং আন্দোলন ছিল দাবি আদায়ের জন্য।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম কথা হলো একটি দাবিনামা ঘোষণা। নির্দিষ্ট দাবির লক্ষ্যে হলো আন্দোলন। আন্দোলন মোটামুটি শুরু হয় ধর্মঘট ও মিছিল করে। সরকারি দফতরে ধর্মঘট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে হরতাল বা যানবাহন হরতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, আদালত বর্জন, সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য। যেমন সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা কারফিউ ভাঙা। আরো কঠোর পদক্ষেপ হলো কর

প্রদান বন্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো অহিংস পদ্ধতিতে সরকারকে অচল করে দেয়া এবং সমঝোতায় আসতে বাধ্য করা। তাই এই আন্দোলনকে বলা হয় সুশীল অবাধ্যতা। অসহযোগ আন্দোলন মোকাবিলা করারও একটি পদ্ধতি গড়ে ওঠে। প্রথমে বিক্ষোভ প্রদর্শন, সমাবেশ বা মিছিলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বিধিনিষেধ ভাঙলে টিয়ার গ্যাস বা মৃদু লাঠি চালনা হয়। তবে প্রধান অস্ত্র হলো গ্রেফতার, নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা নেয়া হয় এবং এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আন্দোলন তারপরও যদি চলতে থাকে তখন সরকার প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং সমাধান খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন এই অভিজ্ঞতার আলোকেই ঘোষিত ও পরিচালিত হয়। তাঁর আন্দোলন ছিল স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে, বিনা কারণে বা অপর্যাপ্ত যুক্তিতে বিশ্বাস ভঙ্গের বিরুদ্ধে। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বক্তৃতায় তিনি সঙ্কটের জন্য ইয়াহিয়াকে দায়ী করেন, ভুট্টোকে সুযোগ দেয়ার জন্য তাঁর এই একতরফা ঘোষণা তিনি অগ্রাহ্য করেন।[৩] পয়লা মার্চের প্রতিক্রিয়া দেখে ইয়াহিয়া ৩ মার্চ এক নতুন ঘোষণা দিলেন। তিনি বারোজন নেতৃবর্গকে ১০ মার্চ ঢাকায় এক সম্মেলনে ডাকলেন এবং জানালেন যে, এই সম্মেলন শেষে পক্ষকালের মধ্যে পরিষদ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। এই সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডাকলেন শুধু দুজনকে—বঙ্গবন্ধু এবং নুরুল আমিনকে। উপজাতীয় এলাকা থেকে ডাকলেন শুধু দুইজনকে, এরা অবশ্য তাঁরই মনোনয়নে নেতা হন।[৪] পরিষদ ডিঙিয়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সম্মেলন আহ্বানটি ছিল খুবই সন্দেহজনক, মনে হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতবাহী। অধিবেশন শুরু করেই এরকম আলোচনা সভা করা যেতো। বঙ্গবন্ধু এই উদ্যোগকে একটি নিষ্ঠুর রসিকতা বলে নাকচ করে দেন। তিনি তাঁর তিনটি দাবি ঘোষণা করে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল ডাকলেন। তবে জনজীবন যাতে বিপন্ন না হয় সেজন্য হাসপাতাল, এম্বুলেন্স, সংবাদ মাধ্যম, ঔষধালয়, পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ হরতালের আওতার বহির্ভূত রাখলেন। সারাদেশ তাঁর ডাকে সাড়া দিল। পরবর্তী দিনে আরো কিছু প্রতিষ্ঠানকে হরতালের আওতামুক্ত করতে হলো। ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, দমকল বাহিনী এবং বর্জ্য কর্তৃপক্ষকে কাজ অব্যাহত রাখতে নির্দেশ দেয়া হলো। ৩ মার্চেই ভবিষ্যতের বিস্তৃত কর্মসূচির ধারণা দেয়া হয় এবং ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর চূড়ান্ত ঘোষণা দেবেন বলে জানান।

মার্চের এই পঁচিশ দিনের একটি দিনপঞ্জি পরিশিষ্ট ৬-এ তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যাবে যে, অসহযোগ আন্দোলন কীভাবে ক্রমে ক্রমে একটি সমান্তরাল সরকার গড়ে তোলে। এতে আরো দেখা যাবে যে, সূচনাতে কিছু বিশৃঙ্খলার পর বস্তুতপক্ষে ৭ মার্চ থেকেই দেশে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো অসহযোগ আন্দোলন বজায় রেখেও জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশাবলি দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা এবং জনজীবন স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয় ১৫

মার্চ। যে পঁয়ত্রিশটি মৌলিক নির্দেশ দিয়ে জীবন নির্বাহের কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয় সেগুলোকেও পরিশিষ্ট ৭-এ সংযুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, অসহযোগ আন্দোলনের মুখে ইয়াহিয়া জান্তার প্রতিক্রিয়া। যে সংলাপ ১৬ মার্চে শুরু হয় তারও বিভিন্ন পর্যায় ও ঘটনার বিবরণ এতে পাওয়া যায়।

মার্চের আন্দোলনের বিশেষত্ব

শুরুতে কিছু সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়।[৫] পয়লা ও ২ মার্চে ঢাকায় বিহারিদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের সংঘর্ষ বাধে। সেনাবাহিনীর প্ররোচনায় অবাঙালিরা উস্কানিমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তারা ৬ দফার বিরোধিতা করে। উর্দু বিদ্যালয়ের দাবি তোলে, বাঙালিদের নিয়ে ঠাট্টামশকরা করে। মূলত এই কারণেই তাদের ওপর আক্রমণ ঘটে। তবে শেখ সাহেবের কড়া নির্দেশ এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্যোগে ৩ মার্চেই শান্তি ফিরে আসে। ৩ মার্চ চট্টগ্রামেও এইরকম দাঙ্গা বাধে। সেখানে রেলওয়ে কলোনি ছিল অস্থানীয়দের আড্ডাখানা আর সেখান থেকে জনতার মিছিলে আক্রমণ হয়। যদিও উস্কানিদাতা ছিল গুটিকয়েক ব্যক্তি, হামলায় সব বিহারিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খুলনায় এই ধরনের সংঘর্ষ হয় ৩ মার্চে। এই দুই শহরে সংঘর্ষ ৪ মার্চ চলে এবং ৫ মার্চ আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় শান্তি ফিরে আসে। মার্চের ৬ তারিখ ঢাকায় কয়েদিরা জেল ভেঙে পলায়ন করে। নারায়ণগঞ্জে এধরনের ঘটনা ঘটে ১০ মার্চে, বরিশাল ও কুমিল্লাতে জেল পলায়নের ঘটনা ঘটে ১১ মার্চে। অসহযোগ আন্দোলনে সর্বত্র প্রশাসনযন্ত্র এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অন্যদিকে দেশের অবস্থা এবং আচার-আচরণে অনভ্যস্ত ও অজ্ঞ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মাঠে নামে পয়লা তারিখ রাতে। অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শেখ মুজিব তাঁর কর্মীবাহিনী নিয়োগ করেন এবং পুলিশকে সক্রিয় করেন। একই সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি তোলেন। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাঙালিদের কাছে উস্কানি বলে বিবেচিত হয়। তারা একান্তই ছিল ভিন্ন দেশীয় এবং তাদের ব্যবহারে ছিল না কোনো সহমর্মিতা এবং তারা অস্থানীয়দের সবসময় প্ররোচিত করছিল। অবস্থার অবনতি দেখে প্রদেশপাল ও সেনাধিনায়ক জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব ৬ মার্চ রাতে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেন। শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠায় এই পদক্ষেপটি বিশেষ ইতিবাচক অবদান রাখে। জেনারেল ইয়াকুব ৫ মার্চে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে বাঙালি সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার এম.আর. মজুমদারের অধীনে ন্যস্ত করেন। তাতেও খুব ইতিবাচক ফল লাভ হয়। ৭ মার্চ সেনাবাহিনীর তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সামরিক বাহিনীর গুলিতে পূর্ববর্তী সপ্তাহে ঢাকায় মাত্র ২৩ জন মারা যান। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলার কারণে ঢাকায় ১৭২ জন ও চট্টগ্রামে ১৩২ জন নিহত হন। বাঙালি ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা কিন্তু ছিল যে, সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রায় হাজারখানেক লোক মৃত্যুবরণ করে। তবে অসহযোগ আন্দোলন ৭ মার্চে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং তার আগের দিন সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। এর পরবর্তী সময়ে এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানি

ভাবধারার মুখপত্রেও স্বীকার করা হয় যে, সহিংস ঘটনা আর তেমন ঘটে নি।[৬] অবস্থার ক্রমবিবর্তনের একটি চমৎকার বিবরণ দেন নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা টিলম্যান ডারডিনের সাংবাদিক ও লেখিকা স্ত্রী পেগি ডারডিন। "আন্দোলনের তীব্রতা এবং অনুভূতির উত্তাপ বাঙালি মহলে অস্থানীয়দের অহেতুক ভয় বা ঘৃণার জন্ম দেয়। এতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আক্রান্ত হয় এবং তাদের দোকানপাট লুট হয়। তাদের বাড়ি আক্রান্ত হয় এবং তাদের বেশ কয়েকজন রাস্তায় বা বাড়িতে হত্যার শিকার হয়। এই উত্তাপ বা তীব্রতা মাঝে মাঝে বিদেশিদের বিশেষ করে শ্বেতগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ভীতি বা বিদ্বেষ আশ্চর্যজনকভাবে শেখ মুজিবের কড়া হুকুমে এবং ঐকান্তিক ব্যবস্থায় মিইয়ে যায়। আমরা একটি অভূতপূর্ব এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। একজন রাজনৈতিক নেতার নির্দেশাবলি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিচ্ছে। এই নির্দেশাবলি প্রয়োগের জন্য এই নেতার কোনোই বাহিনী বা প্রশাসন ছিল না। আওয়ামী লীগের অসংগঠিত কর্মীগোষ্ঠী এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোথাও অনুনয় করছে আবার কোথাও নেতার হুকুম মানতে বলছে; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত এই নির্দেশ মানার পেছনে ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বাঙালি জাতির ও নেতার মধ্যে একটি অলিখিত অথচ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠার অঙ্গীকার।"[৭]

৬ মার্চ ইয়াহিয়া আবার গর্জন করলেন। তিনি ২৫ মার্চে পরিষদ অধিবেশন ডাকলেন এবং তাতে যোগদানের জন্য সবাইকে হুমকি দিলেন। জেনারেল ইয়াকুবের পদত্যাগ তিনি গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্তি দিলেন 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত কঠোর ব্যক্তি লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। একই সঙ্গে লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজিকে পাঠালেন প্রদেশের সেনাধিনায়ক হিসেবে। পাকিস্তানি সূত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিবকে ভালো করে শাসানো হয় এবং তাঁকে নমনীয় করতে উদ্যোগ নেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড। ফারল্যান্ডের সঙ্গে ইয়াহিয়ার বিশেষ সম্পর্কের কথা সবাই জানতো। কারণটি অবশ্য তখন জানা ছিল না, ইয়াহিয়া নিক্সনের হয়ে চীনের সঙ্গে দূতিয়ালিতে নিযুক্ত ছিলেন। ইয়াহিয়া তাঁর ঘোষণায় শেখ মুজিবকে তাঁর আহূত সম্মেলনের প্রস্তাব বাতিল করায় দোষারোপ করলেন। পরিষদ অধিবেশন পিছানোর ব্যাপারে নিজের সাফাই গাইলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমঝোতা; যাতে পরিষদে অচলাবস্থা সৃষ্টি না হয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সংবিধান অনুসমর্থন করার দায়িত্ব তাঁর; আইনগত কাঠামো আদেশের এই বিধি তিনি প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন।[৮] ইয়াহিয়ার বক্তব্যে হুমকি ছিল বেশি এবং একের পর এক প্রদেশপালের বিতাড়ন জনগণ মোটেই গ্রহণ করতে পারলো না। নতুন যাদের নিযুক্তি দিয়ে তিনি ঢাকায় পাঠালেন তাদের বদনাম বাঙালি আশঙ্কাকে আরো বদ্ধমূল করে। এটাও জানা গেল যে, জেনারেল ইয়াকুব ইয়াহিয়াকে ঢাকায় এসে সরেজমিনে সঙ্কট সমাধানের জন্য আহ্বান করেছিলেন এবং তিনি তাতে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু ভুট্টো ও পীরজাদার প্রভাবে ইয়াহিয়া তাঁর মত পরিবর্তন করলে

জেনারেল ইয়াকুব পদত্যাগ করেন।[৯] ইতোমধ্যে শেখ সাহেবের ৩ দফা দাবির প্রতি সব নেতাই সমর্থন জানাচ্ছিলেন। অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন এবং বাঙালিদের আশঙ্কা স্বীকার করে এয়ার মার্শাল আসগর খান, মওলানা হাজারভি. মালিক গোলাম জিলানি জেনারেল ইয়াহিয়াকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানালেন। লাহোর হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন ইয়াহিয়া ও ভুট্টোকে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানালো।[১০] সকলের মনে আশঙ্কা ছিল যে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে হয়তো এককভাবে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবেন।

অবশেষে এলো ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে সেদিন দুপুর থেকে জনসমাবেশ শুরু হয়। প্রায় দশ লাখ লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ভাষণ দেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে দাবিগুলোকে ৪ দফায় ব্যক্ত করলেন।[১১] ১. সামরিক আইন উঠিয়ে নিতে হবে, ২. জনপ্রতিনিধির হাতে অনতিবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, ৩. সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৪. মার্চ থেকে শুরু করে এ যাবৎ সামরিক বাহিনীর মানুষ হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। এই ৪ দফা দাবি না মানলে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কোনো কর দেয়া যাবে না, কোনো দোকান খোলা রাখা চলবে না, কোনো দফতরে কাজ হবে না, কোনো কারখানা চলবে না। অবশ্য মানুষের কষ্ট যাতে না হয় সে জন্য অব্যাহতিও ঘোষণা করা হয়েছিল। ৭ মার্চ নতুন অব্যাহতি ঘোষিত হলো রেলওয়ে এবং সমুদ্র বন্দরের জন্য। তবে তারা কোনো সৈন্য-সামন্ত বা যুদ্ধ রসদ চলাচল করতে দেবে না। ব্যাঙ্কগুলো খোলা থাকবে কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক লেনদেন চলবে না। ৪ দফা দাবি না মানলে পরিষদ অধিবেশনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তও তিনি ঘোষণা করেন। তিনি একই সঙ্গে সাবধান করে দেন যে, সামরিক নির্যাতন আর সহ্য করা হবে না। জনগণের কাছে তাঁর আবেদন ছিল : "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা আছে সবকিছু— আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। ...শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পেছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যাঁরা আছে আমাদের ভাই, বাঙালি-অবাঙালি তাঁদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।" এবারেও তাঁর দাবি পশ্চিম পাকিস্তানের সব নেতার সমর্থন পেল শুধু পিপিপি ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ ছাড়া। আর সব দল ১৩ মার্চ লাহোরে এক সভায় বসে এই সমর্থন ঘোষণা করলো।[১২] নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ৭ মার্চেই ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী শোনান। তিনি ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমস্যা ফয়সালার উপদেশ দেন।[১৩] ১২ মার্চ এয়ার মার্শাল আসগর খান ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষমতা একমাত্র শেখ মুজিবেরই আছে।[১৪]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণা দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর ওপর ভীষণ চাপ। বঙ্গবন্ধুর শিষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবর্গ একযোগে তাঁকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছিলেন। আ.স.ম. আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ এবং সিরাজুল আলম খান এরা সবাই ছিলেন ছাত্রলীগের নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংসদের নির্বাচিত কর্তাব্যক্তি। এরা কোনোমতেই পাকিস্তানিদের বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বঙ্গবন্ধু এই সমস্ত চাপ এবং আশঙ্কার উর্ধ্বে উঠে সঙ্কট সমাধানের একটি সম্মানজনক উপায় বাতলে দেন। একই সঙ্গে তিনি বিকল্পেরও ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তাঁর অনুপস্থিতির সম্ভাবনাও তিনি বিবেচনা করেন। ৯ মার্চ ইয়াহিয়া জানালেন যে, তিনি ঢাকায় আসছেন সঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখানেও জান্তার প্রভাবমুক্ত তিনি হতে পারলেন না। পরদিন না এসে তিনি তাঁর আগমন বিলম্বিত করলেন ১৫ মার্চ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে অবস্থা জটিলতর হতে থাকলো। ৯ মার্চ মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে আহ্বান জানালেন। ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে সলাপরামর্শ শেষে ১৪ মার্চ ঘোষণা করলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ১৩ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি তথ্য সচিব সাইউদ আহমদকে বদলি করে সেখানে রোয়েদাদ খানকে নিযুক্তি দেয়া হলো। জেনারেল টিক্কা খান সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে সামরিক দফতরে সব কর্মচারীর হাজিরা দাবি করে বসলেন।[১৫] সারাটি সময় অবশ্য জোরেশোরে সৈন্য ও রসদ আমদানি চলতে থাকলো। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিদের আশঙ্কা বাড়লো এবং ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার বিশ্বাসযোগ্যতা আরো প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ালো।

অসহযোগ আন্দোলনের একটি বড় সমস্যা ছিল জীবনের সাধারণ প্রবাহকে বহাল রাখা। সর্বত্র হরতাল পালিত হলে জীবনধারণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, সত্যিকার অর্থে জীবনের চাকা বন্ধ হয়ে যায়। সারা জাতির এমন গভীর একাত্মবোধ এর আগে কখনো হয় নি। কিন্তু মানুষের ক্ষতি তো এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই একটি বিকল্প প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। বিভিন্ন নির্দেশাবলি দিয়ে জীবন প্রবাহ স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চলে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখলে দেশেরই ক্ষতি, তাই শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঘোষণার পরেই আবার ৮ মার্চে নতুন অব্যাহতি ঘোষণা করতে হলো। সার, বীজ, ডিজেলের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কয়লা পরিবহন না করলে ইট পোড়ানো যাবে না, তাই সেক্ষেত্রে অব্যাহতি দিতে হলো। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ বহাল করতে হলো। আন্তঃ জেলা যোগাযোগ চালু করতে হলো, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহের খাতিরে এবং উন্নয়ন উদ্যোগে ব্যবহৃত সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আবার চালু করতে হলো। ১১ মার্চ তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করলেন যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে।[১৬] সারা দেশ চেয়ে রইলো বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের দিকে। ৮ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

বি.এ. সিদ্দিকী জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নরের শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানালেন। ১২ মার্চে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনিক ক্যাডার অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করলো।[১৭] এক কথায় ইয়াহিয়া জান্তার হুকুম পূর্ব পাকিস্তানে একেবারে নাকচ হয়ে গেল।

কৌতুকছলে সাংবাদিকরা বলতে শুরু করলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে শুধু সামরিক ছাউনিগুলোতেই বহাল ছিল। অন্যত্র ছিল আওয়ামী লীগের রাজত্ব।[১৮] আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রশাসনকে পরিচালনা করার উদ্যোগটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক, অল্পভাষী, নিবেদিতপ্রাণ তাজউদ্দিন আহমদ। তাঁকে সাহায্য করেন বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা। তাঁর অধীনে এক ধরনের সচিবালয় গড়ে ওঠে। এতে অংশ নেন রাজনীতিবিদ ড. কামাল হোসেন, অর্থনীতিবিদ ড. নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান, ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা খায়রুল কবির এবং একটি সাহসী ও সক্রিয় আমলা গোষ্ঠী। এই দলে ছিলেন এ.এম. সানাউল হক, এ. এম. আনিসুজ্জামান, মোকাম্মেল হক, মোহাম্মদ আলী, আবদুল মোমেন খান, খন্দকার আসাদুজ্জামান, ড. আবদুস সাত্তার। আন্দোলন যখন তৃতীয় সপ্তাহে পৌঁছলো তখন এক হিসেবে নির্দেশ অনুশাসনের এক সমন্বিত সঙ্কলন তৈরি হয়ে যায়। এই নিয়ম নীতি প্রতিপালনের জন্য কোনো নিগ্রহ বল প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। মানুষের মনেই এগুলো সর্বোচ্চ আইনের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আবারও প্রমাণিত হলো যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো আইন মেনে চলা আর সে আইনের পেছনে যদি থাকে জনতার ইচ্ছার প্রতিফলন এবং যোগ্য নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও ন্যায়বোধ। ১৫ মার্চ তাজউদ্দিন আহমদ এই সংক্রান্ত পঁয়ত্রিশটি নির্দেশাবলির ঘোষণা দেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশাবলিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একমাত্র দিকনির্দেশনা। সরকারি দফতর, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলোতে হরতাল পালিত হবে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন সেবা সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ, বেসরকারি শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সরকারি সংস্থা সচল ও সক্রিয় থাকবে। বিশেষ করে নজর দেয়া হবে সমুদয় উন্নয়ন উদ্যোগে এবং নিয়মিত বেতন ও ভাতা প্রদানে। ব্যাঙ্ক পরিচালনা ও কর প্রদানের বিষয়ে দেয়া হয় বিস্তৃত নির্দেশ। এই সব নির্দেশ তদারকির দায়িত্ব বর্তে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের ওপর।[১৯]

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সুশীল অবাধ্যতাকে পরিচালনা করেন। তাঁর উদাত্ত আহ্বান ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা আন্দোলনের শুরুতেই সহিংস কার্যাবলিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে। সামরিক শাসন থেকে মুক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি সারা দেশের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। সামরিক বাহিনী ও তার দোসরদের প্ররোচনার মুখে জাতিকে তিনি সংযমী, সহনশীল ও উদার থাকতে নির্দেশ দেন। তিনি আলোচনার দুয়ার ও সমঝোতার রাস্তা উন্মুক্ত রেখে কঠিন পরীক্ষার জন্য জাতিকে তৈরি করতে সচেষ্ট হন। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি আন্দোলনের গতিপথ

রচনা করেন। নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিহার করা হবে না কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণে বিহ্বলও যেন না হতে হয়। গোটা আন্দোলনকে ন্যায়ের কষ্টিপাথরে ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ করা ছিল তাঁর উদ্যোগ ও ব্রত। একই সঙ্গে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা বজায় রেখে জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য কঠিন সব সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়।

ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ

ঢাকায় ইয়াহিয়ার বিলম্বিত সফরটিই ছিল অলুক্ষণে। মার্চের শুরুতে তাঁর ঢাকায় আসার কথা। তখন তিনি এলেন না কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। তাঁর ধারণাই ছিল না যে, তাঁর জান্তার প্রধান খেলোয়াড়রা শুরুতেই ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয়ে তারও গত্যন্তর ছিল না। আবার তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন যে, দশ মার্চ তিনি ঢাকা পৌঁছবেন। কিন্তু আবারও বাদ সাধলো তাঁর জান্তা, তাদের আটঘাট বাধা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ঢাকায় আসা হলো না। ১৫ মার্চ তিনি এসে পৌঁছলেন আর ১৬ মার্চ শুরু হলো সংলাপ। ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত সংলাপ স্থায়ী হয়। ২৫ মার্চ একটি চূড়ান্ত আলোচনা বা ঘোষণার কথা ছিল। সেই ঘোষণাটি হলো কামানের গোলাবর্ষণে, বন্দুকের গুলিতে আর ট্যাঙ্কের অভিযানে এবং এই অভিযানের পুরো ১৮ ঘন্টা পরে করাচির নিরাপদ অবস্থান থেকে কাপুরুষ ইয়াহিয়া জানালেন যে, সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে এবং তিনি গণহত্যার হুকুম দিয়েছেন। এই কয়দিনের সংলাপে পাকিস্তানের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করে। ১৬ ও ১৭ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব একান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহারের এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের। এই মৌলিক বিষয়ে একটি প্রয়োগবাদী সমাধান ছাড়া আলোচনার কোনো সুযোগই ছিল না। ১৬ মার্চেই ইয়াহিয়া ভুট্টোকে সংলাপে যোগ দিতে বললেন। ভুট্টো প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়ে অবশেষে ২১ মার্চ ১৪ জন উপদেষ্টাসহ ঢাকায় হাজির হলেন। প্রথম পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা যিনি সংলাপে যোগ দেন, তিনি ছিলেন ন্যাপ দলের ওয়ালি খান এবং ১৭ মার্চেই তিনি আলাদাভাবে ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আবদুল কাইয়ুম খান পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে সর্বশেষে ২৩ মার্চে আসেন এবং সেদিনই একান্তে ও পরে অন্যদের সহ ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেন। ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা মোজাফফর আহমদ সংলাপে অংশ নেন ২৩ ও ২৪ মার্চ। আইনজ্ঞ এ কে ব্রোহি আওয়ামী লীগের আহ্বানে ঢাকায় আসেন ২০ মার্চ এবং পরদিনই প্রত্যাবর্তন করেন। এই সব নেতা বিভিন্ন দফায় পৃথক বা একযোগে বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে যে ছয় দফা আলোচনা হয় তার মধ্যে প্রথম তিনটি ছিল একান্ত আলোচনা। ২০ মার্চ উপদেষ্টাসহ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা হয় এবং ২১ মার্চ হয় তার পুনরাবৃত্তি। ২২ মার্চ ইয়াহিয়া, মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে প্রথম ও শেষবারের মতো আলোচনা হয়। ইয়াহিয়া-মুজিব কোনো স্বতন্ত্র একান্ত আলোচনা হয় নি, তবে কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা দু'জন রাষ্ট্রপতি ভবনে একান্তে

মিলিত হন ২২ মার্চ। ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে চার দফা আলোচনা হয়। প্রথমেই একান্ত বৈঠক হয় ২১ মার্চ। পরদিন হয় ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো যুক্ত বৈঠক, ২৩ মার্চ হয় উপদেষ্টাসহ ইয়াহিয়া-ভুট্টো সংলাপ এবং ২৪ মার্চ হয় একটি আকস্মিক একান্ত বৈঠক। বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টারা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, কামারুজ্জামান, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং ড. কামাল হোসেন। ইয়াহিয়ার দলে ছিলেন বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা, কর্নেল হাসান এবং ২৩ মার্চ যোগ দেন মির্জা মোজাফফর আহমদ। ভুট্টোর উপদেষ্টা ছিলেন ১৪ জন, তবে আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা রাখেন জে.এ. রহিম, মাহমুদ আলী কাসুরি, মুবাশ্বির হাসান, হাফিজ পীরজাদা এবং রফি রাজা। পশ্চিম পাকিস্তানি অন্য নেতারা যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ইয়াহিয়া এবং মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা ছিলেন মিয়া মমতাজ দৌলতানা ও শওকত হায়াত খান (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), মুফতি মাহমুদ নুরানি (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম), মীর গাউস বকশ বাজেনজো (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)। সংলাপ চলাকালে সৈন্য ও রসদের ফেরি রইলো অব্যাহত। সেনাবাহিনী ব্যারাকে ছাড়াও কতগুলো চেকপোস্টে অবস্থান নেয় এবং সুযোগ পেলেই উস্কানিমূলক উদ্যমে লিপ্ত হয়। ১৯ মার্চ জয়দেবপুর ছাউনি এলাকায়, ২৩ মার্চ চট্টগ্রামে রেলওয়ে ও ওয়ারলেস কলোনি এবং সমুদ্র বন্দরে, একই দিনে রংপুর জেলার সৈয়দপুরে এবং ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর অবাঙালি এলাকায় সেনাবাহিনী তৎপর হয়। জয়দেবপুরে তারা গুলিবর্ষণ করে, রংপুরে কারফিউ জারি করে আর অন্যান্য এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ১৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান বঙ্গবন্ধুর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২-৯ মার্চ সেনা সদস্যদের গুলি চালনার বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা দিলেন। তবে কমিশনের বিবেচ্য বিষয় ও এখতিয়ার এমন সঙ্কীর্ণভাবে রচনা করলেন যে, বঙ্গবন্ধু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলেন।

১৭ মার্চ ইয়াহিয়া 'অপারেশন সার্চলাইট' আয়োজনের হুকুম দেন[২০] অথচ ১৯ মার্চ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মূল দাবি মেনে নিয়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ঘোষণা প্রস্তুত করতে উপদেষ্টাদের বৈঠক ডাকেন। ২০ মার্চ ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে একটি খসড়া ঘোষণাও প্রস্তুত করা হয়। অবশ্য ইয়াহিয়া শর্ত আরোপ করেন যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দল এটি গ্রহণ করলেই সমঝোতা হবে।[২১] ইয়াহিয়া এবং বঙ্গবন্ধু উপদেষ্টারা প্রথম বৈঠক করেন ১৯ মার্চ। ২০ ও ২১ মার্চ উপদেষ্টাসহ দুই নেতা বৈঠক করেন। ২৩ মার্চ শুধু দুই দলের উপদেষ্টারা দুই দফায় মিলিত হন। ২৪ মার্চ হয় তাঁদের সর্বশেষ বৈঠক এবং এই বৈঠকে আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার খসড়া রদবদল করে নিজেদের খসড়া পেশ করে। এখানেই এই দুই দলের সংলাপে ইতি ঘটে। ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা ২২ মার্চ প্রথম আলোচনায় বসেন এবং সেখানে ইয়াহিয়ার খসড়া আলোচিত হয়। পরদিন উপদেষ্টাসহ ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৪ মার্চ দুই দলের উপদেষ্টাদের শেষ বৈঠক হয় এবং আওয়ামী লীগের খসড়া সেখানে বিবেচিত হয়। ভুট্টোও এই আলোচনার শেষ পর্বে হাজির হন এবং পরে ইয়াহিয়ার

সঙ্গে অনির্ধারিত একান্ত আলোচনায় বসেন। সংলাপের এই হলো ইতিবৃত্ত।

২০ মার্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু খুব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন, "আমাদের আলোচনা চলছে এবং কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।"[২২] ২১ মার্চ ভুট্টো সংলাপ সম্বন্ধে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২২ মার্চ ভুট্টো সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন যে, "ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনায় সমঝোতা হয়েছে। আমরা এখন এই সমঝোতার নিহিতার্থ পরীক্ষা করে দেখছি।" তিনি আরো বলেন যে, ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো যুক্ত বৈঠকের ফলাফল সন্তোষজনক।[২১] ইয়াহিয়া ২৩ মার্চ জাতীয় দিবস উপলক্ষে যে ভাষণ দেন সেখানে আশাবাদই ব্যক্ত করেন। এই ভাষণেই তিনি ২৫ মার্চ আহূত পরিষদ অধিবেশন পিছিয়ে দেন এবং জানান যে, এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাতি গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের মুখোমুখি এবং এজন্য প্রায় সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ মার্চ সব পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা করাচি ফিরে যান, শুধু ইয়াহিয়া আর ভুট্টো ছাড়া। তাঁরা করাচিতে পৌঁছে বলেন, সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হবে। ভুট্টো ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শেষে ঘোষণা করেন যে, নেতাদের সঙ্গে আলোচনার আর কোনো বিষয় নেই বলে তাঁরা সবাই ফেরত যাচ্ছেন। উপদেষ্টারা ২৫ মার্চ সব বিষয়ে সমাধানে পৌঁছবেন।[২৪] মোটামুটিভাবে সঙ্কট সমাধানের প্রত্যাশা ছিল সর্বত্র এবং সে হিসেবে বলা যায়, ইয়াহিয়া-ভুট্টো জান্তা শঠতার পরাকাষ্ঠা স্থাপন করে। ২৫ মার্চের ওয়াশিংটন পোস্টে (১২ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত) শিরোনাম ছিল, "পাকিস্তানি সমঝোতার সংবাদ : পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংলাপে সম্পূর্ণ সমঝোতার খবর।"[২৫]

সংলাপের ব্যর্থতা

এই রকম আশাবাদ ও ইতিবাচক প্রত্যাশা থাকলেও ঈশান কোণে কালো মেঘ জমে উঠছিল। ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালি সেনাদের নাকি নিরস্ত্র করার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সেই কারণেই জনগণ ব্যারিকেড গড়ে তোলে ও বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সেনাবাহিনীকে গুলি করতে হয়। ঢাকায় জেনারেলদের সমাহার খুবই অশুভ ইঙ্গিত দেয়। চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ আসেন ২১ মার্চ এবং তিনি মফস্বলে ঘুরে বেড়ান। জেনারেল নিয়াজি, খাদেম রাজা এবং রাও ফরমান আলী তো আগে থেকেই ছিলেন। মিঠা খান, খোদাদাদ খান, আনসারী এসব জেনারেলও ভিড় করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। 'সোয়াত' জাহাজে করে রসদ আসে ২৮ ফেব্রুয়ারি কিন্তু বন্দর কর্মচারী ও শ্রমিকরা এই জাহাজ খালাস করতে আপত্তি করে। ২৪ মার্চ চট্টগ্রামের বাঙালি সেনাপতিকে বদলি করা হলো আর সেদিনই সোয়াত খালাসের আয়োজন হলো। বিহারিদের এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা আস্তানা গাড়তে থাকে এবং তাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিলি করতে থাকে। অন্যদিকে বাঙালিদের মধ্যেও ছিল উত্তেজনা এবং আগ্রহের আতিশয্য। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করা হলো। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো সেদিন। অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যরা ২২ মার্চ

ঢাকায় র‍্যালি করলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে বাঙালিদের দমনের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা চললো। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম ব্যাটেলিয়নই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে এবং এতে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার। প্রায় ১২ হাজার সৈন্য ছিল ইপিআরে কিন্তু তাদের মাত্র কয়েকজন অফিসারই ছিলেন বাঙালি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালিদের ছড়িয়েছিটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা কার্যকরী হয় মার্চের শুরুতেই। বাঙালি অফিসারদের সৈন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ারও চক্রান্ত চলে। এই সব আলামত ছিল খুবই নেতিবাচক। কিন্তু আওয়ামী লীগ দলটি ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী তাই উৎকণ্ঠা থাকলেও সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য তারা কোনো নীলনকশা বানাতে প্রস্তুত ছিল না। জনতার শক্তি, আন্দোলনের বিক্ষোভ এগুলোই ছিল তাদের ক্ষমতার উৎস। তারা তাই বিচ্ছেদের কথা ভাবলেও একটি ভদ্র বিচ্ছেদের আশা করতেন। সেনাবাহিনীর অনেকেই বিদ্রোহের কথা ভাবতেন কিন্তু সে বিষয়ে তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিলেন। আবার সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের ভক্তও কম ছিল না। ইয়াহিয়া জান্তার কৃতিত্ব ছিল যে, তারা আওয়ামী লীগকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমঝোতার প্রত্যাশী হিসেবে ধোঁকা দিতে পেরেছিল।

২৫ মার্চ আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার তরফ থেকে একটি ঘোষণা আশা করছিল। দিনের শেষে খবর পাওয়া গেল যে, ইয়াহিয়া করাচির পথে বিমান আরোহণ করেছেন। সেই যাত্রার বিষয়টিও খুব গোপনীয় ছিল। খবরটি মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেলে সেনাবাহিনীকে ঠেকানোর জন্য নানা জায়গায় ব্যারিকেড বানানোর ধুম পড়ে গেল। রাজনৈতিক নেতারা সরে পড়তে থাকেন। বঙ্গবন্ধু কিন্তু গা ঢাকা দিতে রাজি হলেন না। তাঁর কথা ছিল, তাঁকে খোঁজার বাহানায় সেনাবাহিনী অনেক মানুষ মারবে আর দেশবাসীকে অনেক যন্ত্রণা দেবে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীক্ষিত রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই ভেবে থাকবেন যে তাঁকে গ্রেফতার করে অবস্থা আয়ত্তে না আনতে পারলে তাঁরা তাঁর সঙ্গে আলোচনায় সমাধান খুঁজবে। যাই হোক মধ্যরাতে পাকিস্তানি অভিযান শুরু হলো। সংবাদপত্র, বস্তি এবং ছাত্রমহলের প্রতি সেনাবাহিনীর আক্রোশ ছিল বোধগম্য। কিন্তু পুলিশ লাইন এবং ইপিআর সদর দফতরে যে তারা বাঙালি সৈন্যদের আক্রমণ করবে তা কেউই ধারণা করতে পারে নি এবং এজন্য এরা মোটেই প্রস্তুতি নিতে পারে নি। কি কারণে সংলাপ ভেঙে গেল এবং সামরিক অভিযানের প্রয়োজন হলো তার প্রথম ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ১৮ ঘন্টা পরে ইয়াহিয়ার বিবৃতিতে। তিনি বলেন, সামরিক শাসনের অবসানের ঘোষণাটির আইনগত ভিত্তি সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের দ্বিমত হয় এবং এই ঘোষণাটি দিতে তিনি অপারগ। তদুপরি জাতীয় পরিষদকে শুরুতেই দুই কমিটিতে ভাগ করে দেয়ার প্রস্তাবও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তারপর তিনি বলেন, অসহযোগ আন্দোলন আসলে ছিল দেশদ্রোহী। ঐ তিন সপ্তাহ বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা পাকিস্তানের অবমাননা করেছে, সেনাবাহিনীকে কষ্ট ও টিটকারি দিয়েছে এবং অনেক

মানুষ মেরেছে। তারা যে ঘোষণার দাবি করে সেটা ছিল দেশকে ভাঙার জন্য একটি চালিয়াতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হুকুম দিয়েছেন। পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা তাঁর লক্ষ্য। তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সারা দেশে কঠোর প্রেস সেন্সরের ব্যবস্থা করেছেন এবং আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছেন।[২৬] এই ব্যাখ্যাকে তিনি আর একটু বিস্তৃত করেন আরো তিন মাস পরে। ২৮ জুনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিব সংলাপের শেষ দিকে ফেডারেশনের ধারণা বাদ দিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি স্বতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।[২৭] আগস্টের ৫ তারিখ সংলাপের ব্যর্থতা এবং শেখ মুজিবের দেশদ্রোহিতা বিষয়ে ইয়াহিয়ার সম্পূর্ণ কাহিনীটি প্রকাশ করেন তাঁর গুপ্তচর বাহিনীর সুনিপুণ প্রধান জেনারেল এম. আকবর।[২৮] এই আকবরই ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র উপাখ্যানের রূপকার ছিলেন।

এখানে আরো কিছু নতুন অভিযোগ উত্থাপন করা হলো। আওয়ামী লীগ একটি ফেডারেল মন্ত্রিসভা গঠনে আপত্তি করে। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর ঘোষণাকে জাতীয় পরিষদে অনুসমর্থনে অসম্মতি জানায়। আইনগত কাঠামো আদেশকে মানতে অস্বীকার করে— প্রেসিডেন্টের ভেটো ক্ষমতা ও পরিষদ সদস্যদের আনুগত্য শপথ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে। এইবারেই ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে ইয়াহিয়া জান্তার অভিমত সর্বপ্রথম জানা গেল। ফেডারেল সরকারের কর ক্ষমতা থাকবে; মুদ্রা, বৈদেশিক সাহায্য ও বহির্বাণিজ্য বিষয়গুলো ফেডারেল এখতিয়ারে থাকবে। পরিকল্পনা ও সমন্বয়, সমরূপী মান, দেশের নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্যও ফেডারেল কর্তৃত্ব থাকবে।

আওয়ামী লীগের বক্তব্য হচ্ছে, ইয়াহিয়া জান্তা কোনো সময়েই সংলাপে অচলাবস্থা স্বীকার করেন নি। ২৪ মার্চ দু'ঘণ্টা আলোচনার পর তারা ২৫ মার্চ একটি ঘোষণা আশা করছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ ১৭ এপ্রিলেই এক বিস্তৃত বক্তব্যে ইয়াহিয়ার ২৭ মার্চের অভিযোগ খণ্ডনের প্রয়াস পান।[২৯] তিনি বলেন, "কোনো সময়েই সংলাপ ভেঙে পড়ে নি এবং জেনারেল ইয়াহিয়া বা তাঁর উপদেষ্টারা কোনো সময়েই বলেন নি যে তাঁদের একটি চূড়ান্ত অবস্থান রয়েছে, যা থেকে তাঁরা বিচ্যুত হতে পারেন না।" তাজউদ্দিন আহমদ আরো বলেন, "দুই কমিটিতে জাতীয় পরিষদের বৈঠকের ধারণা ইয়াহিয়ারই পরামর্শে হয়। এই প্রস্তাবটি করেন ভুট্টো কারণ অন্যথায় তাঁর ভয় ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে তার প্রভাব নাকচ করে দেবে।" প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তাঁতে তাদেরকে স্বতন্ত্র কমিটিতে বসার প্রয়োজন মোটেই ছিল না। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণার বৈধতা নিয়ে দুই দলে বিস্তৃত আলোচনা চলে। সামরিক শাসন উঠিয়ে নিলে আইনানুগ ভিত্তি কি হবে সে বিষয়ে ইয়াহিয়ার সন্দেহ ছিল। এই

সন্দেহ নিরসনের জন্য আওয়ামী লীগ এ.কে. ব্রোহির শরণাপন্ন হয়, ব্রোহি দ্ব্যর্থহীনভাবে সমস্যার সমাধান বলে দেন। পাকিস্তানের নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দুটিরই উৎস ছিলেন সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া। সুতরাং তাঁর ঘোষণাই ছিল যথেষ্ট। ১৯৪৭ সালে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বড়লাটের ঘোষণাই নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু যেহেতু বড়লাটের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না সেজন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ পাস করতে হয়। পাকিস্তানে ১৯৭১ সালে তার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ইয়াহিয়া যে সামরিক আইন জারি করেন তারও তো কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল না। বস্তুতপক্ষে এই অজুহাতটি ছিল নিতান্তই ভুয়া। ব্রোহি ২০ মার্চ তাঁর অভিমত দেন এবং তারপরেই কিন্তু ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। জনপ্রতিনিধিদের হাতে প্রাদেশিক ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল কথাই ছিল ফেডারেল ক্ষমতার প্রতিসংক্রম। তাজউদ্দিনের ১৭ এপ্রিলের বক্তৃতায় প্রতীয়মান হয় যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণায় প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব হবে ছয় দফা দাবিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করা। ভুট্টো বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাদেশিকীকরণ নিয়ে প্রথমে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেন। মির্জা মোজাফফর আহমদের মতে ভুট্টো চূড়ান্ত বিবেচনায় এই আপত্তি আর রাখেন নি। তবে আহমদ দেখতে পান যে, বিষয়ের বিভাজনে ফেডারেল তালিকা থেকে বেশ কিছু বিষয় বাদ পড়ে যায় এবং এ সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ আওয়ামী লীগ মেনে নেয়। তিনি ফেডারেল সরকারের জন্য আওয়ামী লীগের তালিকায় ১২টি বিষয়ের জায়গায় ১৭টি বিষয় সন্নিবেশিত করেন। এই নতুন বিষয়গুলো ছিল কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশন, জাতীয় শুমারি (আদম বা কৃষি), প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট শিল্প এবং বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতিমালা। আহমদ আরো কতগুলো প্রস্তাব দেন। ফেডারেল সরকার নিজেদের খরচ মেটানোর জন্য সীমিত করক্ষমতা বহাল রাখবে। প্রাদেশিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতো তাড়াতাড়ি স্থাপন করা যাবে না, বিদেশী মুদ্রার হিসাবও ভাগ করতে করতে জুলাই মাস লাগবে। পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক মুদ্রানীতির মধ্যে প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে তার সমন্বয় সাধন করবে। বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ক প্রস্তুতি হিসাব ও বিভাজন প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে থাকলেও বিদেশি রাষ্ট্র বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবে ফেডারেল সরকার। তিনি মনে করেন, কর ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর উপদেশ ছাড়া সবগুলো আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। তিনি আলোচনা শেষে ২৪ মার্চই ঢাকা ছাড়েন, কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে সমঝোতা হয়ে গেছে এবং তাঁর উপদেশের আর কোনো প্রয়োজন নেই।[৩০] শ্বেতপত্রে তাই যে দাবি করা হয়েছে তা একেবারেই বানোয়াট। পরিকল্পনা ও সমন্বয়, সমরূপী মান, জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিষয়ক বিধি আইউবের শাসনতন্ত্রে ছিল এবং এই শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের ফেডারেল চরিত্রই স্বীকার করে নি। জেনারেল আকবর এই উদ্ভটতত্ত্ব না বুঝেই তার রূপকথা রচনা করেন। ইয়াহিয়া আরো বলেন,

কনফেডারেশনের ধারণা তাঁর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য ছিল না। ছয় দফার ভিত্তিতে যে ফেডারেশনের ধারণা ছিল তা বাস্তবে কিন্তু কনফেডারেশনই ছিল। কিন্তু নামে এসে যাওয়ার কিছুই ছিল না এবং তিনি ফেডারেশনের ঘোষণা দিলে তাই গৃহীত হতো।

গোটা সংলাপ প্রক্রিয়া যে একটি ধোঁকাবাজি ছিল সে বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। পাকিস্তানি সূত্রেই জানা যায় যে, কোনো সময়ই সামরিক জান্তা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি ছিল না। ভুট্টোর সঙ্গে এদের আঁতাত শুরু হয় আইউবের পতনের আগেই। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্যের পরপরই শুরু হয় ষড়যন্ত্র। বিমান ছিনতাই নিয়ে ভারতের সঙ্গে জটিলতার কারণে সামরিক প্রস্তুতিতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই চলে সংলাপের প্রহসন। তবে পাকিস্তানের অজান্তে মার্চের বিক্ষুব্ধ দিনগুলোই বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধ লড়তে উদ্বুদ্ধ করে। মার্চের অভিজ্ঞতার পর বাংলাদেশকে অবদমিত করার সুযোগ পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলে। মার্চের অভিজ্ঞতা বাঙালি জনসাধারণকে পাক সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে বদ্ধপরিকর করে তোলে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নিষ্ঠুর দমন জন্ম দেয় রক্তক্ষয়ী সাহসিক মুক্তিযুদ্ধের।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি : *A History of the Freedom Movement,* তৃতীয় খণ্ড, করাচি, ১৯৬১।
এস. মইনুল হকের প্রবন্ধ : *The Khilafat Movement,* পৃ. ২০৫-২৩৯।

২. আইএইচ কোরেশি : *The Struggle for Pakistan,* করাচি ইউনিভার্সিটি, করাচি, ১৯৬৫, পৃ. ২৪।

৩. শেখ মুজিবের ৩ মার্চে পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতা, *The Dawn,* করাচি, ৪ মার্চ, ১৯৭১।

৪. পাকিস্তান সরকার : *White Paper on the Crisis in East Pakistan,* ইসলামাবাদ, ৫ আগস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১১-১২।

৫. সহিংস ঘটনার বিবরণের সূত্র ২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চের, *Pakistan Observer,* ঢাকা এবং *দৈনিক পাকিস্তান,* ঢাকা।

৬. *Morning News,* করাচি, ৭ মার্চ।

৭. *New York Times,* Sunday Magazine, নিউইয়র্ক, ২ মে, ১৯৭১, পৃ. ৯১, পেগি ডারডিনের লেখা প্রবন্ধ The Political Tidal Wave that Struck East Pakistan.

৮. ইয়াহিয়া খানের ৬ মার্চের বেতার বক্তৃতা, *The Dawn,* করাচি, ৭ মার্চ, ১৯৭১।

৯. রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided,* জাং পাবলিশার্স, ১৯৯২, লাহোর, পৃ. ৬৫-৬৯।

১০. *The Dawn* : করাচি ৪ ও ৫ মার্চ, ১৯৭১।

১১. ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ। বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ— দলিলপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০০-৭০২।

১২. The Dawn, করাচি, ১৪ মার্চ, ১৯৭১।

১৩. *The Dawn,* করাচি, ৮ মার্চ, ১৯৭১।

১৪. *Pakistan Observer,* ঢাকা, ১৩ মার্চ, ১৯৭১।

১৫. *Pakistan Observer,* ঢাকা, ১৪ মার্চ, ১৯৭১।

১৬. *Pakistan Observer,* ঢাকা, ১২ মার্চ, ১৯৯১।

১৭. *Pakistan Observer*, ঢাকা, ১৩ মার্চ, ১৯৯১।

১৮. *Pakistan Observer*, ঢাকা, ১৫ মার্চ, ১৯৯১, *Washington Post*, ওয়াশিংটন ডিসি, ১৭ মার্চ, ১৯৯১।

১৯. পরিশিষ্ট-৬ দেখুন।

২০. সিদ্দিক সালেক : *Witness to Surrender*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৭, করাচি, পৃ. ৬২-৬৩।

২১. রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided*, জাং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯২, পৃ. ৭৫।
হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan* : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯৪, পৃ. ১৫০-১৫২।
পাকিস্তান সরকার : *White Paper on the East Pakistan Crisis.* ইসলামাবাদ, ১৯৭১, পৃ. ১৭-২০।
তিনটি বিবরণই ভিন্ন কিন্তু সবখানেই ইয়াহিয়ার নমনীয় ভাব প্রকাশ পায়। তিনি সবকিছুতে আগ্রহী নন কিন্তু আওয়ামী লীগের দাবিমতো খসড়া বানাতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

২২. Pakistan Observer, ঢাকা, ২১ মার্চ, ১৯৭১।

২৩. *Pakistan Observer*, ঢাকা, ২৩ মার্চ ১৯৭১, এবং New York Times, নিউইয়র্ক ২১ মার্চ, ১৯৭১।

২৪. *Pakistan Observer*, ঢাকা, ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এবং *Morning News*, করাচি, ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

২৫. *Washington Post*, ওয়াশিংটন ডিসি, ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

২৬. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের ভাষণ।
পাকিস্তান সরকার : *White Paper on the Crisis on East Pakistan*, ইসলামাবাদ, আগস্ট ১৯৭১, পৃ. পরিশিষ্ট ১১-১৩।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৭।

২৮. পূর্বোক্ত।

২৯. ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : *Bangladesh Documents*, নিউ দিল্লি, ১৯৭১।
বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ১৭ এপ্রিলের সংবাদ বিবৃতি, পৃ. ২৯১-২৯৮।

৩০. মির্জা মোজাফফর আহমদ ১৯৭১ সালের মে মাসে ওয়াশিংটন সফরে আসেন। ১০ মে তাঁর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত একান্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই বিবরণ দেয়া হলো। একই সময়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহানও ওয়াশিংটনে আসেন। লেখক রেহমান সোবহানের কাছে আহমদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করেন। রেহমান সোবহানের একটি প্রবন্ধেও এই বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। রেহমান সোবহানের প্রবন্ধ 'Negotiating for Bangladesh : A Partcipant's View', *South Asian Review*, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, লন্ডন, ১৯৭১।

নবম অধ্যায়

পাকিস্তানি সামরিক নৃশংসতা : কামানের মোকাবিলায় লাঠিসোঁটা

আদিপর্ব

আইউবের ক্ষমতার ভিত নড়বড়ে হতে না হতে ১৯৬৯ সালেই ভুট্টো উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতাগ্রহণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জনতার বিক্ষোভে সওয়ার হয়ে ক্ষমতায় আরোহণ। ইয়াহিয়ার সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে ভুট্টো সখ্য গড়ে তোলেন এবং জান্তার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হন। তাঁর কৌশল ছিল ছলেবলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষমতাগ্রহণের সুযোগ প্রতিহত করা। পূর্ব পাকিস্তানের ভোটদাতারা ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রান্তকে একান্তই বানচাল করে দিল। আওয়ামী লীগের এই রকম বিজয় তাঁরা কখনো কল্পনাও করেন নি। তখন ভুট্টোর নতুন চাল হলো ছয় দফার বিরোধিতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর নেতৃত্বের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধু যখন ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে দোসর হলেন না তখনই তৈরি হলো বাঙালিদের উসকানি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা ছিল বাঙালির সহনশীলতা ও সমঝোতা স্পৃহার একটি কঠিন পরীক্ষা। ধোঁকাবাজি ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সংলাপে বসলেন। ১৭ মার্চ একদিকে তিনি সংলাপে বসলেন আর অন্যদিকে 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রস্তুতির হুকুম দিলেন। সংলাপে যখন ইতিবাচক সমাধানের প্রত্যাশা জাগরিত হলো তখনই গোপনীয়তার আবরণে এবং রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঢাকা থেকে পলায়ন করেন। এই পলায়নের প্রাক্কালে মাতাল ইয়াহিয়া বাঙালিদের জন্য একটি পাইকারি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে গেলেন। গভর্নর টিক্কা খান, সেনাপতি খাদেম হোসেন রাজা ও রাও ফরমান আলী সেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ তামিলের তাণ্ডবে লিপ্ত হন ২৫ মার্চের মাঝ রাতে।

অপারেশন সার্চলাইটের কৌশল ছিল ধুরন্ধর পদ্ধতি, আচমকা আক্রমণ, চূড়ান্ত শঠতা, ত্বরিত সাফল্য এবং অত্যধিক সন্ত্রাস। একই সঙ্গে সারা দেশে অভিযান এবং

ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখলের বিশেষ উদ্যোগ। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হবে। সশস্ত্র বাঙালিদের নিরস্ত্র ও নিহত করতে হবে। ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে হবে। আর ছিন্নমূল কর্মী ও সমর্থক শ্রমিক গোষ্ঠীকে সন্ত্রাস দিয়ে অবদমন করতে হবে। হিন্দুদের বিশেষভাবে নির্যাতন করে বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে হবে। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক শক্তির উপস্থিতি জোরদার করা হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের পর এই উপস্থিতিকে আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী করা হয়। প্রায় প্রত্যেক জেলা শহরে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সুকৌশলে সর্বত্র সামরিক ইউনিটের অধিনায়কদের পদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধিষ্ঠিত করা হয় এবং বাঙালি ইউনিটগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। যশোরে ছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যার অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি লে. কর্নেল জলিল; তাদের প্রশিক্ষণে চৌগাছায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি লে. কর্নেল মাসুদ হাসান খান; এই রেজিমেন্টকে রাজেন্দ্রপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে ভাগ করে দেয়া হয়। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল অবাঙালি অধিনায়কের অধীনে ছিল সৈয়দপুরে, এর দুই দলকে পাঠানো হয় দিনাজপুর এবং পলাশবাড়িতে। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল ছিল অবাঙালি অধিনায়কের পরিচালনায় কুমিল্লায়, এর একাংশ পাঠানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং সহ-অধিনায়ককে শমসেরনগরে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ছিল অবাঙালি নেতৃত্বে চট্টগ্রামে, তাদের এক বড় অংশ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সদস্যদের সিংহভাগ ছিল বাঙালি। তাদের ক্ষেত্রেও অধিনায়কদের বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তানি এবং সর্বত্র কিছু পাকিস্তানি সৈন্যদল ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়া হয়। পিলখানার সদর দফতরে ছিল প্রায় আড়াই হাজার বাঙালি সৈন্য। সশস্ত্র বাঙালিরা এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল যে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের সহজেই নিরস্ত্র অথবা নিহত করা যেতে পারে।

অবদমিত ঢাকা

ঢাকার অভিযান শুরু হয় রাত এগারোটার অব্যবহিত পরে, আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় ছিল মধ্য রাত, ইয়াহিয়ার বিমান করাচি অবতরণের পর। ইয়াহিয়ার পলায়নের খবর প্রচারিত হলে আওয়ামী লীগ নেতারা গা ঢাকা দিতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু নিজে তাঁর বাড়িতে সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় রইলেন কিন্তু অন্য নেতাদের গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। কর্মী ও যুব সম্প্রদায় নানা জায়গায় সেনাবাহিনীর গতিরোধের জন্য ব্যারিকেড স্থাপন করে। অভিযানের শুরুতেই ছাউনির সব বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র ও গৃহবন্দি করা হয়। ট্যাঙ্ক, কামান এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্র নিয়ে ছাউনির বাইরে পাকসেনা ছড়িয়ে পড়লো। তাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের সদর দফতর পিলখানা, পুলিশের সদর দফতর রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছিন্নমূল ও হিন্দুদের বসতি। দুটি সাহসী সংবাদপত্র বাংলা *ইত্তেফাক* এবং ইংরেজি

পিপল-এর কার্যালয় কামানের গোলায় ধ্বংস করলো। রাজারবাগে সেনাবাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো, তবে কামানের বিপরীতে ৩০৩ রাইফেল ভোরের আগেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অর্ধ নিদ্রিত পুলিশ বাহিনীর বৃহদংশ হত্যার শিকার হলো, অন্যেরা পালিয়ে জীবন বাঁচালো। পিলখানায় সেদিন ছিল বিরাট নৈশভোজ; এর আয়োজনই ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। অস্ত্রাগার ছিল তালাবদ্ধ আর বাঙালি সৈন্যরা ছিল অপ্রস্তুত। পিলখানার হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায় অতি অল্পসংখ্যক বাঙালি সেনা, কিন্তু সেখানেও পাকিস্তানিদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। চলার পথে পথে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বস্তি উচ্ছেদ করে চললো, সবরকম বাধাবিপত্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হলো। রেসকোর্স ময়দানের নিকটস্থ কালীমন্দির ও তৎসংলগ্ন বস্তি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ও বোমায় বিধ্বস্ত করে তারা এগিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এখানে চললো বীভৎস হত্যাকাণ্ড। শিক্ষকদের বাসস্থানে গিয়ে চিহ্নিত ব্যক্তিদের বের করে তারা হত্যা করলো। এঁদের মধ্যে ছিলেন দর্শনের ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, সংখ্যাতত্ত্বের এ.এন. এম মুনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের আবদুল মুকতাদির, গণিত বিভাগের শরাফত আলী, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ফজলুর রহমান খান, পদার্থ বিজ্ঞানের আতাউর রহমান খান খাদিম, ইংরেজির ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, শিক্ষা বিভাগের এম. সাদাত আলী এবং ল্যাবরেটরি স্কুলের মোহাম্মদ সাদেক। ছাত্রদের আবাসিক হলগুলো আক্রান্ত হলো, এমন কি রোকেয়া হলের মেয়েরাও রেহাই পেল না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটে জগন্নাথ হলে, খুব সকালে হলের বেয়ারা ও অন্য শ্রমিকদের ধরে নিয়ে আসে তাদের বস্তি থেকে। তারা নিহতদের লাশ এনে জড়ো করে এবং হল প্রাঙ্গণেই তাদের জন্য গণকবর খোদাই করে। সব লাশ কবরস্থ করার পর এইসব কর্মীকে সারিবদ্ধ করে বর্বর সেনাবাহিনী হত্যা করে।[১] হত্যাকাণ্ড পরদিনও অব্যাহত থাকে। ২৬ মার্চ কারফিউ জারি করে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাদের বর্বর অভিযান চালিয়ে যায়। শাঁখারি পট্টিতে আগুন দিয়ে দুই দিক থেকে কামানের গুলিতে হিন্দুদের নিধন চলে। ঢাকার অসংখ্য বস্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, অনবরত কামান দাগা এবং যত্রতত্র ধ্বংসলীলা সাধন করা হয় একই উদ্দেশ্যে—ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে সব প্রতিরোধ নির্মূল করা হয়। ২৭ মার্চ সামান্য সময়ের জন্য কারফিউ বিরতি হলে কিছু শবদেহ রাস্তা থেকে সরানো হয়। কিন্তু রক্তের চিহ্ন, বস্তিতে শবের স্তূপ এবং সর্বত্র ধ্বংসাবশেষ যেন ইচ্ছে করেই ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা হয়। সমস্ত অপারেশন ছিল একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, সামরিক অভিযান নয়। কারফিউ বিরতির সুযোগ নিয়ে দলে দলে নির্বিরোধী মানুষ ঢাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। কিন্তু ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হলো না। বংশাল থেকে ইংলিশ রোডের সব বস্তি আগুনে পুড়লো ২৮ মার্চ। ২ এপ্রিলে শহরতলি এলাকা বাড্ডা আক্রান্ত হলো, ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত জিঞ্জিরায় অনবরত কামানের আক্রমণ চললো। ঢাকা শহর হলো লাশের শহর, শবদেহ ও রক্তের দুর্গন্ধে পূতিময়। আর শহরতলিতে নদীপথ ছিল মানুষ ও জীবজন্তুর লাশে ভরপুর এবং পথঘাট-মাঠ ছিল

পার্সি গোরস্তানের মতো, যেখানে ছিল শকুনের রাজত্ব।[২] অবশেষে ঢাকায় গণহত্যা ও ধ্বংসলীলায় বিরতি টানা হলো ৪ এপ্রিল। ঢাকা হলো সম্পূর্ণ অবদমিত, দখলিকৃত একটি মৃত শহর। অবশ্য যখন খুশি তখন হত্যাকাণ্ড বা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসসাধন অব্যাহত থাকে পাকিস্তানি দখলের পরবর্তী পুরো নয়টি মাস।

হত্যাযজ্ঞের শুরুতে ঢাকায় ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে তাঁদের সবাইকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গৃহবন্দি করা হয়। ২৭ মার্চ তাঁদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন করা হয়। তাঁদের কেউ কেউ কষ্টেসৃষ্টে কিছু ধ্বংসলীলা অবলোকন করেন, সামান্য কাগজপত্র পাচার করতেও সক্ষম হন। এঁদের একজন লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফের* সাইমন ড্রিং খুব বুদ্ধি করে সবার অলক্ষ্যে একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন এবং দুইদিন পরে দেশত্যাগ করেন। এইসব বিদেশি সংবাদদাতাই সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হত্যালীলার কাহিনী প্রচার করেন। এই অভিযানের খবর প্রথম জানা যায় ঘটনা শুরু হওয়ার ১৮ ঘণ্টা পরে, যখন ২৬ মার্চ বিকেলে জেনারেল ইয়াহিয়া জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি সামরিক বাহিনীকে হুকুম দিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু অভিযানে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা চালানো হচ্ছে সে সম্বন্ধে পাকিস্তানে কোনো খবর প্রচারিত হলো না। তার প্রথম প্রচার হয় বিদেশি সাংবাদিকদের বিতাড়নের পর। পরবর্তী অনেক দিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ মিলতো শুধু ভারতীয় অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশনায়। ২৭ মার্চ ওয়াশিংটন *ইভনিং স্টারের* হেনরি ব্রেডশার লিখলেন, "বিদ্রোহী ঢাকায় সেনাবাহিনী কামান দাগে এবং আগুন জ্বালায়।" পরবর্তী দিনে তাঁর সংবাদ শিরোনাম ছিল, "ঢাকা জ্বলছে" এবং তিনি অভিযানের একটি নির্ঘন্ট প্রকাশ করেন। *ওয়াশিংটন পোস্টে* সেলিগ হ্যারিসন ২৮ মার্চ লিখলেন, "ঢাকায় রক্তাক্ত ঝটিকা অভিযান।" একই তারিখে *নিউইয়র্ক টাইমসে* সিডনি শ্যানবার্গ লিখলেন, "ঢাকায় বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীর ভারি অস্ত্র ব্যবহার।" পরবর্তী দিনে তাঁর প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল "ট্যাঙ্কের বিপরীতে লাঠি ও বর্শা।" ৩০ মার্চ লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ও *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় একই সঙ্গে বেরুলো সাইমন ড্রিংয়ের প্রতিবেদন, "অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য ঢাকার খেসারত— প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ— রক্তগঙ্গা ও জাহান্নাম।" সেলিগ হ্যারিসন ও সিডনি শ্যানবার্গ দু'জনেই অভিমত দেন যে, সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য ঢাকা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সাইমনও তাতে একমত হন। তাই হত্যাযজ্ঞ ছিল একপক্ষীয়। সাইমন ড্রিং হিসাব করেন যে, দু'দিনে প্রায় ১৩ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। বাঙালিরা যে একান্তই অপ্রস্তুত ছিল তারই সমর্থন মিলে সাইমনের অভিমতে যে, আপাতত বাঙালি বিদ্রোহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। শ্যানবার্গ অনুমান করেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ছিল ৩০ থেকে ৬০ হাজার সৈন্যের সমাবেশ। গণহত্যার বিবরণ, হৃদয়হীনভাবে ঢাকায় দলন এবং সেনাবাহিনীর আচরণে নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার সমাহারের পরিচয় পাওয়া যায় এইসব প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদ পরিবেশনায়। সাইমন ড্রিং বলেন, "অখণ্ড পাকিস্তান ও

আল্লাহর ওছিলায় ঢাকা এখন একটি দলিত এবং সন্ত্রস্ত নগরী।" হেনরি ব্রেডশার বলেন, "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একটি উপনিবেশ দখলে রাখার জন্য বিদেশি সেনাবাহিনীর মতো আচরণ করছিল।" ধীরে ধীরে আরো খবর প্রকাশ পেতে লাগলো। ৩ এপ্রিল *মানচেস্টার গার্ডিয়ানে* মার্টিন এডেনে লিখছেন, "ঢাকায় আগুন এবং তরবারি।" প্যারিসের *লে মোঁদ*-এ জেরার্ড ভিরাটেল তার সংবাদের শিরোনাম দিলেন; "পাকিস্তানে রক্তগঙ্গার সপ্তাহ।"[৩] এপ্রিলের ৬ তারিখ বিদেশি কূটনীতিবিদ ও অন্যান্য ব্যক্তির পরিবার-পরিজন এবং জরুরি প্রয়োজন যাঁদের নেই তাঁদেরকে ঢাকা থেকে অপসারণ করা হয়। তাঁরা বেরিয়ে গেলে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার আরো রোমহর্ষক সব কাহিনী প্রকাশ পেল। একজন অপসারিত ব্যক্তি মন্তব্য করেন, এই অভিজ্ঞতা তাকে একশ' বছরের বার্ধক্য দিয়েছে। অন্যরা শুধু গণহত্যার কথাই বলেন।[৪] পরবর্তী এক মাসেরও অধিককাল পূর্ব পাকিস্তানের কোনো খবর এমন কি পাকিস্তানেও পরিবেশিত হতো না এবং সারা দেশে বিদেশি সংবাদদাতাদের প্রবেশ থাকে নিষিদ্ধ। সংক্ষিপ্ত সংবাদে সবসময় বলা হয়, অবস্থা স্বাভাবিক এবং শান্তি ফিরেছে, জীবন প্রবাহ স্বাভাবিক গতিতে চলছে।

চট্টগ্রামে প্রতিরোধ

চট্টগ্রামের বাঙালি সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারকে ২৪ মার্চ চারজন জেনারেল (খাদেম রাজা, আনসারী, খোদাদাদ খান ও মিঠা খান) এসে নিয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় বসলেন ব্রিগেডিয়ার আনসারী। ২৮ ফেব্রুয়ারি রসদ বোঝাই হয়ে 'সোয়াত' জাহাজ চট্টগ্রামে নোঙর করে, কিন্তু জনতার আপত্তিতে এই জাহাজ খালাস করা গেল না। ব্রিগেডিয়ার আনসারী এসেই হুকুম দিলেন, জাহাজের রসদ সব নামাতে হবে। চট্টগ্রাম রেজিমেন্টাল কেন্দ্রে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন বাঙালি লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরী। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল রশীদ জানজুয়া এবং সহ-অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি মেজর জিয়াউর রহমান। নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নতুন হয়েছে, মাত্র দুইজন বাঙালি অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের কেউই তখন চট্টগ্রামে নেই। দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাজ ছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দান, তাদের ছিল গোটা কয়েক প্রশিক্ষক অফিসার। এছাড়া চট্টগ্রামে একটি ইপিআর সেক্টর ছিল, যেখানে সর্বোচ্চ বাঙালি অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। তাদের তিনটি অংশ ছিল কাপ্তাই ও হালিশহরে। রেজিমেন্টাল কেন্দ্রে এবং ইপিআরের বাঙালি মহলে দেশের সমসাময়িক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হতো এবং তাঁরা ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অনেক সচেতন। আওয়ামী লীগ সূত্রে জেনারেল ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম চট্টগ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্রতী হন। তাঁর সৈন্যদল রেলওয়ে পাহাড় ও হালিশহরে অবস্থান নিয়ে শহর রক্ষার ব্যবস্থা করে। ছাউনির সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ না থাকায় তাঁরা ছাউনির কোনো ইউনিটকে সতর্ক করতে ব্যর্থ হলো। সোয়াত খালাস

করতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে গুলি করতে হয় এবং তাতে এই এলাকায় উত্তেজনা খুব বাড়ে। ২৫ মার্চ রাতে ব্রিগেডিয়ার আনসারী মেজর জিয়াউর রহমানকে সোয়াত খালাস করবার দায়িত্ব দেন। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি নীল নকশা অনুযায়ী রেজিমেন্টাল কেন্দ্র ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালিদের নিরস্ত্র করে অকর্মণ্য করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। চট্টগ্রাম শহরে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মেজর জিয়াউর রহমানকে ঢাকার পরিস্থিতি এবং ছাউনিতে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে অবহিত করেন ক্যাপ্টেন খালিকুজ্জামান চৌধুরী। মেজর জিয়া তখন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বন্দরে না গিয়ে সেনানিবাসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাঙালি সহকারীদের ডেকে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নেন। প্রথমেই তাঁরা কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন, পরে তিনি নিহত হন। তারপর তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান এবং পরের দিন ভোরে পটিয়াতে ছাউনী থেকে অন্যান্য যাঁরা পালাতে সক্ষম হন এবং তাঁরা সবাই সমবেত হন।[৫]

রেজিমেন্টাল কেন্দ্রে পাকিস্তানিরা মধ্যরাতে অতর্কিতে আক্রমণ করে সর্বোচ্চ বাঙালি অফিসার কর্নেল চৌধুরীকে হত্যা করে এবং ব্যাপক হারে অফিসার ও সৈন্যদের নির্মূল করে। কয়েকজন অফিসার ও গুটি কয়েক সৈন্য এই হত্যাযজ্ঞ এড়িয়ে পালাতে সক্ষম হন। দশম ইস্ট বেঙ্গলের কর্মকর্তারা পাকিস্তানের অনুগত থাকেন। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ছাউনি ছাড়ার আগে ইপিআর বা স্থানীয় প্রশাসন বা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়। তাঁদের বিদ্রোহের খবর পরিবেশন করেন চট্টগ্রামের টেলিফোন অপারেটর গোষ্ঠী। ২৫ মার্চের কালরাতে চট্টগ্রাম ছাউনিতে সহস্রাধিক বাঙালি সৈন্য শহীদ হয়। অবশিষ্টাংশ হয় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে অথবা ইপিআরের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতিরোধ সবল করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতন ছাত্র ও শিক্ষক গোষ্ঠী সামরিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয় ২৫ মার্চ রাতেই, আর এতে নেতৃত্ব দেন উপাচার্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিক। তাঁদের সাহায্যার্থ এগিয়ে আসে কাপ্তাইয়ের ইপিআর এবং ছাউনি পালানো সৈন্য-সামন্ত। চট্টগ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছাউনি থেকে বেরুতে ব্যর্থ হয়। বন্দর থেকে নৌবাহিনী অনবরত কামান দেগে চললো। কুমিল্লা থেকে একটি ইউনিট চট্টগ্রামের সাহায্যে আসছিল। ইপিআর আর সেনা রেজিমেন্ট তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তারা আর চট্টগ্রাম ছাউনিতে পৌঁছতে পারলো না। বাঙালির সংগঠিত শক্তি ছিল সীমিত, সৈন্য সংখ্যা এবং রসদে তাঁরা ছিল দুর্বল। তবুও ২৬ মার্চ প্রত্যুষে চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীন। এই স্বাধীনতা কিন্তু ধরে রাখা ছিল কষ্টকর। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল খানিকটা অসহায়। জেলা নেতা মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী গেছেন সাহায্যের সন্ধানে সীমান্ত এলাকায়। ইপিআর এবং অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। পতেঙ্গা বিমানবন্দর অরক্ষিত রেখে বেঙ্গল রেজিমেন্ট কালুরঘাটে চললো সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে ওয়ারলেস এবং বন্দর এলাকার বিহারি গোষ্ঠী ২৬ মার্চ সকালে পাকিস্তানের বিজয় হয়েছে ভেবে মারমুখো হয়ে রাস্তায় নামে।

কিন্তু এতে শুধু তারাই মার খেল না, সারা এলাকায় শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইপিআরের সীমিত শক্তির খানিকটা ব্যয় হলো এই দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামের জনগণ ও যুব সমাজ, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন সকলে প্রতিরোধ জোরদার করতে লেগে গেল কিন্তু তাঁদের সামর্থ্য ছিল খুব কম। পতেঙ্গা দিয়ে সৈন্য সাহায্য আসতে থাকলো। ২৭ মার্চ শুরু হলো বিমান হামলা আর নৌবাহিনীর চাপও বাড়তে থাকলো। ইপিআরের পক্ষে চট্টগ্রাম দখলে রাখা দুরূহ হয়ে উঠলো। অন্য কোনো স্থান থেকে সাহায্যও এলো না। মেজর জিয়া কালুরঘাটে সমাবেশের জন্য ইপিআর অথবা সেনাবাহিনীর সবাইকে ধরে রাখলেন এবং নিজে সীমান্ত এলাকায় গেলেন রসদের সন্ধানে। ২ এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীন, বাঙালিদের দখলে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম দখলে থাকার সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ. হান্নান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বিশ্বকে জানানোর প্রয়াস পান। কতিপয় উদ্যোগী রেডিও কর্মচারীর সাহায্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা হান্নান পাঠ করেন। কিন্তু তারপরেই রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। বেতারের কিছু উদ্যোগী ব্যক্তি কিন্তু তাতে নিরাশ না হয়ে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্রে "বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" স্থাপন করে বসলেন। সেখান থেকে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বারবার হান্নান সাহেবের পঠিত ঘোষণাটি প্রচার করেন। প্রথম দিন এই কাজটি সম্পন্ন করেন বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে পাঁচজন বেতারকর্মী। পরদিন আরো পাঁচজন তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁরা বেতারের নতুন নামকরণ করেন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ইতোমধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাটে অবস্থান নেন। বেতারকর্মীরা তাঁকে কিছু ঘোষণা দিতে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এলেন ২৭ মার্চ। তখনই তিনি নিজের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং এতে বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রবীণ জননেতা ও শিল্পপতি এ.কে. খানের উপদেশে এই ঘোষণাকে পরদিনই মেজর জিয়া পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং নিজেকে সেনাপতি আখ্যায়িত করেন।[৬] মেজর জিয়ার সংশোধিত ঘোষণাটি ছিল খুবই তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবারে তা সংহত হওয়ার সুযোগ পেল। এই প্রতিরোধ যে কতিপয় হঠকারী সৈন্যের বিদ্রোহ নয়, দেশের অবিসম্বাদিত নেতার ঘোষণা এই সত্যটি সারা জাতিকে দেয় প্রেরণা, উৎসাহ ও আশা। গণপ্রতিরোধে জনগণের সঙ্গে যে সশস্ত্র সব ইউনিট (সেনাবাহিনীর রেজিমেন্ট, ইপিআরের সেক্টর এবং পুলিশ বাহিনী) যোগ দিয়েছে সেই বাস্তবতা যেমন আত্মবিশ্বাসকে করে তীব্র তেমনি বিজয়ের আশাও সঞ্চার করে। বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণাটি হওয়ায় এবং তা একজন সেনাপতির জবানে হওয়ায় তার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাশক্তি বেড়ে গেলে ৩০ মার্চ ক্যাপটেন রফিক হালিশহর ও রেলওয়ে পাহাড় ছাড়তে বাধ্য হন। ২ এপ্রিল পাকিস্তানি আক্রমণ হলো কোর্ট পাহাড়ে এবং এবার ইপিআরকে চট্টগ্রাম ছাড়তে হলো। ৩০ মার্চ পাকিস্তান বিমান বাহিনী কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রকে নিস্তব্ধ করে দিল।

৬ এপ্রিল চট্টগ্রামে পাকিস্তানের দখল পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এই চট্টগ্রাম ছিল বিরান ও বিধ্বস্ত একটি নগর। তার অগণিত নাগরিক শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে আর শহর জুড়ে রয়েছে ব্যাপক ধ্বংসস্তূপ। কালুরঘাট আক্রান্ত হয় প্রথমে ৩০ মার্চ, তারপর থেমে থেমে যুদ্ধ চলে। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের শক্তিশালী আক্রমণের মুখে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর মীর শওকত আলী পার্বত্য চট্টগ্রামে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। রসদের অভাব ছিল এই প্রতিরোধের প্রধান দুর্বলতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁদেরকে দুই শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়। তাড়িয়ে আসছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। আর ওখানে প্রশিক্ষণ ও আশ্রয়-কেন্দ্রস্থিত বিশ হাজার পাকিস্তানি দোসর মিজোরা শুরু করে শত্রুতা। রামগড়ে কিন্তু বাংলাদেশের পতাকা অনেকদিন উড্ডীয়মান ছিল এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও সেখানে পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়। রামগড় পাকিস্তানের দখলে যায় মে'তে।

বাঙালিদের ছিল উৎসাহ ও উচ্চাশা। কিন্তু তাদের কোনো সামরিক শক্তি ছিল না। রণবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং তাদের রসদও তেমন ছিল না। জনগণ বিক্ষোভ করে, যোদ্ধাদের যাতায়াতে সাহায্য করে, খানাদানা সরবরাহ করে, ব্যারিকেড বানাতে বা খাল কাটতে বা পুল ভাঙতেও তারা সাহায্য করে। কিন্তু একটি সুসংহত ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। গাদা বন্দুক আর লাঠি দিয়ে কামান আর বোমার মোকাবিলা ছিল বাতুলতা। চট্টগ্রামে পাকিস্তানি দখল নিয়ে আসে বাঙালিদের সর্বনাশ। বিহারিদের অভিযোগে নির্দোষ বাঙালিদের হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার শামসুল হক, রেলওয়ের বড় কর্তা শফি, নাসির ও জালাল সাহেব এবং আরো অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনী বিহারিদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করে এবং এরা পরবর্তী নয় মাস সন্ত্রাস চালিয়ে যায়। চট্টগ্রামের কতিপয় বাঙালি গাদ্দার যেমন ফজলুল কাদের চৌধুরী এই সন্ত্রাসে সক্রিয় থাকে। প্রায় মাসখানেক পরে কিছু বিদেশি সাংবাদিককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে পাকিস্তান সরকার। চট্টগ্রামে তাঁরা দেখতে পান মৃত্যু ও ধ্বংসের নিদর্শন এবং শহরটিকে তাঁদের মনে হয় একেবারেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত।[৭]

দেশের অন্যত্র প্রতিরোধ

ঢাকায় সেনাবাহিনীর নৃশংসতা এবং চট্টগ্রামে প্রতিরোধের সাফল্যের খবর দেশের অন্যত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায়। এ ছাড়াও সর্বত্র পাকিস্তানিরা অতর্কিতে আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং আত্মরক্ষার খাতিরেও বাঙালিদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। ২৮ মার্চ *নিউইয়র্ক টাইমসে* সিডনি শ্যানবার্গ লেখেন, "লাঠি, বর্শা এবং স্বহস্তে নির্মিত রাইফেল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা বিমান, বোমা, ট্যাঙ্ক ও ভারি কামানে সজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।" এই প্রতিরোধ নানা জায়গায় নানাভাবে সংগঠিত হয় এবং এর নেতৃত্বেও ছিলেন নানা শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। কুমিল্লাস্থিত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের সহ-অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফকে ২৪ মার্চ শমসেরনগরে পাঠানো হয়। তিনি যাওয়ার আগে সব বাঙালিকে সতর্ক করে দেন এবং

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাকিস্তানি অভিযানের খবর পেয়েই তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্রোহ হয় ২৭ মার্চ সকালে এবং এখানে প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন মেজর খালেদ মোশাররফ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শমসেরনগর পর্যন্ত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের আওতাধীন।[৮] ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাকিস্তানিদের প্রতিহত করে চলে। জয়দেবপুরে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়ক মেজর এম শফিউল্লাহ ২৭ মার্চ দলবল নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে রওনা হন। টাঙ্গাইলে বিদ্রোহ শুরু হয় ২৬ মার্চ রাতে। গাজীপুর ও জয়দেবপুরের অন্যান্য বাঙালি সৈনিক টাঙ্গাইল রওনা দেয়ার আগেই যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে অবশেষে মুক্তাগাছায় পৌঁছেন ২৮ মার্চ। ময়মনসিংহে ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহ করে এবং ২৯ মার্চ সেখানে সম্মিলিত সেনা ইউনিট সংহত হয়। ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবদুস সুলতান এবং স্থানীয় প্রশাসন প্রতিরোধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেনাবাহিনী যোগ দিলে জয়দেবপুর থেকে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহ পর্যন্ত এলাকা স্বাধীন হয়। যশোর ছাউনি থেকে একদল সেনা এসে কুষ্টিয়া দখল করে ২৫ মার্চ রাতে এবং পুলিশকে নিরস্ত্র করে। চুয়াডাঙ্গায় প্রতিরোধ গড়ে উঠে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আসাবুল হকের নেতৃত্বে। ইপিআর মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ২৬ মার্চ এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কুষ্টিয়ায় পুলিশ এবং ইপিআর ২৮ মার্চই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে। ৩১ মার্চ মেজর ওসমান এক বিপুল গণবাহিনী নিয়ে কুষ্টিয়া আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের তাড়িয়ে দেন। পাকিস্তানি সাহায্যকারী একটি দল পথিমধ্যে ৫ এপ্রিল জনতা কর্তৃক পরাভূত হয়। যশোর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত এলাকা ৩১ মার্চই স্বাধীনতা লাভ করে।[৯] যশোরে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ২৯ মার্চ চৌগাছা থেকে ছাউনিতে ফিরিয়ে আনা হয়। ৩০ মার্চ তাদের নিরস্ত্র করতে গেলেই বিপদ বাধে। ত্বরিত আক্রমণে বাঙালিরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাঙালি অধিনায়ক পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় নেতৃত্ব দিতে হয় লেফটেন্যান্ট হাফিজ উদ্দিনকে। তাঁরা ছাউনি ছেড়ে বাইরে জনগণের সহায়তায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরে তাঁরা পাবনা ও যশোরের অন্যান্য এলাকার প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশীভূত হন। সৈয়দপুর ছাউনির ছত্রছায়ায় স্থানীয় বিহারিরা ২৬ ও ২৭ মার্চ এক বীভৎস হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৮ মার্চ দিনাজপুর ইউনিটে বাঙালিদের আক্রমণ করলে ক্যাপটেন আশরাফ বিদ্রোহ করেন। ৩১ মার্চ সৈয়দপুরে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ হয় এবং এতে প্রচুর ক্ষতিসাধিত হয়। তাঁরা ছাউনি ছেড়ে ফুলবাড়িতে ক্যাপটেন আনোয়ারের নেতৃত্বে সমবেত হন। ৩ এপ্রিল এখানে একটি সমন্বিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সিলেটে পাকিস্তানিরা ২৭ মার্চ হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সেখানে বাঙালি অফিসার প্রায় ছিলেন না। জেসিওদের নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল শহরটি পাকিস্তানি কবলমুক্ত হয়। পাকিস্তানিরা কিন্তু সালুটিকর বিমানবন্দরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। স্থানীয় নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী এই প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন এবং পরে হবিগঞ্জ থেকে আগত মানিক চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবদুর রব এবং ক্যাপটেন

সি.আর. দত্ত এতে শামিল হন। পাবনায় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপটেন মনসুর আলী এবং জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খান। পরবর্তীকালে তাঁরা যশোর ও কুষ্টিয়ার প্রতিরোধ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হন। বগুড়ায় প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগ নেতা ড. মফিজ চৌধুরী এবং বামপন্থী নেতা গাজীউল হক। ফরিদপুরে নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগ নেতা ফণীভূষণ মজুমদার, চাঁদপুরে মিজানুর রহমান চৌধুরী, নোয়াখালিতে আবদুল মালেক উকিল, খুলনায় শেখ আবদুল আজিজ। ইপিআর-এর অফিসার ক্যাপটেন নওয়াজেশ উদ্দিন রংপুরে, মেজর নাজমুল হক নওগাঁয় ও ক্যাপটেন নজরুল হক দিনাজপুরের প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন।

প্রায় সর্বত্র বাঙালিদের সাফল্যের কারণ ছিল জনসমর্থন কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের অভাব তাঁদের দখলকে দৃঢ় করতে ব্যর্থ হয়। যশোর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও সিলেটে তাঁরা পাকিস্তানিদের ছাউনি ঘিরে রাখে কিন্তু আক্রমণ করবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। প্রথমদিকে প্রতিরোধের লক্ষ্যও খুব স্বচ্ছ ছিল না। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে মোটেও সমন্বয় ছিল না। সবাই আশা করছিল, এই মুখোমুখি অবস্থানের আশু সমাধান হবে। কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা যুদ্ধ পরিহার করবে। দিন যতোই যেতে থাকলো উদ্বেগ ততোই বাড়তে লাগলো। পূর্বাঞ্চলের সেনাধিনায়করা তবু ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় সমবেত হয়ে সমন্বিত উদ্যোগের প্রচেষ্টা চালান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেও ছিল সমন্বয়ের অভাব। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ৩০ মার্চ মেহেরপুর হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুষ্টিয়ার নেতা আমিরুল ইসলাম। পূর্ব রণাঙ্গনের চট্টগ্রামের মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর ২ এপ্রিল যোগাযোগ হয়। অন্যান্য নেতা যেমন কুমিল্লার খন্দকার মোশতাক আহমদ, সিলেটের কর্নেল এমএজি ওসমানী, রাজশাহীর এএইচএম কামারুজ্জামান, ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পাবনার মনসুর আলী, দিনাজপুরের ইউসুফ আলী ও কুমিল্লার মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রথম একত্র হলেন ১০ এপ্রিল। সরকার গঠনের ঘোষণা হলো ১৩ এপ্রিল। ইতোমধ্যে প্রতিরোধ শক্তি হারাতে থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখল করার পর পাকিস্তানি বাহিনী মফস্বল শহরের দিকে নজর দিল। তারা নানা জায়গায় বিমান হামলা শুরু করলো। ৮ এপ্রিল তারা প্রথম স্বীকার করলো যে সিলেট, রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহে বিমান হামলা হয়েছে। পাকিস্তানি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিমান হামলা প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা ছিল না প্রতিরোধ শক্তির। তাদের কোনো বাজুকা বা বিমান বিধ্বংসী কামান ছিল না। তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল রাইফেল আর জনতা। ইতোমধ্যে বিহারি সম্প্রদায় নানা জায়গায় গোলমাল বাধালো। ঢাকা ও চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় তাদের বাঙালি হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠনের কাহিনী অন্যান্য জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে। শান্তাহার, রংপুর, যশোর, দিনাজপুর, পার্বতীপুর এইসব এলাকায় তাদের ওপর হামলা হলো। অনেক ক্ষেত্রে তাদের গুপ্তচর ও গৃহশত্রু অপবাদ দিয়ে শাস্তিও দেয়া হলো। ময়মনসিংহে ১৭ এপ্রিল রেলওয়ে কলোনির বিহারিরা প্রতি-আক্রমণ চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো এবং এতে একটি

বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হলে প্রতিরোধের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। এই সময় চট্টগ্রামের পতনের খবর হয় অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক। ধীরে ধীরে সর্বত্র প্রতিরোধ ব্যর্থ হতে থাকলো। এই অবস্থায় প্রতিরোধে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের পিছুহটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ৬ এপ্রিল চট্টগ্রামের পতন হয়। ১০ এপ্রিল সিলেট ও পাবনার পতন হলো। রাজশাহীতে প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো ১৫ এপ্রিল। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পতন হলো। ২১ এপ্রিল ফরিদপুর, ২২ এপ্রিল ময়মনসিংহ, ২৩ এপ্রিল বগুড়া, ২৬ এপ্রিল রংপুর ও নোয়াখালি থেকে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করলো। বাঙালি প্রতিরোধ কিন্তু ছিল দুঃসাহসী। অপ্রস্তুত অবস্থায় এতো সাহস ও আত্মবিশ্বাস অসাধ্য সাধন করে। ফরিদপুরে লাঠি, বর্শা, বল্লম, গুটিকয়েক বন্দুক ও রাইফেল তিন তিনবার পাকিস্তানি সাঁজোয়া বাহিনীর পদ্মা অতিক্রম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। নরসিংদীতে পাকিস্তানি বাহিনী পরাভূত হয় এবং প্রায় এক সপ্তাহের চেষ্টায় তারা নরসিংদী দখল করে ১২ এপ্রিল। কোনো কোনো এলাকায় কখনই পাকিস্তানিরা দখল কায়েম করতে পারে নি। বেলোনিয়া, মাধবপুর, ধুম, কসবা, মধুপুর, রাজইর বা টাঙ্গাইলে কখনো মুক্তিবাহিনী হাল ছাড়ে নি। পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসসাধন করে একস্থান থেকে আর একস্থানে এগোয়। তাদের কামানের আওতায় যেটুকু জায়গা পড়ে তারা সেখানেই দখল স্থাপন করে। এপ্রিলের শেষে গোটা দেশই তাদের দখলে ছিল কিন্তু এই দখল ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। সার্বিক প্রতিরোধের একটি চমৎকার বর্ণনা দেন *ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের* সাংবাদিক পিটার কান। ২১ এপ্রিলের সংবাদপত্রে তিনি লেখেন, "বহুদিন ধরে যুদ্ধের আশঙ্কা নয় বরং নিশ্চিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বাঙালিরা আশ্চর্যজনকভাবে এই যুদ্ধটির জন্য অপ্রস্তুত ছিল। তাদের মধ্যে কোনো সার্থক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, মায় রানারেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই জেলায় জেলায় বা গ্রামে গ্রামে তাদের ভাগ্যের হেরফের হয়। নেতৃত্ব ছিল মোটামুটিভাবে আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা এবং বেসামরিক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের হাতে। তারা সাধারণত আড্ডা জমাতে পছন্দ করেন। প্রথমে তারা খুবই উৎসাহের সঙ্গে ও গভীর আবেগে জনগণের মুক্তি ও দেশের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করেন। তারপর সমান আবেগে তাদের অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তাদের কোনো বিমান নেই, তাদের কোনো কামান নেই এবং তারা কোনো বৈদেশিক সমর্থন পেলেন না— এই নিয়েই তাদের ক্ষোভ ও হতাশা।"

পাকিস্তানি গণহত্যা

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে ধরনের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালায় তাতে মনে হয় গণহত্যা সংঘটন তাদের পরিকল্পনায় ছিল। সব বিদেশি সাংবাদিকদের তাড়িয়ে দিয়ে, সংবাদ মাধ্যমে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে একনাগাড়ে ছয় সপ্তাহ তারা হত্যালীলা চালিয়ে যায়। ছয় সপ্তাহ পরে যখন তারা

নিজেদের পছন্দমতো কতিপয় সাংবাদিককে অবস্থা পর্যবেক্ষণে আমন্ত্রণ করে তখন তাঁদের রাখা হয় খুব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। সামরিক কর্তা ব্যক্তিরা তাঁদের দেখাশোনা করেন, তাঁদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন, এমন কি তাঁরা কি দেখবেন, কোথায় যাবেন, কার সঙ্গে কথা বলবেন এসব ঠিক করে দেন। তা সত্ত্বেও এসোসিয়েটেড প্রেসের মর্ট রোজেনব্লুম তাঁর প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন, "শকুনি এত মোটা যে উড়তে পারে না।" তিনি হিসাব করেন যে, "প্রায় দশ লাখ লোককে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে।"[১০] *নিউইয়র্ক টাইমসের* ম্যালকম ব্রাউন তাঁর প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন, "আকাশে যার ছায়া পড়ছে সে একটি শকুনি আর তার পেট খুব মোটা।" তাঁর ধারণা হয় যে, সেনাবাহিনী যতই সাফাই গাক না কেন তারা বসতির পর বসতি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে বা কামান দেগে ধ্বংস করেছে। তাঁর হিসাব ছিল যে পাঁচ লাখ নিহত বললে অত্যুক্তি করা হবে না।[১১] *টাইম* ম্যাগাজিনের ডান কগিন অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে স্কুটার, ট্রাক, বাস ও সাইকেলে চড়ে বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ান। তাঁর প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, "ঢাকা একটি মৃতের শহর। গরিব এলাকায় আগুনের বলয় বানিয়ে মানুষ খুন করা হয় আর কেউ যদি এই বলয় থেকে বেরুবার চেষ্টা করতো তখন সেনাপতির হুকুম হতো 'হারামজাদাকে খতম করো'।" একজন পাঞ্জাবি ক্যাপটেন বলেন, "আমরা যে-কোনো ব্যক্তিকে যে-কোনো কারণে হত্যা করতে পারি। আমাদের কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"[১২] অনেক নতুন সামরিক আইন জারি করে হত্যা ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করা হয়। ২৭ এপ্রিল জারি হয় সামরিক আইন হুকুম ১৪৮। এতে বলা হয় যে, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে এবং যে এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে সেখানে পাইকারি শাস্তি দেয়া যাবে। এর আগে ৯ এপ্রিল জারি হয় সামরিক আইনের হুকুম ৭৮। তাতে বলা হয় যে, কারো বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সন্দেহ হলে তাকে বন্দি করা যাবে অথবা দেশ থেকে বিতাড়ন করা যাবে।[১৩] সীমান্ত পোস্টের পাঁচ মাইল এলাকাস্থিত বসতি বা ঘরবাড়ি বা দোকান-হাট সবকিছু ধ্বংস করবার অধিকার দেয়া হয় সেনাবাহিনীকে। সামগ্রিক চিত্রটির যথার্থ বিবরণ দিয়েছে ২৬ এপ্রিলের *নিউজউইক* ম্যাগাজিন— "অভিযানের নৃশংসতা ও তিক্ততা দেখে মনে হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শুধু সামরিক বা নিরাপত্তা টার্গেট ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুরোপুরি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে শহরের পর শহরে সৈন্যরা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও ভিত্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ছিল বদ্ধপরিকর। ইসলামাবাদের জান্তার হুকুমে তারা সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিটি সম্ভাবনাময় ছাত্র, প্রকৌশলী, ডাক্তার বা নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের হত্যা করে চলে। জাতীয়তাবাদী হোক আর না-ই হোক যে বাঙালির জীবনে কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা আছে তাঁকেই খতম করতে হবে।"

প্রথম পর্বে পাকিস্তানিরা সর্বত্র তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু তবুও তাদের নৃশংসতায় কোনো ভাটা পড়লো না। মনে হয় যেন তারা চিরদিনের জন্য বাঙালিদের উপদ্রব গুঁড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এর জন্য প্রয়োজন পড়ে এক নতুন জাতের

বাঙালি। এই বাঙালি হবে ধর্মান্ধ, ঘোর সাম্প্রদায়িক, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডহীন এবং অত্যন্ত নমনীয়— এক কথায় ক্রীতদাসের চরিত্রের লোক। তাদের হিসাব ছিল সহজ। প্রায় দেড় কোটি লোক ছিল পাকিস্তানের সমর্থক, এদের মধ্যে ছিল সংগ্রামী বিহারি গোষ্ঠী এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। হয়তো তিন কোটি বাঙালি ছিল জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী। এদের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি ছিল হিন্দু অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য, যাঁরা মনেপ্রাণে পাকিস্তানের শত্রু। বাকি তিন কোটি ছিল নির্বিরোধী ও নির্বাক জনতা। সুতরাং মোট সাড়ে চার কোটি পাকিস্তানির জন্য তিন বা ত্রিশ লাখ দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করা মোটেই অযৌক্তিক বা অন্যায় নয়। এই যুক্তিতেই বাঙালি মেয়েদের বলপূর্বক ধর্ষণে তাদের বাদ সাধে নি। একই সঙ্গে সামরিক জান্তা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেয়। ইসলামি মূল্যবোধ ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হবে, আধুনিকতাকে বিতাড়ন করা হবে এবং বাংলাভাষার চর্চা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য অর্ধেক বাঙালিকে তৃণসম করতে এই উন্মাদ জান্তার কোনো আপত্তি ছিল না। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালিদের প্রায়ই 'মুরগি' বা 'বাঁদর' বলে সম্ভাষণ করতো। জেনারেল নিয়াজি তো বলতেনই, "এটি হচ্ছে একটি নিম্নজাতের নিম্নভূমির দেশ।"[১৪] পাকিস্তানিদের এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা বাঙালিদের আরো তিক্ত ও দৃঢ়চিত্ত করে তোলে। যেভাবেই হোক এই দস্যুদের বিতাড়ন হয়ে উঠে প্রতিটি বাঙালির পণ।

অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানিরা হিন্দুদের হত্যা করে, ভয় দেখায় এবং বঞ্চিত করে দেশ থেকে বিতাড়ন করে। হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালাতে চাইলে প্রায়ই তারা সুযোগ করে দিত।[১৫] তাদের যুক্তি ছিল তিনটি। প্রথমত, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই শত্রুদের চিরতরে বিতাড়ন। দ্বিতীয়ত, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি। তৃতীয়ত, ভারতের ওপর একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ। হিন্দুদের তারা পাকিস্তানি মনে করতো না, তাই সবসময়েই শরণার্থীদের হিসাব থেকে এদের বাদ দিতে চেষ্টা করতো। যেসব হিন্দু দেশে থেকে যায় তাদের ওপরে ছিল ধর্মান্তরণের চাপ, অনেকেই সাময়িকভাবে হয় মুসলমান না হয় খৃস্টান হয়ে যায়। একটি গোষ্ঠী হিসেবে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করা ছিল সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য। এই জান্তা গণহত্যার বিষয়টি চেপে রাখতে ব্যর্থ হয়ে এক নতুন চালিয়াতিতে মত্ত হলো। জেনারেল আকবর ৫ মের শ্বেতপত্রে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর প্রয়াস পেলেন। এই শ্বেতপত্রে দাবি করা হলো যে, পঞ্চাশ লাখ মোহাজেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা নেয় আওয়ামী লীগ এবং প্রায় এক লাখ লোককে হত্যা করে। তাদের দাবির সমর্থনে শ্বেতপত্রে প্রদত্ত সহিংস ঘটনার একটি হিসাব পরিশিষ্টে তুলে ধরা হলো।[১৬] এই হিসাবে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ঘটনা ঘটে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার পর। ২৫ মার্চের আগের ঘটনাগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত ও সীমিত। এই শ্বেতপত্রে দাবি করা হয় যে, আওয়ামী লীগের গণহত্যা রোধ করার জন্য সামরিক অভিযান শুরু করতে হয়। আরো বলা হয় যে, এই অভিযোগ আগে করা হয় নি, কারণ তাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরো ব্যাপক

আকার ধারণ করতো। এই পুরো কাহিনীটি নিতান্তই বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং পরবর্তীকালেও বাঙালিরা বিহারিদের খানিকটা নির্যাতন করে এবং কিছু লোক খুন করে। এই সত্যটি স্বীকার করেও বলতে হয় যে, পাকিস্তানের অভিযোগ যে মাপে করা হয়েছে তা শুধু হাস্যাস্পদ নয়, নিদারুণভাবে মিথ্যা। বাঙালি কর্তৃক বিহারি নির্যাতনের বিষয় কখনো গোপন ছিল না। মার্চ-এপ্রিলে প্রচুর বিহারি পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি দেয়। বিষয়টি ছিল খুবই দুঃখের কিন্তু তেমন ব্যাপক না হওয়ায় ততোটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ২৫ মার্চের পর বিহারিদের ওপর আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তারা বিহারিদের বাঙালিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, যেমন চট্টগ্রামে ২৫ মার্চ ও ২ এপ্রিল, ময়মনসিংহে ১৭ এপ্রিল বা সৈয়দপুরে ২৬ মার্চ। এতে ক্ষিপ্ত বাঙালিরা বিহারিদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। পাকিস্তানের মিথ্যা ভাষণের বড় নিদর্শন হলো বিহারি জনসংখ্যার হিসেব। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৫ কোটি ৮ লাখ পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে অবাঙালি ছিল মাত্র ৪ লাখ ৯০ হাজার আর এদের মধ্যে চা বাগানের উড়িয়া কুলি ছিল ১ লাখ ৫৫ হাজার। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে হয় দেড়গুণ, তাই বিহারির সংখ্যা সম্ভবত ছিল মাত্র ৫ লাখ।[১৭] ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের হিসেবে বাংলাদেশে বিহারি জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৮২,০০০।[১৮] মাত্র ৫ লাখ বিহারি অধিবাসীর মধ্যে এক লাখের হত্যা কাহিনী নিতান্তই অলীক।

নভেম্বরের মাঝামাঝি ভারতে বাঙালি শরণার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ৯৭ লাখ, এদের মধ্যে ৭০ লাখ ছিল হিন্দু। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাস্তুহারাদের সংখ্যা ছিল দুই কোটি। নয় মাসে এই যে অঘটন তার জন্য দায়ী ছিল পাকিস্তানি দস্যু বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন কার্য। যে-কোনো অজুহাতে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া, যুবকদের ধরে এনে বধ্যভূমিতে গুলি করা, মেয়েদের ধরে এনে ক্যাম্পে বন্দি করা, পরিচিত ব্যক্তিদের গুম করা, 'মুক্তি' বা 'মুক্তি'র সহযোগী বলে বাঙালিদের হত্যা করা ছিল পাকিস্তানিদের হোলি খেলার মতো। একজন সেনাপতি একটি চিরকুটে লেখেন, "বাংলার শ্যামলিমাকে লালে রঞ্জিত করতে হবে।" তিনি অবশ্যি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি অন্যজনের একটি উক্তি, তিনি শুধু লিখেছিলেন।[১৯] যুদ্ধ শেষে অনেক বধ্যভূমি, নির্যাতন কেন্দ্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। কোনো কোনো বধ্যভূমি ছিল রাজাকার ও আলবদরদের দখলে। একই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় অনেক বন্দি মেয়েকে ক্যাম্পে রাখা এবং অনেকের আত্মহত্যার কথা। যাঁরাই বাংলাদেশ বা ভারতে শরণার্থী কেন্দ্র দেখতে আসেন তাঁরা সবাই গণহত্যা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যান। বৃটিশ সাংসদ মাননীয় রেজিনাল্ড প্রেন্টিস সীমান্তের দুই পারে ভ্রমণ করে বলেন যে, এইটি ছিল একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, "আমার জীবনে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আর হয় নি। মানুষের দুর্দশা যেমন অন্তহীন তেমনি ব্যাপক এই নির্যাতন।"[২০] ২৮ জুনের *নিউজউইক* ম্যাগাজিন গণহত্যা ও গণধর্ষণের এক বীভৎস বিবরণ প্রকাশ করে, এর শিরোনাম ছিল "টিক্কা খানের ভয়ঙ্কর রক্তগঙ্গা।" তবে সবচেয়ে মারাত্মক কাহিনী

লেখেন সাংবাদিক এন্টনি মাসকারেনহাস। তিনি ছিলেন পাকিস্তানি সাংবাদিক এবং ২ মে-তে তিনি বিহারি হত্যার ওপর একটি প্রতিবেদন লেখেন পাকিস্তানের প্রচারবিদ হিসেবে। এরপর তিনি দেশত্যাগ করে তাঁর প্রতিবেদনে পাকিস্তানের সবচেয়ে তীব্র ও কঠোর নিন্দাবাদ করেন। লন্ডনের *রবিবাসরীয় টাইমসে* ১৩ জুন এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সম্পাদকের টিপ্পনীসহ। 'কি দামে পাকিস্তান' শীর্ষক এই কাহিনীর উপসংহার ছিল, "ধর্মীয় পাণ্ডাদের এটি ছিল একটি পরিকল্পিত গণহত্যা। এর জন্য নির্দেশ দেয়া হয় সর্বোচ্চ স্তর থেকে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বেচ্ছায় ও সুচিন্তিতভাবে একটি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন।"[২১] জুনের শুরুতে একটি বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশন আসে অর্থনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে। তাদের গোপন প্রতিবেদন ১৩ জুলাই *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রকাশ করে দেয়।[২২] এতে ধ্বংসলীলা, গণহত্যা, প্রতিরোধ আন্দোলন, সামরিক কর্মকাণ্ড সবকিছু সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়। মিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ত্রাসের রাজত্বে ভীতি ও কর্মবিমুখতা এবং নিরাপত্তার অভাব এমন এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ফিরে পাওয়া তো দূরের কথা স্বাভাবিক অবস্থাই দুরূহ। একজন মিশন সদস্য হেনরিক ভান ডার হাইডেন তাঁর দক্ষিণ বাংলা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া ভ্রমণের বিচিত্র বর্ণনা দেন—মানুষ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজকর্ম সব বন্ধ, সর্বত্র ধ্বংসের নিদর্শন এবং সামরিক সরকার হুকুম দিয়েই যাচ্ছে। কুষ্টিয়া সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, "মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছে। আমরা যেতেই সবাই পালিয়ে গেল। এটা যেন ছিল আণবিক আক্রমণের পরের সকাল। মানুষ ছিল ভীত, সন্ত্রস্ত এবং হতবুদ্ধি। আমাকে কেউ বলেছে যে কুষ্টিয়া ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'মাইলাই'। আমার প্রতিক্রিয়া ছিল এই ধারণার সত্যায়ন।" মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নিউজার্সির কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গালাগার মে মাসের শেষে ভারতে শরণার্থী কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। ফিরে গিয়ে তিনি *নিউজউইকের* সাংবাদিকের কাছে বলেন, "আমি সর্বশক্তি ও দৃঢ়চিত্ততা প্রয়োগ করে ক্রন্দন রোধ করি এবং ভেঙে পড়ি নি।" তিনি কংগ্রেসে যে বক্তব্য দেন তাতে বলেন, "আমার এশিয়া প্রশান্ত বিষয়ক পররাষ্ট্র সাব-কমিটির দুই দিনব্যাপী শুনানি হয় মে মাসে। তখন আমার মনে হয় যে গণহত্যার প্রতিবেদন, নৃশংসতার কাহিনী এবং নজিরবিহীন মানবিক দুর্গতির চিত্রটি ছিল অতিরঞ্জিত। আমি এখন আমাদের সহকারীদের জানাতে পারি যে, এই সব বিবরণ মোটেই অতিরঞ্জিত নয়, বরং অপর্যাপ্ত এবং উনোক্তি।"[২৩] সিনেটর কেনেডি শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যান আগস্ট মাসে। তিনিও অনুধাবন করেন যে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও ভয়াবহ। ওয়াশিংটনে ফিরে তিনি ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যায় লিপ্ত।[২৩]

১৯৭১ সালের ২ আগস্ট *নিউজউইক* ও *টাইম* ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ কাহিনী আবার হয় বাংলাদেশের গণহত্যাকে নিয়ে। টাইমের শিরোনাম ছিল "পাকিস্তান—সোনার বাংলার ধ্বংস সাধন"। পুরো কাহিনী ছিল রক্তগঙ্গা নিয়ে। পাকিস্তানের অভিযান ছিল

অত্যন্ত নৃশংস ও নিষ্ঠুর এবং বাঙালির দুর্দশা ছিল অবর্ণনীয়। *নিউজউইকের* শিরোনাম ছিল "বাংলা— একটি জাতির হত্যা।" কাহিনী শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরতার কতিপয় নিদর্শন দিয়ে। বাঙালি যুবকের সব রক্ত নিয়ে তাকে মৃত ফেলে দেয়া হলো, এই রক্তের প্রয়োজন পাকিস্তানি আহত দস্যুদের জন্য। শরণার্থী কেন্দ্রে মায়ের কোলে শিশু মৃত্যুবরণ করছে। পিতামাতার চোখের সামনে যুবতী ও কিশোরী মেয়েকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছে পাকিস্তানি পশুর দল। যে মাপে গণহত্যা সাধিত হয় তা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত। নৃশংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, এই বর্বরতার অন্যতম হোতা ভুট্টোও ২৯ সেপ্টেম্বর ঘোষণা দেন, "ভয়াবহতার দীর্ঘ কালরাত্রির অবসান চাই, জেনারেলদের রাজত্বের অবসান চাই।"[২৫] কিন্তু হত্যাযজ্ঞ বা ধ্বংসলীলা শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ২৫ অক্টোবর *টাইম* ম্যাগাজিন আবার প্রচ্ছদ কাহিনী করলো, "পাকিস্তান— এমন কি আসমানও কাঁদছে।" অকল্পনীয় হত্যাকাণ্ড, নির্বিচার ধ্বংসলীলা এবং অকথ্য নির্যাতন হয় পাকিস্তানের পরিচয়চিহ্ন। *টাইমের* হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছিল দশ লাখেরও বেশি।[২৬] ১২ নভেম্বর *বাল্টিমোর সানের* সাংবাদিক জন উডরাফ বলেন যে, "বাংলাদেশের একমাত্র বাস্তবতা হলো ভীতি এবং মৃত্যু ছিল সহজ এবং আকস্মিক। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেয়া, বসতির পর বসতিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া এই ছিল স্বাভাবিক। গণহত্যা বা ধ্বংসসাধনে কোনো বাধাবিপত্তি বা বিবেকের দংশন ছিল না।"[২৭] গণহত্যার সবচেয়ে জঘন্য কাহিনী প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর। সেনাবাহিনী যখন আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেই সময়ও তাদের গণহত্যার নীলনকশা কার্যকরী করে চলে। জেনারেল নিয়াজি অথবা জেনারেল ফরমান আলীর নির্দেশে আলবদর ও আল শামসের গোঁড়া কর্মীবৃন্দ ডিসেম্বরের ১৪ তারিখের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। ঐ বর্বর রাজত্বে কোনো বিচার প্রক্রিয়া মানা হতো না বলে এভাবেই লোকজনকে বন্দি অথবা হত্যা করা হতো। ১৮ ডিসেম্বর জানা গেল যে, রায়েরবাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমিতে তাঁদের অনেকের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। এই সব ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন দেশের স্বনামধন্য চিন্তাবিদ, পেশাজীবী, শিক্ষক প্রমুখ। তাঁদের যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে অত্যন্ত রুগ্ন ও নিচুমনের পরিচয় মেলে। চোখের ডাক্তারের চোখ উপড়ে ফেলেছে, লেখকের হাত ভেঙে দিয়েছে, হৃদরোগের ডাক্তারের হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, কণ্ঠশিল্পীর গলা কেটে ফেলেছে। এইসব জঘন্য কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রাখে জামায়াতে ইসলামী দলের নেতৃবর্গ এবং তাদের অনুসারী আল বদর ও আল শামসের গুণ্ডারা। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসাবিদ্যার কতিপয় দিকপাল মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ মুর্তাজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এস.এম.এ. রশীদুল হাসান, শিক্ষা বিভাগের ড. সিরাজুল হক খান, ইতিহাস বিভাগের আবুল খায়ের, গিয়াসউদ্দিন আহমদ এবং সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগের মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং এম আনোয়ার পাশা, পৌর নেতা মোহাম্মদ ইয়াকুব এবং সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, নিজামউদ্দিন আহমদ,

গোলাম মোস্তফা, সেলিনা পারভিন, সৈয়দ নাজমুল হক এবং মোহাম্মদ আখতার। ১১ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি গভর্নর ডা. মালিকের পরামর্শে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে অনেকেই মনে করেন যে, চীনা ও মার্কিন মিত্ররা পাকিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তাতে বোধহয় পাকিস্তানিরা খুব বেপরোয়া ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ১২ ডিসেম্বর লাটভবনে উচ্চ পর্যায়ের বেসামরিক কর্মকর্তাদের এক সভা আহ্বান করা হয়। গুজবে প্রকাশ হয় যে, ঐ সভায় তাঁদের একত্রে হত্যা করা হবে। গভর্নর মালিক এবং মুখ্য সচিব মোজাফফর হোসেনের উদ্যোগে এই সভা বাদ দেয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে কেউ ছিল না এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। এই বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য পরোক্ষে কিসিঞ্জার-নিক্সনকে দায়ী করা হয়, কারণ তাঁদেরই পরামর্শে জেনারেল ইয়াহিয়া নিয়াজির আত্মসমর্পণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে এত রক্তক্ষয় এবং এত ব্যাপক ধ্বংসলীলার পেছনে ছিল পাকিস্তানের নৃশংসতা। পাকিস্তানের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো রকম নীতিবোধ, জবাবদিহিতা বা ভদ্র আচরণের লেশমাত্র ছিল না। অন্যায় যুদ্ধে যেখানে বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং নেতৃত্ব যেখানে ছিল কলুষিত, মাতাল ও ব্যক্তি স্বার্থান্বেষী সেখানে এমন পরিণতি মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না। নয় মাসে এই দস্যু বাহিনী প্রায় সারা দেশটিকে ধ্বংস করে ফেলে। জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশ এই যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (মোট তিনশ' কোটি ডলার)। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ছিল নব্বই হাজারের মতো, কিন্তু এই বাহিনী নিরস্ত্র ও নির্বিরোধী ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে। একই সঙ্গে তারা ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত হরণ করে। ইতিহাসে এই রকম বর্বরতার নজির একেবারে নেই। হিটলারের হত্যাযজ্ঞে প্রায় ছয় বছরে ৬০ লাখ ইহুদি নিহত হয়। ইহুদিদের কিন্তু গোপনে অনেক জার্মান সাহায্য করে, কিন্তু বাঙালিদের জন্য কোনো পাকিস্তানি দুঃখবোধও করে নি। মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ বাঙালি শহীদ হয়েছিলেন কি না তা নিয়ে অধুনা নানা প্রশ্ন উঠছে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নিধনের অনেক কাহিনী ১৯৭১ সালেই বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকরা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন হিসেব দেওয়া হয়। সাইমন ড্রিং বলেন যে প্রথম দুদিনে ১৩০০০ মৃত্যু ঘটে। এপ্রিলের শেষে মর্ট রজেনব্লুম হিসেব দেন যে, দশ লাখ লোক নিহত হয়েছে। মের প্রথম দিকে ম্যালকম ব্রাউনের হিসেবে পাঁচ লাখ মৃত্যু অত্যুক্তি ছিল না। আগস্টে নিউজউইক কোনো হিসেব না দিয়ে বলে একটি জাতির হত্যা সাধিত হচ্ছে। সেপ্টেম্বরে টাইম হিসেব করে দশ লাখের অধিক শহীদ হয়েছেন। গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ সামরিক আইনও জারি করা হয়। যেমন সামরিক আইন ৭৮—সন্দেহের বশে ধরপাকড়, গুম করা ও দেশ থেকে বিতাড়ন। অথবা সামরিক আইন ১৪৮ যাতে এলাকার পরে এলাকায় পাইকারি শাস্তি বা ধ্বংস সাধন করা যায়। বস্তুতপক্ষে গণহত্যার মাসচারেক পরের কোনো হিসাব নেয়ার প্রয়োজনও কেউ তেমন মনে করে নি। পাকিস্তানিরাই স্বীকার করে যে ভয়ঙ্করের

রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের উদ্দেশ্য এবং সুযোগ পেলেই গ্রামকে গ্রাম উজাড় করা ছিল তাদের কৌশল।[২৮] সম্মুখ সমরে মৃত্যু তেমন হয় না কিন্তু গেরিলা আক্রমণের প্রতিফলে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পাকিস্তানিরা নিতো তাতে শত শত খুন সাধিত হতো। আগুন এবং কামানও গণহত্যায় সবিশেষ অবদান রাখে। আরও এক সূত্রে জীবনহানি হয়, আর তা হলো শরণার্থী সংশ্লিষ্ট। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত ৯৭ লাখ শরণার্থী গণনা করা হয়। আশ্রয় কেন্দ্রে কলেরার মহামারী ছাড়াও অন্যান্য কারণে অনেক মৃত্যু ঘটে। দেশ ছাড়া ও দিনের পর দিন কষ্ট করে যাত্রা এবং বর্বর পাকসেনা ও তার দোসরদের হাতে বিড়ম্বনায় অগণিত উদ্বাস্তু তাঁদের জীবন হারান। এই প্রক্রিয়ায়ও লাখ দুই মানুষ শহীদ হয়।

১৯৭১ সালে আদমশুমারি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কারণে তা বিলম্বিত হয় এবং বাংলাদেশে আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৬৯ সালে জুন মাসে জনসংখ্যা ৬৯৮ লাখে প্রাক্কলিত হয় এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৮ শতাংশ। এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ১৯৭৪ সালে ৮০১ লাখ জনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতপক্ষে ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭৬৪ লাখ। এই হিসাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জনসংখ্যা খুব কমে যায়। সেই হিসাবে ৩০ লাখ শহীদের হিসাব যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।

পাকিস্তানি গণহত্যার দুটি দিক ছিল। একটি হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়কে তারা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, হত্যা ও বিতাড়ন দুই প্রক্রিয়াই গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, তাদের বর্ণবোধ ছিল প্রগাঢ় এবং "অবনমিত বা নিম্নজাতের" বাঙালিদের তৃণসম করার আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল খুবই প্রবল। এত অল্প সময়ে এত বড় হত্যাকাণ্ড সাধন করা সম্ভব হয় তিনটি কারণে, যথা ঘনবসতির দেশে হাজার হাজার হত্যা ছিল সহজ। নিরস্ত্র ও নির্বিরোধী বাঙালি সহজেই হত্যার শিকার হয়। এবং তেজী ও উদ্দীপ্ত মুক্তিকামী বাঙালি পাকিস্তানিদের আক্রমণে নিজেদের জীবনের থোড়াই তোয়াক্কা করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এত বড় গণহত্যার কোনো শাস্তি বা বিচার হলো না। পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে প্রথমে ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার লংঘন বা গণহত্যা তখন ততো ঘৃণিত আচরণ ছিল না। এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অর্থাৎ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য সব জাতিই ছিল উদ্‌গ্রীব। তাই পাকিস্তানের বল প্রয়োগে আতিশয্য, নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তাণ্ডব-ধ্বংসলীলা সবই বিশ্বসমাজ সহ্য করতে রাজি ছিল। বঙ্গবন্ধু তবুও পাকিস্তানকেই নিজেরা বিচার করে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কথা।

সে যাই হোক, সব হিসাবে ঘোল ঢেলে এবং সব ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে নিরস্ত্র, নির্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় বাঙালি নয় মাসে লাঠিসোঁটা আর তীর-বল্লম নিয়েই একটি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেয়। ন্যায়সঙ্গত দাবির পক্ষে এবং লক্ষ্যের দৃঢ়তায় ভাস্বর বাঙালি বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসে সদর্পে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন পূরণ করে ভারত এবং যুদ্ধের শেষ

পর্যায়ে নিয়মিত বাহিনীকে পরাস্ত করতে প্রয়োজন হয় ভারতের ভারি অস্ত্রশস্ত্র, নিয়মিত বাহিনী এবং নেতৃত্ব।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হুদা জগন্নাথ হলের ওপারে অবস্থিত তাঁর ফ্লাট থেকে এই ঘটনাটি ভিডিও টেপে ধারণ করেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর এই ভিডিওটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়।

২. ঢাকা থেকে পলায়মান একজন টেলিভিশন ফটোগ্রাফার নদী ও মাঠের এই দৃশ্য ভিডিও টেপে ধারণ করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তা প্রদর্শিত হয়।

৩. *Le Monde,* Weekly English Edition, প্যারিস ১-৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

৪. *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

৫. কর্নেল জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণ—কর্নেল জিয়ার সাক্ষাৎকার, *দৈনিক বাংলা,* স্বাধীনতা সংখ্যা, ২৬ মার্চ, ১৯৭২।

৬. এম.এ. ইউসুফ : Swadnin Bangla Betar Kendra, *বাংলাদেশ অবজারভার,* ২৩ এপ্রিল ১৯৭২ এবং বেলাল মোহাম্মদ *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,* ঢাকা, ফুলদল প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৪২, ৪৪।

৭. *নিউইয়র্ক টাইমস,* ১১ মে, ১৯৭১।

৮. কর্নেল খালেদ মোশাররফের স্মৃতিচারণ, কর্নেল খালেদ মোশাররফের সাক্ষাৎকার, *দৈনিক বাংলা,* স্বাধীনতা সংখ্যা, ২৬ মার্চ ১৯৭২।

৯. *Time* ম্যাগাজিন, নিউইয়র্ক, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

১০. *ইভনিং স্টার,* ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

১১. *নিউইয়র্ক টাইমস,* ১৬ মে, ১৯৭১।

১২. *টাইম* ম্যাগাজিন, নিউইয়র্ক, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

১৩. *Pakistan Observer,* এই হুকুম দুটি প্রকাশিত হয়, ৭৮ নম্বর ৯ এপ্রিল ও ১৪৮ নম্বর ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

১৪. নিউইয়র্ক টাইমস, সিডনি শ্যানবার্গের প্রতিবেদন, ১৭ জুলাই, ১৯৭১।

১৫. বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে এই বিষয়টি প্রতিভাত হয়।
দি টাইমস, লন্ডন, ২৩ জুন ১৯৭১ সালে মাইকেল হর্নসবির প্রতিবেদন।
নিউইয়র্ক টাইমস, ৪ জুলাই ও ২৩ সেপ্টেম্বর সিডনি শ্যানবার্গের প্রতিবেদন।
ওয়াশিংটন পোস্ট, ৭ আগস্টে আরনল্ড জাইটলিনের প্রতিবেদন।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ২৩ জুলাই পিটার কানের প্রতিবেদন।

১৬. পাকিস্তান সরকার : *White Paper on the Crisis in East Pakistan.* ইসলামাবাদ, মে, ১৯৭১।

১৭. পাকিস্তান পরিসংখ্যান দফতর : *Population Census of Pakistan*, ১৯৬১, দ্বিতীয় খণ্ড। করাচি, ১৯৬২, পৃষ্ঠা (vi) ৬৩০, সারণি ৩৯।

জনসংখ্যার হিসাব	(পূর্ব পাকিস্তান)
মোট	৫০,৮৪০,০০০
বাংলা ভাষাভাষী	৫০,৩২১,৯৯৫
উর্দু ভাষাভাষী	৩১০,৬২৮
অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি ভাষাভাষী	২৩,২২৮
হিন্দি ও উড়িয়া ভাষাভাষী	১৫৫,৭২৬

১৮. বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি : *Bangladesh*, ১৪ জুলাই, ১৯৭২।

১৯. এই চিরকুটটি জেনারেল রাও ফরমান আলীর হাতে লেখা। এটি তার পরিত্যক্ত কাগজপত্রে পাওয়া যায় এবং এইটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৪ সালে জুন মাসে ঢাকায় ভুট্টো-মুজিব আলোচনা সভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নজরে আনেন। লেখক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং এতে বক্তব্য ছিল যে এই রকম ছিল যাদের ধারণা তাদের বিচার কেন পাকিস্তান করছে না। পরবর্তীকালে জেনারেল রাও ফরমান আলী তার বই *How Pakistan Got Divided*-এ এর ব্যাখ্যা দেন, (জাং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৮৮)

২০. *সানডে স্টার গার্ডিয়ান*, লন্ডন, ৩০ জুন, ১৯৭১।

২১. *সানডে টাইমস*, লন্ডন, ১৩ জুলাই, ১৯৭১।

২২. *নিউইয়র্ক টাইমস*, ১৩ জুলাই, ১৯৭১, প্রতিবেদনগুলো আছে আবুল মাল আবদুল মুহিত : *American Response to Bangladesh Liberation War*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১০১-১২০।

২৩. ডকুমেন্টস সুপারিটেনডেন্ট : মার্কিন সরকার, *The Congressional Records*, ১১ জুন, ১৯৭১, ওয়াশিংটন ডিসি, পৃ. E ৫৭৪৯।

২৪. ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৭ আগস্ট, ১৯৭১।

২৫. *নিউইয়র্ক টাইমস*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

২৬. *Time* ম্যাগাজিন, নিউইয়র্ক, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

২৭. *বাল্টিমোর সান*, বাল্টিমোর, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১।

২৮. সিদ্দিক সালেক : *Witness to Surrender* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। করাচি ১৯৭৭। পৃ. ৯৪-৯৬

সৈয়দ আলমদর রাজা : *Dacca's Debacle*, জাং. পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯৩ পৃ. ২৬, ২৮, ৫৬, ৭৮।

দ শ ম অ ধ্যা য়

স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

অবতরণিকা

পাকিস্তানি বর্বর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সর্বত্রই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত; কিন্তু কীভাবে প্রতিরোধ বহাল রাখতে হবে এবং তাকে সফল করতে হবে সে ব্যাপারে বিশেষ কোনো চিন্তাভাবনা বা পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না। সামরিক হামলা সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল কিন্তু তাতে যে একটি যুদ্ধ বেধে যাবে সে রকম কোনো ধারণাই ছিল না। সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো রকম প্রস্তুতি তো দূরের কথা সম্ভাবনা নিয়েই কোনো চিন্তা ছিল না। সামরিক বাহিনী কুচকাওয়াজ করবে, কালো বা বাংলাদেশ পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেবে, শোভাযাত্রাকারীদের পেটাবে, হয়তো গুলিও করবে, রাস্তাঘাটে যে প্রতিবন্ধক গড়ে তোলা হয়েছে তা গুঁড়িয়ে দেবে, এ সবই চিন্তাভাবনায় স্থান পায়। কিন্তু সবশেষে টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সমাধান মিলবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মোটামুটিভাবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে সে বিষয়ে বাংলাদেশে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাঁধে ন্যস্ত হয়। ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ প্রথমেই বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রত্যেকে স্থানীয়ভাবে তাঁদের আন্দোলন গড়ে তোলেন। জেলা অথবা মহকুমায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র প্রতিষ্ঠান (সাধারণত সশস্ত্র পুলিশ এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌স্) একযোগে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। কিন্তু এক জেলা জানতো না যে অন্য জেলায় কি হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনীর যে সব ইউনিট প্রতিরোধ শুরু করে তারাও একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারে নি।

চট্টগ্রামে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম শুরুতেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারও তাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু পঁচিশের মধ্যরাতে যখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর

জিয়াউর রহমান প্রতিরোধ করতে মনস্থ করেন, তখন তাঁর না ক্যাপটেন রফিক, না রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করবার সুযোগ হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের খবর প্রচার করে চট্টগ্রামের টেলিফোন অপারেটররা।[১] জয়দেবপুরে মেজর শফিউল্লার প্রতিরোধ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর খালেদ মোশাররফের প্রতিরোধের মধ্যে প্রথম যোগাযোগে প্রায় সপ্তাহখানেক অতিবাহিত হয়। কুষ্টিয়া, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়া, বরিশাল এসব বিচ্ছিন্ন এলাকায় প্রতিরোধ কোনোটির সঙ্গে কোনোটি যুক্ত ছিল না। তাদের সংযোগ হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিছু হটার সময় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর। এই সব বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ ঘটেছিল নানা কারণে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা।

এই প্রতিরোধকে একটি সমন্বিত মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম। নতুবা প্রশাসকের অবাধ্যতা অথবা সেনাপতির বিদ্রোহ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতো। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি প্রতিরোধের গৌরবোজ্জ্বল প্রথম কয়েকটি সপ্তাহে একে করে কাণ্ডারিহীন এবং সাময়িকভাবে পরাভূত। সৌভাগ্যবশত সারা দেশের মুক্তিকামী জনতার রাজনৈতিক নেতৃত্ব বস্তুতপক্ষে এককভাবে ছিল আওয়ামী লীগের হাতে এবং অন্য দলগুলো এই নেতৃত্ব মেনে নেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ঢাকায় ছিলেন বলে সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিরোধে যোগ দিতে কালক্ষেপণ করেন এবং অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় ভোগেন। একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন সঙ্কল্পে অটল ও কৌশলে প্রয়োগবাদী।

চট্টগ্রামের মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদই সর্বপ্রথম ভারতের কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে পৌছেন। অবশ্য অনেক সংগ্রামী ছাত্রনেতা ২৫ মার্চের আগে থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় অস্ত্র সাহায্যের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আশ্রয়প্রার্থী বিদ্রোহী সেনানায়করা যখন সাহায্য চাইলেন, তখন ভারত সরকারের বিষয়টি বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে। তাজউদ্দিন আহমদ কুষ্টিয়ার সাংসদ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছলেন এপ্রিলের ২ তারিখ। এম.আর. সিদ্দিকীও এমনি একটি প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, তবে তাজউদ্দিন আহমদের উদ্যোগের খবর পেয়ে তিনি বিরত থাকেন। দিল্লিতে পৌঁছে তাজউদ্দিন আহমদের প্রধান সমস্যা হলো ভারত সরকারকে তাঁদের উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করা। উচ্চ পর্যায়ে এই রকম মুক্তিযুদ্ধের কোনো আভাসও আগে ছিল না। ছয় দফা দাবির রফা হবে রাজনৈতিকভাবে, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়—এই ছিল ভারতের ধারণা। তাজউদ্দিন আহমদ শুধু নৈতিক সমর্থনই চান নি, তিনি চান অস্ত্র সাহায্য, আশ্রয় কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের অধিকার— এক কথায় একটি মুক্তিযুদ্ধে পরিপূর্ণ সহায়তা। ভারতের নেতৃত্বের সামনে যে প্রশ্ন দেখা দিল তা ছিল যে, এঁদের আবেদন ও দাবি কি সত্যি

সত্যিই বাংলাদেশের জনগণের অভিমত ব্যক্ত করে? এঁরা কি ঐ দেশের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সত্যিকার প্রতিনিধি ও মুখপাত্র? ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা কি সত্যি সত্যি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা? তাজউদ্দিনের পরিচিতিতে কোনো ভুল ছিল না, তিনিই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি যে, বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হচ্ছে এবং তিনি সেই সরকারের অন্যতম নেতা, তাও গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ কি জনগণের যুদ্ধ ও স্বাধীনতা কি সর্বসাধারণের ইচ্ছা তা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর সরকারের সন্দেহ পুরোপুরি দূরীভূত হলো না। অনেকের মতে, ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় তাৎক্ষণিকভাবেই প্রদান করে এবং তাঁদের যৎসামান্য অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করতে শুরু করে; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিরত থাকে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী শুরু থেকেই কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিতে থাকে এবং সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনেও সাহায্য করে।

স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার গঠন— রাজনৈতিক পদক্ষেপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বস্তুতপক্ষে রেসকোর্স ময়দানের ৭ মার্চের জনসভায়ই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। একে একটি শর্তসাপেক্ষ স্বাধীনতা ঘোষণা বলে বিবেচনা করা যায়। তিনি পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে বলেন। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়াকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সৈন্যদের ছাউনিতে ডেকে নিতে বলেন। একই সঙ্গে তিনি বাঙালিদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন; প্রত্যেক বাড়িতে একটি দুর্গ বানাতে এবং সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে তাঁদের বলেন। তিনি আরো বলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি যদি নির্দেশ দেয়ার জন্য উপস্থিত না থাকেন তাহলে তাঁরা স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তিনি এই বিরাট জনসভায় তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলেন :[২]

"এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টাই চলছে, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আপনাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।"

পঁচিশ মার্চ রাতে তিনি তাঁর সব সহকর্মীকে সরে যেতে বলেন এবং আন্দোলনকে চালু রাখতে নির্দেশ দেন। তিনি নিজে স্বগৃহে হামলাকারীদের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। নিরাশার মধ্যেও তাঁর আশা ছিল যে তাঁকে গ্রেফতার করে প্রতিপক্ষ ক্ষান্ত দেবে এবং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করবে। সময়ে আলোচনার মাধ্যমে হয়তো দুই দেশ বিভক্ত হবে। যে ট্রাডিশনে তাঁর রাজনৈতিক বিকাশ ও মনমানসিকতা সৃষ্ট তাতে এ ছাড়া অন্য রকম কোনো ভাবনার অবকাশ ছিল না। তিনি কখনো সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরিচালক। কিন্তু পাকিস্তানের বর্বর দস্যুদল যখন

হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলো এবং ধ্বংসলীলা শুরু করলো তখন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রত্যুত্তর ছিল মুক্তিযুদ্ধ। এতে সেনাবাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী যোগ দিলে এই প্রতিরোধের গতিকে আর কোনোমতেই স্তিমিত করার সুযোগ থাকলো না। ট্যাঙ্ক এবং কামানের হামলায় ঢাকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ২৫ মার্চই শহরটি সারা বিশ্ব ও সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু দেশের অন্যত্র অবস্থা এ রকম ছিল না। অনেক জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নামেমাত্র অবস্থানে ছিল। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর ছাউনিতে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রামে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের সাহায্যে জনতা প্রাথমিক পর্যায়ে শহরটিকে পাকিস্তানি হামলামুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। সেই সুযোগে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ সম্পাদক এমএ হান্নান সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পড়ে শোনাতে সক্ষম হন। এই ঘোষণার পরই বিমান হামলায় বেতার কেন্দ্রটি স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কয়েকজন উদ্যোগী বেতারকর্মীর প্রচেষ্টায় সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম হয়। বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, হাবিবুদ্দিন আহমদ, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক এবং আমিনুর রহমান কালুরঘাট ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে বেতার সম্প্রচার শুরু করেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আবুল কাশেম সন্দ্বীপ হান্নানের পঠিত বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণাটি বারবার প্রচার করতে থাকেন।[৩] পরের দিন ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাটে তাঁর সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। বেতারকর্মীরা এই বিদ্রোহী সেনানায়ককে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করতে আহ্বান জানান। মেজর জিয়া ঘোষণা করে বসলেন যে, তিনিই অস্থায়ী সরকার প্রধান এবং তিনি ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সারা বিশ্বের সমর্থনের আবেদন জানান। এই ঘোষণায় কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়— এটা কি জনগণের মুক্তিযুদ্ধ না এক সেনানায়কের বিদ্রোহ, এটা কি বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, না অন্য কোনো নেতার ইচ্ছা। অবশ্য পরে ২৮ মার্চ মেজর জিয়া আবার একটি বেতার ঘোষণায় পরিষ্কার করে জানালেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার সমর্থনে তাঁর সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করেছেন, তিনি বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী নেতা। তিনি আরো বললেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশকে এই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের আবেদনও তিনি পেশ করলেন। আবারও তিনি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন দাবি করলেন।[৫] বেতারকর্মীদের ইতোমধ্যে একটি দশজনের দল গঠিত হয়, পূর্বোক্ত পাঁচজন ছাড়া আরো ছিলেন রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামান, সৈয়দ আবদুস শাকের, মুস্তাফা মনোয়ার এবং রেজাউল করিম চৌধুরী— পাঁচজন প্রকৌশলী এবং পাঁচজন অনুষ্ঠান বিভাগের।[৬] ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রতিরোধ আন্দোলনকে সংহত করতে বিশেষ অবদান রাখে। প্রতিরোধকারীরা একটি লক্ষ্যের সন্ধান পেল। তবে এই ঘোষণাকে বলবৎ করার জন্য

প্রয়োজন পড়ে একটি রাজনৈতিক কাঠামো। বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনের সংহতির জন্য দরকার ছিল একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনা। এ ক্ষেত্রে দুটি বিকল্প ছিল, যথা একটি অস্থায়ী সরকার অথবা একটি বিপ্লবী কমান্ড পরিষদ। কোনো বিপ্লবী কমান্ড পরিষদ দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের সুযোগ ছিল খুব সীমিত। এই কমান্ড পরিষদকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করতে খুব অসুবিধা ছিল না। ইতোমধ্যে বাঙালিদের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করা হয়। শেখ মুজিব জনগণের নেতা, তাঁকে নির্বাচন করে দেশের ৮২ শতাংশ ভোটদাতা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একটি রাজনৈতিক সরকার। ছয় সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন একান্তই তাজউদ্দিন আহমদের উদ্যোগে ও বুদ্ধিতে হয়। একটি প্রতিনিধিত্বশীল ও দায়িত্বশীল যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা এবং এর জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। পদদলিত ও শৃঙ্খলিত বাংলাদেশে মানুষের আশাকে জাগিয়ে রাখবার জন্যও প্রয়োজন ছিল একটি সরকারের, হোক না তা দেশের ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত। তাজউদ্দিন আহমদ ২ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লিতে ছিলেন এবং তখনই ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ পাকাপোক্ত করেন। তিনি দিল্লিতে থাকাকালেই অস্থায়ী সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং সম্ভবত এই বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে অবহিত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নানা বিতর্কের অবতারণা অধুনা প্রায়ই হয়ে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ স্থায়ী ছিল মাত্র নয় মাস কিন্তু সহসা তা ঘটে যায় নি। এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতি ছিল বহুদিনের। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও রক্তক্ষরণের মধ্যে হয় এর প্রত্যক্ষ সূচনা। বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদান ক্রমে ক্রমে জাতিসত্তার উন্মেষকে করে অপরিহার্য। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক বনিবনার অভাবই দুই অঞ্চলের মধ্যে ঔপনিবেশিক সম্পর্কের সুযোগ করে দেয়। বাঙালির কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও অর্থনীতি দলন ও শোষণের প্রক্রিয়া দুই অঞ্চলকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয়দফা হয় বাঙালি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সনদ। ছয় দফা আন্দোলন একদিকে যেমন বাঙালি রাজনৈতিক অঙ্গনে মতৈক্য নিয়ে আসে, অন্যদিকে তেমন একটি অনমনীয় ও অকুতোভয় মানসিকতা সৃষ্টি করে। ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে বানচাল করে দেবার পাকিস্তানি উদ্যোগই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ১৯৭১-এর ১ মার্চ গণপরিষদ অধিবেশনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েই জেনারেল ইয়াহিয়া বাঙালি প্রতিরোধ শুরু করে দেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক ধরনের শর্তাধীন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। একসঙ্গে থাকতে গেলে চারটি দাবি মানতে হবে, অন্যথায় বাঙালি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে নেমে পড়বে। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সমঝোতার পথ পরিহার করে শঠতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালিকে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এক পৈশাচিক সামরিক অভিযান শুরু করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকারীদের সরে পড়তে বলে নিজে অপেক্ষা করে রইলেন তাঁর

আক্রমণকারীদের জন্য। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অভ্যস্ত জননেতার এই ছিল স্বাভাবিক আচরণ। পাকিস্তানি আক্রমণে কিন্তু কোনো সদিচ্ছার স্থান ছিল না, তারা বন্দুকের জোরে বাঙালিকে সম্পূর্ণ পদানত করতে ব্রতী হয়। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর মার্চের দিকনির্দেশনাই হয় সারা দেশের আশ্রয়। যাঁর যা কিছু আছে তাই নিয়ে তাঁরা সর্বত্র শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মার্কিন সরকারি সূত্রে তখনই জানা যায় যে বঙ্গবন্ধু ধরা পড়বার আগে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু সে বার্তা প্রেরণ ছিল শুধুমাত্র একটি লৌকিকতা। বাংলাদেশের সর্বত্র, শুধু চট্টগ্রামে নয়, পঁচিশে মার্চ রাতেই প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মেজর জিয়াউর রহমান সেই রাতেই বিদ্রোহ করে টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে। সেই রাতেই ইপিআর এবং জনতা চট্টগ্রাম শহরে বাংলাদেশ প্রতিরোধ শক্তির দখল প্রতিষ্ঠা করে। ২৬ মার্চ দুপুরে বঙ্গবন্ধুর কোনো বাণীর অপেক্ষা না করেই জননেতা আবদুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর নামে চট্টগ্রাম রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করেন। চট্টগ্রাম রেডিওকে পাকিস্তানি আক্রমণ বিকল করে দিলে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকে বেতার কর্মী আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সেই ঘোষণা বারবার প্রচার করেন। পরদিন মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর বিদ্রোহী ইউনিট নিয়ে কালুরঘাটে এলে বেতারকর্মীদের আহ্বানে তিনি এই ঘোষণা আবার পাঠ করেন। প্রথমে তিনি নিজে ঘোষণা দেন কিন্তু তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ হতে পারে বলে তিনি বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণাটি প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, তিনি সেনাপতি এবং বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গেই থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। উচ্চভিলাষী জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণায় নিজেকেই সাময়িক রাষ্ট্রপ্রধান বলে জাহির করেন। অবশ্যি সহজেই তিনি বুঝতে পারেন যে তাতে তাঁকে শুধু একজন বিদ্রোহী সৈন্য হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। একটি রেজিমেন্টের দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে তখন তাঁর এমন কোনো অবস্থান ছিল না যে তিনি একটি স্বাধীন দেশের প্রধান হিসেবে ঘোষণা দিতে পারতেন। অন্যদিকে একটি স্বাধীনতা আন্দোলন তখন জমেই উঠেছিল এবং তার অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে-বিদেশে ছিলেন সুপরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সুদীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষ অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনমত প্রতিফলনের জন্য ছিলেন সন্দেহাতীত, তাঁরা বিপুল ভোটে মাত্র কদিন আগে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তবুও তৎকালীন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় তাঁরা সরাসরি স্বীকৃতি কোনো দেশ থেকেই পেলেন না। তবে সমর্থন ও সহানুভূতি তাঁরা সহজেই আদায় করেন। এবং এই সাফল্যের মূলে ছিল বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ নেতৃত্ব এবং তাঁর নামে গঠিত মুজিবনগর সরকার। তবে এও অনস্বীকার্য যে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা মানুষের মনে আশা সঞ্চার করে। তাঁরা যখন জানলেন যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত সকল বাঙালি ইউনিট বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তাতে তাঁরা ভরসা পান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা যে একেবারেই অসহায় ও অনভিজ্ঞ নন এই আত্মবিশ্বাস

তাঁদের মনে বাসা বাধে। ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা কিন্তু বাংলাদেশের আইনগত অবস্থান দৃঢ় করে। নৈতিকভাবে এই যুদ্ধ ঘোষণা যে-কোনো জনগোষ্ঠি করতে পারতো। তবে মুজিবনগর সরকার তাদের আইনগত ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে এই ঘোষণার ওপর রচনা করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে সংবিধানের ভিত্তি হয় ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা। আর একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে বাঙালি সশস্ত্র ইউনিট একই দিনে বা ভিন্ন সময়ে তাদের বিদ্রোহ শুরু করে। কিন্তু অন্যত্র কোথাও কোনো বেতার মারফত তাদের কোনো ঘোষণা দেবার সুযোগ ছিল না। মেজর শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর আবু ওসমান, প্রশাসক নুরুল কাদের, প্রশাসক হোসেন তওফিক ইমাম, মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, দেওয়ান ফরিদ গাজী, গাজিউল হক, ডা. আসাবুল হক, ফনিভূষণ মজুমদার এবং আরো অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁদের ঘোষণাও তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। বেতার ঘোষণাকে এই আলোকে বিবেচনা করলে বিতর্কটি নিতান্তই অবান্তর ও নিরর্থক মনে হয়।

শেখ মুজিব শত্রুদের হাতে বন্দি থাকলেও তাঁকে ছাড়া কাউকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে চিন্তা করা ছিল অসম্ভব। তিনি ছিলেন বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক এবং বাঙালি আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। জাতির অনিশ্চয়তাকালে তাঁর নামেই প্রতিরোধ চলতে পারতো। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমর্থন দাবি করতে পারতো। জীবিত অথবা মৃত, স্বাধীন অথবা বন্দি— তিনিই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিভূ। তাই তিনি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রথম সহ-সভাপতি ও সংসদীয় দলের উপনেতা। শেখ মুজিব ১৯৬৬ সাল থেকে তিন বছর যখন একনাগারে কারাবন্দি ছিলেন, তখন সৈয়দ নজরুল ইসলামই দলটিকে নেতৃত্ব দেন ও টিকিয়ে রাখেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তিনি স্বাভাবিকভাবেই হলেন দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন দলের প্রধান সংগঠক, পরিকল্পনাকারী এবং নেতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রয়োগবাদী এবং সুদক্ষ প্রশাসক। অসহযোগ আন্দোলনের বাস্তব পরিচালনা ছিল তাঁরই হাতে ন্যস্ত। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই ছিল না। এ ছাড়া অন্য তিনজন মন্ত্রী ছিলেন দলের প্রথম সারির নেতা। ক্যাপটেন মনসুর আলী ছিলেন বয়োজ্যষ্ঠ নেতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে দলীয় নেতা। আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালে যখন প্রাদেশিক সরকার গঠন করে তখন তিনি ছিলেন একজন মন্ত্রী। এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান ছিলেন একজন ঝানু সাংসদ এবং আইউব আমলে জাতীয় সংসদে তিনি ছিলেন খুবই সক্রিয় এবং সুবক্তা। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের উঁচু কাতারের প্রচারবিদ। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন দলের একজন সহ-সভাপতি এবং পুরনো কর্মী। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন এবং এক সময় দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এঁদের সমকক্ষ অন্য

কোনো নেতা আওয়ামী লীগে ছিলেন না। তাজউদ্দিনের বিচারে গঠিত এই মন্ত্রিসভায় কারো আপত্তি করবার সুযোগ ছিল না এবং নানা ষড়যন্ত্র ও কোন্দলের পরেও বাস্তবে তাই হয়। এই ছয় সদস্যের মন্ত্রিসভা ছাড়া আর একজন রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তিবাহিনীর সেনাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ. গনি ওসমানী ছিলেন নির্বাচিত সাংসদ, তিনি হন মুক্তিবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় সব নেতাই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বাড়ালেই ছিল বিপদ, তাতে কোন্দল ও বিরোধ এবং মন কষাকষিই শুধু বাড়তো।

এই ছয়জন নেতা এবং সেনাধিনায়ককে একত্র করা ততো সহজ ছিল না। যদিও এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশই পাকিস্তানি দখল থেকে মুক্ত ছিল, কিন্তু এক অঞ্চল বা এক নেতার সঙ্গে অন্য অঞ্চল বা অন্য নেতার কোনো যোগাযোগ ছিল না। শীর্ষস্থানীয় নেতারা ছিলেন ঢাকায় যেখানে পাকিস্তানি দখল শুরুতেই বহাল হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক নেতাকে অতি সাবধানে চলতে হয়। নিজ প্রচেষ্টায় তাঁদেরকে মুক্ত এলাকায় পাড়ি দিতে হয়। এপ্রিলের ৭/৮ তারিখ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক সীমান্ত অতিক্রমে ব্যর্থ হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অনেক কষ্টে ঢাকা পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তারপর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অনেক বেগ পেতে হয়। আওয়ামী লীগ সামরিক হামলার বিরুদ্ধে কোনো রকম পরিকল্পনাই নেয় নি। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ বা প্রতিরোধও ছিল অপরিকল্পিত। বিভিন্ন ইউনিট অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয় এবং একের পদক্ষেপ অন্যের সঙ্গে মোটেই সমন্বিত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তাদের ইচ্ছাও তেমন ছিল না। পাকিস্তানি আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকলেই বাঙালি সশস্ত্র ইউনিটগুলো সমন্বিত কার্যক্রমের কথা চিন্তা করতে থাকে। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণার সমর্থনে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলে।

দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তন করে ৮ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ কলকাতায় বাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেকে নিজে থেকেই কলকাতায় পাড়ি দেন। এই আলোচনা সভায় যুব-নেতৃবৃন্দ কঠোরভাবে তাজউদ্দিনের বিরোধিতা করেন। শেখ মনি প্রবাসী সরকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হলেও প্রধানমন্ত্রী কার হওয়া উচিত এ নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরদিন তাজউদ্দিন আহমদ অন্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের খোঁজে বেরুলেন। ইতোমধ্যে অনেকে আগরতলায় সমবেত হয়েছেন বলে জানা যায়। এঁদেরকে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সহায়তায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। নেতৃবৃন্দের বৃহত্তর সমাবেশে ১১ মার্চ অবশেষে মন্ত্রিসভা নিয়ে ঐকমত্য হলো। মন্ত্রীদের দায়িত্ব নতুন করে বণ্টন করা হলো এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে যথেষ্ট ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা হলো।[৭] একই সঙ্গে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমবেত করবার একটি উদ্যোগ নেয়া হলো। ইতোমধ্যে সিলেট, কুমিল্লা ও আগরতলার সঙ্গমস্থলে একটি মোবাইল ট্রান্সমিটার স্থাপন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সচল

হয়ে উঠেছে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এই বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছেন। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এর প্রচারই তাঁদের বুকে আশা জাগায়, তাঁদের সাহস দেয় এবং দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা দেয়। এর মাধ্যমেই মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অঙ্গনের খবর পায়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্যকে আগরতলায় অথবা মেহেরপুর সীমান্তে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ১৩ এবং ১৭ এপ্রিলের মধ্যে মোট ৪৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি কুষ্টিয়া সীমান্তে সমবেত হয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা গ্রহণ করেন। এতে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ঘোষিত স্বাধীনতা বাণী সত্যায়িত করা হয়। (স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পরিশিষ্ট ৮-এ প্রদত্ত)। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরত থাকে, পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান রচনা করতে দেয় নি এবং শঠতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও গণহত্যা চালায়, তাই বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন এবং একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছেন। দিনাজপুরের সাংসদ প্রফেসর ইউসুফ আলীকে এই ঘোষণা প্রকাশের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত পটেনশিয়ারি নিযুক্ত করা হয়। এই ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতিকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি করা হয়। এই ঘোষণা যে সব নির্বাচিত সদস্য পাকিস্তানি হামলা এড়াতে সক্ষম হন তাঁদের সবাই সমর্থন করেন। জুলাইয়ের শুরুতে এই ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী ছিলেন ১২১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ২২৯ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য।[৮] মন্ত্রিসভার ঘোষণা দেয়া হয় ১৩ এপ্রিল এবং এর লৌকিক অভিষেক হয় ১৭ এপ্রিল। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে এবং এই স্থানের নামকরণ হয় মুজিবনগর।[৯]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি প্রায় দুশো বছরের পুরনো মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের (১৭৭৬) ধাঁচে প্রণয়ন করা হয়।

তাদের ঘোষণায় মার্কিন নাগরিকরা দাবি করেন যে, সময়ের প্রবাহে "একটি জাতিকে অন্য একটি জাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে এবং পরিবর্তে এমন নীতিমালা ও কাঠামোর ওপর একটি নতুন সরকার গঠন করতে হয়, যাতে তাদের নিরাপত্তা ও সুখের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা থাকে।" তারা আরো বলেন যে, সরকার পরিবর্তন কোনো "সামান্য বা সাময়িক কারণে" করা ঠিক নয়। "যখন অনবরত দুঃশাসন ও ক্ষমতার অপব্যবহার একটি জাতিকে একান্তই স্বৈরতন্ত্রের শিকারে পরিণত করে", তখনই নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন হয়। মার্কিন জাতির প্রতিবাদ ছিল "প্রতিনিধিত্বশীল সরকার অস্বীকার করলে, বিনা অনুমতিতে ট্যাক্স বসালে, সুশীল সমাজের ওপর সামরিক কর্তৃত্ব জারি করলে এবং ন্যায়বিচারহীন স্বেচ্ছাচারী সরকার প্রতিষ্ঠা

করলে।"[১০] বাঙালিদের ঘোষণাটিও ছিল এই রকমের। তারা একটি বহুদূরের ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই ঔপনিবেশিক সরকার ছিল সামরিক শক্তিতে বলীয়ান। তারা উপনিবেশ স্থাপনের নির্জলা প্রচেষ্টা এবং মানবাধিকার হরণের বর্বর উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। যে শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালিরা বিদ্রোহ করে তাদের সব ক্ষমতার উৎস ছিল বন্দুকের নল। নৈতিক ও আর্থিকভাবে এই শক্তি ছিল একেবারে ফাঁপা এবং গোটা বাঙালি জাতি তাদের শুধু অস্বীকার করে নি বরং গভীরভাবে ঘৃণা করতে শেখে। বাঙালিদের না ছিল কোনো সাংগঠনিক বা সামরিক প্রস্তুতি ও শক্তি কিন্তু তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল যুদ্ধের এবং আশার ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। ২০ এপ্রিল *বাল্টিমোর সান* পত্রিকা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "তাদের শুধু সুন্দর ভবিষ্যতের দিকেই নজর দিতে হবে এবং তাদের একমাত্র উপায় হলো সামনে চলা এবং আশায় বুক বাঁধা। তাদের নিশ্চয়ই মনে আসছে যে অনেক জাতির ঐতিহাসিক শুরু এমনি সাদামাটা আমবাগানের গ্রামে হয়েছে।"[১১]

স্বাধীনতা ঘোষণার ওপর ভিত্তি করেই সাংগঠনিক ও সামরিক উদ্যোগকে সংহত করবার প্রচেষ্টা শুরু হলো। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ভার নিল প্রবাসী সরকার। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদ ১১ এপ্রিল একটি ভাষণে সরকারের এবং দেশবাসীর কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন।[১২] প্রথম কর্তব্য ছিল মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য অর্জন অর্থাৎ পাকিস্তানি দখলদারদের বাংলাদেশ থেকে উৎখাত। আর দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল একটি বিধ্বস্ত দেশের ভার গ্রহণ এবং তার পুনর্গঠন।

বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকটি ইউনিট এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌সের নানা ইউনিট যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সশস্ত্র পুলিশের অনেক সদস্যও এদের সঙ্গে যোগ দেয়। এদেরকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন একটি মুক্তিবাহিনী গঠনের ঘোষণা দেন। এদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত, তিন হাজারেরও কম। মুক্তিবাহিনীর জন্য তিনি এলাকাভিত্তিক কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান, যাঁদের কোনোরকম সামরিক প্রশিক্ষণ নেই বা যাঁরা অস্ত্র ধরতে জানেন না বা পারেন না তাঁরা রাস্তা কেটে, শত্রুর ওপর আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শত্রুর জন্য খাদ বানিয়ে বা নদী পথ পাহারা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করতে পারেন এবং সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেন। সবাইকে নিজ নিজ সাধ্যমতো মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি পৃথিবীর সব জাতিকে পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করতে আবেদন করেন। তিনি বাঙালিদের জন্য মানবিক সাহায্য ত্রাণসামগ্রী এবং অস্ত্র সাহায্য চান। তিনি বলেন, "সব সূত্র থেকে মানবিক সাহায্য সাদরে গ্রহণ করা হবে। তবে মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে হামলাকারীকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সমরাস্ত্র ও সামরিক সাহায্যের।" তিনি প্রশাসক, বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী,

বুদ্ধিজীবী সবাইকে সীমানা অতিক্রম করে মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানান। যাঁরা এই পদক্ষেপ নিতে পারবেন না তাঁদের তিনি আশায় বুক বাঁধতে বলেন এবং শত্রুদের সঙ্গে যোগসাজশ থেকে বিরত থাকতে বলেন। প্রয়োগবাদী নেতা প্রথমেই সাবধান করে দেন যে, মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হতে পারে এবং জনগণের দুর্দশা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা অসহনীয় হতে পারে। তিনি সবাইকে কৃচ্ছসাধনে ব্রতী হতে বলেন এবং ব্যবসায়ী ও বণিকদের মজুতদারি, মুনাফাখোরি এবং কালোবাজারি পরিহার করতে বলেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানি শত্রুর হামলা রুখতে বলেন। তাঁর উদাত্ত আহ্বান ছিল, "যাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চান, তাঁরা বেরিয়ে আসুন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিন। যাঁরা নানা প্রয়োজনে দখলিকৃত এলাকায় থাকবেন তাঁদের কাছে আমাদের আশা ও উৎসাহের বাণী হলো যে, বিজয় আমাদের হবেই।" তিনি একই সঙ্গে বাস্তববাদী এবং আশাবাদী ছিলেন, কল্পনাবিলাসের সঙ্গে প্রয়োগবাদের সংযোজন ঘটে তার মধ্যে। "আমাদের যুদ্ধ ততো প্রলম্বিত হবে না। কারণ প্রতিদিন আমাদের শক্তি বাড়ছে এবং আমাদের বিশ্ব সমর্থন প্রসারিত হচ্ছে। তবে কসাই পাকিস্তানিদের হাতে অনেক মৃত্যু আসবে এবং অনেক ধ্বংসলীলা সাধিত হবে, যতদিন না তারা মুক্তিবাহিনী কর্তৃক নির্মূল হয়। তাই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, ধ্বংসস্তূপের উপরে আমাদের বাংলাদেশকে নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে।"

এই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও প্রবাহ সম্বন্ধে গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধই ক্রমে মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। নিরস্ত্র জনগণের অদমিত ইচ্ছাশক্তিই তাদের রুখে দাঁড়াতে সক্ষম করে। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, "ইয়াহিয়ার পেশাদার খুনি গোষ্ঠীর মারাত্মক আক্রমণকে শুধু ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ়চিত্ততা দিয়ে প্রতিহত করে আপনারা নতুন বাঙালি জাতির জন্ম দিয়েছেন। সারা পৃথিবী আমাদের একটি শান্তিপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, দয়ালু জাতি বলে জানতো। আমরা গানবাজনা-নাচ পছন্দ করি, আমাদের বাহাদুরি আমাদের পরিশীলিত সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যপ্রেম। যুদ্ধ এবং সন্ত্রাস আমাদের দেশে অপরিচিত ছিল। কিন্তু আজ আমরা আমাদের সুচারু ঐতিহ্যের বড়াই করলেও আমরা যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিয়েছি। আমাদের বলের ভিত্তি হলো আমাদের অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি এবং বহুগুণ সশস্ত্র আগ্রাসী শত্রুর মোকাবিলার দুঃসাহস।"

মুক্তিবাহিনীকে সংহত করে ঢেলে সাজানোর আগেই পাকিস্তানি দস্যুরা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। এপ্রিলের শেষে তারা দাবি করে যে, সব দুষ্কৃতকারীকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে এবং সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানিরা ভেবেছিল যে, বাঙালিরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে এবং ভারত তাদের বিস্তর অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে। তারা আরো ভেবেছিল যে, ভারত সরাসরি বাঙালিদের সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত বাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সেনাবাহিনী বিপুল কলেবরেই মোতায়েন ছিল। তারা তাই বেশ শক্ত প্রতিরোধের অপেক্ষায় ছিল।

অসংগঠিত এবং নিরস্ত্র বাঙালিদের পরাজিত করে তাই তাদের দেমাক চড়ে যায়। এক ধর্মযুদ্ধের প্রেরণায় তারা মারাত্মক ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। এতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণবাস্তুত্যাগের সূচনা হয় এবং ভারতে শরণার্থীর প্লাবন নামে। এর অন্য প্রতিফল ছিল বাঙালি যুবমনে পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণাবোধ এবং প্রতিহিংসা-স্পৃহা। পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞই মুক্তিবাহিনীর কলেবরকে রাতারাতি স্ফীত করে। মুক্তিবাহিনীতে যোগদান ইচ্ছুকদের দীর্ঘ সারি সাড়ে নয় মাসে কখনো ক্ষীণ হয় নি।

গোটা মে মাসে পাকিস্তানি নিষ্পেষণ বহাল থাকলো। এতে শুধু মুক্তিবাহিনী শক্তি সঞ্চয় করলো না বরং কোনোরকম সমঝোতার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিলীন করে দিল। একটি সভ্য দেশ হিসেবে পাকিস্তানের বিশ্ব আসরে স্থান গ্রহণ করা হলো দুরূহ। পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ মির্জা মোজাফফর আহমদ বা আরশাদ হোসেনের বিদেশে মিশন পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। সর্বত্র তাঁদের সাবধান করে দেয়া হলো এবং নিষ্পেষণ বন্ধ করতে তাগিদ দেয়া হলো। অত্যন্ত রক্ষণশীল বাঙালি মহলেও এরপর আর পাকিস্তানের জন্য দরদ অবশিষ্ট রইলো না। পাকিস্তানের দুঃসময়ে ভারত যে পূর্ব পাকিস্তান দখল করলো না তাতে পাকিস্তানি প্রচার কৌশল দারুণভাবে মার খেল। দেখা গেল যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগাযোগ ছিল না এবং আওয়ামী লীগের কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি ছিল না। অন্যদিকে, শরণার্থীদের বিরামহীন মিছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দল ভারি করলো এবং তাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুললো। যতই সময় যেতে থাকলো ততই পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, পাকিস্তানি দখলদারদের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত শরণার্থীরা দেশে ফিরবে না। এক কোটি শরণার্থীদের অন্য দেশে পুনর্বাসন করাও ছিল একটি অসম্ভব বিষয়। পাকিস্তানি দস্যু বাহিনীও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। ধ্বংসলীলা, লুটপাট, হত্যা ও ধর্ষণে তারা এত অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা আর কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনী রইলো না। তারা হয়ে গেল অনিয়ন্ত্রিত দস্যুদল। জুন-জুলাই মাসে প্লাবিত বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এই দস্যুদল জলযানে ঘোরাফেরা শুরু করলো এবং লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে গেল। বাঙালির প্রতিহিংসা আরো প্রজ্বলিত হলো এবং দস্যুদলের সদস্যদের নিধন প্রক্রিয়া আরম্ভ হলো।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাঁধে চাপলো কাজ ও দায়িত্বের বিরাট বোঝা। সরকারের কর্মস্থল একটি মুক্ত এলাকায় স্থাপনের প্রাথমিক চিন্তাভাবনা বেশি দূর এগুলো না। মুক্ত এলাকা রক্ষার জন্য যে উদ্যোগ ও ব্যয়ের প্রয়োজন তা ছিল সরকারের সাধ্যের বাইরে। বিশেষ করে বিমান হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এবং একটি মুক্ত এলাকা রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনীকে যেভাবে মোতায়েন করা দরকার ছিল তা নিতান্তই অপচয়মূলক বলে বিবেচিত হয়। মুজিবনগর সরকার হলো বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের একটি পরিচয়-চিহ্ন। মুজিবনগর সরকার বলতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বোঝাতো। মুজিবনগর সরকার বাস্তবে কলকাতায় আট নম্বর থিয়েটার রোডে অবস্থিত ছিল, তার একটি শাখা ছিল আগরতলায়।

কিন্তু মানুষের মনে মুজিবনগর ছিল প্রতিটি মুক্তাঞ্চলে, প্রতিটি রণাঙ্গনে। যেখানেই সরকারি নেতারা সমবেত হতেন সেটাই ছিল মুজিবনগর। আগরতলায় সরকারের অস্তিত্ব ছিল বস্তুতপক্ষে স্বশাসিত। তাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল যুদ্ধ পরিচালনা।

মুক্তিবাহিনী সংগঠন— সামরিক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সামরিক কর্তব্য ছিল বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র ইউনিটগুলোকে সংহত করে তাকে কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে একটি নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত করা। এই বাহিনীর জন্য জনবল ও অস্ত্রবলের ছিল নিদারুণ প্রয়োজন। প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল বলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধারা জোট বাঁধে। এসব স্থানীয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল প্রশিক্ষিত সামরিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌সের কর্মকর্তা, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোর কতক নেতা এবং অবসরপ্রাপ্ত বা ছুটিতে যাওয়া কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর এবং রংপুরে। সর্বত্র ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ এবং পুলিশ ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধের ভিত্তি। চট্টগ্রামে মেজর জিয়াউর রহমান অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং রেজিমেন্টাল সেন্টারের সেনাদের নেতৃত্ব দেন। মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের নেতা ছিলেন। মেজর শফিউল্লা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে ময়মনসিংহ যান। ক্যাপটেন হাফিজ আহমদ যশোরের বিধ্বস্ত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কতিপয় সৈন্যদের সংহত করেন। মেজর নিজাম একইভাবে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দলের নেতৃত্ব দেন সৈয়দপুরে। চট্টগ্রামে অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন ইপিআরের ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন হারুন চৌধুরী, কুষ্টিয়ায় মেজর ওসমান, রংপুরে ক্যাপটেন নওয়াজেশ এবং রাজশাহীতে মেজর নাজমুল হক। ছুটিতে রত মেজর এম.এ. জলিল বরিশালে এবং মেজর সি.আর. দত্ত হবিগঞ্জে তাঁদের বাহিনী গড়ে তোলেন। সবখানেই জনতা সেনাদের সঙ্গে ছিল কিন্তু তাঁদের কোনো যুদ্ধ অভিজ্ঞতা ছিল না এবং ভারি অস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়াতে পারলো না। সামরিক বাহিনী, ইপিআর এবং পুলিশকে নিয়ে অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী এবং সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল কেবল অনধিক ১২ হাজার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোর তিন হাজার আর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের আট হাজার। কিন্তু এর চেয়েও দুরবস্থা ছিল সেনানায়কদের নিয়ে। অনেক এলাকায় বেসামরিক নেতা যেমন মহকুমা প্রশাসক, সাংসদ বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে হয়। আবার অনেক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নন-কমিশন্ড বা জুনিয়র কমিশন্ড অফিসাররা।

পূর্ব রণাঙ্গনের সামরিক নেতারা ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় (হবিগঞ্জ জেলায়) সমবেত হন। তাঁরা সার্বিক অবস্থার একটি ধারণা করতে প্রয়াস পান। একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেন। তাঁদের অন্যতম দাবি ছিল একটি রাজনৈতিক

নেতৃত্ব, একটি প্রবাসী সরকার গঠন। তাঁরা ভারতের কাছে আশ্রয় এবং অস্ত্র চান। এই সমাবেশে হাজির ছিলেন কর্নেল এম.এ গনি ওসমানী, লে. কর্নেল আবদুর রব ও মেজর কাজী নুরুজ্জামান। এঁরা সবাই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদ, কর্নেল ওসমানী ও রব দু'জনই ছিলেন নির্বাচিত সাংসদ। সামরিক বাহিনীর নিয়মিত কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর জিয়া, মেজর শফিউল্লা, মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপটেন নুরুল ইসলাম এবং ক্যাপটেন মইনুল হক চৌধুরী। তাঁরা সবাই মিলে কর্নেল ওসমানীকে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান করেন।

তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণেই সামরিক অঙ্গনে কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দেন এবং এই বক্তৃতায়ই তিনি এলাকাভিত্তিক কমান্ড গঠনের ঘোষণা দেন। চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলের দায়িত্বে নিযুক্ত হন মেজর জিয়াউর রহমান। সিলেট-কুমিল্লা এলাকার ভার নেন মেজর খালেদ মোশাররফ। ময়মনসিংহে টাঙ্গাইল এলাকা হয় মেজর শফিউল্লার অধীনস্থ। কুষ্টিয়া-যশোরের কমান্ড হয় মেজর ওসমান চৌধুরীর। ফরিদপুর-বরিশাল-পটুয়াখালি-খুলনা অঞ্চলের দায়িত্ব হয় মেজর জলিলের। সৈয়দপুর-দিনাজপুরের দায়িত্বে ছিলেন মেজর নাজমুল হক। রাজশাহীর ভার পান মেজর আহমদ এবং রংপুর-বগুড়ার দায়িত্ব পান মেজর নওয়াজেশ। ১১ এপ্রিল এই কমান্ডগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৪ এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর সেনাধিনায়ক নিযুক্ত হন কর্নেল এম আতাউল গনি ওসমানী। কিছুদিন পর সাংসদ ও অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আবদুর রব হন উপ-সেনাধিনায়ক (চিফ অব স্টাফ) এবং পূর্ব এলাকার সার্বিক দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়।

মুক্তিবাহিনীর সেনাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন যে, মুক্তিবাহিনী রাতারাতি গড়ে ওঠে। তাঁর মন্তব্য ছিল, "পাকিস্তান সেনাবাহিনীই রাতারাতি মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার প্রেরণা ও রসদ সরবরাহ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যদি তাদের নিষ্পেষণ শুধু রাজনীতিবিদদের দলনে সীমাবদ্ধ রাখতো, তাহলে হয়তো সেনা ইউনিট বা পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা নিত। কিন্তু যখন জানা ও দেখা গেল যে, পাকিস্তানিরা রাজনীতিবিদদের ছাড়াও সব সশস্ত্র বাঙালি (অবসরপ্রাপ্ত অথবা চাকরিরত) এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তাদের হত্যাকাণ্ডের টার্গেট করেছে, তখনই দেশের সমুদয় সশস্ত্র ইউনিট একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করে।"[১৩] পাকিস্তানিদের সামরিক উদ্যোগ এবং সার্বিক সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য যুবা কিশোরের কোনো অভাব কখনো অনুভূত হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের সেপাই ছিল সব যুবক, অনেকেই ছাত্র কিন্তু বিস্তর চাষী, শ্রমিক, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী এবং সরকারি কর্মচারীও ছিল। অনেকেই সামান্য সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েই গেরিলা যুদ্ধে লেগে পড়ে। পাকিস্তানি অত্যাচারে জর্জরিত মায়েরা তাঁদের কর্মঠ সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে, বয়স্ক গুরুজনেরা কম বয়সের ছেলেদের সীমান্ত পার করে দেয় স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে। জুলাই এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক আট অঞ্চলিক কমান্ডের জায়গায় এগারোটি কমান্ড নিযুক্ত হয় এবং তিনটি ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার

ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই সময়ে নিয়মিত বাহিনীর কলেবর তিন হাজার থেকে বেড়ে ১০/১২ হাজারে পৌঁছে। এপ্রিলে মুক্তিবাহিনীর নাম ছিল মুক্তি ফৌজ কিন্তু জুলাইয়ের মাঝামাঝি এর নাম পরিবর্তিত হয় মুক্তিবাহিনীতে। পাকিস্তানি দুর্ব্যবহার এমনি চরমে পৌঁছে যে, পাকিস্তানিদের সংশ্লিষ্ট সবকিছু পরিহারে বাংলাদেশ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। সেই উদ্যোগেরই এক ফসল ছিল ফৌজের বদলে বাংলা শব্দ 'বাহিনীর' প্রতি আকর্ষণ। তবে এই সময়ে মুক্তিবাহিনীর চরিত্রগত পরিবর্তনও সাধিত হয়। মুক্তিবাহিনীতে বিমান ও নৌ-বাহিনীর সেনানী ও কর্মকর্তারা এসে যোগ দেন। গ্রুপ ক্যাপটেন আবদুল করিম খন্দকার মে মাসে তাঁর কয়েকজন সহযোগী বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁকে কেন্দ্রীয় দফতরে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। উইং কমান্ডার কে এম বশর রংপুর-দিনাজপুর এলাকার কমান্ড পান। বেশ কিছুদিন পর ২১ জুনে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমদ রেজার কমান্ডে একটি নৌ ইউনিট গঠন করা হয়।

১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই ১১ সেক্টরের সব কমান্ডারকে নিয়ে প্রথম স্ট্রাটেজি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুজিবনগরে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ।[১৪] এই সম্মেলনে ১৬ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন— প্রধানমন্ত্রী, সেনাধিনায়ক (তিনি প্রথম দিনে যোগ দিতে পারেন নি), চিফ অব স্টাফ লে. কর্নেল রব, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে.এম. শফিউল্লা, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর মীর শওকত আলী, উইং কমান্ডার কে.এম. বশর, মেজর এম.এ. ওসমান চৌধুরী, মেজর রফিকুল ইসলাম, মেজর নাজমুল হক, মেজর এম.এ. জলিল এবং মেজর এ.আর. চৌধুরী। এই সম্মেলনে একটি কমান্ড কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু শেষ বিবেচনায় তা টিকলো না। এই সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথমত, একটি ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো ব্রিগেড গঠন করা হবে বলে ঠিক করা হয়। জুলাইতে জেড ফোর্স, সেপ্টেম্বরে এস ফোর্স ও অক্টোবরে কে ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড বাস্তবে প্রতিষ্ঠা পায়। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব তো ছিলই কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা ছিল যথাসংখ্যক কর্মকর্তার অভাব। মুক্তিবাহিনীতে অফিসারদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। দ্বিতীয়ত, সেক্টর কমান্ডারদের ভূখণ্ড দখল করে সেখানে কর্তৃত্ব বহাল রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (মুক্তিবাহিনীর সেক্টর ও কমান্ডারদের হিসাব পরিশিষ্ট ৯-এ দেয়া হলো)।

শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের অভাব ছিল সহজেই বোধগম্য। বাঙালি সামরিক অফিসারদের সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল এবং তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োজিত। অস্ত্রশস্ত্র মোটেই ছিল না, বাঙালি ইউনিটগুলো পূর্ব-পরিকল্পনা করে কোথাও বিদ্রোহ করে নি বলে তারা অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ নিয়ে আসতে পারে নি। ভারি

অস্ত্রের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাঞ্চলে সেক্টর কমান্ডাররা শুরুতেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করতে থাকেন। প্রথম যেসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায়ই স্থাপিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী এসব এলাকায় জোর আক্রমণ চালিয়ে এগুলোকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা নেয়। অবশেষে এই সব কেন্দ্রের প্রায় সব কটি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে স্থাপন করা হয়। ভারতীয় সাহায্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার জন্য একটি নির্দিষ্ট ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন করা হয়। স্বল্প পরিসর কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য বেশির ভাগ কেন্দ্র সীমান্ত এলাকায় স্থাপন করা হয়। এইসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যরা হয় গণবাহিনীর সদস্য এবং তারা মূলত নানা গেরিলা তৎপরতায় নিযুক্ত থাকে। বর্ষ শেষে এক লাখ সদস্যের একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কার্যক্রম নেয়া হয়। তাতে নিয়মিত বাহিনী হবে ২৫ হাজার সৈন্যের আর বাকিরা হবে গেরিলা যোদ্ধা। গেরিলাদের কাজ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তোলা এবং এমনভাবে তাদের দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করা, যাতে উপযুক্ত সময়ে নিয়মিত বাহিনী তাদের নির্মূল করতে পারে। অবশ্য সেই অবস্থায় পৌঁছবার প্রাক্কালেই শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত যুদ্ধ। ইয়াহিয়ার হিসাব মতে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি ২৪টি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধারা তৈরি হচ্ছিল।[১৫] মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য যুবকদের ভিড় এত বেশি ছিল যে তাদের অপেক্ষারত অবস্থায় দেখাশোনার জন্য অসংখ্য ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর অধীনে যুবকদের অভ্যর্থনা ও ট্রানজিট ক্যাম্পের পরিচালনার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করতে হয়। এই সব অভ্যর্থনা বা ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনে ও পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরখ করে দেখতেন যে, রিক্রুটরা রাজনৈতিক মতবাদে আওয়ামী লীগের অনুসারী ছিল কি না। এই বাছাই পদ্ধতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল এবং এতে বেশ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বেশির ভাগ যুবক কোনো দলের সদস্য ছিল না এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখতে উদ্‌গ্রীব ছিল। বস্তুতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য খুব কম লোকই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পঞ্চম বাহিনীকে চিহ্নিত করা খুবই অসম্ভব ছিল। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকদের চাপে এই ধরনের বাছাই ক্রমে ক্রমে বিসর্জন দিতে হয়। তাছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল যথা ন্যাপ, কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধের পরামর্শক পরিষদের সদস্য হলে পর এই বাছাই পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। আগস্টের শুরুতে প্রায় ১২০টি ট্রানজিট ক্যাম্পে ২ লাখ যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য অপেক্ষারত ছিল। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভিড় বহাল থাকে এবং প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ত সুযোগের বিরুদ্ধে যুবক সম্প্রদায় সবসময় সোচ্চার ও অসন্তুষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের স্বল্পতা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের নিরত করতে পারে নি। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা যাঁরা লক্ষ্য করেন তাঁদের অভিমত ছিল যে, উদ্যোগ ও আগ্রহে, শিক্ষায় ও দৃঢ়চিত্ততায় বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো সেনাবাহিনী ছিল বলে জানা ছিল না।[১৭]

সমাজের সব স্তর ও পেশার লোকেরা দেশ স্বাধীন করবার জন্য অস্ত্র ধরে, তবে এঁদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ছিল।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী প্রকৃতপক্ষে কখনো যথার্থ কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে ছিল না। প্রধান সেনাধিনায়কের দফতর ছিল মুজিবনগরে এবং তিনি নানা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়মিত হাজিরা দেন। প্রধানমন্ত্রী অনবরত যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীকে প্রেরণা যোগাতে ব্যস্ত থাকতেন। চিফ অব স্টাফ সবসময়ই আগরতলায় তাঁর দফতর বহাল রাখেন। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আই মজিদ ছিলেন একজন অরাজনৈতিক ব্যবসায়ী। কিন্তু পাকিস্তানি বর্বরতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনিও সীমান্ত পেরিয়ে মেঘালয়ে একটি কমান্ড স্থাপন করেন। সেক্টর কমান্ডাররা মোটামুটি স্বাধীনভাবে তাঁদের সামরিক তৎপরতা চালিয়ে যান। আগস্ট মাসে একজন সামরিক সচিব নিযুক্ত করা হয়। সিলেটের জেলা প্রশাসক আবদুস সামাদ এপ্রিলেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং অবশেষে জুলাইয়ের শেষে আগরতলায় আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁকে সামরিক সচিব নিযুক্ত করা হয়। প্রায় একই সময়ে পেশাদার চিকিৎসক ডা. টি হোসেনও ঢাকা পালিয়ে মুজিবনগরে যান। তাঁকে স্বাস্থ্য সচিব নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর প্রধান দায়িত্ব হয় সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্য বিভাগের। কেন্দ্রীয় কমান্ড মূলত দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণ, আহতদের পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরিচালনা এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে রত থাকে। সামরিক সচিবালয়ের প্রধান দায়িত্ব হয় জনসংযোগ, সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে সমন্বয় এবং সেনাবাহিনীর উৎসাহ-উদ্দীপনা অব্যাহত রাখার উদ্যোগ। অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তাবিত তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয় কিন্তু কোনোটিরই যথেষ্ট কর্মকর্তা ছিল না। ৬০ জন অফিসারকে রিক্রুট করে তাঁদের জন্য একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বানানো হয়। এতেও সামরিক কর্মকর্তার অভাব দূরীভূত হলো না। যাই হোক সেপ্টেম্বরে যুদ্ধকৌশলের পরিবর্তন হলো। ভূখণ্ড দখল করে সেখানে কর্তৃত্ব বহাল রাখার উদ্যোগ শিথিল করে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ জোরদার করা এবং সীমান্ত এলাকার সর্বত্র পাকিস্তানিদের ব্যস্ত রাখার কৌশল গ্রহণ করা হয়। সেক্টর কমান্ডার এবং ব্রিগেড কমান্ডাররা স্বাধীনভাবে তাঁদের তৎপরতা চালান এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ও সমন্বয়ও ছিল সরাসরি। দেশের মধ্যে গেরিলা তৎপরতার সিংহভাগ তাঁরাই পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু শেখ মনির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মুজিব বাহিনী কোনো কেন্দ্রীয় কমান্ড বা সেক্টর কমান্ডের তোয়াক্কা করতো না। তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক ছিল সরাসরি এবং তাঁরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষেরও কোনো হুকুম মানতো না। ১৩ ডিসেম্বর যখন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো তখন মুক্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে। মুজিব বাহিনীর আট হাজার সদস্য এই হিসেবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিয়মিত বাহিনীতে ছিল প্রায় ২০ হাজার সৈন্য এবং মাত্র ২শ' অফিসার। এরা এক লাখ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১৮]

এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি স্বাধীন স্বশাসিত সেনাবাহিনীও গড়ে ওঠে। তাঁরা মূলত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তৎপর ছিল এবং ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য গ্রহণ

করতো। এদের সংখ্যা ছিল মোট ৩০ থেকে ৪০ হাজার। তাঁরা পাকিস্তানিদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েই তাঁদের উদ্যোগ বহাল রাখতো, শুধু মাঝেমধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতো। যে সব গেরিলা যোদ্ধা সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ন্ত্রণে তৎপরতা চালাতো এই সব বাহিনী তাদের সাহায্য করতো এবং গেরিলা যোদ্ধারাও প্রায়শ তাঁদেরকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতো। এইসব বাহিনীর মধ্যে তিনটি দল খুব প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাঁরা শুধু গেরিলা তৎপরতায় লিপ্ত ছিল না, প্রায়ই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতো। দুর্ধর্ষ কাদের বাহিনী টাঙ্গাইল এলাকায় তৎপর ছিল এবং তাঁদের বাহিনীতে ছিল ১৭ হাজার সদস্য। ময়মনসিংহের আফসার বাহিনীর শক্তি ছিল প্রায় সাড়ে ৩ হাজার সেনানী। গোপালগঞ্জ ও বরিশালে হেমায়েত বাহিনী ছিল ছোট কিন্তু সুসংহত। তাঁদের সদস্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। এইসব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয় এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।

অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নিয়ে মুক্তিবাহিনীর অভিযোগ ও ক্ষোভের শেষ ছিল না। মেজর শফিউল্লার দল টঙ্গিতে বিদ্রোহ করার সময় বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিতে সক্ষম হয়। অন্য কোনো কমান্ডের সে রকম সুযোগ হয় নি। শুরুতে ভারতীয় অস্ত্র সরবরাহ ছিল অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম উদ্যোগ ছিল পাকিস্তানিদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়া। অস্ত্রাভাবে অনেক গেরিলা দল কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ শেষে শুধু ক'টি গ্রেনেড নিয়ে তাঁদের অভিযানে যেত। ভারতীয় সাহায্যে মোটামুটিভাবে হাল্‌কা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং ব্রিগেড যখন প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন কিছু ভারি কামান সংগ্রহ করা হয়। প্রবাসী বাঙালিরা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য কিছু উদ্যোগ নেন কিন্তু সেগুলো তেমন কিছু ছিল না। আমেরিকা থেকে রেজাউল হাসান ফিরোজের উদ্যোগে পাঠানো টেলিযোগাযোগ যন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে জুন মাসে একটি জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। অক্টোবরের শেষে সামরিক অফিসারদের প্রথম দলের নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ভারত থেকে ভারি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে থাকে। একটি বিমান বাহিনী গড়ে তোলার জন্য বৈমানিকদেরও প্রশিক্ষণ শুরু হয়। একটি ফাইটার স্কোয়াড্রন গঠনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ১০ জন পাইলট এবং ৭০জন সহযোগী নিয়ে যে বিমান বাহিনী গঠিত হয় তাদের ছিল একটি ডাকোটা, একটি ওটার এবং একটি হেলিকপ্টার। তবে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হলে বিমান বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি পর্ব

ভারতীয় আইনবিদ ও লেখক সুব্রত রায় চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুজিবনগরের সরকার এবং আশ্রয়প্রার্থী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন নিবেদিত বিশ্লেষক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করেন।[১৯] তাঁর হিসেবে প্রথম পর্ব ছিল ২৫ মার্চের রাতে শুরু হয়ে

মে মাসের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের শুরু ও সংগঠন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসমন্বিত। বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ ছিল এর বিশেষত্ব। অবশ্য এই পর্বেও বেশ ক'টি চমকপ্রদ গেরিলা আক্রমণের সাফল্য সাধিত হয়। গেরিলারা ঢাকায় দুঃসাহসিক আক্রমণ চালায় এবং ঢাকা-খুলনা নৌপথে রকেট জাহাজকে দখল করে।[২০] অবশ্য এই সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মোটামুটিভাবে প্রতিরোধ দমনে সফল হয়। একে একে তারা সব শহর দখল করে এবং ক্রমে ক্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিবাহিনী শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করে এবং জুন-জুলাই মাসে তাদের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সামরিক শক্তির ভারসাম্য এমন ছিল যে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং সশস্ত্র করে একটি সংগঠিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। তাই গেরিলা তৎপরতা—সাবোটাজ এবং অ্যামবুশ হয় তাদের প্রধান কৌশল। এই সময়ে তারা সার্বিক সামরিক অবস্থানের একটি বাস্তবমুখী মূল্যায়নও সম্পূর্ণ করে। তারা সব রকম যোগাযোগ ব্যাহত করতে প্রচেষ্টা চালায়—রাস্তা কাটা, টেলিফোন লাইন ধ্বংস, পুল ভাঙা বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিনষ্ট করা হয় এই তৎপরতার লক্ষ্য। এবং বেশুমার পাকিস্তানি সৈন্যদের গেরিলা যোদ্ধারা নিহত করে। পাকিস্তানিদের তৎপরতা ছিল কামান দেগে, বসতি কেন্দ্র উড়িয়ে দিয়ে এবং লোকজনকে সমবেত করে গুলি করে হত্যাযজ্ঞ। গেরিলাদের প্রতিশোধ ছিল বিচ্ছিন্নভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা করা। ভরা বর্ষায় সব আশার গুড়ে বালি দিয়ে দখলদার পাকিস্তানিদের দৌরাত্ম্য খুব বেড়ে গেল। ভরা নদী বা খালের সুযোগ নিয়ে যন্ত্রচালিত সব নৌযানকে যুদ্ধযানে পরিণত করে তারা নদীর দুই কূলে গ্রাম ও বসতি ধ্বংস করে চললো এবং জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ব্রতী হলো। যে সব রাস্তা দিয়ে বা নৌপথে গেরিলারা চলাফেরা করতো অথবা সীমান্তের ওপার থেকে তাদের রসদ পেত সেগুলো পেট্রোল করা পাকিস্তানিদের জন্য অনেক সহজসাধ্য হয়ে যায়। কিন্তু এই সময়ে অন্যদিকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জোর আসে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক ট্রানজিট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পর্ব ছিল আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। কৌশলগতভাবে মুক্তিবাহিনী তখন গেরিলা তৎপরতা ও সীমান্তে পাকিস্তানিদের ব্যস্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। আগস্টের মাঝামাঝি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের গভীর অভ্যন্তরে তাদের দুঃসাহসিক আক্রমণ চালাতে থাকে। জুন মাসের শেষদিকে নৌবাহিনী গঠন করা হয়, এই সময়ে তাদের তৎপরতারও নজির মিলে। *নিউইয়র্ক টাইমসের* ম্যালকম ব্রাউন ৬ অক্টোবর এক সংবাদ প্রতিবেদনে জানান যে, ছয় আগস্ট থেকে শুরু করে বাংলাদেশ নৌ কমান্ডো বাহিনী মোট ১৬টি নৌযানকে হয় ধ্বংস করে অথবা অচল করে দেয়।[২১] ঢাকা শহরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল অথবা হাবিব ব্যাঙ্ক গেরিলাদের আক্রমণের শিকার হয়। তারা নানা জায়গায় থানা দখল করে, পাকিস্তানি প্লাটুন বা অনুসন্ধান গোষ্ঠীকে নির্মূল করে এবং পাকিস্তানের বাঙালি ও বিহারি দোসর ও রাজাকারদের বিপুল হারে হত্যা করে চলে।

মুক্তিযুদ্ধের চতুর্থ পর্বে মুক্তিবাহিনী প্রথমবারের মতো সাফল্যের পরিচয় রাখে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একদিকে গেরিলা তৎপরতা বাড়লো, অন্যদিকে পাকিস্তানিরা পালিয়ে গেলে বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং ছোট ছোট ইউনিট বিচ্ছিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে সমবেত অবস্থান নিতে শুরু করে। এ ছাড়াও তারা তখন তাদের ছাউনি বা ক্যাম্প থেকে খুব বাইরে যেতে সাহস পেত না। এর ফলে অন্তত রাত্রিবেলায় সারা গ্রামীণ এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে।[২২] পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখ সমর হয়ে যায় নিত্যদিনকার বিষয় এবং এই সব যুদ্ধ শুধু সীমান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশের অভ্যন্তরেও বাঙালি-পাকিস্তানি মুখোমুখি যুদ্ধ অনবরত ঘটতে থাকে।[২৩] সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানিরা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের ছিল অবাধ গতি। কৌশলগতভাবে মুক্তিবাহিনী সীমান্ত এলাকায় ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যাতে অভ্যন্তরে গেরিলারা তাদের তৎপরতা জোরদার করতে পারে।[২৪] মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্ব শুরু হয় ৩ ডিসেম্বর। নভেম্বরের ২১ তারিখ থেকে ভারতীয় ভারি কামান সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন করতে থাকে। ভারত এই সহায়তাকে বলে "আত্মরক্ষামূলক অনুপ্রবেশ"। পাকিস্তান এই কৌশলের বিপরীতে কোনো কিছুই করতে পারলো না। দখলদার বাহিনীর মানসিক দুর্বলতা এবং সারা দেশে 'শত্রুদের' ব্যাপ্তি তাদের দিশেহারা করে দেয়। সীমান্তে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। একান্তই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইয়াহিয়া ৩ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বিমান হামলা চালান। এতেই শুরু হলো পাক-ভারতের অঘোষিত যুদ্ধ এবং কয়েকদিন পরেই বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে ভারত যৌথ বাংলাদেশ-ভারত কমান্ড প্রতিষ্ঠা করলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী সমভিব্যাহারে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এগিয়ে যেতে থাকলো। পশ্চিম সীমান্তেও যুদ্ধ শুরু হলো। বাংলাদেশে ভারতীয় বিমান হামলায় অচিরেই বাংলাদেশের আকাশ মুক্ত হলো। ভারতীয় ট্যাঙ্ক ও কামানের সাহায্য নিয়ে যৌথ বাহিনী ঢাকার পথে এগুতে থাকলো। মুক্তিবাহিনীর পাকিস্তানি অবস্থান ও কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং গেরিলাদের দেশের অভ্যন্তরে তৎপরতা পাকিস্তানি কাপুরুষ বাহিনীর ঢাকায় পলায়নকে ত্বরান্বিত করে। দুই-তিনটি সীমান্ত যথা যশোর, ফেনী বা সৈয়দপুর ছাড়া তারা কোথাও তেমন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে ঢাকায় পালিয়ে যেতে থাকলো। ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় আর ৬ দিন পরে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ২৫ মার্চ যে সামরিক প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিন্তু নিতান্ত অগোছালো ধারায় শুরু হয়, নয় মাস যেতে না যেতে সেই সামরিক তৎপরতা বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীকে উৎখাত করে। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও বেসামরিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে রক্ষা পায়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের ভূখণ্ড পাকিস্তানিদের দখল থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. কর্নেল জিয়াউর রহমানের স্মৃতিকথা, *দৈনিক বাংলা,* স্বাধীনতা সংখ্যা, ২৬ মার্চ, ১৯৭১, ঢাকা।

২. *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৭০০-৭০২।

৩. বেলাল মোহাম্মদ : *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,* ফুলদল প্রকাশনী, ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ৪২, ৪৪-৪৮।

৪. *NewYork Times,* নিউইয়র্ক, ২৭ মার্চ, ১৯৭১।
Washington Post, ওয়াশিংটন ডিসি, ২৭ মার্চ, ১৯৭১।

৫. *Washington Post,* ৩১ মার্চ, ১৯৭১।
Evening Star, ৩১ মার্চ, ১৯৭১, ওয়াশিংটন ডিসি।
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১-২, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১-১৫।
বেলাল মোহাম্মদ : *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,* পৃ. ৪৪, ৪৬, ৫৬-৫৯।
তৃতীয় খণ্ডে দুইটি বিবৃতি আছে; একটি হলো ২৬ মার্চে শেখ মুজিবের বাণী আর অন্যটি হলো মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের বিবৃতি। চতুর্থ খণ্ডে ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণার ট্রান্সক্রিপ্টগুলো আছে। কিন্তু এতে ২৬ মার্চ এম.এ. হান্নানের ঘোষণা এবং ২৭ মার্চ জিয়ার ঘোষণার ট্রান্সক্রিপ্ট নেই।
বেলাল মোহাম্মদ তাঁর বইয়ে এই ট্রান্সক্রিপ্ট দুটো হারিয়ে যাওয়ার কারণ নির্দেশ করেন। তিনি আরো জানান যে, জিয়া ২৭ মার্চ দুটি ঘোষণা দেন। একটিতে তিনি বলেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধ করছেন এবং অন্যটিতে তিনি বলেন, তিনিই অস্থায়ী সরকারের প্রধান। এই ঘোষণায় যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় তারও বর্ণনা করা হয়েছে। বেলাল মোহাম্মদ ৩০ মার্চ যে জিয়া আর একটি ঘোষণা দেন সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।
পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যম কিন্তু ২৭ মার্চ ও ৩০ মার্চের দুইটি বিবৃতিই প্রকাশ করে। *ওয়াশিংটন পোস্ট* ও *নিউইয়র্ক টাইমস* দুইটি দৈনিকেই এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয়।

৬. বেলাল মোহাম্মদ : *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,* পৃ. ২৬ ও ৩২।

৭. মইদুল হাসান : *মূলধারা* ৭১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৮৬ ,পৃ. ১১-১৩, ১৬-১৭।

৮. অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলমের লেখা ১৭ জুলাইয়ের চিঠিতে এই তথ্য পাওয়া যায়। মাহবুব আলম লেখকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

৯. তৌফিক এলাহী চৌধুরী : 'That Day on Mango-Grove', *Bangladesh Observer,* স্বাধীনতা সংখ্যা, ২৬ মার্চ, ১৯৭২। তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং মাহবুবউদ্দিন আহমদ যথাক্রমে চুয়াডাঙ্গার মহকুমা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁরাই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেন।

১০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *Declaration of Independence,* ৪ জুলাই, ১৯৭৭, ফিলাডেলফিয়া থেকে ঘোষিত।

১১. *Baltimore Sun,* বাল্টিমোর, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১।

১২. ভারত সরকার : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : Bangladesh Documents, দিল্লি, ১৯৭১, পৃ. ২৮২-২৮৬।

১৩. কুশওয়ান্ত সিং : The Freedom Fighters of Bangladesh, *The Illustrated Weekly of India,* দিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১৪. এই সম্মেলনের আরো বিবরণ পাওয়া যাবে।
মইদুল হাসান : *মূলধারা* '৭১, পৃ. ৫৩-৬৩।
রফিকুল ইসলাম : *A Tale of Millions,* বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১৮৯-২০০।

১৫. Neville Maxwell-এর প্রতিবেদন : *The Financial Times,* ১৯ জুলাই, ১৯৭১, লন্ডন।
১৬. ডা. টি হোসেন : This Week Last Year, *Weekly Freedom*, ঢাকা, ৮ আগস্ট, ১৯৭২।
১৭. *New Statesman*-এ প্রতিবেদন 'With the Bangladesh Guerrilla,' ১৩ আগস্ট, ১৯৭১, লন্ডন।
১৮. সেনাবাহিনীর কলেবরের হিসাব লেখক ১৯৭২-৭৩ সালে তৈরি করেন। এই উদ্দেশ্যে লেখক জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী, তদানীন্তন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ও মুজিবনগরের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুর রব এবং প্রবাসী সরকারের সামরিক সচিব আবদুস সামাদের সঙ্গে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেন।
কাদের, আফসার ও হেমায়েত বাহিনীর হিসাব মিলবে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* নবম খণ্ড ৬৩৫-৬৭৬ পৃ. এবং দশম খণ্ড ৭৯৮-৯১০ পৃ.।
২৪৩ সামরিক অফিসারের হিসাব পাওয়া যায় মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের *লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে*, ১৯৮৬ দ্বিতীয় সংস্করণ, ছায়াপথ, পৃ. ৩১৬-২৩।
এ.এস. এম শামসুল আরেফিন *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা ১৯৯৫। এই গ্রন্থে সামরিক অফিসারদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় পৃ. ৪৯-৬৮। সদর দফতর ও এগারো সেক্টরে মোট অফিসার ছিলেন ২৬৬ জন। এদের মধ্যে ২৯ জন ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, ৩৭ জন অন্যান্য পেশা থেকে এসে সামরিক দায়িত্ব গ্রহণকারী এবং ৪৫ জন নতুন রিক্রুট অফিসার। এ ছাড়া তিনটি ব্রিগেডে মোট অফিসার ছিলেন ৯৫ জন।
১৯. সুব্রত রায় চৌধুরী : *The Genesis of Bangladesh*, নিউইয়র্ক এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২, পৃ. ১৫৮।
২০. *Evening Star* : 23 May 1971, ওয়াশিংটন ডিসি।
২১. *The New York Times : October* 16, 1971, নিউইয়র্ক।
২২. *The Christian Science Monitor,* October 13 & 15, 1971, বোস্টন।
২৩. *The New York Times, November* 13, ১৯৭১ নিউইয়র্ক।
২৪. খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *দৈনিক বাংলা,* স্বাধীনতা সংখ্যা, ২৬ মার্চ, ১৯৭২, ঢাকা।

একাদশ অধ্যায়

প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো ১০ এপ্রিল এবং আনুষ্ঠানিক অভিষেক হলো ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। প্রথমেই সামরিক উদ্যোগকে সংহত ও সংগঠিত করতে হলো। একই সঙ্গে একটি প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তুলতে হলো। পদানত ও দখলিকৃত বাংলাদেশে জনগণের আশা-উদ্দীপনা জিইয়ে রাখা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তারপর শরণার্থীরা এসে যখন ক্যাম্পে উঠতে থাকলো তাদের মনেও আশা জাগরূক রাখা ছিল একটি কঠিন কর্তব্য। কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশের সমর্থনে এবং পাকিস্তানি উন্মাদনা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বমত গড়ে তোলা ছিল আর একটি অপরিহার্য কর্তব্য। মুক্ত এলাকা শাসনের ব্যবস্থাও করা দরকার ছিল। যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন সম্বন্ধে অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ছিল মুজিবনগর সরকারের দায়িত্ব।

বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা— সরকারের ব্যবস্থাপনা

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন আমলা যাঁরা প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন এবং যুদ্ধ শুরু হলে সীমান্ত অতিক্রম করেন তাঁদের দিয়েই প্রশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর মুজিবনগরে (কলকাতায় ৮ নম্বর থিয়েটার রোড) স্থাপিত হয় এবং আগরতলায় একটি আঞ্চলিক দফতর স্থাপন করা হয়। এই আঞ্চলিক দফতরের প্রধান ছিলেন চট্টগ্রামের সাংসদ মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী। কিছুদিন পর তিনি প্রথমে মুজিবনগরে এবং আগস্টের শুরুতে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত হয়ে চলে যান। তখন আর একজন সাংসদ জহুর আহমদ চৌধুরী হন এই দফতরের নেতা। সামরিক নেতৃত্বের দায়িত্বে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন চিফ অব স্টাফ কর্নেল আবদুর রব। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হোসেন তওফিক ইমাম ছিলেন আঞ্চলিক দফতরে প্রশাসনের নেতৃত্বে। তিনি জুন মাসে মুজিবনগরে মন্ত্রিসভা দফতরের সচিব হিসেবে

নিযুক্তি পান। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা হাকিম কাজী রকিবুদ্দিন আহমদ প্রশাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতায় ছিল সব মন্ত্রীর দফতর। মহাসেনাধিনায়কের দফতরও ছিল ওখানে। বেশির ভাগ নির্বাচিত নেতারা, প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সদস্যরাও মুজিবনগরে ছিলেন। একদিকে যেমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করানো খুবই জরুরি ছিল, অন্যদিকে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। পাবনা জেলার প্রশাসক নুরুল কাদের খানকে প্রথমেই সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে সচিব নিয়োগ করা হয়। তাঁর প্রধান কাজ ছিল একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা এবং যেসব সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রবাসী সরকারে কাজ করতে চান তাঁদের নানা চাকরিতে নিয়োগ করা। পরবর্তীকালে নুরুল কাদের খানকে ত্রাণ কাজের দায়িত্বেও নিযুক্তি দেয়া হয়। প্রাদেশিক অর্থ দফতরে যুগ্ম সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান প্রথমে তাঁর শহর টাঙ্গাইলে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরে সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাঁকে অর্থ সচিব নিযুক্ত করা হয়। বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদরা সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে পরিত্যক্ত কোষাগার ও ব্যাঙ্কগুলো থেকে বেশ পরিমাণে পাকিস্তানি টাকাপয়সা নিয়ে আসেন। এই টাকাপয়সার হিসাব নেয়া এবং এইসব টাকা সত্বর পরিবর্তন করে নেয়া হয় অর্থ সচিবের অন্যতম দায়িত্ব। যে সব সরকারি কর্মচারী বা বুদ্ধিজীবী কোনো-না-কোনোভাবে মুজিবনগর সরকারকে সাহায্য করছিলেন অথবা সরকারের কাজে লিপ্ত ছিলেন তাঁদেরকে সরকার একটি মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে। এই কাজটিও অর্থ সচিবকে করতে হতো। সারদা পুলিশ একাডেমির (রাজশাহীতে অবস্থিত) উপপ্রিন্সিপাল এম.এ. খালেকের দায়িত্ব হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা। প্রথমে তাঁর নিযুক্তি হয় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা হলে তাঁকে এর সচিব নিযুক্ত করা হয়।

মাহবুব আলম ছিলেন পাকিস্তান কূটনৈতিক ক্যাডারের সদস্য। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি চাকরি ছেড়ে চট্টগ্রামে গ্রামীণ উন্নয়নে আত্মনিবেদন করেন। সেখানে তিনি চাষীদের সমবায় গঠন করেন, উন্নত বীজের ব্যবহার এবং অন্যান্য আধুনিক উপাদান কৃষিতে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা নেন। তাঁর নাম হয় মাহবুব আলম চাষী। জুন মাসে তাঁকে আগরতলা থেকে মুজিবনগরে ডেকে পাঠানো হয় এবং পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত করা হয়। পরের মাসে আগরতলা থেকে হোসেন তওফিক ইমামকে (পার্বত্য চট্টগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক) ডেকে এনে মন্ত্রিসভা সচিবালয়ে সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। আগস্টে আরো দুটো সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়। সিলেটের জেলা প্রশাসক আবদুস সামাদ হন সামরিক সচিব এবং ঢাকার পেশাদার ডাক্তার টি হোসেন হন স্বাস্থ্য সচিব। সামাদ প্রথম কিছুদিন তথ্য দফতরের দায়িত্বেও ছিলেন। টি হোসেনের অন্যতম দায়িত্ব ছিল মুক্তিবাহিনীর স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যাবলি। সেপ্টেম্বরে আরো কিছু সচিব নিযুক্ত করা হয়। নুরুদ্দিন আহমদ ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি ঢাকা

ছেড়ে আসেন মুজিবনগরে এবং তাঁকে কৃষি সচিব নিযুক্ত করা হয়। আবদুল হান্নান চৌধুরী উত্তরাঞ্চলে একজন জেলা জজের দায়িত্ব পালনকালে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন। তিনি সৈনিকের দায়িত্ব নিয়ে রণক্ষেত্রে অবস্থান নেন। তাকে আইন ও সংসদ বিষয়ক সচিব নিযুক্ত করা হয়। আর একজন আইন বিভাগের কর্মকর্তা জয়গোবিন্দ ভৌমিককে দেয়া হয় ত্রাণ কমিশনারের দায়িত্ব। এমদাদ আলী ছিলেন একজন প্রকৌশলী, তাঁকে প্রথমে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সচিব নিযুক্ত করা হয়। আনওয়ারুল হক খান ছিলেন পাকিস্তান কর বিভাগের কর্মকর্তা, তাকে ইকনমিক পুলে মনোনীত করা হয়। তিনি বিলেতে প্রশিক্ষণে লিপ্ত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি মুজিবনগরে যান বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। ইতোমধ্যে তথ্য সচিবের জন্য উপযুক্ত লোকের খোঁজ চলছিল। বোস্টনে অবস্থানরত আমলা খোরশেদ আলমকে এই পদ নিতে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি তাতে সাড়া না দেয়ায় পদটি খালি থাকে এবং সামাদ দ্বৈত দায়িত্ব পালন করে চলেন। আনওয়ারুল হককে তথ্য সচিব নিযুক্ত করা হয়। সচিবালয়ে এক হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তি দেয়া হয় ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। রুহুল কুদ্দুস ছিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের প্রথম দলের সদস্য (১৯৪৯ সাল)। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন এবং ১৯৬৯ সালে মামলা খারিজ হলে তাঁকে অবসর প্রদান করা হয়। তিনি নভেম্বর মাসে সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আশ্রয় নেন। ৭ ডিসেম্বর তাঁকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিযুক্ত করা হয়। সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত মুজিবনগর সরকারের প্রথম সচিব নুরুল কাদের খানের হিসেবে সর্বমোট ১৩টি মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ, সাধারণ প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ-শিল্প-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, তথ্য ও বেতার, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি, প্রকৌশল, আইন বিষয়ক এবং যুব শিবির। সচিব ছিলেন ১২ জন। যুব শিবিরের দায়িত্ব ছিল সাধারণ প্রশাসন সচিবের, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব ছিল ত্রাণ কমিশনারের কাছে।[১] পরিশিষ্ট ১০-এ মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ও সচিবদের হিসেব দেয়া হলো।

বেসামরিক সচিবালয় গড়ে উঠে প্রয়োজনের তাগিদে এবং উপযুক্ত অফিসারের আগমনে। কাজের প্রয়োজনে নানা পদ সৃষ্টি করা হয়, আবার কখনো কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়ার জন্য একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। কোন্ দফতরে কি কাজ হয় এবং কর্মপ্রণালি কিভাবে নির্ধারিত হয় তার অনেক কিছু নির্ভর করে ঐ দফতরের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তার ওপর। বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগে কোনো নীতিমালা অনুসরণ করা হয় নি এবং তা তখন সম্ভবও ছিল না। আমলাবর্গ এইসব নিযুক্তিতে বেশি সুযোগ পান এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৪ জন সদস্য সবাই গুরুদায়িত্ব বহন করেন। কিন্তু রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, প্রকৌশলী, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবীদের অনেকেও প্রশসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল নেহায়েত বরাতের বিষয় বা ঘটনা পরম্পরা। প্রশাসনিক দায়িত্বও ছিল বিভিন্ন

রকমের। মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ে বা আঞ্চলিক প্রশাসনে অনেকগুলো পদ ছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লিয়াজোঁ করবার জন্য অনেক পদ ছিল, যেমন সীমান্ত জেলাগুলোতে জেলা প্রশাসনে উপদেষ্টার দায়িত্ব বা ভারতীয় ত্রাণ কর্মকর্তাদের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা। শরণার্থী কেন্দ্র, যুব কেন্দ্র, ট্রানজিট ক্যাম্প এগুলোতেও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু পদ ছিল। আবার কেউ কেউ নিজের নিজের কাজ করেও নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে সরকার থেকে মাসোহারা পেতেন। বিভিন্ন পেশা বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি সরকারের কোনো বেসামরিক দায়িত্বের পরিবর্তে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে সুদূরপ্রসারী দায়িত্ব সংবলিত একটি পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করা হয়।[২] এই বোর্ডে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য ইয়েলে অবস্থানকারী পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের ছুটি ভোগকারী পরিচালক ড. নুরুল ইসলামকে আহ্বান করা হয় এবং এই বোর্ডের সচিবের পদে যোগ দিতে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাঙ্কে কর্মরত হারুন-উর রশীদকে আহ্বান করা হয়। নানা কারণে তাঁদের এইসব পদে যোগ দেয়া হয় নি এবং তাঁরা দু'জনেই প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থাকেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ছিল এই বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব। এছাড়াও সাময়িক নানা সমস্যা যেমন খাদ্য সরবরাহ, শরণার্থী কেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তাব রাখাও ছিল এই বোর্ডের দায়িত্ব। বাংলাদেশের নানা পেশা থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের এই বোর্ডে সমাবেশের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী অনেকদিন পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে আগস্ট মাসে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় পৌঁছেন। তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক সরকার যে পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করে তার একজন সদস্য ছিলেন। তাঁকে অবশেষে বাংলাদেশ পরিকল্পনা বোর্ডের সভাপতি করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ খান সারওয়ার মুরশিদ হন একজন সদস্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ মোশররফ হোসেন হন আর এক সদস্য। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার আনিসুজ্জামান হন অপর সদস্য। এবং পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের গবেষক স্বদেশরঞ্জন বসু হন অন্য সদস্য। পরিকল্পনা বোর্ডের দায়িত্ব নিয়েই তাঁরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেন এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁদের কাজে লিপ্ত হন। তাঁরা একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও কিছু দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা প্রণয়নের চিন্তা করেন। তবে তাঁদের দায়িত্ব হয় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার অবলম্বন করে ও যুদ্ধের ধ্বংসলীলা বিবেচনা করে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন। তাঁদের কাজের বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ : সভাপতি চৌধুরী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও লোক প্রশাসন সম্বন্ধে কাগজপত্র তৈরি করবেন। খান সারওয়ার মুরশিদ সামাজিক দিক বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মহিলা পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করবেন।

মোশাররফ হোসেন দেখবেন অর্থনৈতিক কাঠামো ও কৌশল। স্বদেশ বসু অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বহির্বাণিজ্য নিয়ে কাজ করবেন। আনিসুজ্জামান শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করবেন। সামাজিক দিক বিবেচনার একটি বড় বিষয় ছিল সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অব্যাহতিদান বা ডিমোবিলাইজেশন। কমিশনের কাজের লোক ছিল খুব সীমিত এবং সব বিষয়ে তাঁরা যথাযথ উপাত্ত সংগ্রহে অপারগ হন। ড. বসু বাংলাদেশে খাদ্য বিতরণের ওপর একটি মূল্যবান প্রতিবেদন পেশ করেন। ড. চৌধুরী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং প্রশাসন বিষয়ে একটি ব্যাপক নীলনকশা প্রণয়ন করেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের আগেই ১৩ ডিসেম্বর তাঁর প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। ড. মুরশিদ ডিমোবিলাইজেশনের ওপর একটি উত্তম প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আশু পদক্ষেপের সুপারিশ করেন ড. আনিসুজ্জামান। দুর্ভাগ্যবশত দেশ মুক্ত হলে এইসব কাগজপত্র আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পাকিস্তান সরকার সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বিশ্বব্যাঙ্কে ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি ও পানি সম্পদ নিয়ে একটি ব্যাপক সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ চলছিল (এরই ফসল ১৯৭২ সালের নয় খণ্ড ভূমি ও পানি সম্পদ সমীক্ষা)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের স্থানীয় দফতর এবং ইউএসএইড যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও পুনর্বাসনের কলেবর বা দিকদর্শন নিয়ে অনেক প্রতিবেদন পেশ করে চলছিল। এইসব দলিলের সুযোগ নিয়ে বোস্টনের একদল উৎসাহী যুবক একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়নে লিপ্ত হন। অর্থনীতিবিদ আলমগীর মহিউদ্দিন ও মতিলাল পাল, প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম এবং এ.আর ভুঁইয়া এই উদ্যোগে মুখ্য ভূমিকা নেন। হারভার্ড পপুলেশন সেন্টারে রবার্ট ডর্ফম্যান এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের রবার্ট সেডোভ এই উদ্যোগে সহায়তা করেন। ওয়াশিংটনে আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং হারুন-উর রশীদ এতে উপদেষ্টার ভূমিকা রাখেন এবং ইয়েলে ড. নুরুল ইসলাম এর সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮ মাসের জন্য সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ হয় ১৭ ডিসেম্বর। স্বাধীন বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসেই পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করা হয়। তাঁরা মুজিবনগর বোর্ড অথবা বোস্টন পরিকল্পনা কোষের কোনো প্রতিবেদনেরই তেমন মূল্য দেন নি। তাঁদের কাজ শুরু হয় নতুন উদ্যমে এবং মুজিবনগর পরিকল্পনা বোর্ড এমনি বিলুপ্ত হয়। ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা সবাই অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। শুধু ড. মোশাররফ হোসেন নতুন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হলেন।

জুন মাসেই মুক্ত এলাকায় প্রশাসনিক কাঠামো কেমন হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এত বাঙালি এবং এত পেশা ও অভিজ্ঞতার লোকজন যেভাবে সীমান্ত এলাকায় সমবেত হতে থাকেন, তাঁদেরকে সংহত ও সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামোর উদ্ভব হয়। তারপর যখন শরণার্থীদের ভিড় বাড়লো এবং তাতে অদূর ভবিষ্যতে কোনো বিরতির লক্ষণ পাওয়া গেল না, তখন তাদেরকে কোনো রকম নিয়ম বা শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার জন্যও সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ

সরকারের কিছু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয়। ভারতীয় ত্রাণ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবার জন্য এই কাঠামোর দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত বিনিশ্চায়ক। মুজিবনগর সরকার যখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তখনই আগরতলায় এর আঞ্চলিক শাখা খুলতে হয়। জুন মাসে পাঁচটি এলাকাভিত্তিক প্রশাসন পরিষদ গঠন করা হয় এবং তাদের কর্তব্যের ফর্দও তৈরি করা হয়।[৩] জুলাই মাসে এই সংখ্যা হয় ৯ এবং আগস্টে আরো দুটো পরিষদ স্থাপন করা হয়।[৪] বাংলাদেশের সকল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়ে হয় এলাকাভিত্তিক প্রশাসন পরিষদ এবং তারা নিজেদের মধ্য থেকে তাদের সভাপতি নির্বাচন করেন। প্রত্যেক পরিষদের ছিলেন একজন সচিব এবং সচরাচর এই সচিব ছিলেন একজন আমলা। সব পরিষদের অধীনে অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাও ছিলেন যেমন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, শিক্ষক, প্রকৌশলী ইত্যাদি। প্রশাসনিক পরিষদের প্রথম পর্বে দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা এবং তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখা। অনেক সময় তাদের খাদ্য বা বস্ত্র সরবরাহ করতে হয়েছে। অথবা তাদের পণ্য রফতানিতে সাহায্য করতে হয়েছে। তাদের আর এক কাজ ছিল যুব, ট্রানজিট বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনায় সহায়তা। শরণার্থী কেন্দ্রেও সহায়তা করা তাদের দায়িত্ব ছিল এবং শরণার্থী কেন্দ্র থেকে পলায়ন বা তাতে অনুপ্রবেশের প্রতি তাদের কড়া নজর রাখতে হতো। মুক্তি বাহিনী ও সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও ছিল তাদের কর্তব্য।

যেসব এলাকা পাকিস্তানি দখলমুক্ত হতো সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল তাদের অন্যতম দায়িত্ব। এইসব এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ছিল বিরাট কর্তব্য। অনেক এলাকায় রফতানি দ্রব্যাদি ভারতে পাচার করে একদিকে কৃষকের হাতে অর্থ পৌঁছে দেয়া এবং অন্যদিকে পাকিস্তানকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বঞ্চিত করার কাজে বেশ পারদর্শিতা দেখানো হয়। বাংলাদেশ সরকার বস্তুতপক্ষে এই উদ্দেশ্যে একটি বাণিজ্য বোর্ড গঠন করে। সাংসদ মতিউর রহমান এই বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন। রংপুরের এই সাংসদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যুৎপত্তি ছিল, তিনি ঢাকা বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বারের সভাপতি ছিলেন। এলাকাভিত্তিক এই প্রশাসনিক পরিষদগুলো নির্দিষ্ট জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তাদের সদর দফতর ছিল নিকটবর্তী কোনো ভারতীয় শহরে। ১০টি পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি ছিল, শুধু দক্ষিণ এলাকায় কোনো সভাপতি নির্বাচন হয় নি। পরিশিষ্ট ১১-তে এই পরিষদগুলোর এলাকা, সদর দফতর, সভাপতি ও সচিবের বিবরণ দেয়া হলো।

রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগোষ্ঠী এবং মুজিবনগর সরকার

বেশ কিছু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সরকারি আমলা মুজিবনগরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হান্নানের ভূমিকা প্রশাসনে ও রাজনীতিতে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনিই চট্টগ্রাম রেডিও থেকে ২৬ মার্চ সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর

নামে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি আগরতলায় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খুবই প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি কিছুদিন বেতারের পরিচালনায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। কুমিল্লার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য তাহেরউদ্দিন ঠাকুরও প্রথমে আগরতলায় ছিলেন। সেখানে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভার নেন। পরে তিনি মুজিবনগরে এসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রচার ও বহির্সংযোগ বিভাগের ভার নেন। কুষ্টিয়ার সাংসদ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ঢাকা থেকে তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং তাঁর সহকারী হিসেবে নয় মাস কাজ করে যান। স্বাধীনতা ঘোষণা রচনায় তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। বড় মাপের বিদেশি ব্যক্তিত্ব মুজিবনগরে গেলে তিনি তাঁদের সঙ্গে সংযোগ রাখতেন। সিলেটের সাংসদ আবদুস সামাদ আজাদ হন মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি ছিলেন খুবই সক্রিয়। তিনি বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে যান, এখানেই বাংলাদেশ প্রথম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ পায়। তিনি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায়ই দিল্লির সঙ্গে আলোচনায় যেতেন। তিনি জাতিসংঘেও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যান। টাঙ্গাইলের সাংসদ আবদুল মান্নান ছিলেন প্রচার বিভাগের দায়িত্বে। তাঁরই সম্পাদনায় *জয় বাংলা* সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো এবং স্বাধীন বাংলা বেতারেরও তিনি ছিলেন রাজনৈতিক পরিচালক। ঢাকার সাংসদ শামসুল হক ছিলেন দিল্লিতে মুজিবনগর সরকারের লিয়াজোঁর দায়িত্বে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সাংবাদিক এবং ন্যাপ কর্মী মঈদুল হাসান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিক ছিলেন সরকারের একজন উপদেষ্টা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের নেতার ভূমিকায় খুবই দক্ষতার পরিচয় দেন। বাংলাদেশের একজন শক্তিশালী মুখপাত্র হিসেবে তিনি প্রথমে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে নানা শিক্ষাঙ্গনে ঘুরে বেড়ান। তিনিও বাংলাদেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে ময়মনসিংহের সাংসদ সৈয়দ আবদুস সুলতানও সরকারের মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনিও জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন এবং ভারতে ও আমেরিকায় বাংলাদেশের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। সাংবাদিক এম.আর. আখতার মুকুল এবং কামাল লোহানী বেতারে তাঁদের শক্তিশালী বক্তব্য রেখে দখলিকৃত বাংলাদেশে মনোবল দৃঢ় রাখতে অমূল্য অবদান রাখেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদও প্রচার কার্যে অবদান রাখেন এবং বিদেশি অতিথি ও পরিব্রাজকদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন। পাকিস্তানের ইরাকে রাষ্ট্রদূত এ.এফ.এম. আবুল ফতেহ আগস্টে এবং আর্জেন্টিনায় রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমিন অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁরা দু'জনেই রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আবুল ফতেহ বাংলাদেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। ডিসেম্বরে তাঁকে পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত করা হয়।

কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি বিরাট সমাবেশ ঘটে। শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী, সিনেমা শিল্পী, চিত্রকর,

গায়ক-গায়িকা, আইনবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী— সব ধরনের লোক ও বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ ক্রমে ক্রমে কলকাতায় গিয়ে ভিড় জমান। পাকিস্তানি দস্যুদের বিশেষ শত্রু ছিলেন এইসব ব্যক্তিবর্গ, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দল আত্মরক্ষার্থে সীমান্ত অতিক্রম করেন। এছাড়াও এই গোষ্ঠীতে ছিলেন স্বাধীন বাংলার জন্য নিবেদিতপ্রাণ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা রণাঙ্গনে বীর সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে গড়ে তুলতে তাঁদের ছিল সবিশেষ অবদান। মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়ে তাঁরা শরণার্থী ও যোদ্ধাদের মনে আশা সঞ্চার করেন। চিত্রকলা ও সিনেমার মাধ্যমে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন আদায় করেন। তাঁদের অনেকে মুজিবনগর সরকারেও বিশেষ ভূমিকা রাখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এপ্রিলের শুরুতেই বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গড়ে উঠেছিল। এর সভাপতি ছিলেন উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী। তাঁরা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পুনর্বাসনে উদ্যোগী ভূমিকা নেন এবং তাঁদের প্রচারকার্যে সুযোগ ও সহায়তা প্রদান করেন। বাঙালিরা 'লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইন্টেলিজেন্সিয়া' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এর সভাপতি ছিলেন ড. এ আর মল্লিক এবং সম্পাদক ছিলেন জহির রায়হান ও ড. বেলায়েত হোসেন। বাঙালি শিক্ষকদের একটি স্বতন্ত্র সংগঠনও গড়ে ওঠে। এর সভাপতিও ছিলেন ড. মল্লিক এবং সাধারণ সম্পাদক হন ড. আনিসুজ্জামান। শিল্পীরা আর একটি প্রতিষ্ঠান মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা স্থাপন করেন, যার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপিকা সন্‌জীদা খাতুন। পরবর্তীকালে আর একটি সংগঠন হয় 'সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির', যার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অজয় রায় এবং সম্পাদক ছিলেন আহমদ ছফা। এঁদের নানা কাজে ভারতীয় সমগোত্রীয় ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো সর্বতোভাবে সহায়তা করে। তাঁরা অনেক বই-পুস্তক, প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেন। সভা-সমিতিতে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমে যাঁরা দক্ষিণ এশিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরাও অকাতরে শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল রেস্কু কমিটিও বিশেষ করে শিক্ষকদের সাহায্য করে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহু বিদেশি পণ্ডিত বাঙালিদের দুর্দিনে সাহায্য ও ভরসা দিতে কার্পণ্য করেন নি। ড. আজিজুর রহমান মল্লিকের নেতৃত্বে বাঙালি শিক্ষকরা বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিতি দেয়ার সার্থক উদ্যোগ নেন। শিক্ষকদের অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ড. খান সারওয়ার মুরশিদ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যক্ষ), সৈয়দ আলী আহসান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যক্ষ), ড. মযহারুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যক্ষ)। খ্যাতনামা শিল্পীরা হন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক ও প্রচারক। চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের 'এই জানোয়ারটিকে মারতে হবে' শীর্ষক ইয়াহিয়াকে নিয়ে কার্টুনটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। এই শিল্পী মৃত্যুর মুহূর্তে আর একটি বিখ্যাত কার্টুন আঁকেন ১৯৯০ সালে, যার শিরোনাম ছিল 'বিশ্ব বেহায়া' এবং বিষয় ছিল তদানীন্তন একনায়ক জেনারেল এরশাদ। সাহিত্যিক ও সিনেমা শিল্পী জহির রায়হান ছবির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ

ও বীরত্বগাথা প্রচার করে বেড়ান। বাংলাদেশ বেতারকে প্রাণবন্ত করে রাখেন অনেক শিল্পী—সমর দাস, আবদুল জব্বার, হাসান ইমাম প্রমুখ। সনজীদা খাতুন, মাহমুদুর রহমান বেনু এঁরা গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গীত স্কোয়াড। অধুনা পরিবেশিত 'মুক্তির গান' এঁদেরই কর্মকাণ্ডের ওপর সংগৃহীত। চিত্তরঞ্জন সাহা মুক্তধারা নামে এক প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করে *রক্তাক্ত বাংলা* সঙ্কলন প্রকাশ করলেন। বলা হয় যে, কোনো প্রবাসী সরকার কখনো বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, কবি, শিক্ষক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, চিত্রকর, নাট্যকার, অভিনেতার এমন সমাহার দেখে নি। বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষব্যক্তি ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে শরিক ছিলেন। বাংলাদেশ আমলাতন্ত্রের একটি বিরাট অংশ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতি অল্প ক'টি বাঙালি ইউনিট মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়। শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগ এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ও চারুকলা অঙ্গনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা সবাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক, মুজিবনগর সরকারের কর্মী, নেতা বা সহায়ক।

মুজিবনগরের প্রশাসন যন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে পৌঁছার অনেক আগে থেকেই মুক্ত বাংলাদেশের জন্য পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করে। অবরুদ্ধ যে দেশে দখলদারি সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করাই হচ্ছে রীতি, সেখানে কি করে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে এই প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত জটিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন ছিল বড় সমস্যা। কিন্তু কি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা যাবে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপাদান যোগাড় করা যাবে তা ছিল আর একটি কঠিন সমস্যা। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা ছিল আর এক দুরূহ সমস্যা। বিশেষ করে শহীদদের পরিবারের দেখাশোনা, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীতদের সমাজে পুনর্বাসন এবং পঙ্গুদের সেবাশুশ্রূষা ছিল আর এক অসম্ভব সমস্যা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছিল আর এক চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা, পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা—এই সব বিষয় নিয়ে মুজিবনগর সরকার ছিল অত্যন্ত চিন্তিত। দখলিকৃত এলাকার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পাকিস্তানের সহযোগীদের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তা ছিল আর এক জটিল প্রশ্ন। নভেম্বর মাসেই সরকার এইসব ব্যাপারে মনোযোগ দেয় এবং নানা রকম কার্যক্রম প্রণয়নে হাত দেয়।[৫] মন্ত্রিসভা ১৮ নভেম্বর একটি ব্যাপক সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বিবেচনা করে। নভেম্বরের ২৬ তারিখের মধ্যে বড় মাপের ১০টি সমস্যা নিয়ে প্রশাসন তাদের প্রস্তাব প্রণয়নে লাগে। এই ১০টি বিষয় ছিল ১. রাজনৈতিক কাঠামো, ২. পুলিশ বাহিনী, ৩. শত্রু সম্পত্তি এবং বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি, ৪. মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং নিরস্ত্রীকরণ, ৫. পাকিস্তানি সহযোগী ও আমলাদের জন্য ব্যবস্থা, ৬. জনপ্রশাসন ব্যবস্থা, ৭. ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ৮. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, ৯. বেসামরিক প্রশাসন কাঠামো, ১০. অর্থসংস্থান। মন্ত্রিসভা ৩০ নভেম্বর থেকে এইসব বিষয় বিবেচনা করতে শুরু করে এবং ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিবাহিনীর পুনর্বিন্যাস নিয়ে

গায়ক-গায়িকা, আইনবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী— সব ধরনের লোক ও বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ ক্রমে ক্রমে কলকাতায় গিয়ে ভিড় জমান। পাকিস্তানি দস্যুদের বিশেষ শত্রু ছিলেন এইসব ব্যক্তিবর্গ, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দল আত্মরক্ষার্থে সীমান্ত অতিক্রম করেন। এছাড়াও এই গোষ্ঠীতে ছিলেন স্বাধীন বাংলার জন্য নিবেদিতপ্রাণ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা রণাঙ্গনে বীর সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে গড়ে তুলতে তাঁদের ছিল সবিশেষ অবদান। মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়ে তাঁরা শরণার্থী ও যোদ্ধাদের মনে আশা সঞ্চার করেন। চিত্রকলা ও সিনেমার মাধ্যমে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন আদায় করেন। তাঁদের অনেকে মুজিবনগর সরকারেও বিশেষ ভূমিকা রাখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এপ্রিলের শুরুতেই বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গড়ে উঠেছিল। এর সভাপতি ছিলেন উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী। তাঁরা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পুনর্বাসনে উদ্যোগী ভূমিকা নেন এবং তাঁদের প্রচারকার্যে সুযোগ ও সহায়তা প্রদান করেন। বাঙালিরা 'লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইন্টেলিজেন্সিয়া' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এর সভাপতি ছিলেন ড. এ আর মল্লিক এবং সম্পাদক ছিলেন জহির রায়হান ও ড. বেলায়েত হোসেন। বাঙালি শিক্ষকদের একটি স্বতন্ত্র সংগঠনও গড়ে ওঠে। এর সভাপতিও ছিলেন ড. মল্লিক এবং সাধারণ সম্পাদক হন ড. আনিসুজ্জামান। শিল্পীরা আর একটি প্রতিষ্ঠান মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা স্থাপন করেন, যার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপিকা সন্‌জীদা খাতুন। পরবর্তীকালে আর একটি সংগঠন হয় 'সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির', যার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অজয় রায় এবং সম্পাদক ছিলেন আহমদ ছফা। এঁদের নানা কাজে ভারতীয় সমগোত্রীয় ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো সর্বতোভাবে সহায়তা করে। তাঁরা অনেক বই-পুস্তক, প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেন। সভা-সমিতিতে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমে যাঁরা দক্ষিণ এশিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরাও অকাতরে শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল রেস্কু কমিটিও বিশেষ করে শিক্ষকদের সাহায্য করে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহু বিদেশি পণ্ডিত বাঙালিদের দুর্দিনে সাহায্য ও ভরসা দিতে কার্পণ্য করেন নি। ড. আজিজুর রহমান মল্লিকের নেতৃত্বে বাঙালি শিক্ষকরা বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিতি দেয়ার সার্থক উদ্যোগ নেন। শিক্ষকদের অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ড. খান সারওয়ার মুরশিদ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যক্ষ), সৈয়দ আলী আহসান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যক্ষ), ড. মযহারুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যক্ষ)। খ্যাতনামা শিল্পীরা হন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক ও প্রচারক। চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের 'এই জানোয়ারটিকে মারতে হবে' শীর্ষক ইয়াহিয়াকে নিয়ে কার্টুনটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। এই শিল্পী মৃত্যুর মুহূর্তে আর একটি বিখ্যাত কার্টুন আঁকেন ১৯৯০ সালে, যার শিরোনাম ছিল 'বিশ্ব বেহায়া' এবং বিষয় ছিল তদানীন্তন একনায়ক জেনারেল এরশাদ। সাহিত্যিক ও সিনেমা শিল্পী জহির রায়হান ছবির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ

ও বীরত্বগাথা প্রচার করে বেড়ান। বাংলাদেশ বেতারকে প্রাণবন্ত করে রাখেন অনেক শিল্পী—সমর দাস, আবদুল জব্বার, হাসান ইমাম প্রমুখ। সনজীদা খাতুন, মাহমুদুর রহমান বেনু এঁরা গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গীত স্কোয়াড। অধুনা পরিবেশিত 'মুক্তির গান' এঁদেরই কর্মকাণ্ডের ওপর সংগৃহীত। চিত্তরঞ্জন সাহা মুক্তধারা নামে এক প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করে *রক্তাক্ত বাংলা* সঙ্কলন প্রকাশ করলেন। বলা হয় যে, কোনো প্রবাসী সরকার কখনো বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, কবি, শিক্ষক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, চিত্রকর, নাট্যকার, অভিনেতার এমন সমাহার দেখে নি। বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষব্যক্তি ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে শরিক ছিলেন। বাংলাদেশ আমলাতন্ত্রের একটি বিরাট অংশ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতি অল্প ক'টি বাঙালি ইউনিট মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়। শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগ এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ও চারুকলা অঙ্গনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা সবাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক, মুজিবনগর সরকারের কর্মী, নেতা বা সহায়ক।

মুজিবনগরের প্রশাসন যন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে পৌঁছার অনেক আগে থেকেই মুক্ত বাংলাদেশের জন্য পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করে। অবরুদ্ধ যে দেশে দখলদারি সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করাই হচ্ছে রীতি, সেখানে কি করে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে এই প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত জটিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন ছিল বড় সমস্যা। কিন্তু কি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা যাবে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপাদান যোগাড় করা যাবে তা ছিল আর একটি কঠিন সমস্যা। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা ছিল আর এক দুরূহ সমস্যা। বিশেষ করে শহীদদের পরিবারের দেখাশোনা, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীতদের সমাজে পুনর্বাসন এবং পঙ্গুদের সেবাশুশ্রূষা ছিল আর এক অসম্ভব সমস্যা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছিল আর এক চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা, পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা—এই সব বিষয় নিয়ে মুজিবনগর সরকার ছিল অত্যন্ত চিন্তিত। দখলিকৃত এলাকার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পাকিস্তানের সহযোগীদের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তা ছিল আর এক জটিল প্রশ্ন। নভেম্বর মাসেই সরকার এইসব ব্যাপারে মনোযোগ দেয় এবং নানা রকম কার্যক্রম প্রণয়নে হাত দেয়।[৫] মন্ত্রিসভা ১৮ নভেম্বর একটি ব্যাপক সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বিবেচনা করে। নভেম্বরের ২৬ তারিখের মধ্যে বড় মাপের ১০টি সমস্যা নিয়ে প্রশাসন তাদের প্রস্তাব প্রণয়নে লাগে। এই ১০টি বিষয় ছিল ১. রাজনৈতিক কাঠামো, ২. পুলিশ বাহিনী, ৩. শত্রু সম্পত্তি এবং বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি, ৪. মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং নিরস্ত্রীকরণ, ৫. পাকিস্তানি সহযোগী ও আমলাদের জন্য ব্যবস্থা, ৬. জনপ্রশাসন ব্যবস্থা, ৭. ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ৮. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, ৯. বেসামরিক প্রশাসন কাঠামো, ১০. অর্থসংস্থান। মন্ত্রিসভা ৩০ নভেম্বর থেকে এইসব বিষয় বিবেচনা করতে শুরু করে এবং ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিবাহিনীর পুনর্বিন্যাস নিয়ে

সবচেয়ে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ ও দূরদর্শিতার ফসল হিসেবে যেদিন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলো সেই ১৬ ডিসেম্বর সংস্থাপন সচিব দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর বিস্তৃত নির্দেশমালা জারি করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও মনোবল অব্যাহত রাখার উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল স্বাধীনতা ঘোষণাকে সকলের জন্য বাস্তবায়িত করা। দখলিকৃত বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য শুধু মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট ছিল না। একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল পদদলিত ও অত্যাচারিত জনগণের মনোবল দৃঢ় করা এবং তাদের বুকে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখা। পাকিস্তানিদের বর্বর অত্যাচার এবং হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ মুহূর্তের জন্যও বন্ধ ছিল না। তারা বাঙালিদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে ব্রতী ছিল। তারা দেশের মানসিকতা ও চেহারা পরিবর্তনের কৌশল গ্রহণ করে। অবাঙালিদের একজোট করে তাতে গোঁড়া ও মৌলবাদী বাঙালি কুলাঙ্গারদের শামিল করে তারা সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠন করে। এইসব কমিটিতে সমাজের অনেক নিরীহ, নির্বিরোধী ও গণমান্য ব্যক্তিদেরও যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। সুযোগ-সন্ধানী অনেক দুরাচারী বাঙালিও এই উদ্যোগে সায় দেয়। একই সঙ্গে তারা সমাজের গুণ্ডাপাণ্ডা ও গোঁড়া মৌলবাদীদের নিয়ে রাজাকার এবং আলবদর বাহিনী গঠন করে। বিভিন্ন দাগি আসামি এবং চোর-ডাকাতরাও এই বাহিনীতে যোগ দেয়।[৬] এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় তারা অবাঙালি উপনিবেশ গড়ে তুলতে থাকে। এই রকম দলন নীতি ও নিষ্পেষণের মুখে বাঙালিদের মনোবল জাগরূক রাখা ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এপ্রিল ও মে মাসে পাকিস্তানিদের দর্শনীয় সাফল্য বাঙালিদের খুবই ম্রিয়মাণ ও দুর্বল করে দেয়। মে মাস ছিল আশা ও আত্মবিশ্বাসের সমস্যার সবচেয়ে দুঃসময়। দখলিকৃত বাংলাদেশ হতাশার নিম্নতম গহ্বরে এই সময়ে পতিত হয়। জুনে যদিও মুক্তিযোদ্ধারা কিছু দুঃসাহসিক অভিযান চালায় কিন্তু দেশটি থাকে পাকিস্তানের দখলে এবং পাকিস্তানি অত্যাচার তুঙ্গে থাকে। ভারত এবং অন্যান্য বিশ্ব শক্তি বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো সক্রিয় ভূমিকা না নেয়ায় হতাশা আরো বাড়লো। পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে বলে বাঙালি দুরাশাও সফল হলো না। মধ্য জুন থেকে শুরু করে মধ্য আগস্ট পর্যন্ত বাঙালির মন ছিল আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান। বর্ষায় পাকিস্তানিরা ডুবে মরবে বলে বাঙালি প্রত্যাশা হিসেবে মিললো না, বরং ভরা নদীতে পাকিস্তানি দখল আর অত্যাচার আরো শক্ত হলো। হতাশার দুর্দিনে মনোবলের দৃঢ়তা এলো পাকিস্তানিদেরই প্রচেষ্টায়। দখলদার বাহিনীর অমানুষিক বর্বরতা এবং পাকিস্তানি দস্যুদলের রক্তলোলুপতাই হলো তাদের কাল। এই বর্বরদের প্রতিরোধ করবার স্পৃহা প্রতিটি বাঙালির মনে দিনের পর দিন দৃঢ়তর হলো। শুরুতে অনেক গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা এলে গ্রামবাসী ভয় পেত এবং তাদের আশ্রয় দিতে দ্বিধাবোধ করতো। পাকিস্তানিরা কিন্তু নির্বিচারে সর্বত্র অত্যাচার

করে চললো। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন করে নি বা আশ্রয় দেয় নি তাদেরও ধ্বংস করতে বা মারতে পাকিস্তানিরা পিছপা হলো না। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে আর গেরিলা যুদ্ধে সহায়তা করতে বাঙালিদের আর কোনো দ্বিধা রইলো না। বরং তারা এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সাদর আহ্বান জানালো। ধ্বংস ও মৃত্যু এমন নিত্যদিনকার ব্যাপারে পর্যবসিত হয় যে মানুষের ভীতি আর রইলো না, তারা হয়ে উঠলো বিরুদ্ধবাদী এবং প্রতিরোধকারী। পাকিস্তানিদের হাতে জীবনের দাম এত কম ছিল যে এই জীবনপাতে আর ভয় রইলো না।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৪ মে-তে একটি ১১ দফা নির্দেশমালা জারি করেন। এই ১১ দফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনোবল চাঙ্গা করা এবং তাদের আশ্বস্ত করা।[৭] তিনি যে বিষয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন তা ছিল বিপদে এবং প্রতিকূল অবস্থায় দৃঢ়চিত্ততা, কারণ বিপদ অতিক্রান্ত হবেই। তিনি ঐক্য এবং আশার ওপর জোর দেন। তিনি বাঙালি সরকারি কর্মচারীদের দখলদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেন। তাঁর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, যে সব এলাকায় শত্রুর দখল রয়েছে, সেখানে জনগণের প্রতিনিধির উপদেশে কাজ করা এবং সময়োপযোগী সাবধানতার সঙ্গে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে চলা। সশস্ত্র বা আধাসশস্ত্র বাহিনীর চাকরিরত বা অবসরপ্রাপ্ত সব সক্রিয় ব্যক্তিকে তিনি নিকটস্থ মুক্তিবাহিনী কমান্ডের কাছে কর্তব্যের জন্য হাজিরা দিতে বলেন। তিনি জনগণকে দখলদার বাহিনীর কাছে রাজস্ব বা ট্যাক্স দিতে মানা করেন। যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি বিশেষ করে ইয়াহিয়া জান্তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে বারণ করেন এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানান। যুদ্ধে রত দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে অসুবিধা তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। আমদানিতে অসুবিধা রয়েছে, সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা সহজ নয়। তাই তিনি উপদেশ দেন যে, বেশি করে কৃষি উৎপাদনে জোর দিতে হবে। স্থানীয়ভাবে যেসব দ্রব্য পাওয়া যায় তার ব্যবহারে নজর দিতে হবে এবং কুটির শিল্প চালু রেখে শিল্পদ্রব্যের প্রয়োজন মেটাতে হবে। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের এলাকায় কাজ করতে বলেন এবং সীমান্তের অন্য পারে স্থায়ী বসতি স্থাপনে অনুৎসাহিত করেন। আবার তিনি পাকিস্তানি দোসরদের, দখলদার বাহিনীর সহযোগীদের, চোরাচালানি ও কালোবাজারি ব্যবসায়ীদের, মজুতদার আর অন্যায় মুনাফাখোরিদের দৃঢ়ভাবে সাবধান করে দেন। এইসব নির্দেশ ছিল দখলিকৃত বাংলাদেশের জনগণের প্রতি দিকনির্দেশনা, তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনে আশা জাগরূক রাখা এবং তাদেরকে ভরসা করবার সুযোগ দেয়া। হতাশা ও ব্যর্থতার পরিবেশে তাদের হৃদয়ে দোলা দেয়া ছিল ১১ দফার প্রধান লক্ষ্য।

হতাশাগ্রস্ত দেশবাসীর কাছে সব প্রেরণা ও উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। পাঁচ দিন ক্ষীণ স্বরে চালু থাকার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৩০ মার্চ বন্ধ হয়ে যায়। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার পাকিস্তানি বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটতে হলো। বেতারটি কিন্তু একেবারে বন্ধ হলো না। ১৩ এপ্রিল

রামগড়ের সীমান্তে কালুরঘাটের নিবেদিতপ্রাণ বেতার গোষ্ঠী সেটা আবার চালু করে। মুজিবনগর সরকার পরবর্তী সময়ে এই বেতার কেন্দ্রের ভার নেয়। ২৫ মে'তে ৫০ কিলোওয়াটের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তখন সম্প্রচারের সময়ও বাড়ানো হয়। এই বেতারের বাণী ছিল বাংলাদেশের জনগণের আশার উৎস। মধ্য জুন থেকে যখন গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যের কাহিনী ফলাও করে ঘোষিত হতে থাকলো, মানুষের মনে তখন আশা জাগলো। মাঝেমধ্যে যখন গেরিলা তৎপরতার খবর থাকতো না তখনই শুরু হতো আশা-নিরাশার দোদুল্যমান অবস্থা। কোথাও বোমা ফেটেছে, একটি জাহাজ ডুবেছে, পাকিস্তানি প্লাটুন মরেছে, রাজাকাররা উৎখাত হয়েছে, পুল বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে— এইসব খবরে মানুষের বুক ফুলে উঠতো। মধ্য আগস্টের পর মানুষের আত্মবিশ্বাস এতই বেড়ে যায় যে, পাকিস্তানি দস্যুরা তখন দল না বেঁধে জনতার মোকাবিলায় যেত না অথবা রাজাকাররা সশস্ত্র দল ছাড়া ঘোরাফেরা বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানি সেনাদের মৃতদেহ পরিবহনের ঘটনা থেকে তাদের দুর্বলতা জনতার কাছে ধরা পড়লো। জুনের শেষে খবর পাওয়া গেল যে, দিনে ৫০/৬০ জন সৈন্য হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।[৮] এক মাস পরে মুক্তিবাহিনী ২০০০০ পাকিস্তানিদের নিহত করেছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়লো।[৯] এই সব খবরের সত্যতার নিদর্শন হলো পাকিস্তানি দস্যুবাহিনীর অতি সাবধানতা। তারা রাতে আর প্যাট্রলে বেরোয় না। তারা দল-ছাড়া কোথাও হামলা চালায় না। কোথাও কোথাও তারা বাঙালিদের সমীহ করে চলে। ব্যবহারের এই পরিবর্তন ও নমনীয়তা বাঙালিদের আশা বাড়িয়ে দিল। অক্টোবরে শক্ত অভিযানের কানাঘুষা খুবই জনপ্রিয় হলো। বেতারের উৎসাহমূলক প্রচারণা 'চরমপত্রে'র হাস্য বা ব্যঙ্গরসের পেছনে দৃঢ়তা ও শ্লাঘা মানুষের মনে গভীর দাগ কাটলো। ইতোমধ্যে নানা দেশে বাঙালি কূটনীতিবিদদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে জনগণের মনে হলো যে, পাকিস্তানের ভাঙা নৌকা সবাই ছেড়ে চলছে। বছর শেষ হতে-না-হতে তারা মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো। অবশ্য শঙ্কার কোনো অভাব ছিল না। গেরিলা বাহিনী কি একটি নিয়মিত এবং ব্যাপক ধারায় সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের দখল থেকে বিতাড়িত করতে পারবে? তাদের দুর্বল করা বা নিষ্ক্রিয় করা বা তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করা এক জিনিস আর উচ্ছেদ করা অন্য বিষয়। বেতারের প্রেরণামূলক সম্প্রচারের পর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশা-ভরসার দ্বিতীয় উৎস ছিল গেরিলা তৎপরতা এবং মুক্তিবাহিনীর বিজয়গাথা।

সেপ্টেম্বরে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বাংলাদেশ সরকারকে খুবই উৎকণ্ঠিত করে। মানুষের দুয়ারে খাদ্য পৌছতে হবে সুতরাং তারা খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে খাদ্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য চলাচলও যে স্বাভাবিক হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। আবার খাদ্য বিতরণের মধ্যে জনগণের আনুগত্য আহরণের প্রচেষ্টা যে হবে তাকে রোধ করা সহজ ছিল না। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। অবশেষে তারা একটি মধ্যপথ খুঁজে বের করেন। এই মধ্যপথ তত সন্তোষজনক না হলেও গ্রহণযোগ্য ছিল। তারা জাতিসংঘ

ত্রাণ কার্যক্রমকে খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানালেন। নিরপেক্ষভাবে খাদ্য প্রশাসন পরিচালিত না হলে মুক্তিবাহিনী খাদ্য সরবরাহে বাধা দেবে।[১০] তারা সব দাতাগোষ্ঠীকে মুজিবনগর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহেও আহ্বান জানালেন। কিছু দিনের জন্য খাদ্য সরবরাহ নির্বিবাদে চললো, কিন্তু সামরিক তৎপরতা রোধ করার জন্য কখনো কখনো খাদ্য জাহাজ আক্রমণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যবশত খাদ্য সঙ্কট তত মারাত্মক আকার নিলো না। দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ লোক সীমান্ত অতিক্রম করায় বাংলাদেশে খাদ্যের চাহিদা অনেক কম থাকে। আবহাওয়া ভালো থাকায় চাষ কম হলেও উৎপাদন তত খারাপ হলো না। সর্বোপরি শত্রুশক্তির দখল তত দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় সঙ্কট তেমন ব্যাপক হতে পারলো না। ভারতে শরণার্থীদের ভরণপোষণে আন্তর্জাতিক সাহায্য বেশ সীমিত ছিল। তবে ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের ফলে ভারতে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন হয়। শরণার্থী কেন্দ্রে খাদ্যের অভাব ছিল না এবং যখন তারা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করলো তখন পর্যাপ্ত খাদ্য সাহায্য পাওয়া গেল। শুধু ভারতই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে ৭ লাখ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়।

প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার একটি যথার্থ সরকার হিসেবে কার্যকরী ছিল। সচরাচর প্রবাসী সরকার শুধু যুদ্ধ বা প্রতিরোধ পরিচালনা করে; কিন্তু মুজিবনগর সরকার যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়াও প্রশাসনিক নানা কাজে সাফল্যের পরিচয় রাখে। রাজনৈতিক কোন্দলের কোনো ঘাটতি ছিল না। অনেক কেন্দ্রে শরণার্থীদের কষ্টেরও সীমা ছিল না। নানা বিষয়ে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রবাসী সরকার বাঙালি আমলা, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এঁদের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। মুক্ত এলাকায় প্রশাসন বহাল রাখে। একটি সার্থক প্রচার উদ্যোগ পরিচালনায় সফল হয়। বাংলাদেশে এবং শরণার্থী শিবিরে মানুষের মনোবল বজায় রাখতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ মুক্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়েও মৌলিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয়। বিজয়ের দেড় বছরের মধ্যে এক কোটি শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করে ও পুনর্বাসিত হয়। বিধ্বস্ত অবকাঠামো কোনোমতে ব্যবহারযোগ্য হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। সহিংসতা মোটামুটিভাাবে নিয়ন্ত্রণে থাকে। তিন মাসে সহযোগী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে বিদায় জানানো সম্ভব হয়। বস্তুতই সার্থক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে মুজিবনগর সরকার।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. নুরুল কাদের খান : 'পঁচিশ বছর পরে মুজিবনগর সরকারের প্রশাসন প্রসঙ্গে', *জনকণ্ঠ* ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

২. পরিকল্পনা বোর্ড গঠন ও তার কার্যাবলির বিবরণের জন্য লেখক তিনটি সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন। ১৯৭১ সালে নিজস্ব জ্ঞান এবং সেই সময় ড. নুরুল ইসলাম ও হারুন রশীদের সঙ্গে আলোচনা একটি সূত্র। অন্যটি মঈদুল হাসানের *মূলধারা* '৭১ এবং তৃতীয়টি আনিসুজ্জামানের

প্রকাশিত কলাম 'আমার একাত্তর', *ভোরের কাগজ*, ৪ অক্টোবর, ১৯৯৬।
৩. বি.এন. আহুজা : *The Liberation of Bangladesh*. Varma Brothers, দিল্লি, ১৯৭২, পৃ. ১৩৫।
৪. ডা. টি হোসেন This Week Last Year: *Weekly Freedom*, ঢাকা, ৮ আগস্ট ১৯৭২ এবং বেলাল মোহাম্মদ : *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, পৃ. ২০, ৩২। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার : *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৬৫, ১০৪-১০৯, ১৩৭।
৫. বাংলাদেশ সরকার : *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪১।
৬. *The Times*, ১১ জুলাই, ১৯৭১, লন্ডন, Murray Sale-এর সংবাদ প্রতিবেদন।
৭. ভারত সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : *Bangladesh Documents*, দিল্লি ১৯৭১, পৃ. ৩১৮-৩১৯।
৮. *Evening Star*, ওয়াশিংটন ডি,সি, ২৩ জুন, ১৯৭১।
৯. *The Times* : লন্ডন, ২৩ জুলাই, ১৯৭১।
১০. পূর্বোক্ত, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ

একটি মুক্তিযুদ্ধে শক্তিশালী দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই নানা রণাঙ্গনে করতে হয়। অসংগঠিত শক্তিকে রণাঙ্গনে ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে সহায়ক কর্মকাণ্ড ও সমর্থকের। যে-কোনো মুক্তিযুদ্ধেই সাফল্য এসেছে কিছুটা বৈদেশিক সাহায্যের কারণে। মার্কিন মুলুকের ঐতিহাসিক সাফল্যে ফ্রান্সের অবদান কখনো ভুলবার নয়। যুদ্ধকালে সামরিক সহায়তা ছাড়াও অন্য এক ধরনের সমর্থন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে আর তা হচ্ছে বিশ্বজনমত বা কূটনৈতিক অঙ্গনে সাফল্য। ভারতের সামরিক সহায়তা বাংলাদেশের জন্য ছিল অত্যন্ত জরুরি কিন্তু এই সহায়তাকেও নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমর্থন। পুরোপুরি সমর্থন না পেলেও অন্তত আপত্তি বা আক্রোশকে যদি নমনীয় করা যায় তাতেও অনেক কাজ হয়।

প্রবাসে বাঙালি সংগঠন এবং বিদেশি জনমত

মুক্তিযুদ্ধের নানা অঙ্গনের একটি ছিল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগ। কূটনৈতিক উদ্যোগের বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। সর্বাগ্রে পাকিস্তানকে এক ঘরে করা, তাকে অত্যাচার বন্ধ করতে এবং সমঝোতায় আসতে চাপ প্রয়োগ করা এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের দুর্বল করা ছিল এই উদ্যোগের লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য আহরণ করা ছিল আর একটি উদ্দেশ্য। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক জনমত ছাড়া ভারতের দৃঢ়তর ও ব্যাপক সাহায্য নিশ্চিত করাও সম্ভব ছিল না। শরণার্থীর বোঝা ছিল বিশাল, তার ওপর সামরিক সাহায্য ছিল আরো দুষ্প্রাপ্য এবং কূটনৈতিক সমর্থন ছাড়া ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়া ততো সহজ ছিল না। প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক মঞ্চে বাংলাদেশের কথা বলা এবং সমর্থন আদায় ছিল মুজিবনগর সরকারের লক্ষ্য। ২৭ মার্চ

মেজর জিয়াউর রহমান যুদ্ধ পরিচালনার ঘোষণা দেন, তখনই বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সমর্থন তিনি দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিবৃতিতে ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য অসম যুদ্ধে সারা বিশ্বের সহায়তা চান। লৌকিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে ১৪ এপ্রিল আবার বিশ্বসমর্থন ও কূটনৈতিক স্বীকৃতির আহ্বান জানানো হয়। মুজিবনগরে মন্ত্রিসভার অভিষেক উৎসবে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেন। বাংলাদেশের নির্দিষ্ট দাবি ছিল ১. সামরিক সাহায্য, ২. মানবিক ও ত্রাণ সাহায্য (দখলিকৃত এলাকার বাঙালির জন্য এবং ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীদের জন্য), ৩. পাকিস্তানের জন্য সামরিক সাহায্য স্থগিত এবং ৪. পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ।

যেসব রাজনৈতিক দলের কিছু জনসমর্থন ছিল তাদের সবাই মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়। মৌলবাদী ও ধর্মীয় দল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সব দলই মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন করে। স্মরণ করা যায়, ১৯৭০-৭১-এর নির্বাচনে এই দুটি দলের বাঙালি স্বকীয়তার বিরোধিতার কারণে তারা ২ শতাংশ ভোটও পায় নি। ন্যাপের (মস্কোপন্থী) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ২০ এপ্রিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে অভিনন্দন জানান।[১] তিনি বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে আমরা একমাত্র বৈধ বাংলাদেশ সরকার বলে মনে করি। আমরা সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জাতিকে এই নতুন দেশকে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানাই। আমরা আরো চাই যে একে সারা বিশ্ব নৈতিক ও বাস্তব সমর্থন জানাবে।" স্থানীয়ভাবে ন্যাপের নেতা ও কর্মীরা ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়ে গেছেন। যেমন সিলেটে ন্যাপ নেতা পীর হাবিবুর রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সামনের কাতারে। বগুড়ায় তৎকালীন ন্যাপ নেতা গাজিউল হক একইরকম ভূমিকা পালন করছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বিপুলভাবে তাদের কর্মীদের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাথমিক কিছু অসুবিধার পর দলে দলে ন্যাপ কর্মী বা সমর্থকরা মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হয়। এছাড়া তারা নিজেরাই ছোটখাটো একটি বাহিনী গড়ে তোলে।

চীনাপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অশীতিপর বয়স্ক নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও সীমান্ত অতিক্রম করে রেহাই পান। ২১ এপ্রিল তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১২ জন বিশ্ব নেতার কাছে বাংলাদেশকে সমর্থনের জন্য আবেদন করেন।[২] তাঁর আবেদন যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের কাছে, চীনের চেয়ারম্যান মাও-সেতুং এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর কাছে, সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পডগর্নি, পার্টির মহাসচিব ব্রেজনেভ ও প্রধানমন্ত্রী কসিগিনের কাছে, জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের কাছে, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের কাছে, আরব লীগের মহাসচিব আবদুল খালেক হাসুনার কাছে, আফ্রিকান ঐক্যজোটের মহাসচিব দিয়ালো টেলির কাছে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদুর কাছে, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটো এবং মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের কাছে।

তিনি এঁদের সবাইকে পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আহ্বান করেন এবং বাঙালিদের তাদের ন্যায় যুদ্ধে সমর্থন দিতে আবেদন করেন। পরদিন তিনি বাঙালিদের অস্ত্র ধরতে আহ্বান করে এক সংবাদ বিবৃতি দেন। আবার তিনি বিশ্ববাসীকে বাঙালিদের পাশে এসে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমি চাষী, শ্রমিক, কামার, কুমার, নাইয়া, তাঁতি, দিনমজুর, ব্যবসায়ী, কুটির শিল্পী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং সরকারি বা অন্য কর্মচারীদের সবাইকে নিয়ে ইস্পাত শক্ত ঐক্য গড়ে তুলতে চাই।" মওলানার বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা ও সহযোগী তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি জান্তাকে সমর্থন করে। কিন্তু মওলানা মুক্তিযুদ্ধে একজন দিশারীর ভূমিকা পালন করেন।

ভাসানী ন্যাপের ভিন্নমতাবলম্বী দলও তাদের নিজেদের ধারায় মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে। তোহা ও মতিন গোষ্ঠী চীনা প্রতিক্রিয়াশীলতায় মোটেই বিচলিত ছিলেন না, চীনের পাকিস্তান সমর্থন তাঁরা জায়েজ করে নেন। তবে পাকিস্তানি দস্যুদলেরও তারা বিরোধিতা করেন। পাবনা বা নোয়াখালি এইসব এলাকায় তাঁরা একদিকে পাকিস্তানিদের হত্যা করে, অন্যদিকে স্বাধীনতা সমর্থক বুর্জোয়া গোষ্ঠীকেও নাস্তানাবুদ করে। তাঁরা চায় একটি প্রলম্বিত মুক্তিযুদ্ধ, যাতে শুধু পাকিস্তানি দখলদাররাই নিপাত যাবে না বরং বাঙালি সমাজের বুর্জোয়া গোষ্ঠীও নির্মূল হবে। তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আওয়ামী লীগের তখনকার নেতৃত্ব কোনো মতেই একটি প্রলম্বিত মুক্তিযুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে না। অবশ্য তাঁদের আরো গোষ্ঠী নিজেদের রাস্তা নিজেরা দেখে এবং অনেক এলাকায় পাকিস্তানের সমর্থন করে। কুষ্টিয়ায় আবদুল হক শুধু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেন নি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক বছর পাকিস্তান পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টোর দালালি করে যান। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে এই কুলাঙ্গার তাঁর প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর কাছে অর্থ, সমরাস্ত্র ও যোগাযোগ যন্ত্রপাতির জন্য আবেদন করে।[৩] মনি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ৩ মে-তে ভ্রাতৃসম কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রীদের সমর্থন চেয়ে এক চিঠি লেখে। তাঁরা বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক শক্তিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করতে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান করে।[৪]

সকল রাজনৈতিক দলকে অবশেষে এক মঞ্চে সমবেত করা হয় সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখ।[৫] মওলানা ভাসানীকে নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা এই কমিটির দায়িত্ব। মওলানা ভাসানী হন চীনাপন্থী ন্যাপের প্রতিনিধি, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মস্কোপন্থী ন্যাপের প্রতিনিধি, মণি সিংহ প্রতিনিধিত্ব করেন কমিউনিস্ট পার্টির, আর মনোরঞ্জন ধর হন কংগ্রেস দলের নেতা। আওয়ামী লীগ থেকে ছিলেন দুইজন প্রতিনিধি—মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান। মুজিবনগর সরকারের ছিলেন দুইজন প্রতিনিধি—প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। এই উপদেষ্টা

কমিটি মূলত ছিল প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে গঠিত। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জাতীয় বিষয়, এতে জনগণের কোনো দ্বিমত ছিল না, জাতীয় ঐক্য ছিল এর মূলমন্ত্র। তারই প্রতিফলন হয় সর্বদলীয় ৮ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিতে।

২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার সব দেশের কাছে স্বীকৃতি চেয়ে বার্তা প্রেরণ করে। বাংলাদেশ সরকার সত্যিকারভাবেই জাতীয় ইচ্ছার প্রকাশ ছিল। অন্যদিকে ইয়াহিয়ার জান্তা ছিল স্বশাসিত একটি সেনাবাহিনীর বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী অবৈধ শাসক। তদুপরি স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি আধুনিক জাতির সমুদয় কর্তব্য পালন ও বিধিনিষেধ মানতে প্রতিশ্রুত। বাংলাদেশ এই ঘোষণায় জাতিসংঘের সনদের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। এপ্রিলের শুরুতে প্রকৃত প্রস্তাবে সারা দেশ কয়েকটি শহর বাদে ছিল বাংলাদেশের কর্তৃত্বে। সেই কর্তৃত্ব অবশ্য বাংলাদেশ বজায় রাখতে পারলো না এবং কেবল কয়েক মাস পরে আবার তা বহাল হয়। তবে ৯ মাসের যুদ্ধকালে পাকিস্তানের বাংলাদেশের ওপর দখল কখনো নিরঙ্কুশ ছিল না এবং কখনো সারা দেশে তাদের কর্তৃত্ব ছিল না। বাংলাদেশ তাই দাবি করে যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে পাকিস্তানকেও বাংলাদেশে বৈধ সরকার বলে স্বীকার করা চলবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মাটিতেই শুরু হয়। কিন্তু বাঙালিরা কোনো সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ছিল শক্তিশালী ও সুসজ্জিত। তাই একটি অসম যুদ্ধে কামান-বোমার বিপরীতে বর্শা-লাঠিসোঁটার প্রতিরোধে সহজেই বাঙালিদের পিছপা হতে হলো। উন্মুক্ত ও বিস্তৃত সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে আশ্রয় নিলো। এলাকাভিত্তিক প্রশাসন অথবা সেক্টর কমান্ড সবগুলোরই কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের সীমান্ত এলাকায়। মুজিবনগর সরকারও তার অভিষেকের পরপর ভারতের কলকাতায় প্রধান দফতর স্থাপন করে। ভারতের জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সমর্থন মুক্তিযুদ্ধকে চাঙ্গা রাখে এবং বাঙালিদের খুবই আশান্বিত করে। ভারতীয় জনসাধারণ, প্রবাসী ভারতীয়রা এবং ভারতের নানা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রবাসে ভারতীয় গোষ্ঠী শুধু বাঙালিদের নিয়েই আন্দোলন করে নি বরং অনেক এলাকায় তারাই নেতৃত্ব দেন ও মূল উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেন। ভারতীয় সংসদীয় নানা গোষ্ঠী, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বিশ্ব জনমত গঠনে মূল্যবান অবদান রাখেন।

ভারতে পাকিস্তান দূতাবাস ও কনসুলেট জেনারেলের বাঙালি কূটনীতিবিদ ও অন্য কর্মচারীরা কূটনৈতিক অভিযানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। ৬ এপ্রিল দিল্লিস্থ দূতাবাসের ২ জন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা দ্বিতীয় সচিব কেএম শাহাবুদ্দিন এবং সহকারী প্রেস অ্যাটাশি আমজাদুল হক পাকিস্তান সরকারের জঘন্য হামলার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিচ্ছেন। একটি অনিশ্চিত সময়ে এঁদের অন্যায়ভাবে পাকিস্তানে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁরা এই নির্দেশ মানতে মোটেই রাজি ছিলেন না। তাঁদের প্রতিবাদ ও সাহসী পদক্ষেপ হয় পরবর্তীকালে বাঙালি কর্মকর্তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের দৃঢ় উদ্যোগের দিশারী। বাংলাদেশ সরকারের অভিষেকের পরের

দিন ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তানি কনসুলেট জেনারেল পুরোপুরি বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করে। এই মিশনে প্রায় ৪০ জন বাঙালি কর্মচারী কাজ করতেন। পাকিস্তান সরকার এই মিশনের প্রেস বিভাগ বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সকল কর্মচারীকে পাকিস্তানে ডেকে পাঠায়। এই মিশন পাকিস্তানি বর্বরতার টাটকা খবর সহজেই পেতে থাকে। বাঙালি শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধারা অতিসত্বর কলকাতায় হাজির হয়। ভারতীয় বাঙালিরা এই মিশনের সামনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে সমবেত হয়, এতে শরিক হয় বাংলাদেশের আশ্রয় প্রার্থীরা। কিছু কম বয়সী কর্মকর্তা যথা তৃতীয় সচিব আনওয়ারুল করিম চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম ও মাকসুদ আলী এবং আরো কতক কর্মচারী সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান, একান্ত সচিব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও এম আবদুল হাকিম নিজেরাই ছিলেন বিক্ষুব্ধ। প্রেস বিভাগ বন্ধ করে পাকিস্তান পুঞ্জীভূত অঙ্গারে যেন স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিল। পাকিস্তানের বাঙালি ডেপুটি হাই কমিশনার এম হোসেন আলীর বীরোচিত নেতৃত্বে এবং বেগম আলীর প্ররোচনায় এই মিশনের সমুদয় বাঙালি কর্মচারী একবাক্যে তাঁদের আনুগত্য পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হলেন। বাংলাদেশে বর্বর পাকিস্তানি জান্তা বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। হোসেন আলী ঘোষণা করলেন যে, এই বর্বর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা একেবারেই অনৈতিক ও অসম্ভব। কলকাতা মিশন ঐ দিন থেকেই হয় বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগসূত্র। এই জানালা দিয়েই নয় মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করে। পাকিস্তানের দিল্লিস্থ দূতাবাসে বাঙালি কর্মচারীদের জীবন ছিল দুর্বিষহ, তাঁরা নানা বাধানিষেধে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। অনেক নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে বহু কষ্ট করে পাকিস্তানি বেষ্টনী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে হয়। ৪ অক্টোবর কাউন্সিলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী যেদিন অবশেষে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য পরিবর্তন করলেন, তখন দিল্লির পাকিস্তান মিশনে আর কোনো বাঙালি কর্মচারী অবশিষ্ট থাকলো না। প্রথম সচিব রিয়াজ রহমান ততদিনে ইসলামাবাদে বদলি হয়ে চলে গেছেন।

বৃটেনে ও আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এই দুটি দেশেই ছড়িয়েছিটিয়ে কিছু বাঙালি বসবাস করতেন। কিন্তু যেসব দেশে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য সেখানেও তারা সক্রিয় হয়ে অন্যদের দলে টেনে আনেন। যেমন সিঙ্গাপুরে অধ্যাপক ড. মাহফুজুল হক একটি শক্ত লবি প্রতিষ্ঠা করেন। জাপানে একজন ছাত্র ও বেতার ঘোষক জালাল আহমদের উদ্যোগে একটি বাংলাদেশ বন্ধু সমিতি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের জাপানি সমর্থকরাই তাতে সোচ্চার হন। সুদূর স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় এক আমলের পাকিস্তানি কূটনীতিবিদ আবদুর রাজ্জাক সুইডেনে একটি সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। বৈরুত, প্যারিস বা ব্রাসেল্‌সে পাকিস্তান মিশনের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা দুঃসাহস দেখিয়ে বাংলাদেশ সমর্থনে লিপ্ত হন। ম্যানিলায় পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমানের রশীদ আহমদ, ইস্তাম্বুলে পাকিস্তান সমুদ্রযান সংস্থার জোবায়ের আহমদ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ব্রতী হন।

বৃটেনে কূটনৈতিক অভিযান

বৃটেনের বাঙালিদের কট্টর জাতীয়তাবাদী বলে সুনাম অনেক দিনের। ষাটের দশকের শুরুতেই পাকিস্তানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করতে থাকেন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সূচনার আগেই বাঙালি ছাত্ররা একটি সংগঠিত ও সচেতন শক্তি ছিল এবং আওয়ামী লীগেরও ভালো অবস্থান ছিল।[৬] ঢাকায় সামরিক হামলা তাৎক্ষণিকভাবে বিলাতে বাঙালি মহলে আগুন লাগিয়ে দিল। ২৮ মার্চ বৃটেনের সব এলাকা থেকে বাঙালিরা এসে সমবেত হলো ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিক্ষোভ সভায়। আওয়ামী লীগ নেতা গউস খান এতে নেতৃত্ব দেন। পরের দিন বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি পরিষদ গঠন স্থির করেন এবং প্রত্যন্ত এলাকার কর্ম-কমিটিকে এর অধীনে নিয়ে আসেন। মার্চের মাঝামাঝি অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন কর্ম-কমিটি সর্বত্র গড়ে ওঠে। যুক্তরাজ্যে বাঙালি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিল নানা ধরনের ব্যক্তিবর্গ—ছাত্র, পেশাজীবী, রেস্তরাঁ মালিক, যুবনেতা, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ সব রকমের মানুষ। স্থানীয় নেতারা আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নেন। এদের মধ্যে স্মরণীয় ছিলেন গউস খান, মিরহাজউদ্দিন, তৈয়বুর রহমান, বিএইচ তালুকদার, ওয়ালি আশরাফ, শেখ আবদুল মান্নান, শামসুর রহমান, আবদুল হামিদ এবং আতাউর রহমান খান। লুলু বিলকিস বানু এবং জেবুন্নেসা বখস মেয়েদের সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। লুলু বিলকিস বানু গোটা বাঙালি সমাজের নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। লন্ডনের বাইরে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা রাখেন তাঁরা ছিলেন বার্মিংহামে জগলুল পাশা, আজিজুল হক ভুঁইয়া এবং তোজাম্মেল হক, ম্যানচেস্টারে আবদুল মতিন, মিডল্যান্ডসে মনোয়ার হোসেন এবং ব্র্যাডফোর্ডে মুসব্বির তরফদার। ছাত্ররা ছিল বিশেষভাবে সক্রিয় এবং তাঁদের নেতৃত্বে ছিল অনেক কৃতিৎকর্মা ছাত্রনেতা যথা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং সুলতান শরিফ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বিলেতে পাড়ি দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাকারিয়া খান চৌধুরী, শফিক রেহমান এবং আবদুর রকিব। তসাদ্দুক আহমদ ১৯৫২ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা এবং বাম ও প্রগতিপন্থীদের তিনি একজন দিশারী। তাঁর রেস্তরাঁ গ্যানজেস হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু এবং তিনি হন মুক্তিযুদ্ধের একজন শক্ত সমর্থক। আমির আলী, সাখাওয়াত হোসেন এইসব বামপন্থী চিন্তাবিদ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। লন্ডন বস্তুতপক্ষে ভারতের বাইরে হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কর্মক্ষেত্র।

মার্চ মাসে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী জেনেভায় ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের বৈঠকে। ২৬ মার্চ তিনি লন্ডনে পৌঁছেই বাংলাদেশে সামরিক বর্বর হামলার খোঁজ নিতে শুরু করেন। তিনি সংবাদ মাধ্যম, বাঙালি সমাজ ও বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরে যোগাযোগ করেন। এপ্রিলের শুরুতে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যু হয়েছে। দুটি জাতির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঐক্যকে বর্বর সামরিক হামলা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ১০ এপ্রিল

তিনি বিবিসিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁর ব্রত হলো পাকিস্তানিদের বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়ন এবং তিনি শুধু স্বাধীন বাংলাদেশেই ফিরে যাবেন। পশ্চিমে বিচারপতি চৌধুরীর এই ঘোষণা বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলাদেশের তরফ থেকে কূটনৈতিক অভিযানের সূচনা করে। বাংলাদেশ সরকার ২১ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরীকে তাদের আন্তর্জাতিক দূত হিসেবে নিযুক্তি দেন। পরবর্তীকালে যখন আরো দূত নিযুক্তি হয়, তখন বিচারপতির ওপর দায়িত্ব হয় যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপ এবং একই সঙ্গে তিনি হন জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি। বৃটেনে, আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইউরোপে সর্বত্র বিচারপতি চৌধুরীর সমর্থনে বাঙালি সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে। লন্ডনে তাঁর সহযোগী হিসেবে কয়েকজন যুবকর্মী দায়িত্ব গ্রহণ করেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. এনামুল হক, রাজিউল হাসান রঞ্জু, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং হাবিবুর রহমান। হাবিবুর রহমান পাকিস্তান দূতাবাসে শিক্ষা কর্মকর্তা ছিলেন এবং বাংলাদেশ পক্ষ অবলম্বন করায় তাঁকে ২৭ এপ্রিল বরখাস্ত করা হয়।

বিচারপতি চৌধুরী যুক্তরাজ্যের বিচ্ছিন্ন বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঐক্যের প্রতিভূ ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ২৪ এপ্রিল তাঁরই মধ্যস্থতায় যুক্তরাজ্যের সমুদয় কর্ম-কমিটির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থাপিত হয় একটি স্টিয়ারিং কমিটি। ৮ মে-তে বিভিন্ন কর্ম-কমিটির প্রায় একশ' সভাপতি ও সম্পাদক মিলে প্রতিষ্ঠা করেন যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ তহবিল। এই তহবিল দিয়ে শুধু বিলেতে আন্দোলন পরিচালনাই উদ্দেশ্য ছিল না বরং এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ উদ্যোগ সহায়তা। যুক্তরাজ্যের বাঙালিরা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। লন্ডন এবং অন্যান্য এলাকায় বিক্ষোভ-র‍্যালি, সভা-সমিতির আয়োজন ও অর্থ যোগানোতে এই উদ্যোগে সীমিত থাকে নি। তারা ভারতে মুক্তিযুদ্ধে রত অনেক বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীর ভরণপোষণের ভার নেন। আবার অনেকে ভারতে গিয়ে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, যেমন ডা. জাফরুল্লা সামরিক বাহিনীর সেবা সহায়তায় ব্রতী হন। অনেকে সেখানে শরণার্থী কেন্দ্রে ত্রাণ কাজে সহায়তায় লিপ্ত হন।

যুক্তরাজ্য সংবাদ মাধ্যম, পার্লামেন্ট সদস্য এবং বিশেষ করে সাহায্য ও ত্রাণ সংস্থা মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক সমর্থন প্রদান করে। ত্রাণ সংস্থাদের সমন্বিত পরিষদ 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ' শুধু ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়। হাউস অব কমনসে বাংলাদেশ নিয়ে কয়েকবারই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানি বর্বর হামলার নিন্দা করে। জাতিসংঘের তরফ থেকে উদ্যোগ দাবি করে এবং পাকিস্তানে সবরকম সাহায্য বিরতি চেয়ে পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ হয়। সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব ১৮ জুন ২৫০ জন সদস্যের নামে পেশ করা হয়। ১৯৭১ সালে যে একদল সংসদ সদস্য বাংলাদেশকে সমর্থন করেন, তাঁরা হয়ে যান বাংলাদেশের স্থায়ী বন্ধু। এদের মধ্যে ছিলেন জন স্টোনহাউস, ব্রুস ডগলাস ম্যান, লর্ড ব্রকওয়ে, আর্থার বটমলি, জুডিথ হার্ট, পিটার শোর, ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ, রেজিনাল্ড প্রেন্টিস এবং

জন এন্যালস। সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ছিল একেবারে শুরু থেকে। *ডেইলি টেলিগ্রাফের* সাইমন ড্রিং নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে ঢাকার হত্যা ও ধ্বংসলীলা অবলোকন করে এক লোমহর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ৩০ মার্চ। *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের* মার্টিন এডেনে, *টাইমসের* পিটার হেজেলহার্স্ট ও সারে সেইল, *টেলিগ্রাফের* ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ এবং মার্টিন ওয়ালকট বস্তুতই বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে রূপান্তরিত হন। বাঙালি কূটনীতিবিদদের ভূমিকা ইয়াহিয়া জান্তার বৈধতা নিয়ে বেশ প্রশ্ন উত্থাপন করে। যুক্তরাজ্যে পাকিস্তানি হামলা শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। সেদিন বাঙালি শিক্ষা কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বরখাস্ত হন। ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভায় ১ আগস্ট দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সরকারকে ধিক্কার দিয়ে তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন করেন। আগস্ট মাসেই আরো কূটনীতিবিদ বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। অন্যান্য দেশ থেকে বাঙালি কূটনীতিবিদরা লন্ডনে এসে তাঁদের আনুগত্য সম্বন্ধে ঘোষণা দেন। আগস্টে ইরাকে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ এবং অক্টোবরে আর্জেন্টিনায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমিন লন্ডনে পৌঁছে তাঁদের আনুগত্য পরিবর্তন ঘোষণা করেন। শুধু ডেপুটি হাই কমিশনার সেলিমুজ্জামান ছাড়া লন্ডনে নিযুক্ত সব বাঙালি পাকিস্তান মিশন পরিত্যাগ করেন। সেলিমুজ্জামান পাকিস্তানেই সারা জীবন চাকরি করেন। স্টিয়ারিং কমিটির দফতর ছিল যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। ২৭ আগস্ট পেমব্রিজ গার্ডেনসে বাংলাদেশ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ শেষে যখন হাই কমিশন স্থাপিত হয় সেটাও প্রথমে এই দফতর থেকেই কাজ শুরু করে। বাংলাদেশের বহু সমর্থক লন্ডনেই তাঁদের নানা উদ্যোগের শুরু করতো। ২৬ জুলাইতে লন্ডনে এবং মুজিবনগরে একই সময়ে বাংলাদেশ ডাক টিকিট উন্মোচিত হয়। এক সময়কার বৃটিশ পোস্ট মাস্টার জেনারেল সাংসদ জন স্টোনহাউস এতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। লন্ডনে সত্যি সত্যিই ছিল বাংলাদেশের সমর্থনে মুক্ত কেন্দ্র ও মুক্ত মানসিকতা। এখানেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে ৮ জানুয়ারিতে পদার্পণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীন জনগণের সঙ্গে এখানেই হয় তাঁর প্রথম সংযোগ।

আমেরিকায় কূটনৈতিক তৎপরতা

যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় নিউইয়র্কে।[৭] পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকার সভাপতি তখন ছিলেন কাজী শামসুদ্দিন আহমদ। তাঁরা নির্বাচনের সময় থেকেই খুব সক্রিয় ছিলেন এবং নভেম্বরেই সমিতির নাম বদল করে ইস্ট পাকিস্তান লীগ নামকরণ করেন। মার্চে এই নাম আবার বদলে হয় বাংলাদেশ লীগ। ঘূর্ণিঝড়ের সময়ই তাঁরা জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ মনোভাব। লীগের উপদেষ্টা হন নিউইয়র্কের একজন বাঙালি চিকিৎসক ডা. খন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর।

এছাড়াও স্থায়ী মিশনের উপ-রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আনওয়ারুল করিম এবং ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলীরও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। নিউইয়র্কের বাংলাদেশ লীগ মার্চ মাসে শেখ মুজিবের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার আবেদন করে। সামরিক হামলার পর পরবর্তী নয় মাস সারা আমেরিকায় বাঙালিদের সংগঠিত করতে এবং নেতৃত্ব দিতে নিউইয়র্ক লীগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামরিক হামলার প্রতিবাদে ২৯ মার্চ ওয়াশিংটনে সারা আমেরিকার বাঙালি সমাজ একটি র‍্যালিতে সমবেত হন। কংগ্রেসের সিঁড়িতে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা তহবিলের দপ্তরে আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা সকলের কাছে পাকিস্তানি গণহত্যা বন্ধের দাবি তোলেন এবং বাংলাদেশকে সমর্থন করতে আহ্বান করেন। পাকিস্তান দূতাবাসের গউস আহমদ শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি পাকিস্তানের পতাকা কংগ্রেসের সিঁড়িতে পুড়িয়ে ফেলেন। ১ এপ্রিল মার্কিন মুলুকে প্রথম পাকিস্তানি হামলা হলো গউসের ওপর, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ৮ এপ্রিল বাল্টিমোরে পাকিস্তানি জাহাজ ময়নামতি ও শালিমার থেকে কতিপয় নাবিক পাকিস্তানকে ধিক্কার দিয়ে জাহাজ পরিত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অল্প বয়স্ক ক'জন কর্মকর্তা, জলদিয়া একাডেমি থেকে সদ্য পাস করা সেলিম চিশতি, আবদুল আউয়াল মিন্টু, তাহেরুল ইসলাম, আবুল কাশেম, আনওয়ার হোসেন এবং নজরুল ইসলাম। জাহাজ পরিত্যাগের এই ঐতিহ্য গোটা একাত্তর সাল ধরে অব্যাহত থাকে। বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, মন্ট্রিয়াল, ডোভার, লন্ডন নানা বন্দর থেকে বাঙালি নাবিক প্রতিবাদ করে পাকিস্তানি জাহাজ পরিত্যাগ করেন। এপ্রিলের প্রথম দিনে মার্কিন সিনেটে এডওয়ার্ড কেনেডি এবং ফ্রেড হ্যারিস বাংলাদেশ সঙ্কট নিয়ে বক্তব্য রাখেন। হারভার্ডের কয়েকজন স্বনামধন্য শিক্ষক এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গলিন তখন বাংলাদেশের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে অভিমত দেন যে, পাকিস্তানি অত্যাচার বন্ধ করা দরকার এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় অপরিহার্য। হারভার্ডের গুস্তাভ পাপানেক ও জন টমাস ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাংলাদেশ বায়াফ্রা নয়, এর অভ্যুত্থান রোধ করা যাবে না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রোনাল্ড ইনডেন ও এডওয়ার্ড ডিমক, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম রস, রালফ নিকোলাস, জন ক্রুমফিল্ড এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিওনার্ড গর্ডন এক জোটে আর একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে একই মতামত দেন। রিপাবলিকান দলের চিন্তাকোষ রিপন সোসাইটির হয়ে এইরকম প্রতিবেদন পেশ করেন সভাপতি লি আউসপিজ এবং অধ্যাপক মার্গলিন ও পাপানেক। এই প্রতিবেদনগুলো সূচনালগ্নে বাংলাদেশের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তুলতে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রাখে।

নিউইয়র্কস্থ ভাইস কনসাল মাহমুদ আলীর কার্যকলাপ সরকারের পছন্দ হলো না, বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকার জন্য তাঁকে শাস্তি দেয়া হলো। তাঁকে অন্যায়ভাবে মেয়াদ পূরণের অনেক আগে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠানো হলো। ২৬

এপ্রিল আবুল হাসান মাহমুদ আলী পাকিস্তান সরকারের শ্রাদ্ধ করে সদম্ভে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানি কূটনীতিবিদদের আনুগত্য পরিবর্তনের সূচনা করেন। বোস্টনে ইলেকট্রোনিক্সে অধ্যয়নরত রেজাউল হাসানের ধারণা হলো যে, মুক্তিবাহিনীর জন্য টেলিযোগযোগ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষক রবার্ট রাইনের সহায়তায় এবং লিওনার্ড কাটজের আনুকূল্যে হাসান একশ' ওয়াকিটকি এবং আটটি ট্রান্সমিটার ও রিসিভার সংগ্রহ করেন। প্রায় এক লাখ ডলারের যন্ত্রপাতি হাসান মোট বিশ হাজার ডলারে সংগ্রহ করেন। এ জন্য বোস্টনের মাহবুব আলম ও তৈয়ব মাহতাব এবং ওয়াশিংটনের আবুল মাল আবদুল মুহিত চাঁদা আদায়ে লাগেন। কতিপয় বিশিষ্ট বাঙালি বোস্টনের রেজাউর রহমান ও শিকাগোর বাস্তুকলাবিদ ফজলুর রহমান খান, কয়েকটি বাংলাদেশ সমিতি যথা নিউ ইংল্যান্ড এসোসিয়েশন, মিডওয়েস্ট এসোসিয়েশন, লসএঞ্জেলস লীগ, কানাডার মানিটোবা এসোসিয়েশন এবং নিউইয়র্ক লীগ এতে অর্থ সাহায্য প্রদান করে। হাসান অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেন এবং এগুলো মুজিবনগরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মুহিত। ভারতীয় সাপ্লাই মিশনের সৌজন্যে এই চার টন যন্ত্রপাতি মুহিত, হারুন রশিদ এবং আবদুর রাজ্জাক খান জুন মাসে ওয়াশিংটন থেকে কলকাতায় চালান দেন। বিশ্ব ব্যাংকে ভারতীয় প্রতিনিধি ড. সমর রঞ্জন সেনের সুপারিশে ভারতীয় সাপ্লাই মিশনের সুশীতল ব্যানার্জি এই চালানটি সম্ভব করে তোলেন। জুনের শেষে বোস্টন থেকে তৈয়ব মাহতাব গেলেন মুজিবনগরে এইসব যন্ত্রপাতি খালাস করে এর ব্যবহারে মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে। মাহতাব এক সময় পাকিস্তান কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তা ছিলেন। মুজিবনগরে তাঁর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হলে তাঁকে সেখানে পররাষ্ট্র দফতরে নিযুক্ত করা হয়। মাহতাব দেশ স্বাধীন হলে ঢাকায় যান এবং তারপর বোস্টনে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে আগস্ট মাসে ওহায়োর অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম মুজিবনগরে যান টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পুনর্প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য। রেজাউল হাসান ফিরোজ নিতান্তই এককভাবে একটি জরুরি উদ্যোগ নেন ও সাফল্যের সঙ্গে তা সম্পন্ন করেন। ডেলাওয়ার লীগ একটি পঞ্চাশ কিলোওয়াটের রেডিও ট্রান্সমিশন সেট প্রেরণ করে। নিউইয়র্ক কিছু স্কুবা ডাইভিং যন্ত্রপাতি পাঠানোর চিন্তা নেয়, তবে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয় নি। বেশ কিছুদিন পরে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সেনাধিনায়কের নাম করে সমরাস্ত্র প্রেরণের জন্য একটি অনুরোধ আসে। এতে চাওয়া হয় সব ভারি ও জটিল অস্ত্রশস্ত্র, যেমন মিসাইল, বিমান, রকেট লঞ্চার ইত্যাদি। এইসব যন্ত্রপাতি খরিদ করা এবং রফতানি করা খুব সহজ ছিল না এবং এগুলোকে কীভাবে পৌছাতে হবে সে সম্বন্ধেও কোনো পরিষ্কার দিকনির্দেশনা ছিল না। এইসব যন্ত্রপাতি যোগাড়ের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সীমিত সদস্যের বাঙালি মহলের ছিল না। তবে অনেক অস্ত্র ব্যবসায়ী প্রায়ই বিভিন্ন সূত্রে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব নিয়ে আসতো। এগুলো মূলত ছিল কালোবাজারিদের উদ্যোগ। ইসরাইল থেকে অস্ত্র সরবরাহের কতিপয় প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিন্তু এদের সাহায্য নিতে কোনো বাঙালি সংস্থাই রাজি ছিল না। এইসব প্রস্তাব বোধহয় মুজিবনগর

পর্যন্ত কখনো পৌঁছাতে পারে নি।

আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা মুষ্টিমেয় বাঙালি নিজেদের এবং মার্কিন বন্ধুদের বাংলাদেশের পক্ষে সংগঠিত করতে মনোনিবেশ করেন একেবারে মার্চেই। বোস্টনে মাহবুব আলম (রেথিয়ন কর্পোরেশনে কর্মরত) এবং খোরশেদ আলম (প্রশিক্ষণরত সিএসপি কর্মকর্তা), লসএঞ্জেলেসে শামসুদ্দোহা (প্রয়াত) এবং সিরাজুদ্দিন, নিউজার্সিতে মাজহারুল হক টুনু, ওয়াশিংটনে এনায়েতুর রহিম ও মহসিন সিদ্দিকী, কলেজ স্টেশন টেক্সাসে হাফিজুর রহমান, মন্ট্রিয়ালে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (প্রয়াত), টেনেসিতে মোহাম্মদ ইউনুস ও জিল্লুর রহমান আতাহার, উত্তর ক্যারোলাইনায় আবদুল লতিফ চৌধুরী, ইন্ডিয়ানায় ফজলে বারি মালিক, ওহায়োতে আমিনুল ইসলাম ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য, টরোন্টোতে মিজানুর রহমান, ডেনভারে শের আলী, মিশিগানে মোজাম্মেল হক ও আবদুস শহিদ, সানফ্রানসিসকোতে আমেনা পন্নী, ডেভিসে গোলাম মোস্তাফা এবং ভানকুভারে শাহজাহান কবির বাংলাদেশ লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়াশিংটনে কলেরা রিসার্চ লেবরেটরি গোষ্ঠীর উদ্যোগে একটি বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শুরুতে আনা টেইলর, ডেভিড ন্যালিন, রোনাল্ড ইন্ডেন, রাজ্জাক খান, মহসিন সিদ্দিকী, মোহাম্মদ ইউনুস এবং ফরহাদ ফয়সল এর পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। বাল্টিমোরের ডা. উইলিয়াম গ্রিনো ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং এর নেপথ্য সহায়ক ছিলেন টম ও জোন ডাইন, রবার্ট ও কুইন্সি নর্থরুপ এবং সাবিয়া মুহিত। সেপ্টেম্বরে এই কেন্দ্র ওয়াশিংটনের একটি শ্রেষ্ঠ লবিষ্ট সংস্থা হিসেবে সুনাম আহরণ করে এবং এর দায়িত্বে নিযুক্ত হন দু'জন সহ-পরিচালক ডেভিড ওয়াইজব্রড এবং কায়সার জামান। এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকার মার্কিন ও বাঙালি সমাজের সাহায্য-সহায়তায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি পর্যন্ত কাজ করে যায়। পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করতে এই প্রতিষ্ঠান ছিল নিবেদিত এবং বাংলাদেশের জন্য জনসংযোগ হয় এর ব্রত। ঢাকাস্থ কলেরা রিসার্চ লেবরেটরিতে (অধুনা আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র) যেসব মার্কিন বিজ্ঞানী কোনো না কোনো সময়ে কাজ করেন, তাঁরাই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও সমর্থনে মুখ্য উদ্যোগ নেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নরবার্ট হার্সহর্ন, জন ও কর্নেলিয়া রোডি, রিচার্ড ক্যাশ, জিম টেইলর, জর্জ কারলিন, স্ট্যানলি মুজিক, হেনরি মোজলি এবং লিঙ্কন চেন।

কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গালাগার বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রথম শুনানি আহ্বান করেন ১১ মে তারিখে। তিনি তখন এশিয়া প্রশান্ত এলাকার বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক সাব-কমিটির সভাপতি। রাজ্জাক খান এই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁকে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে ১৭ মে বরখাস্ত করা হয়। এই বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন দূতাবাসের তিনজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী—ফজলুল বারি, মুহিদ চৌধুরী এবং মোশতাক আহমদ। তাঁদেরও অচিরেই বরখাস্ত করা হয়। মে মাসের শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দূত অধ্যাপক রেহমান সোবহান ওয়াশিংটনে আসেন। মাসের শেষে

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্কে আসেন। তাঁদের তৎপরতা বাংলাদেশ সমর্থক গোষ্ঠী সংগঠনে বিশেষ অবদান রাখে। জুনের শুরুতে শিকাগোর বিখ্যাত বাস্তুকলাবিদ ফজলুর রহমান খান সারা আমেরিকায় বাংলাদেশের সমর্থনকে সংহত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। শামসুল বারি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। নিউইয়র্কের বাংলাদেশ লীগ আর শিকাগোর ডিফেন্স লীগই হয় বাঙালি সংগঠনগুলোর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। ফিলাডেলফিয়াতে একই সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে— বৃহত্তর ডেলাওয়ার উপত্যকার বাংলাদেশ লীগ এবং ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল। এরা নানা বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেন। তারা ফিলাডেলফিয়ায় অনেক বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান করেন, পাকিস্তানি অস্ত্রবাহী জাহাজে পিকেটিং করেন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে নানা ধরনের র‍্যালির আয়োজন করেন এবং অনবরত প্রচারপত্র বিলি করেন। অধ্যাপক চার্লস কান ছিলেন এই সমিতির সভাপতি এবং অধ্যাপক ক্লাউস ক্রিপেনডর্ফ, সুলতানা আলম ও রিচার্ড টেইলর ছিলেন এর নিবেদিত নেতৃবৃন্দ। মাজহারুল হক (টুনু) ছিলেন সহযোগী ডেলাওয়ার লীগের সভাপতি।

সিনেটর স্যাক্সবি এবং সিনেটর চার্চ ১০ জুন বৈদেশিক সাহায্য বিলে একটি সংশোধনী পেশ করেন। ওহায়োর রিপাবলিকান সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবিকে তাঁর ছেলের বন্ধু জন রোডির চিঠি খুবই অভিভূত করে। আইডাহোর ডেমোক্রেট সিনেটর ফ্র্যাঙ্ক চার্চ ছিলেন নীতিবান প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের দুর্দশা ও মার্কিন পাকিস্তানপ্রীতি তাঁকে খুবই দোলা দেয়। সংশোধনীতে তাঁরা পাকিস্তানে মার্কিন সরকারের সমুদয় সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব করেন। যতোদিন বাংলাদেশে শান্তি না হবে এবং আশ্রয়প্রার্থীরা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করবে ততোদিন এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। নিউ জার্সির ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গালাগার একইরকম সংশোধনী নিম্ন পরিষদে ১৫ জুন পেশ করেন। এই সংশোধনীর পক্ষে সমর্থন আদায় হয় ওয়াশিংটন তথ্য কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা হলে এই কাজই হয় তাদের অন্যতম কর্তব্য। এই প্রস্তাব উত্থাপনে বিনিশ্চায়ক অবদান রাখেন সি আর এল গোষ্ঠী বিশেষ করে জন ও কর্নেলিয়া রোডি এবং পাকিস্তান দূতাবাসে তখনো কর্মরত আবুল মাল আবদুল মুহিত। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি এতোই রূঢ় ছিলেন যে, অবশেষে তাঁরা তাঁর অর্থনৈতিক কাউন্সিলর পদটি ৩০ জুন বিলুপ্ত করে দেন। (প্রায় মাস ছয়েক পরে তা আবার পুনর্স্থাপন করা হয়)।[৮] মুহিত ৩০ জুনেই বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ধিক্কার দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তাঁর চিঠিতে তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়া সরকারের কোনো বৈধতা নেই বলে তাঁর অধীনে জনপ্রশাসনে থাকা অবাঞ্ছনীয় এবং অভিযোগ করেন, "বাংলাদেশে আপনি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন, সমস্ত মৌলিক অধিকার হরণ করেছেন এবং একটি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত আছেন।" ১ আগস্ট ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এনবিসি) একটি বিশেষ প্রোগ্রামে মুহিত তাঁর প্রতিবাদ প্রচার করেন।

এড নিউম্যান পরিচালিত জাতীয় প্রোগ্রাম 'কমেন্টস'-এ মুহিত কেন ইয়াহিয়া জান্তার চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন তার ব্যাখ্যা দেন এবং বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষের বিষয়ে সবাইকে সচেতন করেন।[৯] পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের মোট ১৫ জন সদস্য মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা ছিলেন; মুহিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ।

অন্যান্য কূটনৈতিক উদ্যোগ

মে মাসে বুদাপেস্টে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের তরফ থেকে সাংসদ আবদুস সামাদ আজাদ অংশগ্রহণ করেন।[১০] বাংলাদেশ সরকার অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান পাকিস্তান দাতাগোষ্ঠী থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধ করার জন্য। তিনি মে মাসে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান এবং দুই দেশেই সাংসদ, সংবাদ মাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক গণসংযোগ পরিচালনা করেন। তাঁকে প্রথমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দূত ঘোষণা করা হয় এবং পরে পূর্ব ইউরোপে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও দেয়া হয়। জুলাই মাসে মুজিবনগর সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন খোলা হবে এবং সকল বাঙালি কূটনীতিবিদকে তাঁরা আনুগত্য পরিবর্তনে আহ্বান জানান। এইসব মিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্যও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় একটি তহবিল গঠন করে। বাঙালি কূটনীতিবিদরা এই ডাকে যথেষ্ট সাড়া দেন। কোনো কোনো দেশে আনুগত্য পরিবর্তনের কোনো সুযোগ ছিল না, যেমন সমাজতান্ত্রিক বা মুসলিম দেশসমূহে। ইতোমধ্যে অবশ্য অনেক কূটনীতিবিদ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাঙালি কর্মচারী যাঁরা বিদেশে কর্মরত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আনুগত্য পরিবর্তন করে মুজিবনগর সরকার অথবা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন। (পরিশিষ্ট ১২-তে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিবিদের আনুগত্য পরিবর্তনের বিবরণ দেয়া হলো।) কূটনীতিবিদদের আনুগত্য পরিবর্তনের একটি বড় মাপের ঘটনা ঘটে ওয়াশিংটনে আগস্ট মাসের চার তারিখ। পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাস এবং জাতিসংঘে স্থায়ী মিশনের সমুদয় বাঙালি কর্মচারী ঐ দিন এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁদের আনুগত্য পরিবর্তন করেন। এই দলে ছিলেন ছয়জন কূটনীতিবিদ— নিউইয়র্কে উপস্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আনওয়ারুল করিম, ওয়াশিংটনে উপ-মিশন প্রধান এনায়েত করিম, ওয়াশিংটনে কাউন্সিলর শাহ এ.এম. শামসুল কিবরিয়া, সৈয়দ আবু রুশদ মতিনউদ্দিন, দ্বিতীয় সচিব আতাউর রহমান চৌধুরী, তৃতীয় সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, দু'জন স্থানীয় অফিসার এ.এম. শরফুল আলম ও শেখ রুস্তম আলী। এনায়েত করিম এই সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের বিশেষ পরিচর্যা কেন্দ্রে ছিলেন এবং তাঁর পরিবার তাঁর হয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। ৪ আগস্ট পাকিস্তানের ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক মিশন বস্তুতই পশ্চিম পাকিস্তানি মিশনে রূপান্তরিত হয়। এই

দলের মুখপাত্র হিসেবে এস. আনওয়ারুল করিম বলেন, "এই আমাদের সিদ্ধান্তের মুহূর্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করতে ব্যস্ত। তাদের প্রতিরোধে আমরা নির্যাতিত বাঙালি জাতির সঙ্গে হাতে হাত মিলাচ্ছি। পাকিস্তানি দস্যুরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে দলন করতে চাচ্ছে। তাই তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার কোনোরকম বৈধতা নেই।"

পৃথিবীর নানা কোণ থেকে বাঙালি কূটনীতিবিদরা বাংলাদেশ সরকারের ডাকে সাড়া দেন। এ বিষয়ে প্রতিটি ঘোষণা সংবাদ মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীকে প্রেরণা যোগায়। কূটনীতিবিদদের এই পদক্ষেপ ছিল ইয়াহিয়া জান্তার বৈধতার ওপর এক মারাত্মক আঘাত। সরাসরি যুদ্ধ শুরুর আগে বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ৩৮ জন কূটনীতিবিদ বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করেন। পরিশিষ্ট-৮-এ তাদের পরিচিতি দেয়া হলো, এঁদের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পদমর্যাদার তিনজন ছিলেন— আর্জেন্টিনার আবদুল মোমেন, ফিলিপাইনসের খুররম খান পন্নী এবং ইরাকের আবুল ফতেহ। ৫ জুলাইতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সাংসদ মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী ওয়াশিংটনে এসে উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধানের দায়িত্ব নেন। আর একজন সাংসদ মোল্লা জালালুদ্দিন যান বৈরুতে, সেখানে একটি উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদকে পাঠানো হয় দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায়। দল বেঁধে কূটনীতিবিদদের আনুগত্য পরিবর্তন ছিল একটা অনন্য ঘটনা। সাধারণত এঁরা রক্ষণশীল এবং অরাজনৈতিক, কোনোরকম রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন না। তাঁদের জন্য সাহস করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ানো এবং দেশে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের বিপন্ন করা ছিল অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ এবং এতেই বোঝা যায় যে, সামরিক বর্বরতা কি অগ্রহণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। *মানচেস্টার গার্ডিয়ান* ৯ আগস্ট ওয়াশিংটনে কূটনীতিবিদদের আনুগত্য পরিবর্তনে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে :[১১]

"আমেরিকায় ১৫জন বাঙালি কূটনীতিবিদ যে আনুগত্য পরিবর্তন করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাতে ক্ষুণ্ন হতে পারেন। যে লোকটি এই সেদিন বৃটিশ টেলিভিশনে বললেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি করে পূর্ব পাকিস্তানকে চেনেন, তাঁর শুধু চামড়াটাই গণ্ডারের নয় তাঁর মাথাটাও তেমনি উর্বর। তাঁর মত কোনোমতেই ফেরানো যাবে না। তবে যদি কিছু অসাধ্য সাধন করতে পারে তা হবে এই কূটনীতিবিদদের সম্মানজনক পদত্যাগ। যে দলটি ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে আনুগত্য পরিবর্তন করলো তাঁরাই শুধু এই কাজটি করছে না, তাঁদের পদক্ষেপ শুধু নাটকীয়। কারণ তারা দল বেঁধে এই কাজটি করেছে। অনেকে ইতোমধ্যে পাকিস্তান থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকেই করবেন।"

"তাঁদের পদক্ষেপ একটি বীরোচিত সাক্ষ্য। সচরাচর কূটনীতিবিদরা সরকারি দলের লোক, তাঁরা মোটেই পদত্যাগ করেন না। তাই যখন তাঁদের পদত্যাগ ঘটে সেটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ববর্তী যে ঘটনার সঙ্গে এর সামান্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা

হলো চেকোস্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার সাঁজোয়া বাহিনীর অভিযানের সময় সেই দেশের কূটনীতিবিদদের পদত্যাগ। তাঁরাও পূর্ব পাকিস্তানিদের মতো একটি অভিযানকে অস্বীকার করতে পারলেন না। তাঁরা নিজেদের জীবন ও সম্মান নিয়ে হলেন বিচলিত ও শঙ্কিত। কারণ অভিযানের পর নিষ্পেষণ অবধারিত। প্রাগ সরকার তখন বলেছিল যে, এঁরা কাপুরুষ যাঁরা বিদেশে আরামের জীবন উপভোগ করবার সুযোগ নিয়েছে। রাওয়ালপিন্ডিও হয়তো এখন এই কথাই বলবে; কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর জীবন কখনো সুখের নয়।"

বাংলাদেশের কূটনৈতিক অভিযানের অন্যতম চাল ছিল পাকিস্তানকে একঘরে করা। যুদ্ধের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের আবেদন জানান। পরবর্তীকালে দাবি করা হলো, অর্থনৈতিক সাহায্যও নিষিদ্ধ করা হোক। জুন মাসে পাকিস্তান দাতা গোষ্ঠী (Aid Consortium) প্যারিসে সমবেত হলে রেহমান সোবহান সেখানে এর বিরুদ্ধে তদবির করতে হাজির হন। সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা তহবিলের বার্ষিক সভায় বাঙালি ও তাদের সমর্থকরা পাকিস্তানে সাহায্য নিষিদ্ধ করার জন্য জোর আন্দোলন করেন। এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ মিশন এবং ওয়াশিংটন তথ্য কেন্দ্র। রেহমান সোবহান, আবুল মাল আবদুল মুহিত, হারুনুর রশিদ এবং অধ্যাপক নুরুল ইসলাম জোর লবি করেন। সভাস্থলে একটি র‍্যালিও অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স কক্ষ থেকে অবৈধ লবির জন্য মুহিতকে একদিন বের করেও দেয়া হয়। বার্ষিক সভা শেষে দাতা গোষ্ঠীর সভায় পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদানের বিষয়টি খুব এগুলো না এবং অক্টোবরে এই বিষয়ে আর কোনো সভাও আহ্বান করা হলো না। মার্কিন সদিচ্ছা সত্ত্বেও দাতাগোষ্ঠী পাকিস্তানকে সাহায্য করতে সারাটি বছর বিরত থাকে।

সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে মনস্থ করে। সে সময়ে কোনো মুক্তিযুদ্ধকামী গোষ্ঠীর জাতিসংঘে কোনো সরকারি স্বীকৃতি অচিন্তনীয় ছিল। তাই বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ছিল 'বেসরকারি দল'। এই দলের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আর এতে ছিলেন আরো ১৫ জন সদস্য। শিক্ষাঙ্গন থেকে ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহান। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ছিলেন চারজন সাংসদ— আবদুস সামাদ আজাদ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, সিরাজুল হক এবং ফণীভূষণ মজুমদার, তিনজন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য—ডা. আসাবুল হক, ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ এবং ড. মফিজ চৌধুরী, ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং পাঁচজন সরকারি কর্মকর্তা— রাষ্ট্রদূত মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ, রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী, সৈয়দ আনওয়ারুল করিম এবং আবুল মাল আবদুল মুহিত। নিউইয়র্ক মিশনের মাহমুদ আলীকে দলপতির অনুরোধে তাঁর সহকারী হিসেবে প্রতিনিধি দলের সদস্য করা হয়। এই প্রতিনিধি দলের সহায়ক হন নিউইয়র্কের মাহবুব হোসেন, জমশেদ রেজা খান, ফারুকুল ইসলাম এবং ওয়াশিংটনের আবদুর রাজ্জাক খান ও ফজলুল বারি।

প্রতিনিধি দল নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, বেশির ভাগ দেশের প্রতিনিধি দল তাদের সঙ্গে দেখা করতে বা আলোচনা করতে ততো সহজে রাজি হতো না। অনেকে খুবই সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন কিন্তু ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত ছিলেন না। পাকিস্তান বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের জাতিসংঘ চত্বর থেকে বহিষ্কারের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। ১ অক্টোবর একটি সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল তাঁদের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করছেন। তাঁরা উপনিবেশবাদের অবসান চাইছেন। তাঁরা গণহত্যা বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর চাইছেন। ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে মোট ৪৭টি প্রতিনিধি দল ১৯৭১ সালের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে বাংলাদেশ নিয়ে কিছু-না-কিছু বক্তব্য রাখে। তার মূল কথা ছিল আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য দান এবং রাজনৈতিক সমঝোতা। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা শুধু জাতিসংঘে বিভিন্ন দল বা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বা তদবির করেই ক্ষান্ত দেন নি, তাঁরা আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। শিক্ষাঙ্গনে, বাংলাদেশ সমিতিতে, বাংলাদেশ বন্ধু সমিতিতে বা গির্জা সম্মেলনে তাঁরা বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার কাজ চালিয়ে যান। বিচারপতি চৌধুরী ও সৈয়দ আবদুস সুলতান বেশি সময় নিউইয়র্কে কাটান এবং নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা শুরু হলে তাঁরা সেখানে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের দাবি তোলেন। তবে সেই সুযোগ তাঁরা পরিষদ কক্ষে কখনো পান নি, যদিও সংবাদ মাধ্যম ও সুশীল সমাজ তাঁদের কথা সাগ্রহে শোনে।

সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ বাংলাদেশের সমর্থনে এগিয়ে আসে। মে মাসে বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনের পর অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশনের সম্মেলন। আগস্টে টরোন্টোতে হয় আর একটি সম্মেলন। অক্টোবরে ওয়াশিংটনে সব বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ডাকে ভিন্ন একটি সম্মেলন। ডেমোক্রেটিক দলের চিন্তাকোষ আমেরিকানস ফর ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন, রিপাবলিকান দলের বিকল্প চিন্তাকোষ রিপন সোসাইটি, হেলসিঙ্কি সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস—এরা সবাই বাংলাদেশের বিষয়টি নিয়ে সারা বছর ধরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের প্রধান দাবি ছিল সামরিক অভিযান ও বর্বরতা বন্ধ করা এবং শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি। তারা পাকিস্তানে সব রকম সাহায্য বন্ধেরও আবেদন করে। বৃটিশ পার্লামেন্ট ও মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের লবি ছিল বস্তুতই শক্তিশালী। শরণার্থীদের সমস্যা ও তাদের জন্য সাহায্যদানের প্রশ্ন সব দেশকেই দোলা দেয়। সহানুভূতি ও সহমর্মিতার একটি কীর্তিমান প্রকাশ ছিল নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ১ আগস্টে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কনসার্ট। পণ্ডিত রবিশঙ্করের আমন্ত্রণে জর্জ হ্যারিসন এবং অন্যান্য পপ গায়ক এই কনসার্টের ব্যবস্থা করেন। এই কনসার্টে আদায়ীকৃত অর্থ এবং কনসার্টটির রেকর্ড-বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বাংলাদেশের দুস্থ জনগণের সাহায্যে ব্যয় হয়। এছাড়াও অনেক ছোট ছোট কনসার্ট বা সঙ্গীত সম্মেলন নানা জায়গায় নানা দেশে অনুষ্ঠিত হয়। রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান, জোয়ান বায়েজ এইসব কনসার্ট করেন। কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশ সারাটি বছর ধরে একটি জটিল কিন্তু জীবন্ত বিষয় হিসেবে অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ সাফল্য লাভ করে এমন সব দেশে, যেখানে কিছু বাঙালির অবস্থান ছিল। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় এইসব বাঙালি গোষ্ঠী ছিল সোচ্চার ও সক্রিয় এবং এইসব দেশে সরকারের সরাসরি সমর্থন না পেলেও বিপুল জনমত বাংলাদেশের পক্ষে গড়ে ওঠে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতেও বুদ্ধিজীবী, সাংসদ, সংবাদ মাধ্যম, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বাংলাদেশ সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি বর্বরতার জন্য এবং শরণার্থীদের দুর্দশার জন্য প্রায় সর্বত্র জনমত ও সংবাদ মাধ্যম বাংলাদেশের সমর্থনে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তাঁর বুদ্ধিদাতা হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন পাকিস্তানের ঘোর এবং অনমনীয় সমর্থক, কিন্তু জনমতের চাপে বিশেষ করে কংগ্রেস ও সংবাদ মাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকার ফলে তাঁরা পাকিস্তানকে খুব একটা সাহায্য করতে পারেন নি। একমাত্র মহাচীন ও মুসলিম রাষ্ট্রগোষ্ঠী পাকিস্তানকে নির্ভেজাল সমর্থন দিয়ে চলে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো মনে করে যে, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের ভাঙন উচিত নয়। মহাচীনের ভারত ও রাশিয়া-বিদ্বেষ, পাকিস্তানপ্রীতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে তারা একটি জনগোষ্ঠীর ন্যায্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে, যদিও পাকিস্তানকে সমর্থনের জন্য সৈন্য প্রেরণে বিরত থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া প্রথমে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে পাকিস্তানকে সমঝোতার জন্য চাপ দেয় কিন্তু পরে ভারতকে সমর্থন দেয়। শেষ মুহূর্তে রাশিয়ার সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানই প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়াতো। রাশিয়ার সমর্থনে যুদ্ধবিরতির আগেই বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ সম্ভব করে তোলে। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর ভয়ে মহাচীন যুদ্ধে অংশ নিতে বিরত থাকে। রাশিয়ার সমর্থনের কারণে নিক্সন-কিসিঞ্জার তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধাতে বিরত হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলে রুশ ভেটোর (পরপর তিনটি) সমর্থন না পেলে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি দস্যুদলের উৎখাত নিশ্চয়ই বিলম্বিত হতো।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. ভারত সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : *Bangladesh Documents,* দিল্লি ১৯৭১, পৃ. ২৯৮-২৯৯।
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০৬।
৩. আবদুল হকের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় স্ট্যানলি ওলপার্ট : *Zulf Bhutto of Pakistan,* Oxford University Press, New York 1993. পৃ. ২৪৮।
৪. ভারত সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : *Bangladesh Document,* দিল্লি ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৩০৭-৩১৭।
৫. বাংলাদেশ মিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কলকাতা, প্রেস রিলিজ ৪৭, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
৬. বিলেতে প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় দুইটি পুস্তকে :
আবদুল মতিন : *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি,* এশিয়া প্রকাশনী, লন্ডন, ১৯৮৯ এবং
আবু সাঈদ চৌধুরী : *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯০।

৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি তৎপরতা ও কূটনৈতিক উদ্যোগের বিবরণের জন্য দেখুন :
আবুল মাল আবদুল মুহিত : *American Response to Bangladesh Liberation War*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯৬।
৮. এই সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উষ্মা লিপিবদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি প্রচারবিদ কুতুবুদ্দিন আজিজ।
কুতুবুদ্দিন আজিজ : *Mission to Washington*, ইউনাইটেড প্রেস পাবলিকেশনস, করাচি, ১৯৭৩, পৃ. ৭৯, ১৩৯, ১৪১, ১৫৯, ১৮০।
৯. আবুল মাল আবদুল মুহিতের জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে চিঠি,ওয়াশিংটন ডিসি, ২১ জুলাই, ১৯৭১। এই চিঠির কিয়দংশ ওয়াশিংন পোস্ট দৈনিকে ১৩ আগস্ট প্রকাশিত হয়।
এনবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্কের ১ আগস্টের সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রাম এড নিউম্যান পরিচালিত *Comments*।
১০. ভারত সরকার পররাষ্ট্র দফতর : *Bangladesh Documents*, দিল্লি ১৯৭১, পৃ. ৬০৩-৬০৪।
১১. *দৈনিক ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান*, লন্ডন, ৯ আগস্ট, ১৯৭১।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কলাকৌশল

পূর্বকথা

পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন মোকাবিলা করতে পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে রাজি ছিল না। তারা আগে থেকেই সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা নিচ্ছিল। "অপারেশন সার্চলাইট" প্রস্তুত ছিল। শুধু কখন তা শুরু করতে হবে সেই সিদ্ধান্তটি ছিল জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে। যুগপৎ অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সারা দেশের সব শহরে আন্দোলন দমন করবার ছিল পরিকল্পনা।[১] ঢাকায় অধিকতর বল প্রয়োগের নির্দেশ ছিল, আর সব আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারের ছিল নীলনকশা। শ্রমিক, ছাত্র এবং ছিন্নমূলদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার ছিল পরিকল্পনা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে যে মুহূর্তে অপারেশন সার্চলাইট শুরু হলো তখনই তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো। অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে অস্ত্রহীন বাঙালিদের ঠাণ্ডা করে দেয়ার হিসাবটিই ভুল ছিল। পাকিস্তানিরা ঠিক করে নিয়েছিল, কোনো বাঙালিকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে দমন করতে হবে, বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করতে হবে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হলো। মান্ধাতার আমলের ৩০৩ রাইফেল উঁচিয়ে উঠলো সাব-মেশিনগান, কামান আর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। পিলখানার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদর দফতরেও ঘটলো একই ঘটনা। সেখানে আবার সে রাতে ছিল বড় খানাপিনা। সেনাপতিরা সেনানীদের আপ্যায়ন করছিলেন। আসলে কিন্তু তাঁদের হত্যা করবারই ছিল ষড়যন্ত্র। প্রতিরোধ করলো নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা, রাস্তা কেটে, ব্যারিকেড গড়ে আর মুহূর্তে বিলীন হয়ে গিয়ে। শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন, কিন্তু আর কোনো নেতা বা কর্মীদের খোঁজ পাকিস্তানিরা পেল না। ঢাকা অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পরে ড. কামাল হোসেনও ধরা দিলেন।

তবে পাকিস্তানিদের সত্যিকার বিপদ ঘনিয়ে উঠলো বিদ্রোহী চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ছিল বিপ্লবী। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেন সশস্ত্র বিপ্লব শুরু

করেন এবং কিছু সময়ের জন্য বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করেন। বৃটিশের দৃষ্টিতে যা ছিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ভারতীয়দের কাছে তা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গৌরবময় অধ্যায়।[২] সেই চট্টগ্রাম এবারেও নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়। ৭২ ঘন্টার ধ্বংসযজ্ঞ ঢাকাকে দমন করে কিন্তু চট্টগ্রামে ব্যাপারটা ততো সহজ ছিল না। চট্টগ্রামে দখল কায়েম করতে ২ এপ্রিল হয়ে যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সরবরাহের সংযোগ পথ। বিমানে ঢাকা আর সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম দিয়ে তাদের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দখল শক্ত করে পাকিস্তানি বাহিনী অন্যান্য শহরের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের লক্ষ্যস্থল হয় জেলা শহর এবং ব্যবসা কেন্দ্র। এপ্রিলের শেষে তাদের দখল মোটামুটিভাবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় অবশ্য দখল ছিল সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিষয়, তারা অবস্থান নিলে দখল আছে, অন্যথায় এলাকা পুরো স্বাধীন। সীমান্ত এলাকায় কতিপয় শক্ত বাঙালি ঘাঁটিতে পাকিস্তান কখনো দখল কায়েম করতে পারে নি। পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞ সক্রিয় রাজনীতিবিদ, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং যুব সম্প্রদায়কে সীমান্তের ওপারে বিতাড়ন করে। সশস্ত্র প্রতিটি বাঙালি যাঁরা মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পান তাঁদের প্রায় সবাই ওপারে চলে যান। ভারতে এইসব বাঙালি অচিরে প্রবাসী সরকার গঠন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যান।

ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য

পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন দমন-কল্পে ইয়াহিয়া জান্তা যা কিছু করে তার মধ্যে যেন আত্মহত্যার বীজ নিহিত ছিল। এরকম আত্মঘাতী পথ কোনো দেশের নেতৃত্ব নিতে পারে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া দাবি করেন, তিনি খোরাসানের সম্রাট নাদির শাহের বংশধর। ঐ অপরিণামদর্শী যোদ্ধা নিজের চেষ্টায় সিংহাসন দখল করেন। ১৭৩৯ সালে তিনি দিল্লি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন এবং সেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার কৃতিত্ব দেখান। ১৭৪৩ সালে তিনি তুর্কিদের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁর বিরামহীন যুদ্ধস্পৃহা এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংসে সীমাহীন আগ্রহ তাঁর সহকর্মীদের সহ্যসীমা অতিক্রম করে। চার বছর যুদ্ধে কোনো বিরতির লক্ষণ দেখতে না পেয়ে তাঁর দেহরক্ষীরা শান্তির স্বার্থে তাঁকে হত্যা করে। নাদির শাহের মতো ইয়াহিয়াও বোধহয় ছিলেন রোমাঞ্চকর জগতের একজন দুর্ভাগা অভিনেতা, বিয়োগান্তক নাটকের মূল চরিত্র। ২৬ মার্চ হত্যাযজ্ঞ শুরু করার প্রায় একদিন পর ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভিযানের প্রথম ঘোষণা দেন। তখনও তিনি বলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর তাঁর লক্ষ্য।[৩] তিনি বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্বহাল হলে পর তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন। ৫ এপ্রিল তিনি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগোর্নিকে লেখা এক চিঠিতে বলেন, প্রথম সুযোগেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের "যুক্তিবাদী এবং নিরীহ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবেন।" এই ঘোষণায়ই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করার জন্য দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন

করেন। তাঁর মতে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে আক্রমণ করেছেন।

কয়েক মাস পরে ইয়াহিয়ার অভিযোগ হলো আরো বিস্তৃত এবং উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। ৫ আগস্ট আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম রচয়িতা সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক তৎপরতার ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, ২৫ মার্চের সশস্ত্র অভিযান ছিল আওয়ামী লীগের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য একটি 'মহৎ' প্রচেষ্টা।[৪] এই কল্পকথা অনুযায়ী ২৬ মার্চ ভোর রাত তিনটায় আওয়ামী লীগ সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা ভারতের সঙ্গে এই ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করে এবং সেনাবাহিনী, সীমান্ত বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও আনসারদের নিয়ে একটি ১৭৫,০০০ বৃহৎ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। এই ঘোষণায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তোলা হয় এবং বলা হয়, অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা আওয়ামী লীগ শুরু করে। দেশ ভাগের এই অভিযোগ সম্বন্ধে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর ২৪ মে তারিখের সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য প্রদান করেন।[৫] তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতারের পরিকল্পনা করে এবং ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দখল করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়। এবারেও কিন্তু তিনি নির্বাচনের রায় মেনে নেয়ার অসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর আগে তিনি "সত্যিকার পাকিস্তানিদের" ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি আবার সেই আহ্বান জানালেন। ১ জুন পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের পরখ করে দেখার জন্য ২০টি কেন্দ্র খুললো।[৬]

২৮ জুন ইয়াহিয়া তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন।[৭] এই পরিকল্পনা বারবার বদলানো হয়। প্রথম পরিবর্তন ঘোষিত হলো ১৮ সেপ্টেম্বর আর দ্বিতীয়টি হলো ১২ অক্টোবর।[৮] তাঁর প্রথম ঘোষণার আগে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা ছিল।[৯] সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে বলা হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মোটামুটিভাবে মেনে নেয়া হবে। ৬ দফা থেকে ৩টি পরিবর্তন করা হবে। প্রথমত, ফেডারেল সরকারের খুব সীমিত হলেও নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকবে। ফেডারেল সরকার বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, তবে দুই অংশের হিস্যা আগেভাগেই নির্ধারিত করে নেয়া হবে অর্থাৎ দুই প্রদেশের পক্ষ থেকে তাদের চুক্তিমতো সাহায্যের জন্য ফেডারেল সরকার অন্য দেশের বা সংস্থার সঙ্গে দেন-দরবার করবে। তৃতীয়ত, দুই প্রদেশ তাদের বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করবে এবং বহির্বাণিজ্যের হিসাব আলাদা থাকবে, তবে প্রদেশের পক্ষ হয়ে ফেডারেল সরকার বাণিজ্য বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে। এইসব সংশোধনী মূলত ছিল মানরক্ষার প্রচেষ্টা। গুজবে আরো প্রকাশ পায় যে, প্রায় ডজন খানেক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে গ্রহণ করা হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বিকল্প আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব গঠনের প্রয়াস চলছিল। সাংসদ মোহাম্মদ জহিরুদ্দিনের নাম উচ্চারিত হয় এবং সোহরাওয়ার্দি কন্যা আখতার

সোলায়মান এই বিষয়ে খুব তৎপর হন। আরো বলা হয়, প্রদেশগুলোকে বিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হতে পারে, তবে অন্তত দুই বছরের জন্য এই অধিকার থাকবে না এবং এই অধিকার গণভোটের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। সবচেয়ে মজার গুজব ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ে। বলা হয় তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নন এবং একজন দেশপ্রেমিক নেতা। তবে তাঁর চারপাশে ছিল সব দুষ্কৃতকারী আর তিনি তাদের চাপে পড়ে বিচ্ছেদের পথে পা দেন। তাই তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে সংলাপ চালানো যেতে পারে। এইসব গুজব মোটামুটিভাবে একটি সমঝোতার সম্ভাবনা ব্যক্ত করে। সমঝোতা নিয়ে কথাবার্তা এবং অনুমান এতোই প্রাধান্য লাভ করে যে, মুজিবনগর সরকারকে এই ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সমঝোতার জন্য চারটি শর্ত বেঁধে দেন, যার মোদ্দা কথা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি। তবে ইয়াহিয়া ২৮ জুন যে বক্তৃতা দিলেন সেখানে সমঝোতার সব অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হলো। কোনোরকম আপোসের লেশমাত্রও তাঁর বক্তব্যে স্থান পেল না।

ইয়াহিয়া বাঙালি সমাজ পাল্টে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই সমাজ থেকে সব হিন্দুকে বিতাড়ন করতে হবে, সব বুদ্ধিজীবীকে নির্বাসিত করতে হবে, সব অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা মুছে ফেলতে হবে এবং প্রতিবাদী সব গোষ্ঠীকে নিশ্চুপ করে দিতে হবে। এই সংস্কারের বাসনা ধর্মীয় উন্মাদনা এবং বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠতাবোধ থেকে উৎসারিত হয়। সংস্কারের কৌশল ছিল খুবই সাদাসিধা, সামরিক হুকুমের মতো সরল। হিন্দুদের বিতাড়ন করো, মেয়েদের ধর্ষণ করো, বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করো এবং বল প্রয়োগে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও হুজুগ সৃষ্টি করো। এই উন্মাদ ও অশ্লীল পরিকল্পনা এমন কি প্রয়োগবাদী পাকিস্তানিদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল। ক্ষমতায় মদমত্ত সামরিক জান্তা বিশ্বাস করতো যে, বাঙালিরা কোনোমতেই সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না এবং তাদের নীলনকশা কার্যকরি হবেই হবে। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, বাঙালি মুসলমানকে ধর্মীয় প্রণোদনায় ভারত-বিদ্বেষী বানাতে বিশেষ সময় লাগবে না এবং মুক্তিযুদ্ধকে অতি সহজেই ভারতীয় আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করে জনগণকে বোঝানো যাবে। তাদের কাছে বাংলাদেশের বিচ্ছেদ ততো অসহনীয় ছিল না, কিন্তু ভারতের সহায়তার সেই বিচ্ছেদের সাফল্য মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না।

জেনারেল ইয়াহিয়ার বাঙালি নিধনযজ্ঞ বস্তুতই ছিল পাকিস্তানের আত্মহত্যার উদ্যোগ। শুরুতে হত্যাযজ্ঞ ঢেকে রাখবার প্রচেষ্টা চলে। বিদেশি সাংবাদিকদের বিতাড়ন করা হয়। দেশে একটি ভীতির রাজ্য কায়েম করে সবাইকে মূক করে দেয়া হয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে অধিকৃত এলাকার সব যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়। একই সঙ্গে বিহারি নিধনের কল্পকথা রচনা করে ধ্বংসলীলার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ঢাকগুড়গুড় নীতি বিসর্জন দিয়ে হত্যা ও ধ্বংসলীলা ঢাকঢোল বাজিয়ে পরিচালনা করা হয়। যে করেই হোক "অবনত জাতি বাঙালি"দের শায়েস্তা করতে হবে। ছাত্র পেলেই হত্যা করতে হবে কারণ তারা মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে। হিন্দুকে হয় মারতে হবে না হয় দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে

হবে। স্বাস্থ্যবান লোকের শেষ রক্তবিন্দু সংগ্রহ করে তাদের নির্জীব দেহ ফেলে দেয়ার কাহিনী *নিউজউইক* ফলাও করে প্রকাশ করে। এই রক্ত আহত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। ধনবান ব্যক্তির বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে তাঁর সম্পত্তি লুট করবার জন্য তাঁকে পরলোকে পাঠিয়ে দিতে হবে। গরিব লোকদের বা তাঁদের বস্তি ধ্বংস করতে হবে, কেননা তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারে। আইন করে বলে দেয়া হয় যে, কোথাও কোনো সাবোটাজ বা সরকার-বিরোধী প্রচেষ্টা হলে নিকটস্থ গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দেয়া হবে। বাঙালি হত্যার জন্য বা বাংলাদেশ ধ্বংসের জন্য যুক্তির কোনো অভাব পাকিস্তানের নাৎসিবাহিনীর ছিল না। ফরাসি সংবাদপত্র *লাঁ ফিগারোর* প্রতিনিধির সঙ্গে ২ সেপ্টেম্বর এক আলাপচারিতায় ইয়াহিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তিনি মন্তব্য করেন, যখন আমার সৈন্যরা মানুষ মারে তখন তারা কোনো কাঁচা কাজ করে না। তারা নিশ্ছিদ্র হত্যাযজ্ঞ চালায় অথবা যুদ্ধ যখন করতে হয় তখন ফুল ছড়ানোর প্রশ্নই উঠে না।[১০] ইয়াহিয়া নিশ্চয়ই এতো নির্বোধ ছিলেন না যে এই কৃতকর্মের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত তাঁর করতে হবে সে বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন না। জেনারেল নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের জন্য তিনি যে নির্দেশ পাঠান তা থেকেই বোঝা যায় সম্ভাব্য আত্মহত্যা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। অবশ্য মার্কিন ও চীন সহায়তায় বিপদে পার পাওয়ার আশা তাঁর সবসময়েই ছিল। ১৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া নিয়াজিকে জানান, "তুমি এমন অবস্থায় আছ যে আর প্রতিরোধের কোনো সুযোগ নেই এবং তাতে কোনো ফায়দাও হবে না। এতে শুধু আরো জীবননাশ ও আরো ধ্বংসলীলা হবে। এখন তোমার উচিত হবে এমন পদক্ষেপ নেয়া যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়, সেনাদের জীবন রক্ষা পায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন এবং আমাদের অনুগত গোষ্ঠী বাঁচতে পারে।"[১১]

ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে যে শুদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাতে হত্যা ও ধ্বংসলীলা ছাড়া দ্বিতীয় প্রধান যে প্রতিক্রিয়া ছিল তা হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অভিনিষ্ক্রমণ। ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যেভাবে পারে দেশ ছেড়ে পাড়ি দেয়। জোয়ান ছেলেমেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য দেশ ছাড়ে। প্রাণের ভয়ে অগণিত বাঙালি অন্যত্র শরণার্থী হয়। জুনের মাঝামাঝিতেই প্রায় ৬০ লাখ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়, বেশ কিছুসংখ্যক দেশত্যাগী বার্মা (বর্তমানের মিয়ানমার) বা অন্যত্র পাড়ি দেয়। এই দেশত্যাগী শরণার্থীর দীর্ঘ সারি ডিসেম্বরে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, মাঝে মাঝে হয়তো প্রবাহ খানিকটা ক্ষীণ হতো। দেশ থেকে পালানোর সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনে হয় যেন পাকিস্তানি দস্যুবাহিনী চাইতো যে তাঁরা দেশটি ছেড়ে গেলেই রক্ষা। সীমান্ত এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা যেন দেশত্যাগের সুযোগ করে দিত। এক সময়ে পশ্চিম থেকে লোক আমদানি করে সীমান্ত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করতেও পাকিস্তান সেনাবাহিনী জোর প্রচেষ্টা চালায়। তারা বাঙালিদের তাড়িয়ে দিতেই ছিল ব্যস্ত। ওপারে চলে গেলে পাকিস্তান তাদের আর নিজস্ব নাগরিক বলে স্বীকার করতো না। একান্তই নির্বোধের মতো

ইয়াহিয়া ও তাঁর সামরিক দোসররা মনে করে যে, বাঙালিদের ভারতে তাড়িয়ে দিয়ে তারা একদিকে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় এবং অন্যদিকে দেশ থেকে দুষ্কৃতকারীদের উচ্ছেদ করে। এদের প্রত্যাবর্তন প্রশ্ন যে একটি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে তাদের কোনো ভাবনাই ছিল না।

শরণার্থী সমস্যা

এতো যে বাঙালি দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল, ইয়াহিয়া তাতে মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিলেন। তিনি কোনো সময়েই স্বীকার করেন নি যে, বিরাট জনসংখ্যা দেশ থেকে পালিয়েছে। ভারতীয় শরণার্থী কেন্দ্রে তাঁর মতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। তাঁদের বেশির ভাগই ছিল, "পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশকারী ভারতের পশ্চিমবাংলাস্থিত পঞ্চম কলামের সদস্য" এবং "কলকাতার গৃহহীন, আশ্রয়হীন বেকার বিরাট জনগোষ্ঠী।"[১২] অক্টোবরে বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে যখন শরণার্থী সংখ্যা ছিল ৯৬ লাখ তখন পাকিস্তান সরকার মনে করতো যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত নাগরিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২ লাখ।[১৩] আন্তর্জাতিক চাপে ইয়াহিয়া বাংলাদেশ এলাকায় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং কয়েকবারই প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাঁর নিজস্ব বক্তব্যে ২১ মে, ২৪ মে, ১৯ জুন ও ৪ সেপ্টেম্বর তিনি শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান।[১৪] পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান সর্বপ্রথম এই সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেন ১০ জুন। তারপর ডা. মালিক গভর্নর নিযুক্ত হলে ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি আবার সেই ঘোষণা দিলেন।[১৫] শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ছিল খুবই জটিল। নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে শরণার্থীরা দেশে ফিরবে না। অথচ পাকিস্তান কোনো সময়েই বাংলাদেশে তাদের হত্যাযজ্ঞ বন্ধের উদ্যোগ নিতে পারছে না। তাই শুধু আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন বজায় রাখার জন্য তারা প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিতে থাকে এবং কয়েকটি স্বাগত শিবির গড়ে তোলে। এইসব শিবিরে কখনো কোনো শরণার্থী ফেরত যায় নি। শুধু বিদেশি পর্যটক এবং সাংবাদিকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য সময়ে সময়ে কিছু গরিব লোককে এনে এইসব শিবিরে সমবেত করা হতো।[১৬] ইয়াহিয়া নিজেই স্বীকার করেন যে, শরণার্থীদের খুব কমই প্রত্যাবর্তন করে। তাঁর সরকারের হিসেবে প্রত্যাবর্তনকারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল মাত্র দুই লাখ।[১৭]

এই মারাত্মক অভিনিষ্ক্রমণের যে প্রক্রিয়া ইয়াহিয়া জান্তা শুরু করে এক হিসেবে তাতেই তারা তাদের পরাজয় নিশ্চিত করে। পূর্ব পাকিস্তানে শুদ্ধি উদ্যোগ ছিল এক মাতালের পাগলামো। ইয়াহিয়ার সামরিক কুশলবিদদের বিশ্বাস ছিল যে, এতো শরণার্থীর চাপে ভারত একটি মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অন্তত একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যাবে আর এতে ভারতের অনেক মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি থেকে দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ হবে। ইয়াহিয়ার দুর্ভাগ্য যে, সে রকম কোনো বিপর্যয় ভারতে হলো না। কিন্তু সেজন্যও ইয়াহিয়ার

কৌশলই মূলত দায়ী। ঢালাওভাবে বাঙালি নিধনের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উচ্ছেদ করে দেয়। যদিও শরণার্থীদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠী কিন্তু পাকিস্তানি দস্যুবাহিনী যে সমভাবে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি নিধনে লিপ্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। সামরিক বাহিনী ও কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বার্থে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণকে হত্যা ও নিষ্পেষণ যে মাত্রায় করে তাতে বাংলাদেশে ও ভারতে সাম্প্রদায়িকতার চিন্তাভাবনাই স্থান পায় নি, বরং বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর প্যাকিস্তানের মুসলমানদের অত্যাচার হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আরো জোরদার করে ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতি আসক্তি আরো বাড়িয়ে দেয়। ধর্মের নামে পাকিস্তানি বর্বরতা এক হিসেবে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ইয়াহিয়ার উন্মাদ বিবেচনায় শরণার্থীর চাপ ছিল ভারতের সঙ্গে শত্রুতার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। প্রায় এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয় দান শুধু রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টিতেই অবদান রাখতে পারতো না বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করতে পারতো। বস্তুত ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে শরণার্থীদের চাপ অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।

পশ্চিমবঙ্গে এই সময় নকশালপন্থীরা খুবই সক্রিয় ছিল এবং সহিংসতা ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল খুব নাজুক। আগরতলা, মেঘালয়, আসামে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কোনো অন্ত ছিল না। আগরতলায় তো শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। মেঘালয়ের নিভৃত পাহাড়ি জীবনে শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ ছিল নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। এইসব এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ছিল সীমিত। শরণার্থীদের অনেকেই স্থানীয় শ্রমজীবীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। শত কড়াকড়ি সত্ত্বেও সব শরণার্থীকে আশ্রয় শিবিরে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হতো না। বহু শরণার্থী আহত ও রোগগ্রস্ত অবস্থায় দেশ থেকে পাড়ি দেয়। তাদের দেখাশোনা বা চিকিৎসা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এইসব রাজ্যে ছিল না। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে শুরু হলো কলেরা মড়ক। সৌভাগ্যবশত ঢাকার কলেরা গবেষণা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভাবিত লবণগুড় নিরাময় পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে এই সর্বনাশা ব্যাধি রোধ করা সম্ভব হলো। শরণার্থী শিবিরে ব্যবহৃত এই ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির বহুল প্রচলন কিন্তু হয় আরো এক দশক পরে। কলেরা হাজার হাজার মা ও শিশুর জীবন সংহার করে এবং শরণার্থীদের দুরবস্থার প্রতি বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯ মে জাতিসংঘের মহাসচিব শরণার্থীদের ত্রাণকাজে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। নানা দেশ থেকে অনেক বেসরকারি ত্রাণ সংস্থা শরণার্থী শিবিরে সাহায্যের নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতো শরণার্থীর জন্য আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, সেখানে তাদের স্রেফ খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই হয়ে দাঁড়ায় এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। শুধু প্রশাসনিক সমস্যাই ছিল পর্বতপ্রমাণ। ভারত সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করে। প্রত্যেক সীমান্ত জেলায় এ বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার লিয়াজোঁ অফিস

খোলে এবং বাঙালি প্রশাসক, রাজনীতিবিদ ও যুব নেতারা নানাভাবে এই কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। শরণার্থীদের দেশমুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং দেশের সুনাম রক্ষার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, শরণার্থী শিবিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ব্যবস্থাপনাকে সহনীয় করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক কোটি শরণার্থীকে অন্যথায় আট মাসব্যাপী ভরণপোষণ ও পরিচালনা করা মোটেই সম্ভব হতো না।

ভারত সরকার শরণার্থী সমস্যার মোকাবিলা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকারের মোট খরচ হয় প্রায় ৩৫০ কোটি রুপি এবং এতে মোট আন্তর্জাতিক সাহায্য মিলে ১৮ কোটি মার্কিন ডলার বা ১৩০ কোটি রুপি।[১৮] জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশন, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শরণার্থী কেন্দ্রে নানা ধরনের সাহায্য প্রদান করে। বেসরকারি সংস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বানে যে আন্তর্জাতিক সাহায্য মিলে তা ছিল মাত্র ২১.৫ কোটি মার্কিন ডলার। শরণার্থী শিবিরে কলেরা সঙ্কট উত্তরণ করার পর প্রধান বিষয় ছিল দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ। এতো লোকের চাপে নিকটস্থ এলাকায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছিল ও কর্মসংস্থানের সমস্যা ছিল। সৌভাগ্যবশত ১৯৭১ সালেই ভারতে সর্বপ্রথম খাদ্যশস্যের ফলনে উদ্বৃত্তের দেখা মিলে।

ভারতে ১৯৬৫-৬৬ সালে যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয় তা থেকে উত্তরণ পেতে প্রায় পাঁচ বছর লেগে যায়। ১৯৭১ সালে সবুজ বিপ্লবের সাফল্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন ৯ কোটি টনের হিসেব পেরিয়ে প্রায় ১১ কোটি টনে পৌঁছে। শরণার্থী শিবিরে তাই খাদ্যাভাব কখনো পরিলক্ষিত হয় নি। পুষ্টির অভাব নিশ্চয়ই ছিল। স্বাস্থ্য রক্ষা বা পড়াশোনার ব্যবস্থা মোটেও সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু নয় মাসের মাথায় শিবিরগুলো গুটিয়ে নেয়ার ফলে বড় রকমের কোনো সামাজিক বিপত্তি ঘটে নি।

পাকিস্তানের সমস্ত হিসেবটাই ছিল ভুল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার পালে হাওয়া লাগলো। শরণার্থী শিবিরে উচ্ছৃঙ্খলা এবং অস্থিরতার পরিবর্তে নিয়মানুবর্তিতা তাদের হিসেবে ছিল না। কলেরা মড়ক এত সহজে রোধ করা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় নি। দুর্ভিক্ষের দেশ ভারতে খাদ্যাভাব হবে না সেটা ভাবাও যায় নি। লাখ লাখ বাঙালির অভিনিষ্ক্রমণ যে তাদেরই হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেই চিন্তা পাকিস্তানিদের মাথায় আসে নি। শরণার্থী শিবিরে যে অগণিত মুক্তিযোদ্ধার জন্ম হবে তাও তাদের বিবেচনায় আসে নি। ইয়াহিয়া শরণার্থীদের ঠেলে দিয়ে ভারতের অনর্থ সাধন করতে চেয়েছিলেন। এতো শরণার্থীকে পুনর্বাসন করতে যাওয়ার চেয়ে তাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থায় জোর দেয়া যে কম কষ্ট, সময় ও অর্থ সাপেক্ষ সেই বিবেচনা তাঁর জান্তা মোটেই করে নি।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি শান্তি প্রক্রিয়া

ইয়াহিয়া জান্তা বাংলাদেশে পাকিস্তানি উপনিবেশ সৃষ্টিতে মত্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভারত থেকে আগত একটি শরণার্থী গোষ্ঠী ভারত বিভাগের সময় থেকেই বসতি স্থাপন

করে। কিছু জায়গায় তথা ঢাকা (মোহাম্মদপুর-মিরপুর) এলাকা, চট্টগ্রাম (আগ্রাবাদ ও রেলওয়ে কলোনি), ময়মনসিংহ রেলওয়ে কলোনি, সৈয়দপুর ও পার্বতীপুর রেলওয়ে কলোনি এলাকা ও ঈশ্বরদী এলাকায় তাদের অনেকেই বাস করতো। তারা সবসময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো এবং স্থানীয় সমাজের সঙ্গে একীভূত হওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই কখনো নেয় নি। বাংলাদেশে তারা উর্দু বিদ্যালয়ের দাবি করতো এবং তাদের আনুগত্য সবসময়ই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি ছিল। পাকিস্তানি জান্তা এবারে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিল এবং বাঙালি নিধনে দিল অবাধ অধিকার।[১৯] তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিযুক্তি দেয়া হলো এবং ঐসব এলাকায় বসতির ব্যবস্থা করা হলো। একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শ্রমিক আমদানি করা হলো। বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, লবণগোলা, পাটকল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজে লাগানো হলো। সীমান্ত এলাকায় তাদের কোনো কোনো গোষ্ঠীকে বসতি স্থাপনে লাগানো হলো। বাঙালি সমাজে এরা হবে পথনির্দেশক এবং দুষ্কৃতকারীদের এরা ঠেকাবে। এ ছাড়াও এই সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হাতে বাঙালিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, দোকানপাট, ব্যবসাবাণিজ্য সোপর্দ করা হলো। পুলিশ ও বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীতে এদের প্রচুর হারে নিয়োগ করা হলো। যদিও এরা ভারতের বিভিন্ন এলাকার লোক ছিল, তাদের সাধারণ পরিচিতি ছিল বিহারি নামে। বিহারিরা ইয়াহিয়ার আদরে হয়ে উঠলো তাদের একমাত্র অনুগত ও বিশ্বাসী গোষ্ঠী এবং এদের অত্যাচারে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হলো পাকিস্তানের শত্রু।

১৯৫৮ সাল থেকে প্রাদেশিক প্রশাসন মোটামুটিভাবে বাঙালিদের কর্তৃত্বে ছিল। এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে পাকিস্তান থেকে লোক নিয়ে আসা হলো। বাঙালি মুখ্য সচিব শফিউল আজমকে কেন্দ্রে বদলি করে সিন্ধু প্রদেশের মুজফফর হোসেনকে মুখ্য সচিব করে নিয়ে আসা হলো। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল বাঙালি তসলিমুদ্দিন আহমদকে অবসরে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হলো পাঞ্জাবি কর্মকর্তা এ কে চৌধুরীকে। শিক্ষা, তথ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিশনার হিসেবে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের আমদানি করা হলো। রাস্তাঘাট বা বিভিন্ন এলাকা বা দালানকোঠার বাঙালি নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তানি নাম প্রদান করা হলো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দস্যুদের নামে বসতি বা রাস্তাঘাটের নামকরণ হলো। সর্বজন ঘৃণিত টিক্কা-নিয়াজি এসব সেনানায়কের নামে রাস্তা বা এলাকার নাম রাখা হলো। বাঙালিদের ঘোরাফেরার স্বাধীনতা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হলো। ট্রেনে বা জাহাজে, বিমানে বা বাসে কোথাও যেতে গেলে সামরিক কর্তৃপক্ষের হুকুম লাগে। ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র ছাড়া কারো পক্ষে ঘরের বাইরে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক। অনেক সময় অশিক্ষিত সৈন্য পরিচয়পত্র থাকলেও গুলি করতে দ্বিধা বোধ করতো না। কত বাঙালিকে হত্যা করতে পেরেছে এ নিয়েই ছিল পাকিস্তানি সৈন্য এবং সেনাপতিদের বাহাদুরি। ঔপনিবেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এমন নির্লজ্জ উদ্যোগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর কোথাও এমনভাবে ঘটেছে বলে জানা নেই।*

*একমাত্র চেচনিয়াতে বর্তমানে রাশিয়ার উদ্যোগ এর সাথে তুলনীয় হতে পারে।

শান্তি উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হয় ১০ এপ্রিল নানা জায়গায় শান্তি কমিটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এইসব কমিটিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে দুইটি বিশেষ গোষ্ঠী—বিহারি এবং মৌলবাদী জামাত গোষ্ঠী। সমাজের কিছু নিরীহ গণ্যমান্য ব্যক্তিকেও এইসব কমিটিতে জোর করে সম্পৃক্ত করা হয়। রাজনৈতিকভাবে গোলাম আজমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের গোষ্ঠী বিশেষ (কাজী কাদের, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খাজা খয়রুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ) পাকিস্তানি পাণ্ডাদের দোসর ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য রাজাকার নামে একটি স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনীতে বিহারি, মৌলবাদী গুণ্ডা এবং সমাজের চিহ্নিত বদমায়েশ ও চোর-ডাকাতদের সমবেত করে সকল ধরনের সমাজবিরোধী কাজে নিযুক্ত করা হয়।[২০] এদের অন্যতম কর্তব্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়কদের খুঁজে বের করে পাকিস্তানি দস্যুদের হাতে তুলে দেয়া এবং তাদের পাকিস্তানি কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য লুটপাট ও ডাকাতি করা এবং যুবতী মেয়েদের বন্দি করা। রাজাকারদের নেতৃবৃন্দ এবং কতিপয় শান্তি কমিটির সদস্য নিজেরা বাঙালিদের হত্যালীলায় সবিশেষ ভূমিকা রাখে। এইসব কুলাঙ্গারের অনেকেই সমাজে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। জামায়াতে ইসলামী নিজেদের সন্ত্রাসী বাহিনী আলবদর এবং আলশামস পাকিস্তানি দস্যুবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে তোলে। জুলাই মাসে এই তিন বাহিনীর কলেবর ছিল ৪০,০০০ সন্ত্রাসী। আলবদর ও আলশামসের প্রধান কর্তব্য ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং পেশাজীবীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিধন করা। গোলাম আজম এই ব্যাপারে নীলনকশা প্রণয়ন করেন এবং বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হলেও যাতে সুচারুভাবে পরিচালিত না হতে পারে তার জন্য এই হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করেন।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিশ্চিহ্ন করবার কার্যক্রমও ইয়াহিয়া জান্তা গ্রহণ করে। তাদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল শিক্ষাব্যবস্থা ও ভাষা নিয়ে। বাংলা হরফের পরিবর্তে উর্দু হরফ ব্যবহার করা, উর্দু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে হিন্দু বিদ্বেষ ও পশ্চিম পাকিস্তানি ঐতিহ্যের প্রচার নিশ্চিত করা—এইসব উদ্ভট ধারণা উপস্থাপনার মূল কৃতিত্ব ছিল জামায়াতে ইসলামী ও শান্তি কমিটিগুলোর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পকালে যে হারে বাঙালি মহিলাদের ধর্ষণ করা হয় তা একান্তই নজিরবিহীন। এই বিষয়েও পাকিস্তানি দস্যুদের একটি উন্মাদ ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশে তারা এক নতুন গোষ্ঠীর জন্ম দেবে, যারা ধ্যানধারণায় আর বাঙালি থাকবে না। পাকিস্তানি জান্তার প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের সম্পদ। টিক্কা খান বলতেন যে, বাঙালি জনগোষ্ঠী থাকলো কি না তাতে তার আসে যায় না, দেশের উর্বরা মাটিতে দখল বজায় রাখাটাই মোদ্দা কথা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানি করে পাকিস্তানের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ।[২১] একান্তই ভারসাম্যহীন না হলে কোনো জান্তা যে এভাবে একটি দেশ দখলে রাখবার চিন্তা করতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না।

ইয়াহিয়া ২৮ জুন তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন,

তিনি অচিরেই যুক্তিবাদী বাঙালি নেতৃত্বের সঙ্গে সংলাপে রত হবেন। তিনি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়ে কোনো নতুন দিকনির্দেশনা দিতে বিরত থাকেন, শুধু কথার কচকচি করেন এবং ১৯৭০-এর Legal Framework Order-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি ৬ দফা নিয়ে কোনো মন্তব্যই করলেন না। তিনি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্তির কথা বললেন। এদের প্রণীত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে তিনি আবার জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদকে কার্যকরী করবেন। এইসব পরিষদ সামরিক শাসনের অধীনে কাজ করবে। কতদিন এই সামরিক শাসনের আবরণ বজায় থাকবে সে সম্বন্ধে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ঘোষণা দিলেন না। তিনি আরো জানালেন যে, নির্বাচিত দুষ্কৃতকারীদের একটি ফর্দ তিনি অচিরে ঘোষণা করবেন এবং তাঁদের আসনে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগ চিরতরে নিষিদ্ধ হলো। তবে এই দলের যেসব সদস্য বহাল থাকবেন তাঁদের অন্য দলে যোগ দিতে হবে। তিনি হিসেব দিলেন যে, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সরকার গঠনে আরো প্রায় চার মাস লাগবে। এই ঘোষণায় কোনো রকম সমঝোতার সুযোগই ছিল না। এবং বাংলাদেশের প্রধান দাবি স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কোনো অঙ্গীকারই ছিল না। বরং দেখা গেল যে, সামরিক জান্তা ক্ষমতা ছাড়তে মোটেই প্রস্তুত নয় এবং বাংলাদেশে উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। অবশ্য চার মাসের সময়সীমা পালনে ইয়াহিয়া ব্যর্থ হলেন এবং ১২ অক্টোবর নতুন ঘোষণা দিলেন। এবারে তাঁর পরিকল্পনা হলো ডিসেম্বরের শেষে তথাকথিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন। এই সরকারে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন আর কে উপপ্রধানমন্ত্রী হবেন এবং কার কোন্ দায়িত্ব হবে তা সবই ইয়াহিয়া জান্তা নির্ধারণ করে দেবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, ইয়াহিয়ার এই রকম উদ্ভট ও অবান্তর পরিকল্পনা নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এইসব ঘোষণার ফলে আলোচনার ভিত্তিতে দেশবিভাগের সামান্যতম সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হলো। এবং গেরিলা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী সম্মুখ সমরে যে পাকিস্তানি দস্যুবাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হবে তার আর কোনো বিকল্প রইলো না।

ইয়াহিয়ার মিথ্যাচার

২৮ জুন জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার নীলনকশা ঘোষণা করেন। সপ্তাহ যেতে-না-যেতে তাঁর গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান জেনারেল আকবর ৫ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের ওপর সরকারি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। এতে দেখা গেল যে, জান্তা খুবই যুদ্ধংদেহি অবস্থান নিয়েছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুটো গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরা হলো। তারা গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং তারা বিহারিদের গণহত্যা সাধন করেছে। এই মনোভাবের প্রতিফলন হলো দুষ্কৃতকারীদের ফর্দ ঘোষণায়। আওয়ামী লীগের ৭৯ জন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং ১৯৫ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকে শুধু আসনচ্যুত করা হলো না, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দেশদ্রোহিতা মামলা রুজু করা হলো।[২২] একই সঙ্গে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের অনেক কর্মকর্তার

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হলো। সর্বোপরি তাদের হাতে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে গোপন আদালতে দেশদ্রোহিতার মামলা শুরু করা হলো। শ্বেতপত্রের দুটি অভিযোগই বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। বিদ্রোহী বাহিনীর হিসাবটি বস্তুতই আকাশকুসুম কল্পনা। ১৭৫,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী একাত্তরের ডিসেম্বরও গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় নি। বাংলাদেশে আনসারের মোট সংখ্যা তখন ছিল এক লাখ এবং গোটা পুলিশ বাহিনীর কলেবর ছিল ৩০ হাজার। সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সীমান্ত বাহিনীতে মোট বাঙালি হয়তো ছিল আরো ১২ হাজার। পুলিশ বাহিনীর মাত্র ১০ হাজার ছিল সশস্ত্র ইউনিটের সদস্য। আনসারদের প্রশিক্ষণ যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ছিল না এবং তাদের কাছে কোনো সময়েই অস্ত্র সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র উদ্যোগ শুধু যুবদলের কুচকাওয়াজ এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য-সামন্তের বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২৫ মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে যখন যুবনেতারা ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সাহায্য চায়, তখন তারা কোনো সাহায্যই পায় নি। রাইফেল এবং গ্রেনেড পেতেই লাগে কয়েক সপ্তাহ। শ্বেতপত্রের হিসেবে সকাল তিনটায় বিদ্রোহের পরিকল্পনা ছিল অথচ রাত বারোটায় যখন পাকিস্তানি হায়েনারা আক্রমণ করলো, তখন বিদ্রোহীরা ছিল অপ্রস্তুত, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ছিল নিদ্রিত। ইয়াহিয়ার পলায়নের খবর পাওয়া যায় ২৫ মার্চ সন্ধ্যাবেলা এবং তখন থেকেই নেতৃবর্গ ও সক্রিয় কর্মীরা গা ঢাকা দিতে শুরু করেন। কিন্তু সশস্ত্র বাঙালিরা—পুলিশ, সীমান্তরক্ষী, সেনাবাহিনীর সদস্য কেউই পালানো তো দূরের কথা আত্মরক্ষারই কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। আর সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা হলো যে, বিদ্রোহের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর নিজস্ব গৃহে পাকিস্তানিদের হাতে ধরা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, যশোর সর্বত্র বাঙালি সৈন্যরা আক্রান্ত হওয়ার পরই বিদ্রোহ করে। একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা ছিল অথচ এক সশস্ত্র ইউনিটের সঙ্গে অন্য ইউনিটের কোনো যোগাযোগ ছিল না, বিভিন্ন এলাকায় বাঙালি প্রতিরোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্পূর্ণ অসমন্বিত।

শ্বেতপত্রে বলা হয় যে, চট্টগ্রামের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এম. আর. মজুমদার ছিলেন বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক। অথচ বিদ্রোহের নির্ধারিত সময়ের ৩৬ ঘণ্টা আগে তিনি পাকিস্তানি সেনানায়কদের সঙ্গে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। আরো মজার ব্যাপার হলো যে, ১ মার্চ থেকে সারা দেশ মোটামুটিভাবে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই সময়ে তারা বিদ্রোহ না করে ইয়াহিয়ার আগমনের অপেক্ষায় ছিল। মার্চের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে সৈন্য ও অফিসারের সংখ্যা অনেক কম ছিল, তাদের হাতে রসদ ছিল যৎসামান্য, সারা মার্চ জুড়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য, অফিসার এবং রসদ আসতে থাকে। এ সম্বন্ধে সকলেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই অবস্থায় বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়াকে পূর্ব পাকিস্তানে এসে সংলাপে বসতে আহ্বান করেন। বিদ্রোহের পরিকল্পনা থাকলে এ রকম পদক্ষেপ নেয়া শুধু বেওকুফের পক্ষেই সম্ভব। ইয়াহিয়া তাঁকে গ্রেফতার করার যে রূপকথা রচনা করেন তা খুবই চমকপ্রদ। সীমান্ত বাহিনীর লোকেরা

তাঁকে বন্দি করতে চেয়েছিল, অথচ ঢাকায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সেনাধিনায়ক ছিলেন তাঁর লোক এবং সেনাবাহিনী ছিল সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা একান্তই জেনারেল আকবরের কল্পনাপ্রসূত। ঐ লোকটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কাহিনীও রচনা করেছিল। এবং এই জন্যই বোধহয় উপসংহারে বলা হয়, আগরতলা মামলায় যে ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করা হয় এবারে তারই পুরোপুরি বিকাশ হয়েছে।[২৩] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা। তাঁর সাহস ও শক্তির উৎস ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমর্থন ও ঐকমত্য। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের জন্য কোনো সামরিক প্রস্তুতি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ছিল না। পাকিস্তানের নির্বুদ্ধিতা ও নৃশংসতাই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে। এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা না করে কোনো গত্যন্তর ছিল না এবং এই সহায়তা ছাড়া এতো অল্প সময়ে এই যুদ্ধের অবসানও হতো না।

শ্বেতপত্রে আরো বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ ভারতের সঙ্গে যোগসাজশে পরিকল্পনা করা হয়। এর চেয়ে উদ্ভট ধারণা আর কিছু হতে পারে না। মার্চের ২৫টি দিন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এমন কি পাকিস্তানি আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এপ্রিলের প্রথমার্ধে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা পাকিস্তানি কবলে ছিল না। ভারত এই সুযোগ মোটেও নিল না এবং বিশেষ করে যুব নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিল না। তাজউদ্দিন আহমদকে দিল্লি গিয়ে বহু কষ্টে বোঝাতে হলো যে তাঁদের প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধুর সমর্থন থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণ এজন্য কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। প্রাথমিকভাবে ভারতের সাহায্যের হাত ছিল অনিশ্চিত। গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করে ভারত পরখ করতে চায় যে, বাঙালিরা কতদূর যেতে রাজি আছে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের জন্যও ভারত অপেক্ষা করে থাকে। শরণার্থীদের চাপ সৃষ্টি না হলে মুক্তিযুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারতো। বাঙালিরাও সত্যি সত্যি যে পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সে রকম ধারণাও প্রাথমিকভাবে ছিল না। যখন তারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল দখল করেছিল তখন ভৌত কাঠামো ধ্বংস করার কোনো প্রবৃত্তি তাদের হয় নি। তারা ভেবেছে যে, বিষয়টি সংলাপের মাধ্যমেই সমাধান হবে। এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে দেশ বিভক্তির ইতিহাস এদেশে নবীনত্ব দাবি করতে পারতো না। পাকিস্তানিরা যখন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে চললো, গণহত্যার যুদ্ধ শুরু করলো, বাঙালির সম্মান ও শ্লীলতাহানির হোলি খেলায় মত্ত হলো, তখন মায়েরা তাদের সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করলো এবং আবালবৃদ্ধবণিতা পাকিস্তানিদের বিতাড়নে ইন্ধন যোগাতে শুরু করলো। পাকিস্তানের কৌশল এবং সুপ্ত শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত বিদ্বেষই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে। বাঙালিদের পৃথক কোনো পরিকল্পনার প্রমাণ পাওয়া দুরূহ।

ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা

জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তান এবং আমেরিকা দুই

দশকব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন প্রচারণা চালিয়ে যায়। প্রধানত ভারতীয় ও বাংলাদেশী প্রকাশনায়ই দাবি করা হয় যে সংলাপের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো উদ্দেশ্যই পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কখনো ছিল না। মার্কিন সূত্রে বলা হয় যে তাদের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। নভেম্বর ডিসেম্বরে এই আপোস কার্যকরী হতে পারতো। কিন্তু ভারতের মজ্জাগত পাকিস্তান বিদ্বেষ, রাশিয়ার ঘোলা জলে মাছ শিকার করবার প্রবৃত্তি এবং মুজিবনগর সরকারে কতিপয় নেতার অনমনীয় মনোভাবের ফলে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে গেল। ভারত তার চিরশত্রু পাকিস্তানকে ভেঙ্গে একটি বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো। এই বিবরণে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য অবশ্যি পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা, পাকিস্তানের শোষণ ও দমন নীতি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ন্যায্য দাবি সব সময়েই ফলাও করে তুলে ধরা হয়। সর্বপ্রথম এই প্রচারের সূচনা হয় জেনারেল ফজল মুকিম খানের ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত একটি বই দিয়ে। তারপর এতে অংশ নিলেন হারবার্ট ফেল্ডম্যান এবং গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী। ১৯৭৯ সালে হেনরী কিসিঞ্জার নিজেই তাঁর ভাষ্য প্রকাশ করলেন। ১৯৮১ সালে হাসান আসকারি রিজভির একটি গ্রন্থেও এই প্রচারণা স্থান করে নিল। সর্বশেষে ১৯৯০ সালে দু দশকের গবেষণার ফসল রিচার্ড সিসন ও লিও রোজের বইতে এই প্রচারণাকেই করা হয় মূল বক্তব্য। শুধু ১৯৭৭ সালে সিদ্দিক সালেকের লেখা একটি বই ছিল এর ব্যতিক্রম।[২৪] তবে নব্বই-এর দশকে পাকিস্তানি অনেক সেনাপতি ও গবেষকরা আসল কাহিনী বলতে শুরু করেন। তারা যদিও বাংলাদেশে যুদ্ধবিজয়ে বাঙালিদের কোনো কৃতিত্ব দেখেন না, কিন্তু পাকিস্তানি সেনা শাসন যে কোনো রকমের আপোষের চিন্তা করে নি তা স্পষ্টভাবে কবুল করেন। তারা কেউ সেনাবাহিনীর ওপর দোষারোপ করেন, কেউ ইয়াহিয়া জান্তাকে অভিযুক্ত করেন, আবার কেউ ভুট্টোর উচ্চাভিলাষ এবং পিপিপির ফ্যাসিবাদকে দায়ী করেন।[২৫]

জেনারেল ইয়াহিয়া ২০ ডিসেম্বর ক্ষমতাচ্যুত হন। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তাঁকে গৃহবন্দি করা হয় এবং এই বন্দীদশায়ই তিনি ১৯৮১ সালের ১৬ মার্চ ইহধাম ত্যাগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার মুক্তি পশ্চিম পাকিস্তানে কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা জানতো বা বিশ্বাস করতো যে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সেনাবাহিনী জোর কদমে এগিয়ে চলছে এবং মুষ্টিমেয় ভারতীয় দালাল বাঙালি দুষ্কৃতকারীরা গোলমাল করছিল। তাদের ঠিকমতো শায়েস্তা করা হচ্ছিল এবং ভারতীয় বাহিনীকেও শক্তভাবে ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছিল। পরাজয়ের খবরে তাই সবাই ক্ষেপে গেল। তখন তারা সেনাবাহিনী বিশেষ করে ইয়াহিয়া জান্তার ওপর হয় রুষ্ট।[২৬] এই পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে কতিপয় সেনানেতা চক্রান্ত করে ইয়াহিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসান। পরাজয়ের কারণ নির্ধারণের জন্য ভুট্টো প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে ২৪ ডিসেম্বর একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল—পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি কী পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করলেন এবং কী পরিস্থিতিতে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ বিরতি হলো? ইয়াহিয়া এই

কমিশনের কাছে একটি বিবৃতি দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর বিচারকালে যে বিবৃতি দেন তা কমিশন বিবেচনায় নেন নি। হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদন কখনো প্রকাশ করা হয় নি এবং কেন যেন তা খুব রহস্যাবৃত। গুজবে প্রকাশ যে এই প্রতিবেদনের মূল খসড়া এখন আর নেই। ১৯৭৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো এই প্রতিবেদনটি গুম করে ফেলেন।[২৭] জেনারেল ইয়াহিয়া ভুট্টোর পতনের পর একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করেন। একজন গ্রন্থকার আবদুল বাসিত জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তব্যের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছেন।[২৮] ইয়াহিয়ার বক্তব্যের নানা দিক অন্যান্য গ্রন্থে প্রসাঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে। এইসব সূত্র বিবেচনা করে ইয়াহিয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ বলে প্রতীয়মান হয় :

১. পাকিস্তানের ধ্বংসের জন্য ভুট্টোই মূলত দায়ী। তিনি চান যে পশ্চিমে তিনি রাজত্ব করবেন আর পূর্বে বঙ্গবন্ধু। 'ইধার হাম উধার তুম' এই ছিল ভুট্টোর সমাধান।
২. ভারতীয়েরা শেখ মুজিবকে বোঝায় যে পাকিস্তানে তাঁর কর্তৃত্ব কোনো দিন চলবে না এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে কখনো মানবে না।
৩. ইয়াহিয়া বঙ্গন্ধুর মনে পাকিস্তান ও সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আস্থা সৃষ্টির জোর প্রচেষ্টা নেন এবং তাঁর বিশ্বাস যে তাতে তিনি সমর্থ হন। ভুট্টো ও ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিদের দুরভিসন্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকলে ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য সফল হতো।
৪. ভুট্টো ও তাঁর সমর্থকরা যেভাবে হোক শেখ মুজিবকে হত্যা করতে উৎসুক ছিলেন। জেনারেল টিক্কা তো অভিযানের প্রথম রাতেই এই হুকুম জারি করেন এবং ইয়াহিয়ার প্রচেষ্টায় তা কার্যকর হয় না। ভুট্টো শেখ মুজিবের বিচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। তিনি এবং বেশির ভাগ সেনাপতি চাইতেন যে তাঁকে বন্দিদশায় হত্যা করা হোক।
৫. ভুট্টো শুরু থেকেই সামরিক নেতাদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হন। জেনারেল টিক্কা খান তাঁর আপনজন ছিলেন। জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম ইয়াহিয়াকে সরিয়ে ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসানোর ষড়যন্ত্রে বহুদিন মশগুল ছিলেন এবং অবশেষে তাঁরা সফলও হন।
৬. ভুট্টো তাঁকে বাংলাদেশে সামরিক সমাধান করতে সুপারিশ করেন। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দিতে রাজী ছিলেন কিন্তু শেখ সাহেব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ধ্বংসে বদ্ধপরিকর থাকায় তা আর হয়ে উঠলো না।
৭. চীন ও আমেরিকার সঙ্গে ইয়াহিয়া বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। কিন্তু চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রে এই দুইটি বন্ধুদেশ পাকিস্তানের বিপদে সাহায্য করতে পারলো না। তিনি ইঙ্গিত দেন যে জেনারেল ইয়াকুব, জেনারেল গুল হাসান এবং আরো অনেক সামরিক নেতা ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন এবং সব চক্রান্তের মধ্যমণি ছিলেন ভুট্টো।

ইয়াহিয়ার বক্তব্যে কোথাও কিন্তু সামরিক অভিযান শুরু করার পর কোনো রকম আপোস প্রচেষ্টার কোনো ধারণা বা কথা মোটেই আসে নি। পাকিস্তানে কিভাবে

নতুন শাসন গড়ে উঠবে তার কোনো দিকনির্দেশনা তাঁর বক্তব্যে ছিল না।

বাস্তবে কি ঘটেছে তার একটি হিসাব নিলে দেখা যাবে যে বাস্তবিকই ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো পরিকল্পনা জেনারেল ইয়াহিয়া কখনো চিন্তাই করেন নি। মার্কিন চাপে অথবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লোক দেখানোর জন্য তিনি মাঝে মাঝে বক্তব্য রাখেন এবং নানা অন্তসারশূন্য উদ্যোগ নিয়েছেন বলে প্রচার করেন।

- একান্তই তাঁর সামরিক উপদেষ্টা ও ভুট্টোর ইচ্ছায় ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্কট সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবির প্রস্তাব দেন, তখনই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর অ্যাডমিরেল আহসান ও সামরিক শাসক জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব তাতে আপত্তি করেন। পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভের যথার্থ আশঙ্কা তাঁরা ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিক্ষোভ যখন শুরু হলো তার সামরিক সমাধান তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। দু'জনই পদত্যাগ করেন। সাহেবজাদা তো সরাসরি বলেই বসেন যে এতে গৃহযুদ্ধ অপরিহার্য।[২৯] তাই বলা চলে যে ইয়াহিয়া জাতীয় স্বার্থে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করেন নি। তিনি জেনেশুনেই পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য এর হুকুম দেন। তার একমাত্র স্বার্থ ছিল ভুট্টোর সহযোগিতায় পাকিস্তানে ক্ষমতা বহাল রাখা।
- ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে জাতিকে সে বিষয়ে অবহিত করেন এবং বলেন যে তিনি জনপ্রতিনিধিদের হাতে অবশ্যিই ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ডাণ্ডা মেরে, সম্পদ ধ্বংস করে, বিষয়-সম্পত্তি লুঠ করে পূর্ব পাকিস্তানে শ্মশানের নীরবতা কায়েম করা। সৈয়দ আলমদর রাজা ছিলেন একজন পাকিস্তানি প্রশাসক যিনি যুবা-বয়সে পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করেন। ১৯৭১ সালে তাঁকে পশ্চিম থেকে নিয়ে এসে ঢাকার কমিশনার পদে বসানো হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের খোলা মাঠে খেলার বলটি পুরোপুরি ইয়াহিয়া-ভুট্টোর দখলে চলে যায়। কিন্তু তাঁরা বলটি কখনো খেলার উদ্যোগ নিলেন না। তাঁরা কোনো আপোসের প্রচেষ্টা চালালেন না। এমন কি ছয় দফার যতটুকু তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য তাও স্বীকার করবার কোনো উদ্যোগ নিলেন না। তাঁরা শুধু অনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যহীনভাবে নিষ্পেষণ করেই চললেন। যে হত্যা লুটপাট পূর্ব পাকিস্তানে চললো তার প্রশমনে বা জবাবদিহিতে তাঁরা কোনোই আগ্রহ দেখালেন না।[৩০] হাসান জাহিরও ছিলেন এমনি একজন প্রশাসক। তিনিও উদ্দেশ্যহীন দমননীতির বিষয়টির অবতারণা করেন।[৩১]
- ইয়াহিয়া ২৮ জুনের ঘোষণায় বলেছিলেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা দুষ্কৃতকারী বলে তিনি বিবেচনা করেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তিনি নতুন নির্বাচন

অনুষ্ঠান করবেন। তাঁর কথা ছিল কতিপয় সদস্যদের বাদ দেওয়া। বাস্তবে তিনি প্রায় সারা দেশেই উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। আওয়ামী লীগের মোট সদস্য ছিল ৪৫৫ জন, জাতীয় সংসদে ১৬৭ জন ও প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮ জন। তাদের মধ্যে অধিকাংশ দুষ্কৃতকারী বলে চিহ্নিত হলেন। অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হলো। অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো এবং অনেকে অনুপস্থিত থেকেও শাস্তি পেলেন। উপ-নির্বাচনে ১৬৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন এবং বাকি ১১০টি এলাকায় নির্বাচন হলো। আসলে কিন্তু কোথাও ভোটদানের ব্যবস্থা ছিল না। যোগসাজশে প্রার্থী মনোনীত হলো এবং সেনাশাসনের কতিপয় অপরিচিত দোসর নির্বাচিত হলো। এয়ার মারশাল আসগর খানের দল এই যোগসাজশের নির্বাচন বয়কট করলো। সীমান্ত প্রদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নিষিদ্ধ বিধায় তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারলো না। ভুট্টোর পিপিপি যার কোনো অস্তিত্ব বাংলাদেশে কোনোদিন ছিল না তার প্রার্থীও নির্বাচিত হলো। ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর ডা. আবদুল মোতালেব মালিক, গভর্নরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার জান্তার পছন্দমতো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী বানালেন এবং নির্বাচিত ঘোষণা করলেন। নির্বাচন এমন রহস্যাবৃত ছিল যে যারা মনোনয়ন পেল তারাও ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত ছিল না যে তারা নির্বাচিত হবে। অনেক ক্ষেত্রে জোর করে কাউকে নির্বাচনী লড়াইতে নামানো হলো।[৩২] সামরিক জান্তার ক্রীতদাস হিসেবে চিহ্নিত কতিপয় অপরিচিত দলের (জামাত ও মুসলিম লীগ অবশ্যি শীর্ষে অবস্থান করে) অজ্ঞাতকুলশীল ও গণধিকৃত কুলাঙ্গার এই সুযোগে দুইটি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। তাদের চরম দুর্ভাগ্য যে তারা কোনোদিনই কোনো পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে পারলো না। মুক্তিযুদ্ধের ঠেলায় তাদের সদস্যপদ শুধু বাতিল হলো না, তারা গর্তে গিয়ে আত্মরক্ষা করলো (কেউ কেউ মৃত্যুবরণও করে)। ঢালাওভাবে যথাযথ পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এভাবে বাদ দিয়ে কি করে যে সমঝোতা হবে সে বিষয়ে জান্তার কোনো ভাবনাই ছিল বলে মনে হয় না।

- পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে দেখে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকদের উপদেশে ইয়াহিয়াকে কিছু লোক দেখানো পদক্ষেপও নিতে হয়। ৩ সেপ্টেম্বর সামরিক গভর্নর টিক্কা খানের জায়গায় ডা. আবদুল মোতালেব মালিক হলেন গভর্নর। ডা. মালিক বিভাগোত্তরকালে কলকাতায় শ্রমিক নেতা ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তারপর পাকিস্তানের ইতিহাসে তিনি আর চাকরিচ্যুত হন নি। মন্ত্রিসভা বদলায়, দল বদলায়, কিন্তু ডা. মালিক হয় রাষ্ট্রদূত না হয় মন্ত্রী পদে বহাল থাকেন। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া যখন তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন তখন নাকি ডা. মালিক এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেন। তাঁর কথা ছিল যে, এতে ইয়াহিয়ার

একান্ত মহলে কোনো বাঙালি আর থাকবে না। একটি মজার ব্যাপার হলো যে, ডা. মালিক মূলত ছিলেন রাজনীতিবিদ কিন্তু ১৯৪৮-এর পরে তিনি আর কখনো কোনো নির্বাচনে লড়েন নি এবং নিতান্তই দুঃসাহসিকভাবে ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়ার গভর্নর হতে রাজি হন। তবে তাঁকে উপদেশ দেয়ার জন্য এবং সম্ভবত নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাঁর সব উপদেষ্টা ছিলেন পাকিস্তানি কর্তাব্যক্তি। জেনারেল টিক্কা খানের সহচর জেনারেল নিয়াজি ছিলেন তাঁর সেনাপতি আর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা। এ ছাড়াও তাঁর মুখ্য সচিব ছিলেন সিন্ধু প্রদেশের মুজফফর হোসেন। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং গভর্নরের ব্যক্তিগত সচিবকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়।

- ডা. মালিকের যাঁরা শুভানুধ্যায়ী বা যাঁরা তাঁর উদ্যোগকে কোনোরকমে সহনীয় করে দেখতে চান তাঁরা যুক্তি দেখান যে, ডা. মালিক শুধু সরকারি চাকরি পছন্দ করতেন বলে নয় বরং কিছুটা কর্তব্যবোধের তাড়নায় গভর্নর হন। তাঁর ধারণা ছিল, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি নমনীয়তা ও যুক্তির অবতারণা করতে পারবেন। নিষ্ঠুর ও নিরর্থক সামরিক বর্বরতায় খানিকটা লাগাম টানতে পারবেন। বাঙালিরা যে সম্মুখ সমরে পাকিস্তানের দস্যুবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে তাতে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো যুদ্ধের পালে ফুটো তৈরি করতে পারবেন। তাছাড়া ভারতের সাহায্যে বাঙালিদের বিজয় তাঁর কাছে ছিল অসহনীয়, সুতরাং তা প্রতিহত করা ছিল তাঁর কর্তব্য। ক্ষমতা গ্রহণ করেই ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি দশজন অপরিচিত কুলাঙ্গারকে মন্ত্রীর পদে আসীন করেন। এদের মধ্যে এককালের মুসলিম লীগ নেতা আবুল কাশেম এবং পাহাড়ি এক রাজা অং শু প্রু চৌধুরী ছাড়া বাকি কারও কোনো কুলপরিচয় বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না। ডা. মালিক বস্তুতই ছিলেন সামরিক জটাজালে বন্দি এক ব্যক্তি। সামরিক শাহির দোসর ভুট্টোই প্রশ্ন তুলেন যে, ডা. মালিক কার প্রতিনিধি?[৩৩]
- ইয়াহিয়া লোক দেখানো পদক্ষেপ নিতে প্রায়শই কসুর করেন নি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি অবশ্য একবারের জন্যও বাংলাদেশে যান নি, ভুট্টোও তা করেন নি। তবে সৈন্য ও সেনাপতিদের তিনি অনবরত বাংলাদেশে পাঠান, যাঁদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করে এবং অনেকে পরে যুদ্ধবন্দি হয়। সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ সব সমঝোতার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, সম্ভবত প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। সব দুষ্কৃতকারী দেশে ফিরে এলে তাঁদের মাফ করে দেয়া হবে এবং তাঁর সততা প্রমাণের জন্য পরের দিন কিছু বন্দি দুষ্কৃতকারীকে মুক্তিও দেয়া হলো। তবে মোটামুটিভাবে এই পদক্ষেপ ছিল নিরর্থক এবং তা ফলপ্রসূও হলো না। যথেচ্ছ ধরপাকড় করা, পরিচিত ব্যক্তিদের গুম করে ফেলা এবং গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা অব্যাহত রইলো।[৩৪]

২৮ জুনের বক্তৃতায় ইয়াহিয়া বলেন যে, তিনি নিজেই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা একটি সংবিধান প্রণয়ন করলে তিনি তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা

নেবেন। সাধারণ আশা ছিল যে এই সংবিধানে শিথিলভাবে স্বায়ত্তশাসন বহাল হবে তবে প্রতিরক্ষা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে উপযুক্ত রাজস্ব সূত্র থাকবে। তিনি বিচারপতি কর্নেলিয়াসকে একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন। তবে সংবিধান রচনা বাস্তবে চলে ইয়াহিয়ার ডান হাত বলে পরিচিত জেনারেল পীরজাদার তত্ত্বাবধানে। এই সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের কোনো চিন্তাই ছিল না এবং ইয়াহিয়ার একজন সাংবিধানিক উপদেষ্টার মতে তা ছিল আইয়ুবের সংবিধানের চেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত। এইসব বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন যে ঢাকায় একজন বাঙালি সহ-সভাপতির দফতর স্থাপন করলেই তো স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলো।[৩৫]

১৮ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন যে, তাঁর শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদে পেশ করা হবে এবং পরিষদের সুপারিশ তিনি বিবেচনা করবেন।[৩৬] ইতোমধ্যে অবশ্য তাঁর শাসনতন্ত্রের রূপরেখা কাগজপত্রে আলোচিত হতে থাকলো। এই শাসনতন্ত্র রচনায়ও কতিপয় বাঙালি বিশ্বাসঘাতকের অবদান ছিল বলে পরবর্তীকালে প্রকাশ পায়।[৩৭] লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকার সাংবাদিক পিটার হেজেলহার্স্ট এই সংবিধানের কতগুলো বিশেষত্ব তুলে ধরেন,"এটি হবে পাঞ্জাবিদের জন্য, পাঞ্জাবিদের দ্বারা রচিত পাঞ্জাবি সংবিধান। সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না। কারণ তারা দেশদ্রোহী ও জিম্মি। বাংলাভাষা আরবি হরফে লেখা হবে, যাতে জাতীয় ঐক্য কায়েম হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে কতিপয় প্রদেশে ভাগ করা হবে, যাতে দেশের একমাত্র ক্ষমতাশালী প্রদেশ হিসেবে পাঞ্জাবের প্রতিষ্ঠা হয়।"[৩৮]

১২ অক্টোবর ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ইয়াহিয়া তাঁর শেষ বক্তব্য পেশ করেন। এই বক্তৃতায় কয়েকটি তারিখ ঘোষণা করা হয় : ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। ৭ জানুয়ারির (১৯৭২) মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন সম্পন্ন হবে। ২৭ ডিসেম্বর সংবিধান জারি করা হবে এবং ৯০ দিন পর্যন্ত এর সংশোধন করা যাবে। অবশ্য প্রতিটি সংশোধনীতে প্রতিটি প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ প্রতিনিধির সম্মতি থাকতে হবে। সংবিধান জারির অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হবে। এর পরে এই বিষয়ে তিনি মাত্র একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হন এবং তাঁর নীলনকশা বাস্তবায়নের আগেই তিনি পাকিস্তানের রঙ্গমঞ্চ থেকে নিতান্তই অসম্মানজনকভাবে অপসারিত হন। ৭ ডিসেম্বর তিনি আগেভাগেই তাঁর মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী হবেন পূর্ব পাকিস্তানের নুরুল আমিন আর উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টো খুবই পেরেশান হয়ে যান এবং তাঁর সন্দেহ হয় ধূর্ত ইয়াহিয়া না কোনো মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।[৩৯] তদুপরি তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিরাও কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েন, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের ব্যর্থতার জন্য। এই সব সামাল দেয়ার জন্যই সম্ভবত ইয়াহিয়াকে এই পদক্ষেপ নিতে হয়। সম্ভাব্য উপ-প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘে পাঠানোও ইয়াহিয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১২ অক্টোবরের ঘোষণার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল বাংলাদেশের

যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা। আন্তর্জাতিক অজুহাত না তুলে ইয়াহিয়া বাংলাদেশ ধরে রাখা তো দূরের কথা সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ারও সুযোগ দেখছিলেন না। আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যুদ্ধবিরতি না হলেও কোনোমতে পার পেয়ে যাওয়ার আশা তিনি করেছিলেন। তাঁর ঘোষণাটির মূল শ্রোতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মনোবলহীন প্রায়-আটক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁর বক্তৃতার উপসংহার বিবেচনা করলেই তাঁর উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, "নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা ও ভাগ্য সমৃদ্ধিতে বদ্ধপরিকর ১২ কোটি মুজাহিদদের কেউ ভয় দেখাতে পারবে না, কেউ অবদমিত করতে পারবে না। আসুন আবার আমরা প্রমাণ করি যে, পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিক তাঁর দেশকে রক্ষার জন্য জান কুরবান করে দেবে।" পরিষ্কারভাবে ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ঐ দিনই করে ফেলেন। বাকি থাকলো শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

সমঝোতার জন্য মার্কিন মধ্যস্থতা ও বঙ্গবন্ধুর বিচার

বাংলাদেশের সমস্যাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া গ্রহণ করলেন সামরিক দলন নীতি। স্বভাবতই ধারণা ছিল যে বাঙালিদের কঠোর শিক্ষা দিয়ে অবশেষে তিনি রাজনৈতিক উদ্যোগ নেবেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হওয়ায় আশা করা হয়েছিল যে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সংলাপে বসবেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী বলে সেই সুযোগ সীমিত করে দিলেন। তিনি মার্চের সংলাপের ব্যর্থতার জন্য পুরোপুরি তাঁকেই অভিযুক্ত করলেন। তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে শুধু আওয়ামী লীগকেই নিষিদ্ধ করলেন। প্রায় চার মাস গণহত্যা ও জননিষ্পেষণ ছাড়া অন্য কোনো উদ্যোগের ইঙ্গিতই মিললো না। অবশেষে ২৮ জুন তিনি যে ঘোষণা দিলেন তাতেও কোনো রকমের আপোসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো না। এবারে বরং তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের আসন বাতিলের ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন। সংবিধান রচনায়ও তিনি জনপ্রতিনিধিদের বা বাঙালিদের জন্য কোনো সুযোগ রাখলেন না। জুলাইয়ের শুরুতে হেনরী কিসিঞ্জার যখন উপমহাদেশ ভ্রমণ করলেন তখন বাংলাদেশ সঙ্কট তাঁর কাছে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি ছিলেন চীন-মার্কিন সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ব্যস্ত। তবে ভারতে তিনি শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে গভীর উদ্বেগের পরিচয় পেলেন। ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে তাই কিসিঞ্জারের কৌশল হলো শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য উদার হস্তে সাহায্য প্রদান। কিন্তু ক্রমে রাজনৈতিক সমস্যার সরাসরি সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তাঁর বোধগম্য হয়। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে পাকিস্তান (বিশেষ করে ইয়াহিয়া জান্তা) এ ব্যাপারে নমনীয় হবে। তবে তাঁদের মনে হলো যে তাঁরা যদি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উদ্যোগ নেন তাতে হয়তো সুযোগের কোনো জানালা উন্মোচিত হতে পারে। কোলকাতাস্থিত মার্কিন মিশনে গোয়েন্দা সংস্থা তখন সংলাপের জন্য দল

খুঁজতে লাগলো। ৩০ জুলাই আওয়ামী লীগ নেতা কুমিল্লার জহিরুল কাইয়ুমের সঙ্গে মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের যোগাযোগ হলো। কিসিঞ্জারের ভাষ্যমতে এই যোগাযোগ চালিয়ে যাবার জন্য পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড জেনারেল ইয়াহিয়ার সম্মতি লাভ করেন। কোলকাতায় মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মার্কিন যোগাযোগ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকে। জহিরুল কাইয়ুম ছাড়াও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতিনিধি হিসেবে এই যোগাযোগ চালিয়ে যান। মার্কিন মিশনের গ্রিফিন বাংলাদেশ দূতাবাসের হোসেন আলী এবং সরাসরি খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। বিভিন্ন বিবরণ থেকে প্রতিভাত হয় যে আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয় স্থান পায়। প্রথমত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতা হবে। দ্বিতীয়ত, ছয় দফার ভিত্তিতে আপোস হতে পারে। তৃতীয়ত, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। চতুর্থত, চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে আলোচনার কোনো পূর্বশর্তের প্রয়োজন হবে না। ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর দেশদ্রোহিতার বিচার শুরু করেন। মুজিবনগর সরকার খন্দকার মোশতাকের মার্কিন যোগাযোগ রক্ষা নিষেধ করে দেন। তাদের সন্দেহ হয় যে, মোশতাক পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি নমনীয় করে ফেলতে পারেন। মোশতাকের জাতিসংঘে যাবার কথা ছিল, তা বন্ধ করে দিয়ে জাতিসংঘ দলের নেতৃত্ব বিচারপতি আবু সায়িদ চৌধুরীকে দেওয়া হয়। কিসিঞ্জারের হিসাবে ২৩ সেপ্টেম্বর কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ভারত সরকারের কাছে মার্কিন প্রস্তাব গেলে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সংলাপের উপদেশ দেন। কিন্তু পাকিস্তানি জান্তা সেই উদ্যোগ নিতে অসম্মত হয়।[৪০]

হেনরী কিসিঞ্জার মার্কিন মধ্যস্থতার বিষয় নিয়ে ৭ ডিসেম্বরে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন।[৪১] তিনি জানান যে, কোলকাতায় মার্কিন মিশনের আটবার বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া তিনবার এই বিষয়ে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার উকিল এ.কে. ব্রোহির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবার অনুমতি তাঁরা আদায় করেন। অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। তারপর ভারতীয় আপত্তির কারণে তা ব্যাহত হয়। নভেম্বরে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দেন। সিনেটে প্রশ্নোত্তর পর্বে কিসিঞ্জার স্বীকার করেন যে, যখন সরাসরি যুদ্ধ বেধে গেল তখন পর্যন্ত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাঁদের সম্মতি দেয় নি। তাঁদের ধারণা ছিল যে তাঁরা পাকিস্তানের সম্মতি আদায়ে সমর্থ হবেন। তিনি আরো স্বীকার করেন যে, নভেম্বরের ১৫ তারিখে যখন তাঁরা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ খানের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তখন তিনি বলেন যে, বিষয়টি বিবেচনার উপযুক্ত সময় তখনো হয় নি এবং ডিসেম্বরের শেষে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর তা

বিবেচনা করা যাবে। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ থেকে আমেরিকা শুধু আলোচনা চালিয়ে যাবার সম্মতি পায়। পাকিস্তান কতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেবে অথবা একান্তই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংলাপে বসবে কিনা—সে সম্বন্ধেও কোনো অঙ্গীকার তো দূরের কথা ইঙ্গিতও দেয় নি। কিসিঞ্জার প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে বলেন যে, "আলোচনা সত্যি বলতে কি কখনো শুরুই হয় নি।" ব্রোহির মধ্যস্থতায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের কাহিনীও নিতান্তই গাজাখোরি। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ঘোষণার পর তিনি কোনো উকিলও মানেন নি বা পক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টাও করেন নি। মোদ্দা কথা মার্কিন মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতার আলোচনা কোনো সময়েই কোনো অর্থবহ স্তরে পৌঁছে নি। মার্কিন মিশন অবশ্যিই বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের কাছ থেকে আলোচ্য বিষয়ের সারবস্তু নিয়ে তারা কোনো ইঙ্গিতও আদায় করতে পারেন নি। কিসিঞ্জারের কাহিনী শুধু গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী এবং সিসন ও রোজ ছাড়া আর কেউই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। পাকিস্তানি জেনারেলদের মতে সমঝোতার কোনো চিন্তাও ইয়াহিয়া জান্তার মনে আসে নি। পরবর্তীকালে সরকারি দলিলপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে আমেরিকা সংলাপের উদ্যোগ নেয় এবং সেজন্য কোলকাতায় ও ঢাকায় যোগাযোগ স্থাপন করে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইয়াহিয়ার সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেন। কিন্তু পাকিস্তান কখনো কোনো নির্দিষ্ট আলোচনায় রাজি হয় নি। ইরানের শাহের মধ্যস্থতায় সংলাপের প্রচেষ্টা ইয়াহিয়ার কাছ থেকে যথার্থ সাড়া না পাওয়ায় এগুতেই পারে নি। ঢাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম ও এস বি জামানকে ইয়াহিয়ার দলে নেয়ার জন্যই যেন যোগাযোগ করা হয়। কোলকাতায় অক্টোবর পর্যন্ত যোগাযোগ বহাল থাকে এবং পাকিস্তান থেকে সাড়া না পাওয়ার কারণে তা আর চলে না। এই উদ্যোগকে পাকিস্তান চলতে দেয় এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ফাটল ধরানো। এই দলিল থেকে আরো জানা যায় যে ব্রোহির মাধ্যমে উদ্যোগ শুধু চিন্তাভাবনার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে।[৪২]

মজার ব্যাপার হলো যে, ইয়াহিয়া যখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে আলোচনায় সম্মতি জানালেন ঠিক তখন ৯ আগস্ট তিনি সংলাপের ভিত্তিই মুছে ফেললেন। সেইদিনই তিনি বঙ্গবন্ধুর দেশদ্রোহিতার বিচার শুরু করলেন। তাঁর খয়ের খা মার্কিন সরকারও তাতে খুব বিব্রত বোধ করে। পররাষ্ট্র সচিব বিল রোজার্স নমনীয়তার জন্য আবেদন করলেন এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নসিহত করলেন।[৪৩] প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১০ সেপ্টেম্বরে বিশ্বের তেইশজন নেতার কাছে আবেদন পাঠালেন। সেদিনই জাতিসংঘের মহাসচিব একই রকম আবেদন জানালেন। কংগ্রেসম্যান ব্রেডফোর্ড মোর্স ২৭ জুলাইতেই বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আরো ৫৩ জন সহকর্মীকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আবেদন করেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ের ট্রুডো এবং আরো অনেক বরেণ্য নেতা বিচারের এই

প্রহসন বন্ধ করতে আবেদন জানালেন। জেনারেল ইয়াহিয়া যে কি রকম উন্মাদ হয়ে যান তার প্রমাণ মিলে *লা ফিগারোর* সাংবাদিকের কাছে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষাৎকারে। ২ সেপ্টেম্বর সেই দুরাত্মা বলেন যে, শেখ মুজিব জেলে আছেন আর সে জেল কোথায় তা তিনি জানেন না। পরিবর্তে তিনি প্রশ্ন করেন, "তোমার রাষ্ট্রপতি কি জানেন কোথায় সব ক্রিমিনাল আছে?"[৪৪] জি. ডব্লিউ চৌধুরী অভিমত দেন যে বিচারটি ততো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং ইয়াহিয়া মার্কিন সরকারের কাছে অঙ্গীকার করেন যে বঙ্গবন্ধুকে প্রাণে মারা হবে না। কিন্তু হাসান জাহির বলেন যে বিচারটি অবশ্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১১ আগস্টে বিচার শুরু হয়। পাঁচজন সদস্যের সামরিক আদালতে মাত্র এক ব্যক্তি ছিলেন বেসামরিক বিচারক। গুরুতর বারোটি অভিযোগের প্রধান ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং এইসব অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এ কে ব্রোহি বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে তাঁর উকিল হন। তবে ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের বক্তৃতার রেকর্ড শুনবার পর বঙ্গবন্ধু আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতি জানান। সরকার পক্ষে ছিল কতিপয় বাঙালি সামরিক কর্মকর্তার স্বীকারোক্তি যা তাঁরা সামরিক ও পুলিশ হেফাজতে প্রদান করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ১ ডিসেম্বরে মামলা শেষ হয় এবং ৪ ডিসেম্বরে রায় হয়। শুধু বেসামরিক বিচারক অনিবার্য কারণে অনুপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত দানে বিরত থাকেন।[৪৫] এই বিচারে পুরনো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কাহিনী নতুন করে পেশ করা হয়। এবং অতিরিক্ত বিষয় হয় ১৯৭০-এর নির্বাচনোত্তর কর্মকাণ্ড। অসহযোগ আন্দোলনের পঁচিশ দিনকে বিশেষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ইয়াহিয়া জান্তা শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে মনস্থ করে। ইয়াহিয়া বলেন যে, ভুট্টো তাঁকে ত্বরিৎ এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করতে উপদেশ দেন ও উৎসাহিত করেন। অন্যদিকে ভুট্টো বারবার বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে, তিনিই তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন, ইয়াহিয়া তাঁকে হত্যা করতে চান। কিসিঞ্জার দাবি করেন যে, তাঁদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষা হয়। এই বিচারের দলিলপত্র কিন্তু কোথাও প্রকাশিত হয় নি। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ফয়সলাবাদ (তখন লায়ালপুর নামে পরিচিত) জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর বিচার হয় আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তারপর তাঁকে মিয়ানওয়ালি জেলে স্থানান্তর করা হয়। মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত এই নেতাকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো। তাঁকে তখন মিয়ানওয়ালি থেকে চশমায় একটি বিশ্রামাগারে নিয়ে আসা হয়। এই সুদীর্ঘ নয় মাস বঙ্গবন্ধু কারাগারের একাকীত্ব সহ্য করেন এবং দেশে বা বিদেশে এই সময়ে কি ঘটে সেই খবর সযতনে তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়। এমন অমানবিক নির্যাতনে মানুষটি যে তাঁর বিশ্বাস ও স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সেখানে ভুট্টো তাঁর সঙ্গে প্রথমে ২৭ ডিসেম্বর ও পরে ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেখা করেন। ভুট্টোর প্রার্থনা ছিল কোনো মতে বঙ্গবন্ধু যেন পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক রাখেন। পাকিস্তান ভাঙ্গার অভিশাপ থেকে ভুট্টোর আত্মরক্ষার এই ছিল একমাত্র উপায়। ভুট্টো তাঁর দুটো

মোলাকাতেই বারবার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনিই বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ভুট্টোর দুই দিনের কথোপকথন পুরোপুরি টেপে ধারণ করা হয়।[৪৬] পাকিস্তানে ইয়াহিয়া জান্তা অথবা ভুট্টো কেউই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বন্ধু ছিল না এবং তাঁকে বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে হত্যা করতে কারো কোনো অনীহা ছিল না, বরং আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আন্তর্জাতিক অভিমত ও চাপ এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের কারণেই তাঁর জীবন রক্ষা পায় ও তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্ণধারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি লণ্ডন দিল্লী হয়ে ঢাকায় পদার্পণ করেন।

সঙ্কটের নির্বোধ মোকাবিলা

পাকিস্তান কোনো মতেই সঙ্কট মোকাবিলায় বুদ্ধির প্রয়োগ করতে পারলো না। এমনভাবে যে সঙ্কট সৃষ্টি করা যায় এবং এমনভাবে যে নিজের কবর রচনা করা যায় তার আর কোনো প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া মুশকিল। ২৭ মার্চ ঢাকা থেকে বিদেশি সাংবাদিকদের বিতাড়নের মাধ্যমে শুরু হয় পাকিস্তানের নির্বোধ যাত্রা। এমন অভদ্রভাবে সাংবাদিকদের চটানো শুধু মদমত্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তারপর আবার ইয়াহিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে ওষুধপত্র ও ত্রাণসামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি রেডক্রস বিমানকে ঢাকায় যেতে দিলেন না। ২২ এপ্রিল জাতিসংঘের মহাসচিব মানবিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু ইয়াহিয়া সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৭] সামরিক উদ্যোগের আগেই পাকিস্তানে ঘোরতর অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছিল। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, আমদানি নীতির যৌক্তিকীকরণ এবং উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির দাবি দাতাগোষ্ঠী করেই যাচ্ছিল এবং সাহায্য প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছিল। পাকিস্তানের ছিল একটি বড় রকমের দেনা সঙ্কট। কোথায় এই সব সমস্যার সমাধান করবে, না করে এর পরিবর্তে তারা পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ লাগিয়ে বসলো। পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব বাকি পড়ে গেল এবং রফতানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ খরচ বাজেটের ঘাটতি বাড়িয়েই চললো। পূর্বাঞ্চলের বাজার বিঘ্নিত হওয়ায় আমদানিতে ভাটা পড়লো, পশ্চিমে উৎপাদনেও স্থবিরতা এলো। পাকিস্তান পড়লো দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে। দেনা পরিশোধে রেয়াতি দরকার ও নতুন সাহায্য দরকার। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা মোজাফফর আহমদ মে-র শুরুতে ওয়াশিংটনে এলেন বিশ্বব্যাঙ্ক, মুদ্রা তহবিল ও মার্কিন সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করতে। আন্তর্জাতিক চাপে অবশেষে ২২ মে-তে ইয়াহিয়া জাতিসংঘের মানবিক সাহায্য গ্রহণ করলেন। তবে তাতে জুড়ে দিলেন নানা শর্তাবলি, ত্রাণকাজে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ নিয়ে সমঝোতা হলো ৯ আগস্ট এবং এই সমঝোতা রচনা করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব বিল রোজার্স। ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বাসন, কিছু যানবাহন লাভ ও খাদ্য সাহায্য। যানবাহনের নামে তিনি কিছু কয়েদি ভ্যানও চেয়ে বসেন। তবে আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকভাবে তাঁর সদিচ্ছা প্রতিষ্ঠা করা, এটা দেখানো যে পূর্ব

পাকিস্তানের বিপর্যয়ে তিনি দুঃখিত এবং ত্রাণকাজ বলবৎ করতে উদ্যোগী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অনবরত চাপ দিয়েই চলছিল। ইয়াহিয়ার আর এক উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সাহায্য আহরণ, অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলার জন্য দাতাগোষ্ঠীর সুনজর তাঁর একান্তই জরুরি ছিল।

দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য এতোই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ছিল যে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা একটি বিশ্বব্যাঙ্ক দলকে পূর্ব পাকিস্তানে সরেজমিনে তদন্ত করতে আহ্বান করে বসলেন। তাঁরা জুনের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান পৌছুলো এবং ১১ দিনে ১২টি জেলা ঘুরে দেখলো। ব্যাঙ্ক মিশনকে দাওয়াত করা ছিল পাকিস্তানের একটি বিরাট ও মারাত্মক ভুল। ২১ জুন প্যারিসে দাতাগোষ্ঠীর সভায় বিশ্বব্যাঙ্ক জানিয়ে দিল যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মতো কোনো অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে নেই এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না করলে কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই পাকিস্তান কোনো রকম সাহায্য পেল না, ঋণ রেয়াতি তো দূরের কথা।[৪৮] নিক্সন সরকার অবশ্য পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিল কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দাতাগোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের অভিমতের কারণে কিছুই করতে পারলো না। তারা বললো যে, তারা বন্ধু দেশের ওপর প্রকাশ্য চাপ প্রয়োগ করতে চায় না। তবে গোপনে এবং একান্তে আলোচনা করেই যাবে।[৪৯] পাকিস্তানি বর্বরতা এতোই সীমাহীন ছিল যে, শরণার্থীর দীর্ঘ সারি অক্টোবরেও অব্যাহত রইলো। একইভাবে কোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে শুরু করা গেল না। তাই ২ অক্টোবর দাতাগোষ্ঠী আবারও সিদ্ধান্তে অটল থাকলো যে, পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া যায় না।

ইয়াহিয়া শুরু থেকেই বলতে থাকেন, বাংলাদেশে ভারতীয় চরেরা সক্রিয় ছিল, তাদের অনুচরেরাই যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিল। বাঙালিদের সামরিক দক্ষতা সম্বন্ধে পাকিস্তানিদের খুবই সন্দেহ ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে তাদের সম্বিত ফিরে এলো যে, বাঙালিরা মরিয়া হয়ে কামড় দিচ্ছে, দুঃসাহসিক সব অভিযান চালাচ্ছে। ১৯ জুলাই ইয়াহিয়া নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সার্বিক যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, গেরিলা তৎপরতা আরো বাড়লে বা বাঙালিরা যদি পূর্ব পাকিস্তানের কোনো এলাকা দখল করে নেয় তখন তিনি সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ভারতের বিরুদ্ধে।[৫০] একই সঙ্গে অবশ্য তিনি নানারকম পোশাকি নমনীয়তা দেখান। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সাহায্য গ্রহণের কথা আগেই বলা হয়েছে। সামরিক প্রশাসক বদলিয়ে বাঙালি লাট নিয়োগের কাহিনীও বিবৃত হয়েছে এবং একের পর এক ভুয়া ক্ষমা ঘোষণার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু হত্যা ও ধ্বংসকর্মে তাঁর দস্যু বাহিনী কখনো কোনো নমনীয়তা দেখায় নি। তিনি সযতনে বাঙালিদের মোকাবিলা করার ব্যবস্থা নিয়েই চলেন।[৫১] তাঁর অত্যাচার যতোই বাড়তে থাকলো এবং বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের যতোই তিনি অস্বীকার করে চললেন ততোই তাঁর বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিহিংসা দৃঢ়তর হতে থাকে। ১১ আগস্ট বাঙালি গেরিলারা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটালো, তাঁরা চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজ ডুবিয়ে দিল, কিন্তু পাকিস্তান

বলেই চললো যে এসব ভারতীয়দের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ বাঙালি তাই পাকিস্তানি দস্যুদের খতম করতে আরো বদ্ধপরিকর হলো।

ইয়াহিয়ার সর্বশেষ ভুল হলো আমেরিকা ও চীনের সাহায্যের আশায় ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা। সহসা তিনি ছয়টি ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে (শ্রীনগর, পাঠানকোট, অমৃতসর, আম্বালা, আগ্রা এবং জয়পুর) হামলা চালালেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এতে বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে নিষ্পত্তি হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দখল রেখে যুদ্ধবিরতি ঘটবে এবং একান্ত বিপদে আমেরিকা ও চীন তাঁকে উদ্ধার করবে। ভুলের পর ভুলের মাসুল পাকিস্তানি জান্তা শেষ পর্যন্ত পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আদায় করলো।

জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল একদিকে শঠ এবং অন্যদিকে ভ্রান্ত। সারা পাকিস্তানই যেন নেশার ঘোরে ছিল আবৃত। দেশের সর্বসাধারণকে অত্যাচার করে, দেশের সম্পদ লুট ও ধ্বংস করে, সেখানকার মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করে, সেখানকার যুব সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে কি করে যে দেশরক্ষার উদ্যোগ চলে সে সম্বন্ধে প্রায় কেউই তখন আওয়াজ তোলা তো দূরের কথা, একটি প্রশ্নও তোলে নি। বাঙালিরা যে মরিয়া হয়ে হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে এই স্বীকৃতি তারা আজো দিতে কষ্ট পায়। তারা এখনো তাদের যুদ্ধকালীন মিথ্যাচারকে বহাল রাখছে। উপনিবেশবাদের অবসানের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবেও তারা বলে চলেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়েছে ভারতের ষড়যন্ত্রে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এখনো তারা গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাদের এক তরুণ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, কিসিঞ্জারের মধ্যস্থতায় যখন সমঝোতা হয়ে যাচ্ছে, তখন ভারতীয়রা তাদের প্রশিক্ষিত গেরিলাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দেয় এবং পাকিস্তানি দখল দুর্বল করে দেয়। পরিশেষে দুই সীমান্তে (পূর্ব ও পশ্চিম) যুদ্ধ বাধিয়ে প্রদেশটিকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়।[৫২] শুধু ১৯৭১ সালেই তারা ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে উন্মাদ কর্মকাণ্ড সাধন করে নি, আজও তাদের বাঙালি শৌর্য স্বীকার করতে কষ্ট হয়। কোনোদিনই তারা এদেশে গণহত্যা ও ধ্বংসসাধনের জন্য অনুশোচনা করতে এগিয়ে আসে নি। কোনো কোনো গোষ্ঠী যেমন এক নারী গোষ্ঠী এ ব্যাপারে ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য কতিপয় বাঙালি পদলেহী ও দেশদ্রোহীর পাকিস্তানপ্রীতি এখনও পাকিস্তানিদের এই ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখতে সাহস দিয়েছে।

ইয়াহিয়া জান্তা মুহূর্তের জন্যও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো রাজনৈতিক সমাধান চায় নি। এখন পাকিস্তানিদের সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো সম্মানজনক সমাধান ইয়াহিয়া জান্তার মাথায় আসে নি। আর ভুট্টো সবসময়েই চেয়েছেন ক্ষমতারোহণ এবং সেজন্য সামরিক জান্তার বেইজ্জতি ও ধ্বংসসাধন ছিল তাঁর কাম্য। আলমদার রাজা তাঁর স্মৃতিকথায় দুঃখ করেছেন যে, ইয়াহিয়া জান্তা কোনো সময়েই কোনো রাজনৈতিক সমাধান চায় নি। তাদের একটিই উদ্দেশ্য ছিল আর তা ছিল গণহত্যা এবং পাইকারি নিষ্পেষণ। এমন কি কতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেয়া

যেতে পারে সে সম্বন্ধেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না।[৫৩] একই সুরে মন্তব্য করেছেন প্রবল পরাক্রমশালী জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনি অবশ্য আরো বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অশ্লীল ও নির্বোধ সেনাধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি নির্বিবাদে অত্যাচার করতো ও মানুষ খুন করতো এবং ইয়াহিয়া জান্তা এর প্রতিবিধানে মোটেই সচেষ্ট ছিল না। তিনি আরো বলেন যে, গভর্নর ডা. মালিকের শেষ মুহূর্তের উদ্যোগ ছিল একটি রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি। কিন্তু সেটাও ইয়াহিয়া হতে দেয় নি। অথচ কিসিঞ্জার-নিক্সন নাকি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।[৫৪] দুই দেশেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী ছিল জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী—পাকিস্তানে ইয়াহিয়া জান্তা আর আমেরিকায় নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি। এদের যৌথ উদ্যোগে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. সিদ্দিক সালিক : *Witness to Surrender.* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৭৭; অপারেশন সার্চলাইটের বিবরণ দেয়া আছে এই বইয়ে পরিশিষ্ট ৩-এ।
২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য পূর্ণেন্দু দস্তিদার : *স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম,* চট্টগ্রাম আর্ট প্রেস, ১৯৬৭।
৩. পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : *Federal Intervention in Pakistan : President Explains,* ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৪-৭।
৪. পাকিস্তান সরকার : *White Paper on the Crisis in East Pakistan,* ইসলামাবাদ, আগস্ট ১৯৭১।
৫. পাকিস্তান দূতাবাস : পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১৩।
৬. পাকিস্তান দূতাবাস : *Federal Intervention in Pakistan—The Refugee Problem,* ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯৭১, পৃ. ৩।
৭. পাকিস্তান দূতাবাস : *Federal Intervention in Pakistan—President Explains.* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-২১।
৮. পাকিস্তান জাতিসংঘ মিশন : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ১২ অক্টোবরের বিবৃতি, নিউইয়র্ক, ১৯৭১।
৯. সংবাদপত্রে ছাড়াও এই বিষয়ে আমেরিকায় বসবাসকারী বা ভ্রমণরত পাকিস্তানি সরকারি কর্মচারী এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদেশি ব্যক্তিবৃন্দ লেখকের সঙ্গে আলোচনাকালে সমঝোতার অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
১০. *The New York Times,* নিউইয়র্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
১১. লে. জেনারেল জে.এফ.আর. জেকব : *Surrender at Dacca : Birth of a Nation.* ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯৭, ১৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
১২. পাকিস্তান সরকার : ফিল্মস ও পাবলিকেশনস ডিপার্টমেন্ট : *East Pakistan Crisis : Answers to Questions.* করাচি, ১৯৭১, পৃ. ১৯।
১৩. *ওয়াশিংটন পোস্ট,* ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১, Lee Lescaze-এর প্রতিবেদন।
১৪. পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি : *Federal Intervention : The Refugee Problem,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।
১৫. পাকিস্তান দূতাবাস : *Pakistan Affairs,* Embassy of Pakistan Bulletin. ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
১৬. *ওয়াশিংটন পোস্ট,* ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১ এবং *নিউইয়র্ক টাইমস,* ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১।
১৭. *ইভনিং স্টার,* ওয়াশিংটন ডিসি, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১, হেনরি ব্রেডশারের সংবাদ প্রতিবেদনে পূর্ব

পাকিস্তানের মুখ্য সচিবের হিসাব বলে উদ্ধৃত।

১৮. *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা, ২৭ আগস্ট, ১৯৭২, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ২৫ আগস্টের প্রেস রিলিজ।

১৯. *দি টাইমস*, লন্ডন, ১১ জুলাই, ১৯৭১, মারে সেইলের প্রতিবেদন।

২০. *নিউইয়র্ক টাইমস*, ৩০ জুলাই, ১৯৭১, ম্যালকম ব্রাউনের প্রতিবেদন।

২১. জেনারেল টিক্কা খান জুন মাসে বাংলাদেশে ভ্রমণরত বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশন এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ পার্লামেন্টের পর্যবেক্ষণ মিশনকে এই মর্মে বুঝিয়ে দেন।

২২. *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ১৯ আগস্ট, ১৯৭১।

২৩. জেনারেল এম আকবরের বিবৃতি, পাকিস্তান দূতাবাস ওয়াশিংটনের বুলেটিন, ১১ মে ১৯৯৭১।

২৪. ক. ফজল মুকিম খান : *Pakistan's Crisis in Leadership.* ন্যাশনেল বুক ফাউন্ডেশন, করাচী। ১৯৭৩।

খ. হারবার্ট ফেল্ডমেন : *The End of the Beginning : Pakistan* 1969-1971. অক্সফোর্ড প্রেস, করাচী, ১৯৭৫।

গ. গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী : *The Last Days of United Pakistan*, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

ঘ. হেনরী কিসিঞ্জার : *White House Years*, লিটল, ব্রাউন এন্ড কোম্পানি, ১৯৭৯ সাল।

ঙ. রিচার্ড সিসন ও লিও ই রোজ : *War & Secession. Pakistan, India and the Nation of Bangladesh*, ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

চ. হাসান আসকারি রিজভি : *Internal Strife and External Intervention : India's Role in the War in East Pakistan*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯১।

ছ. সিদ্দিক সালেক : *Witness to Surrender* অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, করাচী। ১৯৭৭।

২৫. এই সব বইয়ের মধ্যে আছে

ক. হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan : The Rise & Realization of Bengali Muslim Nationalism*, অক্সফোর্ড প্রেস, করাচী, ১৯৯৪।

খ. এ. বাসিত : *Bangladesh Background Statements : The Breaking of Pakistan : Yahya Speaks about the Bhutto Mujib Interaction that Broke Pakistan*, লিবার্টি পাবলিশার্স, লাহোর

গ. লেফট্যানেন্ট জেনারেল গুল হাসান : *Memoirs*, অক্সফোর্ড, করাচী, ১৯৯০।

ঘ. রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided*, জং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯২।

ঙ. এয়ার মারশাল আসগর খান : *Generals in Politics, Pakistan 1954-1982* ঢাকা, ১৯৮৩।

চ. মেজর জেনারেল তজম্মুল হোসেন মালিক : *The Story of My Struggle* লাহোর, ১৯৯১।

ছ. লেফট্যানেন্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি : *The Betrayal of East Pakistan* অক্সফোর্ড, করাচী, ১৯৯৮

জ. সৈয়দ আলমদর রাজা : *Dacca's Debacle* জং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯৩।

ঝ. জেনারেল কে. এম. আরিফ : *Working with Zia. Pakistan's Power Politcs 1977-1988* অক্সফোর্ড, ১৯৯৫।

২৬. হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization*

of Muslim Bengali Nationalison, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৯৩, পৃ. ৫২২।

২৭. জেনারেল কে. এম. আরিফ : *Working with Zia : Pakistan's Power Politics 1977-1988*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯৫, পৃ. ৪৬-৪৭।
জেনারেল এ.এ. নিয়াজি : *The Betrayal of East Pakistan*, অক্সফোর্ড প্রেস, করাচী, ১৯৯৮, পৃ. ২৫২-২৫৩।

২৮. আবদুল বাসিত : *Bangladesh Background Documents : The Breaking of Pakistan*, লিবার্টি প্রকাশনা, লাহোর। এই বইয়ে প্রদত্ত জেনারেল ইয়াহিয়ার দু'টি বিবৃতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

২৯. জেনারেল কে.এম. আরিফ : *Working with Zia : Pakistan's Power Politics 1977-1988*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৯৫, পৃ. ২১-২৪।

৩০. সৈয়দ আলমদর রাজা ২৩ মেতে ঢাকায় আসেন ও ঢাকা বিভাগের কমিশনারের দায়িত্ব নেন। তিনি ছিলেন একজন সি.এস.পি কর্মকর্তা এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ তিনি বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি একটি বই লেখেন যেখানে তিনি প্রায়ই এই কথাটি বলেছেন, *"Only the rod was being used."*
সৈয়দ আলমদর রাজা : *Dacca's Debacle*, জং পাব্লিশার্স, লাহোর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৭৮। ২৬, ৪৬ পৃষ্ঠায়ও আরো বিবরণ আছে।

৩১. হাসান জাহিরও একজন সিএসপি কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত বাংলাদেশে চাকরী করেন। ১৯৭১-এ তিনি প্রাদেশিক সচিবালয়ে যোগ দেন। ১৯৯৩ সালে তিনি একটি উত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan : The Rise & Realization of Bengali Muslim Nationalism*, অক্সফোর্ড প্রেস, করাচী, ১৯৯১, পৃ. ৩২২।

৩২. *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস*, ৮ অক্টোবর, ৩ নভেম্বর, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১ এবং *দি বাল্টিমোর সান*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭১।

৩৩. *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৩৪. *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ এবং *নিউইয়র্ক টাইমস* ২৬ ও ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৩৫. কামরুদ্দিন আহমদ : *The End of an Epoch : Weekly Freedom,* ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২।

৩৬. জি. ডব্লিউ চৌধুরী ছিলেন ইয়াহিয়ার একজন মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবার পর তিনি বিলেতে গবেষণা কাজে চলে যান। তবে তাঁকে ইয়াহিয়া পরে খণ্ডকালীন সাংবিধানিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং তিনি বিলেত থেকে মাঝে মধ্যে পাকিস্তানে গিয়ে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন। চৌধুরী তাঁর এই দায়িত্ব অস্বীকার করলেও পাকিস্তানীরা দলিল দস্তাবেজ দিয়ে এই দায়িত্ব প্রমাণ করেন। (আলতাফ গওহর : *Review Article, Third World Quarterly,* ১৯৭৫। (বিচারপতি কর্নেলিয়াস প্রণীত সংবিধানের উপর মন্তব্য চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে করেছেন।
জি. ডব্লিউ চৌধুরী : *The Last Days of United Pakistan*, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ. ১৯১-১৯২, ১৯৬।

৩৭. পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি : *Bulletin,* ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৩৮. *দি টাইমস*, লন্ডন, ১২ জুলাই ১৯৭১।

৩৯. *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৪০. হেনরী কিসিঞ্জার : *White House Years*, লিটন, ব্রাউন এন্ড কোম্পানি, বোস্টন, ১৯৭৯। পৃ. ৮৬৯-৮৭৩।

মঈদুল হাসান : *মূলধারা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯৩-১০০।

৪১. হেনরী কিসিঞ্জার ৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে এক আলোচনায় এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই ব্রিফটি সিনেটর গোল্ডওয়াটার ৯ ডিসেম্বরে কংগ্রেসে উপস্থাপন করেন। রেকর্ড সুপারিন্টেনেডেন্ট : *The Congressional Record*। ওয়াশিংটন ডিসি, সরকারি মুদ্রণ প্রেস, ১৯৭১। সিনেটর গোল্ডওয়াটারের বক্তব্য ও সংযোজন, পৃষ্ঠা এস ১০১২-২০২৬।

৪২. এনায়েত ও জয়েস রহিম : মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গোপন মার্কিন দলিল : বিজয় দিবস সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯, ঢাকা

৪৩. *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ১০ ও ১১ আগস্ট, ১৯৭১।

৪৪. *নিউ ইয়র্ক টাইমসে* উদ্ধৃত ভিরাটেলের সাক্ষাৎকার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

৪৫. হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪-৩৪৬।

৪৬. জেনারেল কে.এম. আরিফ : *Working with Zia*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।

৪৭. *ইভনিং স্টার*, ওয়াশিংটন ডিসি, ১২ মে, ১৯৭১।
নিউ ইয়র্ক টাইমস, নিউইয়র্ক, ১৩ মে ১৯৭১।
বাল্টিমোর সান, বাল্টিমোর, ১৩ মে, ১৯৭১।

৪৮. *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ২৬ জুন ১৯৭১, বার্নার্ড নসিটারের প্রতিবেদন এবং এ.এম.এ. মুহিত : *American Responses to Bangladesh Libration War :* ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১০১-১০৪।

৪৯. *নিউ ইয়র্ক টাইমস* : ৫ আগস্ট ১৯৭১, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সংবাদ সম্মেলনের বিবরণ।

৫০. *ফাইনানসিয়েল টাইমস*, ১৯ জুলাই, ১৯৭১।

৫১. *নিউইয়র্ক টাইমস*, ৩১ জুলাই, ১৯৭১।

৫২. অধ্যাপক শামীম আখতার : *The Trauma of 1971*, *The Dawn*, Pakistan at Fifty Years Supplement, ১৪ আগস্ট, ১৯৯৭।

৫৩. সৈয়দ আলমদর রাজা *Dacca, Debacle*, জাং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১-১৩২।

৫৪. জেনারেল রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided*, জাং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯২, পৃ. ৯৩, ১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৪৩-১৪৬।

চতুর্দশ অধ্যায়

কালরাত্রির অবসান : জয় বাংলা

মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এক হিসেবে প্রায় দুশো বছরেরও বেশি দীর্ঘ। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে রুখে দাঁড়িয়েছে, আবার আনুগত্যও দেখিয়েছে অনেক। এই প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একীভূত হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ অন্যদিকে প্রায় হাজার বছর ধরে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে উপমহাদেশ বিভক্তির প্রশ্ন যখন সামনে আসে, তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা স্পৃহা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতির ঘুরপাকে যুক্ত বাংলার আন্দোলন ব্যর্থ হয়। পূর্ব বাংলা স্বেচ্ছায় পাকিস্তান গড়তে ব্রতী হয়; কিন্তু শুরু থেকেই জটিলতা বাড়তে থাকে। বাঙালি স্বাতন্ত্র্য পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশিত হতে থাকে এবং সুপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার জোর পায়। পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা তাদের ন্যায্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এই প্রচেষ্টা ১৯৭১-এর মার্চে ব্যর্থ হলে শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। অপরিসীম ত্যাগ ও একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য এই মুক্তিযুদ্ধে মাত্র নয় মাসে নিয়ে আসে সাফল্য। পাকিস্তানের মরণ ইচ্ছা যেমন এই সাফল্যে অবদান রাখে তেমনি অবদান রাখে ভারতের সার্বিক সহায়তা—আশ্রয় দানে, যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণে এবং সর্বশেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক চালও বিজয় ছিনিয়ে আনতে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা রাখে।

ইয়াহিয়ার ঔদ্ধত্য ও বর্বরতার ফসল ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। কিন্তু এমনও সময় গেছে যখন মনে হয়েছে যে এটি একটি কাগুজে ঘোষণায় না পর্যবসিত হয়। শুধু বিশ্বাস ও দৃঢ়চেতনাই যথেষ্ট ছিল না, রীতিমতো একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ছিল অতি প্রয়োজনীয়। শুধু আশ্রয়ই যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন ছিল প্রশিক্ষণ ও রসদের সাহায্য। পাকিস্তানকে একঘরে করার উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয় কিন্তু তাতেই তাদের পরাজয়

হতো না, তাদেরকে উচ্ছেদের জন্য শক্তি আহরণের প্রয়োজন ছিল। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব শুধু দৃঢ়চিত্ত হলেই চলতো না, তাকে প্রয়োগবাদী হওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

যুদ্ধের শুরুতে যখন পাকিস্তানিরা মুক্তিসেনাদের সীমান্তের বাইরে বিতাড়নে সক্ষম হয়, তখন অনেকেই সমঝোতার কথা চিন্তা করেন। ইয়াহিয়া বলেন যে, তিনি যুক্তিবাদী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দির কন্যা আখতার সোলায়মান সহসা রাজনৈতিক অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন তাঁর পিতার অনুসারীদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার মিটমাট করবার দাবি নিয়ে। অনেক রাজনৈতিক দূরদর্শীর মতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল অলীক। এমন কি ভারতে অনেক সংবাদ মাধ্যম অভিমত প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।[১] ৪ মে বাংলাদেশের এক মুখপাত্র সমঝোতার শর্তাবলি নির্ধারণ করে দেন। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। ২৩ বছরের অর্থনৈতিক শোষণের খেসারত দিতে হবে। ১৯৭১ সালে যে জীবন ও ধনসম্পদ খোয়া গেছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং সর্বশেষে নুরেমবার্গ বিচারের ধারায় পশ্চিম পাকিস্তানি দস্যুদের নৃশংসতার বিচার করতে হবে।[২] ৬ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আলোচনায় চার শর্ত বেঁধে দেন। এই চারটি শর্ত ছিল : ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি, ২. বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা প্রত্যাহার; ৩. সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি এবং ৪. যুদ্ধকালীন ক্ষতির জন্য খেসারত।[৩] জেনারেল ইয়াহিয়া বস্তুতপক্ষে কোনো রকম সমঝোতার উদ্যোগ কখনো নেন নি। কিন্তু বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের নমনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণা দেন। ২৮ জুন ইয়াহিয়া তাঁর বহু প্রত্যাশিত ঘোষণা দেন কিন্তু এতে সমঝোতার কোনো ইঙ্গিতই ছিল না। পরিবর্তে ১৯ জুলাই *ফাইনানসিয়েল টাইমসের* ন্যাভিল ম্যাক্সওয়েল জানালেন যে, ইয়াহিয়া অতি সত্বর দেশদ্রোহিতার অপরাধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার শুরু করবেন।[৪] ১২ অক্টোবর ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে তাঁর পরবর্তী ঘোষণা দেন। কিন্তু এতে দেখা গেল যে, কোনোমতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়ার তাঁর কোনো ইচ্ছাই ছিল না।[৫] ইতোমধ্যে তিনি বেশির ভাগ আওয়ামী লীগ সাংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নির্বাচন বাতিল করে দেন। একপক্ষীয় বিচারে তাঁদের অনেককেই গণহত্যা ও দেশদ্রোহিতার আসামি হিসেবে শাস্তি দেয়া হয়। তাঁর সেনাবাহিনী মহানন্দে গণহত্যা, গণধর্ষণ এবং ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। সময় যতো যেতে থাকলো তিনিও ততো ক্ষ্যাপা এবং বেপরোয়া হতে থাকলেন। বাংলাদেশের কোনো শত্রু স্বাধীনতা যুদ্ধকে এতো সফলভাবে এগিয়ে দিতে পারতো না। ইয়াহিয়ার কৌশলই মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য বয়ে নিয়ে আসে। মুক্তিবাহিনী ইতোমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, এমন উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনী খুব কমই দেখা গেছে। ভারত সরকারের সর্বাত্মক সমর্থন ও বিশ্ব জনমতের ইতিবাচক মনোভাব মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে দেয়। বাংলাদেশ সরকারও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যও খুব কাজে আসে। প্রবাসীদের সাহায্য ছাড়াও মুজিবনগর সরকার

পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা অর্থের সদ্ব্যবহার করে এবং বাংলাদেশের কিছু রফতানি আয়ও তাদের হাতে আসে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মাত্র নয় মাস স্থায়ী হয়। পাকিস্তানের 'মহিমান্বিত সেনাবাহিনী'কে অতি সহজেই 'নিরস্ত্র বাঙালি' পরাস্ত করে। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের কোনো আশ্রয় ছিল না এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙালিরা ছিল ব্যাকুল, ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত। যুদ্ধ পরিচালনায় এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের অনবদ্য দক্ষতায় নিহিত ছিল এর চূড়ান্ত সাফল্য। শুরু থেকেই তাজউদ্দিন আহমদ খুব সাবধানে এবং সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেন। অন্য নেতৃবৃন্দ সীমান্ত অতিক্রম করবার আগেই তিনি বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। অন্তর্কলহে লিপ্ত নানা বাহিনীকে তিনি সুকৌশলে বশে রাখেন। সেনাধিনায়ক এম.এ.জি. ওসমানী এবং ভারতীয় সেনানায়কদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি পারদর্শিতা দেখান। আওয়ামী লীগের দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সব দলকে একত্র করেন এবং মুক্তিবাহিনীতে সব মতের যুবক-কিশোরের যোগদানের পথ উন্মুক্ত করেন। সামগ্রিক যুদ্ধ উদ্যোগের জন্য উপদেষ্টা কমিটিতে সব দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা তাঁরই প্রচেষ্টায় সফল হয়। প্রবাসী সরকারে একটি নির্দলীয় ও দক্ষ প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলা তাঁর দক্ষতার পরিচয়। বিজয়ের আশাতেই এই দূরদর্শী নেতা প্রস্তুতি নেন যথাসময়ে। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল কি করে বেসামরিক প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলা যাবে, কেমন করে মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, কি ভাবে পল্লী উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে, কিভাবে জাতীয় মিলিশিয়া গড়ে তোলা যাবে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তাজউদ্দিনের জীবন ছিল কর্মময়, ত্যাগে উদ্দীপ্ত এবং চিন্তায় সুদূরপ্রসারী। অনেক নেতা তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন বা একগুঁয়েমি অপছন্দ করতেন। যুবনেতারা তাঁকে পদে পদে বাধা দেন এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে গড়িমসি করেন। কিন্তু সব ষড়যন্ত্রের উর্ধ্বে তিনি ছিলেন একাগ্র মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোগ্য ও সতর্ক নেতা। তাঁর একটি জায়গায়ই ছিল ভরসা ও সমর্থন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁকে দেন অকুণ্ঠ সমর্থন ও উজ্জ্বল আশাবাদ। তাজউদ্দিনের স্বপ্ন এবং সাধনা গোটা বাঙালি জাতির আশা প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা সফল করে। শরণার্থী কেন্দ্রে, মুজিবনগরে, প্রবাসে ও দখলিকৃত বাংলাদেশে তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন সব আশাভরসার মূর্ত প্রতীক।

ভারতের কৌশল

ভারতের ছিল মহা সমস্যা। প্রতিবেশী এক দেশ থেকে লাখ লাখ জনতা মৃত্যু ও সন্ত্রাসের মুখে সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় নিতে ছুটে আসছে। সেই দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এসে বিদেশি দখলদারকে উচ্ছেদ করবার জন্য সাহায্য চাইছেন। কি দুর্বুদ্ধিতেই-না জেনারেল ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন যে, ভারত তার সীমান্তে একটি জাতির হত্যা নীরবে অবলোকন করবে এবং স্বদেশে প্রায় কোটি খানেক আশ্রয় প্রার্থীকে গ্রহণ করবে। এই সঙ্কটের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া ভারতকে নিতান্তই শঙ্কাগ্রস্ত করে। লাখ

লাখ শরণার্থীর আগমনে যে অর্থনৈতিক চাপ এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় তা ছিল অসহনীয়। এতো বিপুল শরণার্থীর ভারতে পুনর্বাসন ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং তাদেরকে যে-কোনোভাবেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো ছিল অবশ্য-কর্তব্য। এই জন্য সমাধান ছিল মাত্র একটি—বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমঝোতা। শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশে সামরিক অত্যাচার বন্ধের দাবি তোলেন। তিনি বিশ্বের দরবারে এই ব্যাপারে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে আবেদন জানান। দূত পাঠিয়ে এবং নিজে গিয়ে তিনি বিশ্বনেতৃত্বকে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করেন এবং তাঁদের সদিচ্ছা ও সহায়তা কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি সাবধান করে দেন যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতকে তার নিরাপত্তা রক্ষা এবং ভারতীয় সমাজ কাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।[৬] ভারত চায় এমন একটি সমঝোতা, যা বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পাকিস্তানের আলোচনার সুপারিশ প্রদান করে।[৭] ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই বাণী নিয়ে যান মস্কো, বন, লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, অটোয়া এবং ওয়াশিংটন। শ্রীমতী গান্ধী নিজে যান মস্কো, লন্ডন, ব্রাসেল্‌স্‌, ভিয়েনা, প্যারিস, বন ও ওয়াশিংটনে। কিন্তু ইয়াহিয়া কোনো মতেই সমঝোতায় পৌঁছবেন না, শেষ মুহূর্তেও তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না। ভারতের আর একটি দুশ্চিন্তা ছিল বাংলাদেশে সহিংসতার বিকাশ নিয়ে। প্রতিরোধের মুখে দখলদার বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা দেশবাসীর কাছে অসহনীয় ছিল। মুক্তিবাহিনীর শক্তি সঞ্চয় বাংলাদেশে অবধারিতভাবে সহিংসতা বৃদ্ধি করছিল৭ সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশবিকভাবে সম্ভাব্য বিনাশ ছিল সত্যিই ভয়াবহ ও আশঙ্কাজনক।

কিন্তু পাকিস্তানে কোনো রকম শুভবুদ্ধির উদয় হলো না। সে ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে মুক্তিবাহিনীকে শক্তিশালী করা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ভারত অতি ধীরে তার কৌশল নির্ধারণ করে। মার্চ-এপ্রিলে যখন পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত তখন কড়া বিবৃতি, শক্ত প্রস্তাব ইত্যাদি অনবরত ব্যক্ত হতে থাকে। ভারতীয় লোকসভা ৩১ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববাংলার বিজয় কামনা করে। সারা বিশ্বকে পাকিস্তানকে এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিরস্ত করতে আবেদন জানায় এবং পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি ঘোষণা করে।[৮] ভারতে শরণার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকলে সঙ্কট একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ছিল এক বিষয়, এখন শরণার্থীদের আশ্রয় দান ও তাদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা হয়ে দাঁড়ায় অন্য একটি সমস্যা। অবশ্য এই দুই সমস্যার সমাধান ছিল একই, পূর্ব বাংলায় বাঙালি প্রতিনিধিদের ক্ষমতা গ্রহণ, আওয়ামী লীগের কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর। বিশ্বজনমতকে ভারত পাকিস্তানে চাপ প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে বিকল্পেরও চিন্তা করতে থাকে। মে মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সরেজমিনে সীমান্ত এলাকায় অবস্থা দেখে আসেন। মে মাসের শেষেই মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশে যুদ্ধের নীলনকশা তৈরি করা হয়। সারা দেশকে

চার সেক্টরে ভাগ করে খুলনা ও চট্টগ্রাম এবং মফস্বলের বড় শহর ও ছাউনি দখল করে ঢাকা পতনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই কৌশল ধীরে ধীরে পরিবর্তনও করা হয়। অভিযান শুরুর পরে ত্বরিৎগতিতে ঢাকায় পৌঁছে যাওয়ার কৌশলই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গেরিলাদের মোকাবিলা করতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, তাদের ঘাঁটি হবে সীমান্ত এলাকায়— যশোরে, সৈয়দপুরে, সিলেটে, কুমিল্লায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের ঘাঁটিগুলো এড়িয়ে গিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়াই হয় ভারতীয় কৌশল। একদিকে এই প্রস্তুতি চললো, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে জোর দেয়া হলো। পাকিস্তানিদের ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের মনোবল হরণ করতে গেরিলা তৎপরতা জোরদার না হলে চলবে না। শুরু থেকেই ভারতের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ করতে হলে তা শীতকালেই করতে হবে, যখন চীন-ভারত সীমান্ত বরফাবৃত থাকবে। ২৫ মে যখন ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব আলোচিত হয়, তখন সরকারের অভিমত ছিল যে, পাকিস্তানের সুমতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের তখনো সুযোগ ছিল, তাই স্বীকৃতির বিষয় এখন বিবেচনায় নেয়া উচিত নয়।

ভারত সরকার অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে কূটনৈতিক উদ্যোগ বহাল রাখলো। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বত্র জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং সরকারি পর্যায়ে সর্বত্র জোর তদবির চলে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ শিং ৬ জুন থেকে ২২ জুন মস্কো, বন, প্যারিস, অটোয়া, ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং নিউইয়র্ক সফরে যান। ছয়টি প্রধান বিশ্বশক্তি এবং জাতিসংঘে তিনি দরবার করেন। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং শরণার্থী সমস্যার জটিলতা ব্যাখ্যা করেন। সকলের কাছে তিনি পাকিস্তানের সুমতির জন্য চাপ প্রয়োগের আবেদন করেন। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ করে পাকিস্তানকে গণহত্যা থেকে নিবৃত্ত করতে তিনি উপদেশ দেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যে, রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না এবং শরণার্থীরাও ফেরত যাবে না। সেই রাজনৈতিক সমঝোতার পথে জেনারেল ইয়াহিয়াকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সারা বিশ্বের এবং বিশেষ করে তাঁর বন্ধু ও সহায়ক দেশগুলোর।[৭] নির্দলীয় সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশের পক্ষে র‍্যালিতে গেলেন জুন মাসে। এই কূটনৈতিক উদ্যোগ নানাভাবে অব্যাহত থাকে নভেম্বরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। আগস্টের ১০ তারিখ শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত বিচারের উদ্দেশ্যই হলো পূর্ব বাংলার অবিসম্বাদিত নেতাকে হত্যা করা এবং এতে পরিস্থিতি আরো জটিল ও উত্তপ্ত হবে।[৮] অবশেষে শ্রীমতী গান্ধী নিজেই সোভিয়েত রাশিয়া, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানি সফরে যান। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেন। যদিও এই সফরে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি নিয়ে অনেক বক্তব্য আসে, বাংলাদেশ সঙ্কট ছিল আলোচনার মূল আকর্ষণ। শ্রীমতী গান্ধী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্গতি বিশ্ব বিবেককে জাগাতে নিতান্তই ব্যর্থ হয়েছে। এশিয়ায়

শান্তির প্রতি হুমকি খুবই প্রকট অথচ তা কেউ নজরে আনছে না।[৯] অক্টোবরের শেষে এক নাগাড়ে ছয়টি দেশে শ্রীমতী গান্ধী যান। এবং সর্বত্র তাঁর ছিল একই আবেদন, পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমঝোতায় যেতে উদ্বুদ্ধ করুন। এই সফর শেষে ১৫ নভেম্বর তিনি লোকসভায় এর একটি বিবরণ দেন। এক কথায় তিনি বললেন যে, বিশ্ব নেতাদের তিনি সঙ্কটের আশু রাজনৈতিক সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন। বাংলার মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা এবং ভারতের ওপর শরণার্থীদের অসহ্য চাপের কথা তিনি তুলে ধরেন। তিনি সকলের কাছেই সহানুভূতির বাণী শোনেন এবং সবাই জানান যে, যুদ্ধ পরিহার করে তাঁরা একটি সমাধান চান। তবে তিনি খেদোক্তি করেন যে, কোনো নেতা কিছু করতে পারবেন বলে বিশ্বাস নেই, পাকিস্তানে কিভাবে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হবে সে বিষয়ে কেউ আশাবাদ দিতে পারেন নি।[১০] ওয়াশিংটনে আলোচনা মোটেই ফলপ্রসূ ছিল না। শ্রীমতী গান্ধীর কথা ছিল ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ কিন্তু নিক্সন-কিসিঞ্জার সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে অপারগ ছিলেন। কূটনৈতিক উদ্যোগের এই ব্যর্থতা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে এ ব্যাপারে এক ধরনের নীরবতা শ্রীমতী গান্ধীর জন্য যুদ্ধ পরিহারের কোনো উপায় রাখলো না। যুদ্ধে ছিল বিরাট ঝুঁকি। ঝটপট শেষ করতে পারলে তার সুফল ছিল অশেষ। বাঙালিদের দুর্ভোগ শেষ হবে। পূর্ব সীমান্তে বন্ধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাবে। শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবে। একটি জাতির দুর্বৃত্তায়ন রোধ করা যাবে। একটি প্রলম্বিত গেরিলা যুদ্ধে সহায়তার চেয়ে একটি নাতিদীর্ঘ সার্বিক যুদ্ধ খরচের দিক দিয়েও বোধহয় ছিল গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি দুই রণক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়, বিজয় না হয় এবং মধ্যপথে যুদ্ধবিরতি মানতে হয় তাহলে প্রলম্বিত দুর্ভোগের আর শেষ হবে না।

ভারতের সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল চীনকে নিয়ে। জুলাই মাসে যখন মার্কিন-চীনা সমঝোতার খবর প্রকাশ পেল এবং এতে পাকিস্তানের ভূমিকা জানা গেল, তখন ভারতের ভাবনা আরো প্রকট আকার ধারণ করলো। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৬৯ সালেই এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির বিষয় উত্থাপন করে। ১৯৬৩ সাল থেকেই চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বনিবনা খুব ভালো ছিল না। ব্রেজনেভের এশীয় নিরাপত্তা চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা। এই প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের কাছেই উত্থাপন করা হয়। শুরুতে কোনো দেশই তাতে বিশেষ সাড়া দেয় নি। ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা কিন্তু অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ সঙ্কটে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের সময় ভারতের বন্ধুর সন্ধান খুব জোরদার হয়। চীনের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনও তাদের বেশ সন্ত্রস্ত করে তোলে। মে মাসে রাশিয়া মিশরের সঙ্গে এক নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করে। ওয়ারসো জোটের বাইরে অন্য দেশের সঙ্গে এইটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় মৈত্রী চুক্তি। ১৯৪৮ সালে অবশ্য ফিনল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার এক চুক্তি হয় কিন্তু দুই প্রতিবেশীর মধ্যে এই চুক্তি ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। মিশরের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলি ভারতের জন্য ছিল ভরসার ব্যাপার। এই চুক্তিতে ওয়ারসো চুক্তির মতো কোনো অসম শর্ত ছিল না এবং এক দেশের যুদ্ধে অন্য

দেশের অংশগ্রহণ বা সাহায্য প্রদান ছিল আলোচনার বিষয়। ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি যখন আলোচিত হচ্ছে তখন জুলাই মাসের ১৫ তারিখ প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর চীন সফরের ঘোষণা দিলেন। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে চীন গিয়ে এই সফর ও শীর্ষ বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। এই ঘোষণার পর ভারত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপত্তার বিষয়ে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ৯ আগস্ট ভারত-রাশিয়া শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ঘোষিত হয়। ২০ বছর মেয়াদি এই চুক্তিটি ১২ দফায় সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির আট, নয় ও দশ দফা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি দফায় নিম্নোক্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত হয় : প্রথমত, একপক্ষ এমন কোনো নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না, যাতে অন্য পক্ষের সামরিক বিপত্তি হতে পারে; দ্বিতীয়ত, এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে কোনো আগ্রাসন চালাবে না অথবা তার এলাকা থেকে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে কাউকে আগ্রাসনের সুযোগ দেবে না; তৃতীয়ত, একপক্ষকে যদি অন্য কেউ আক্রমণ করে তবে সেই তৃতীয় দলকে অন্য দল কোনো সাহায্য দেবে না; চতুর্থত, একপক্ষ কোনো তৃতীয় পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে এই হুমকি বা আগ্রাসন নিবৃত্তির জন্য দুই পক্ষ আলোচনায় বসবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই মৈত্রী চুক্তি ভারতকে আশ্বস্ত করলো এবং বাংলাদেশ সঙ্কটে চীনের সরাসরি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস করলো। এই চুক্তি বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতি বলীয়ান করে এবং সামরিক বাহিনী বা কৌশল নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার করে। এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে সংযত করা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, চুক্তিটির ২০ বছরে কখনো এক পক্ষকে আর এক পক্ষের সরাসরি সাহায্য কামনা করতে হয় নি। ১৯৭১ সালে এই চুক্তিতে নিহিত হুমকিই ছিল যথেষ্ট।

সেপ্টেম্বরে যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হলো, তখন আশা ছিল যে বিশ্ব বিবেকের কষাঘাতে পাকিস্তানের উন্মাদনা নিয়ন্ত্রণে আসবে। পরিস্থিতির গুরুত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৭ সদস্যের এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করে। জাতিসংঘে অনেক দেশের প্রতিনিধি সঙ্কট সম্বন্ধে মন্তব্য করেন কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধাবার কেউ ছিলেন না। প্রভাবশালী দেশের নেতারা, বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার সালেক ডগলাস হোম, কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিশেল সার্প, ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী শুম্যান, সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো সবাই রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বললেন, সাবধান করে দিলেন যে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে শরণার্থীরা ফিরবে না এবং যুদ্ধের হুমকি অকার্যকর হবে না; কিন্তু পাকিস্তানের সুমতি হলো না। আমেরিকা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয় আর চীন পাকিস্তানের শত্রুদের গালিগালাজ দিয়ে তাদের প্রগাঢ় সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলো। বলা যেতে পারে, এই দুই শক্তির উসকানিতে পাকিস্তান ধরাকে সরা জ্ঞান করে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হলো। পাকিস্তানের কৌশল হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটি পাক-ভারত দ্বন্দে

পরিণত করে তাতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা। তারা অক্টোবরের শেষে প্রস্তাব দিল যে পাকিস্তান আর ভারতের সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকা থেকে সরে দাঁড়াবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা সেখানে মোতায়েন হবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনীর আশ্রয় ও ভরসা নির্মূল করা। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় ও দক্ষতায় ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকে এবং তাদের গেরিলা তৎপরতা পাকিস্তানকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সব জেলা শহরে তাদের আস্তানা স্থাপন করে এবং তাদের অভিযান সবসময় চলে দল বেঁধে আর দিনের আলোকে। সাংবাদিকরা মন্তব্য করেন যে, রাতের শুরুতে সারাদেশ মুক্তিবাহিনীর কবলে চলে যেত আর পাকিস্তানিরা ভয়ে ভয়ে তাদের ক্যাম্প বা ছাউনিতে অবস্থান করতো।[১০] গেরিলা বাহিনী এতো সাহস সঞ্চয় করে যে দেশের গভীরে তারা তৎপরতা চালাতে থাকে আর প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে কুণ্ঠিত হতো না।[১১] অক্টোবর-নভেম্বরে পাকিস্তান ও ভারত দুই দেশেই যুদ্ধবাজরা ছিল সোচ্চার। মুক্তিযুদ্ধও ততদিনে হয়েছে অনেক ব্যাপক ও শক্তিশালী। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রথমবারের মতো মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মুক্তিবাহিনী তখন অনেক এলাকা তাদের দখলে নিয়ে এসেছে। পাকিস্তানিরা তাদের দখলচ্যুত করতে যেখানে সম্ভব সেখানে কামান দাগে এবং তাতে সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাও বাদ পড়ে না। আবার কোথাও মুক্তিবাহিনী বা গেরিলাদের ধাওয়া করে তারা ভারতে ঢুকে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড নীতিগতভাবে আত্মরক্ষার্থে অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে বাংলাদেশে তৎপরতার এই হয় সূচনা। পাকিস্তানকে যদি তবুও সংলাপে বসানো যায়; কিন্তু ইয়াহিয়া জান্তার সেই মানসিকতাই ছিল না। কিসিঞ্জার দাবি করেন যে, তাঁরা সংলাপের ব্যবস্থা যখন প্রায় চূড়ান্ত করতে যাচ্ছেন তখনই ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে সব বানচাল করে দেয়। আবার তিনিই প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে স্বীকার করেন, "আমরা ইসলামাবাদ সরকার ও শেখ মুজিবের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংলাপের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলাম। তবে যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় তখনও আমরা এই প্রক্রিয়ার বিষয়ে ইসলামাবাদ সরকারের সম্মতি পাই নি।"[১২] শ্রীমতী গান্ধীর বিশ্ব সফর শেষে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সঙ্কট সমাধানের অন্য উপায় সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে আত্মরক্ষার্থে অনুপ্রবেশের নীতিকে আরো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। ২১ নভেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে ভারি অস্ত্র এবং কামানের ব্যবহার নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ২৯ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী যশোর ছাউনি দখলের উদ্যোগ নেয় এবং ভারতীয় বাহিনী তাদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। একইভাবে উত্তর-পশ্চিমে হিলি অভিযানে এবং দক্ষিণ-পূর্বে আখাউড়া-বেলোনিয়া অভিযানে ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। তখনও পাকিস্তানের একটি সমঝোতায় পৌঁছার সুযোগ ছিল।

ভারতকে তার কৌশলের সাফল্যের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থান পরখ করে দেখতে হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ভারত বিভাগ হলে স্বাধীন দুটি দেশের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক চায়। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে সোভিয়েত রাশিয়াই

প্রথম আমন্ত্রণ জানায়। লিয়াকত আলী খান আমেরিকা সফর করেন কিন্তু রাশিয়া সফরের আগেই তিনি আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর। পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র আমেরিকার প্রভাব বলয়ে আশ্রয় নেয় এবং ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাক-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয়। পাকিস্তান ক্রমে বিভিন্ন মার্কিন আঞ্চলিক চুক্তি সংস্থার সদস্য হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থার (তা প্রথম পর্যায়ে বাগদাদ চুক্তি হিসেবে পরিচিতি ছিল) সদস্য হয় পাকিস্তান। পাকিস্তানের পেশওয়ারে একটি মার্কিন বিমান ঘাঁটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বৈরীভাবাপন্ন ছিল এবং ভারতের সঙ্গে রাশিয়া সম্পর্ক হয় খুব ঘনিষ্ঠ। আইউবের সামরিক সরকার রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে মনোযোগ দেয়। ১৯৬০ সালে তেল ও গ্যাস উত্তোলন বিষয়ে পাকিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তির অধীনে সোভিয়েত কারিগরি ও অর্থ সাহায্য পাকিস্তানে আসতে থাকে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তান নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে সোভিয়েত উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট আইউব ও প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দ চুক্তি সই করে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ করে দেন। আইউব সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণে যান, পেশওয়ারের বিমান ঘাঁটির চুক্তি নবায়ন করেন নি এবং সোভিয়েত সামরিক সাহায্যের প্রত্যাশী হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ও রাশিয়ার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের এবং আরো উত্তম সম্পর্কের প্রত্যাশা ছিল। সোভিয়েত সরকার বাংলাদেশ সঙ্কটে প্রথমদিকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে এবং রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানায়। সরদার শরণ সিং জুন মাসে যখন মস্কো যান, তখন বাংলাদেশ সঙ্কট সম্বন্ধে সোভিয়েত বক্তব্য ওয়াশিংটনের বক্তব্য থেকে খুব পৃথক ছিল না। কিন্তু রাশিয়া যেখানে জরুরি ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান চাচ্ছিল সেখানে আমেরিকা এই বিষয়ে ততো গুরুত্ব দিতে রাজি ছিল না। ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পরেও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে (সচিব) তারা মস্কো ভ্রমণে আমন্ত্রণ জানায়। গুজব রটে যে, তারা মৈত্রী চুক্তিতে আগ্রহী।[১৩] অনুমিত হয় যে, অক্টোবর পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যাশা ছিল যে পাকিস্তান শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা করবে। সেপ্টেম্বরে তাঁরা জোরেশোরে সংলাপের আহ্বান জানায়। জাতিসংঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতায় এই আশা ব্যক্ত করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর এবং পরদিন শ্রীমতী গান্ধীর মস্কো সফরকালেও একই আশা ব্যক্ত হয়। ১৪ অক্টোবর তেহরানে প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে আলোচনায়ও সোভিয়েত বক্তব্য ছিল রাজনৈতিক সমঝোতার। কিন্তু সোভিয়েত মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দেয় নভেম্বরের শুরুতে। তারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, পাকিস্তান কোনো রকম সমঝোতায় বিশ্বাস করে না। তাদের বিচারে আরো প্রতীয়মান হয় যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বাইরের তৃতীয় পক্ষ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না এবং বাংলাদেশের মুক্তি খুব সহজেই অর্জিত হবে। সোভিয়েত মনোভাবের এইরকম

বিশ্লেষণ ভারতকে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসতে ভরসা দেয়। পাক-ভারত যুদ্ধে কোনো তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণ রাশিয়া যে নাকচ করে দেবে সে বিষয়ে ভারত মোটামুটি নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান খুব নাজুক পর্যায়ে পৌছয়। অক্টোবরেই তাদের মধ্যে ভীতি ও হতাশা বাসা বাধে, গেরিলাদের ভয়ে তারা ছিল আতঙ্কিত। একটি নিয়মিত বাহিনীর এই রকম নৈতিক অবক্ষয়ের নজির পাওয়া মুশকিল। পাকিস্তান বাহিনী ছিল বস্তুত পক্ষেই একটি পলায়নপর বাহিনী। তারা ছোট ছোট ছাউনি বা ক্যাম্প ছেড়ে বিভাগীয় সেনানিবাসে সমবেত হতে থাকে, সেখানে শক্ত দুর্গ গড়ার নীতি তারা অবলম্বন করে। তাদের অন্য কৌশল হয় কোনো রকমে যুদ্ধবিরতি করে প্রাণ নিয়ে পলায়ন। এই লক্ষ্যে সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করে পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঁচবার সুযোগ দিতে পাকিস্তান সচেষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় যখন ব্যর্থ হলো তখন নির্বোধের মতো তারা ভারতের ছয়টি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালায়। ৩ ডিসেম্বর সহসা পাকিস্তান বিমান বাহিনী শ্রীনগর, পাঠানকোট, আম্বালা, অমৃতসর, জয়পুর এবং আগ্রা বিমানবন্দরে হামলা চালায়। দুই দেশের মধ্যে তাতে শুরু হয় অঘোষিত সরাসরি যুদ্ধ। পশ্চিম সীমান্তে ভারতের কৌশল হয় পাকিস্তানকে ঠেকিয়ে রাখা এবং সুযোগমতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কবজা করা। পূর্বাঞ্চলে মে মাসে রচিত এবং পরবর্তীকালে সংশোধিত নীলনকশা অনুযায়ী চারটি সেক্টরেই পুরোদমে অভিযান শুরু হলো। এই চার সেক্টরের যুদ্ধ-কৌশল ও সেনাপতিদের বিবরণ পরিশিষ্ট ১৩-তে দেয়া হলো। মোটামুটিভাবে ভারতীয় কৌশল ছিল পাকিস্তানি প্রতিরোধ ক্ষয় করে দ্রুতগতিতে ঢাকায় পৌছানো, কোথাও শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া, তবে পাকিস্তানিদের তাদের দুর্গ থেকে বেরুবার সুযোগ বন্ধ করা।[১৪]

পাকিস্তানি সেনাধিনায়ক জেনারেল নিয়াজির কৌশল ছিল তাঁর বাহিনীকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে বড় শহরগুলোতে দুর্গ গড়ে তোলা।[১৫] তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, বন্ধু বাহিনী (চীন ও আমেরিকা) হস্তক্ষেপ করবে এবং তখন তিনি সারা দেশ তাঁর দখলে দেখাতে সক্ষম হবেন। যশোরের দায়িত্ব ছিল মেজর জেনারেল আনসারীর এবং তাঁর প্রধান ঘাঁটি ছিল যশোর, ঝিনাইদহ এবং খুলনায়। উত্তর বাংলার দায়িত্ব ছিল মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের, তাঁর প্রধান দফতর ছিল নাটোরে আর বড় ঘাঁটি ছিল দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায়। পূর্ব এলাকার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকাস্থ মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজি। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ আর সিলেটে ছিল প্রধান ক'টি ঘাঁটি। চট্টগ্রাম ছিল ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লার স্বাধীন দায়িত্বে। শেষ মুহূর্তে আরো দুটি কমান্ড গঠন করা হয়। একটি কমান্ড হয় ঢাকায় মেজর জেনারেল জামশেদের অধীন আর তাঁর ঘাঁটি হয় ভৈরব বাজারে। অন্য কমান্ডেরও সদর দফতর ছিল ঢাকায়, মেজর জেনারেল রহিম খানের দায়িত্বে আর চাঁদপুরে ছিল তাঁর ঘাঁটি। বন্ধুদের সাহায্যের আশা ছাড়াও এই কৌশল গ্রহণ করা হয় একটি ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

পাকিস্তান মনে করতো যে, ভারতীয় বাহিনী শুধু একটি এলাকা দখল করে সেখানে শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে অধিষ্ঠিত করবে। কি রকম মদমত্ত হয়ে যে একটি মুক্তিযুদ্ধের এইরকম বিশ্লেষণ সম্ভব তা একেবারেই অকল্পনীয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে, পাকিস্তানের বিমান অভিযানের কোনো খবরই পূর্বাঞ্চলে আগাম দেয়া হয় নি। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জানলো যে, একটি সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তান নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রিয়ার এডমিরাল শরিফ তখন ঢাকায়, তাঁকেও খবরটি শুনতে হয় রেডিও ঘোষণায়।[১৬]

ডিসেম্বরের যুদ্ধ

অক্টোবর থেকেই পাকিস্তানের বাংলাদেশে অবস্থান দুঃসহ হয়ে ওঠে, এবং তখন থেকেই তাদের চিন্তা হয় পরিত্রাণের উপায়। যেহেতু বাঙালিদের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় আসতে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, সুতরাং তাদের একমাত্র ভরসা হয় সঙ্কটটিকে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করা। ইয়াহিয়ার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব ভারতীয় আপত্তিতে মোটেই এগুলো না। পাকিস্তানের দুই শুভানুধ্যায়ী চীন ও আমেরিকা তাদের সমর্থনে অটুট রইলো আর তাতেই হলো পাকিস্তানের মৃত্যু। চীনা বাগাড়ম্বরকে ভুট্টো চীনের হস্তক্ষেপের অঙ্গীকার মনে করে বিশ্লেষণ করলেন। (আর ভুট্টোরই-বা কি দোষ, অতিবুদ্ধিমান কিসিঞ্জারও তো সেই ভুলটি করলেন।) ১৫ নভেম্বর কিসিঞ্জার সংলাপের কথা তুললে পাকিস্তানি পররাষ্ট্র সচিব অভিমত দিলেন যে, তার জন্য যথোপযুক্ত সময় হবে ডিসেম্বরের শেষে, যখন বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ডিসেম্বর যে অনেক দূরে, আপন ভুবনে নিশ্চিন্ত পাকিস্তানের সেই চিন্তাই ছিল না। ভারতের 'আত্মরক্ষার্থে অনুপ্রবেশ' নীতির ব্যাপক প্রয়োগ নভেম্বরের শেষে পাকিস্তানের আত্মম্ভরিতা ও নিশ্চয়তাকে নাড়া দিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যে হবে বিমান হামলা করে যুদ্ধ ঘোষণা তা কেউ আশা করে নি। কার্যত পাকিস্তানি জান্তা তখন হয়ে যায় উন্মাদ ও অপরিণামদর্শী।

বস্তুতপক্ষে ২১ নভেম্বরে বাংলাদেশে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তান দখলদার বাহিনী সারা দেশে তাদের কর্তৃত্ব দেখাবার জন্য আত্মরক্ষার যে কৌশল নেয় তাতে তারা সারাদেশে ছয়টি কমান্ডের অধীনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। জেনারেল নিয়াজি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আমেরিকা ও চীন তার সাহায্যে মাঠে নামবে। তাদের আরো আশা ছিল যে পশ্চিমে পাকিস্তান ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। কূটনীতিবিদরা বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপনের সুপারিশ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, আর কিছু না হোক একটি যুদ্ধ বিরতির সুযোগে বাংলাদেশে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কিন্তু জাতিসংঘে পাকিস্তান কোনো উদ্যোগ নিল না।[১৭] পরিবর্তে ২৯ নভেম্বরে পাকিস্তানের সেনাশাসন ভারতের বিরুদ্ধে একটি সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২ ডিসেম্বর (যা ৩ ডিসেম্বরে পরিবর্তিত হয়) পশ্চিমে একটি যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলা হবে এবং পূর্বে ভারতীয় আক্রমণের প্রত্যুত্তরে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হবে। সারাদেশে এমনি ছিল সামরিক শাসন।

তবু সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধোঁকা দেয়ার জন্য ২৪ নভেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং নানা রকম সভা সমিতি, ব্রিফিং ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়।[১৮] ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের উত্তর পশ্চিমাকাশে বিমান আক্রমণ করলো। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিমান অভিযানের বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করেন, "আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের ওপরে আক্রমণ নিয়ে এসেছে। এতে ভারতীয় জাতি, আমার সরকার ও আমার ওপর গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে। আমাদের সারাদেশে যুদ্ধ অবস্থান ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের বীর সৈন্য ও অফিসাররা দেশরক্ষার জন্য ব্রত। সারা ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। প্রতিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।[১৯] পাকিস্তানি অগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই ছিল ভারতের অঘোষিত যুদ্ধ। পাকিস্তান পরদিনই সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করলো। চীন ও আমেরিকা ভারতকে যুদ্ধ ঘোষণাকারী বলে চিহ্নিত করলো, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া পাকিস্তানকে এই দোষে অভিযুক্ত করলো।

ভারত তার ছককাটা কৌশলে চার সেক্টর থেকেই অভিযান শুরু করে। বাংলাদেশের পথঘাট ও মন-মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত মুক্তিবাহিনী হয় তাদের পথপ্রদর্শক। বাংলাদেশের অগণিত জনগণ হয় তাদের সংবাদদাতা ও অভ্যর্থনা সমিতি। কোন্ সময় কোথায় গভর্নর মালিক রয়েছেন, জেনারেল নিয়াজি কোথায় আনাগোনা করছেন, কোন্ সৈন্যদল কোন্ পথে এগুচ্ছে বা পালাচ্ছে তার সঠিক তথ্য মুহূর্তের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পৌঁছে যায়। নিজেদের নৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ১০ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যৌথ কমান্ড প্রতিষ্ঠা করে। তাই যুদ্ধ চলে একদিকে পাকিস্তান আর অন্যদিকে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ শক্তির মধ্যে। ভারতের পাকিস্তান দখলের যে কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং মুক্তিবাহিনীর বিষয়ই যে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সেই ঘোষণাটিই এই দুই পদক্ষেপে প্রকাশিত হলো। শুধু কিসিঞ্জার এবং তাঁর উপদেশে নিক্সন এই ঘোষণাটি অনুধাবন করতে পারলেন না। তাঁরা ভারতের পাকিস্তান ধ্বংসের (পশ্চিম পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করবার) একটি নীলনকশা দৈবযোগে আবিষ্কার করে ফেললেন। পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয় ৪ ডিসেম্বর। ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিপর্যয় ঘটে স্থলে এবং আকাশে, তাদের নৌশক্তি ছিল না বললেই চলে। যশোর ছাউনির পতন হলো, নিয়াজির দুর্গরক্ষা কৌশলে ধস নামলো। একই দিনে তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা দুই বিমানবন্দরেই রানওয়ে অব্যবহার্য হয়ে গেল। পাকিস্তানি বিমানের আকাশে উড়বার সব ক্ষমতা রহিত হলো কয়েকদিনের মধ্যেই। সব পাইলট রেঙ্গুন হয়ে পাকিস্তানে চলেও যায়। ৬ ডিসেম্বর যশোর ছাউনিতে হলো প্রথম বিজয়। কিন্তু খুলনা দখল করা গেল না। পশ্চিম সেক্টরের অভিযান মাগুরা দখল করে ফরিদপুরের পথে আটকে গেল, পাকিস্তানিরা কুমারখালি পুল ধ্বংস করে দেয়। একই সময়ে

কুষ্টিয়ায় শক্তিশালী পাকিস্তানি প্রতিরোধ ভারতীয় অভিযানকে থামিয়ে দিল। কুষ্টিয়ার পতনের পর বাধা এলো পদ্মাপারে, পাকিস্তানিরা হার্ডিঞ্জ সেতু ভেঙে দিয়ে যায়। ভারতীয় বাহিনী ফরিদপুর পৌঁছলো ১৫ ডিসেম্বর। কিন্তু তাদের আর ঢাকা যাওয়া হলো না। ভারতীয় নৌবহর ঠিক সময়ে ৫ ডিসেম্বরই পদ্মায় জড়ো হয় কিন্তু এই বাহিনী কোনো রকম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়ে ওখানেই বসে থাকে, তারা সচেষ্ট হলে হার্ডিঞ্জ সেতু হয়তো রক্ষা পেত। উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের লক্ষ্য ছিল দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া দখল এবং হিলি ও ঘোড়াঘাটে পাকিস্তানি প্রতিরোধ ব্যর্থ করা। নানা জায়গায় প্রতিরোধ এড়িয়ে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী শহরগুলোকে ঘিরে ফেলে এবং হিলি ও ঘোড়াঘাটে পাকিস্তান বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। হিলির পতন হয় ১১ ডিসেম্বর এবং ঘোড়াঘাটের ১২ ডিসেম্বর। আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্ত পাকিস্তানিরা কিন্তু তাদের দুর্গগুলো (রংপুর, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া) রক্ষা করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরে মৌলভীবাজার ও ডাউকি থেকে সিলেটের ঘেরাও সম্পূর্ণ হয় ৯ ডিসেম্বর। একই সময়ে দাউদকান্দি, চাঁদপুর ও আশুগঞ্জ দখলে আসে এবং লাকসাম ও ময়নামতিকে ঘেরাও করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানিরা ভৈরব সেতু ভেঙে দেয়ায় ভারতীয় বাহিনীকে অন্য পথ খুঁজতে হয়। ১৪ ডিসেম্বরেই এই বাহিনী ঢাকার কাছে টঙ্গি পৌঁছে যায়। কিন্তু চট্টগ্রামের পথে ভারতীয় বাহিনী আটকা পড়ে ও ১৪ ডিসেম্বর বিমান আক্রমণের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যায়। একই সঙ্গে রাঙ্গামাটি দখল সম্পূর্ণ হয় কিন্তু কক্সবাজারে কষ্ট করে সমুদ্রপথে আক্রমণ করে দেখা গেল যে, তা মুক্তিবাহিনীর দখলে আছে। উত্তর-পূর্ব সেক্টরে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয় এবং তার একটি বিশেষ কারণ ছিল মধুপুর-টাঙ্গাইল এলাকায় কাদের সিদ্দিকী বাহিনীর প্রতিপত্তি। প্যারাট্রুপসদের বিস্তারণ হয় ১১ ডিসেম্বর অপরাহ্নে এবং ১৩ ডিসেম্বরে কাদের বাহিনী ঢাকার বাইরে পৌঁছে যায়। ভারতীয় ও বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী যখন ঢাকাকে ঘেরাও করে তখন বড় শহরের মধ্যে শুধু যশোর ও কুমিল্লাই ছিল তাদের দখলে। অন্যান্য শহরে পাকিস্তানিরা তাদের দুর্গের মধ্যে এক রকম বন্দিদশায় ছিল।

নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানি উদ্যোগের দিকে মুখ চেয়ে ছিল পাকিস্তানি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড। ৪ ও ৬ ডিসেম্বর পরপর দুটি রুশ ভেটোর পর তাদের আশা-ভরসা আর রইলো না। ৭ ডিসেম্বর অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি কান্নায় ভেঙে পড়েন।[২০] এই মনোবল নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই ছিল না। গভর্নর মালিক সেই কথাটিই জেনারেল ইয়াহিয়াকে জানালেন ৯ ডিসেম্বর এবং ইয়াহিয়া পরদিনই তাঁকে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেন। গভর্নর মালিক এবং সেনাধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি যৌথভাবে তখন তাদের যুদ্ধবিরতি বা আত্মসমর্পণ প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। এই প্রস্তাবে ছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে বাংলাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পাকিস্তানি সৈন্য ও বেসামরিক ব্যক্তিকে তাঁদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান এবং তাঁদের বাঙালি দোসরদের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি। এই শর্তে তাঁরা জাতিসংঘকে যুদ্ধবিরতি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে আহ্বান

জানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই প্রস্তাব ইয়াহিয়া নাকচ করে বাংলাদেশে যুদ্ধ আরো কয়েকদিনের জন্য প্রলম্বিত করেন। এই প্রস্তাব নাকচ করার পেছনে ছিল ভুট্টোর মিথ্যাচার এবং কিসিঞ্জার-নিক্সনের ভ্রান্ত হিসাব। ভুট্টো চীন সফরে যান ৫-৮ নভেম্বর এবং ফিরে এসে জানান যে চীন এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে। বস্তুতপক্ষে চীন সেই রকম কোনো ধারণাই দেয় নি। কিসিঞ্জার আশা করেন যে, সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজের গতিবিধি ভারতকে ভয় দেখাবে এবং চীন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করবে। তার ফলে বন্ধু ইয়াহিয়াকে আত্মসমর্পণের অমর্যাদা থেকে রক্ষা করা যাবে। কিসিঞ্জার ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে চীনা রাষ্ট্রদূত হোয়াং হোর সঙ্গে সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, তাঁর ভয় হলো ভারত পশ্চিম পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং এই উদ্যোগ বন্ধ করতে হবে। হোয়াং হো তখন বলেন যে, "চীন তা হতে দেবে না। যতোদিন না চীনের অস্ত্রাগারে একটি রাইফেল থাকবে ততোদিন চীন যুদ্ধ করে যাবে। নিশ্চয়ই চীন পাকিস্তানকে বর্ধিত সাহায্য দেবে।" হোয়াং হোর এই উক্তিকেই চীনের বাংলাদেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইঙ্গিত বলে কিসিঞ্জার মনে করেন।[২১]

এ যুদ্ধে তিন রণক্ষেত্রে হয় ঘটনার ক্রমবিকাশ। বাংলাদেশে যুদ্ধের অগ্রগতি সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত ইতোমধ্যে করা হয়েছে। যৌথ বাহিনী দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে পাকিস্তানি দুর্গগুলোকে শুধু ঘিরে রাখা হয় এবং যথাসম্ভব প্রতিরোধ এড়িয়ে চলা হয়। পাকিস্তানিরা মূলত তাদের দুর্গে অবস্থান নিয়ে নিজেদের রক্ষায় ব্যস্ত থাকে। শুধু চাঁদপুর থেকে জেনারেল রহিম পেছনে ফেরেন এবং খানিকটা আহতও হন। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথ বাহিনী ঢাকা ঘেরাও করে ফেলে এবং মফস্বলের দুর্গগুলোর সঙ্গে ঢাকার পাকিস্তান বাহিনীর শুধু টেলিযোগাযোগ অব্যাহত থাকে। কিন্তু একে অন্যকে সাহায্য করবার কোনো অবকাশ ছিল না। দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র পশ্চিম পাকিস্তানেও পাকিস্তানিরা তেমন অবস্থান নিতে সক্ষম হলো না। বিস্তীর্ণ এলাকা ভারতীয় বাহিনীর দখলে চলে গেল। শাখরগঞ্জ এলাকায় কয়েক হাজার বর্গমাইল আর লাদাখে প্রায় চারশো' বর্গমাইল। অবশ্য চাম্বে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকশ' বর্গমাইল দখল করে। তৃতীয় রণক্ষেত্র ছিল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দিন আমেরিকার উদ্যোগে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয় ৪ ডিসেম্বর। আমেরিকা আর চীন তীব্র ভাষায় ভারতের আগ্রাসনের নিন্দাবাদ করে এবং যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন প্রস্তাব আলোচিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার ভেটো এই প্রস্তাব নাকচ করে দিল। আবার ৬ ডিসেম্বর বিষয়টি পুনরায় আলোচিত হলো। এবার ভারতের দাবি হলো যে, বাংলাদেশকে সভায় ডাকতে হবে। কারণ তারা এই যুদ্ধের প্রধান দল। এবারেও মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব রাশিয়ার ভেটোতে নাকচ হলো। মার্কিন প্রস্তাবের গলদ ছিল যে, এতে পাকিস্তানি দস্যুবাহিনী বাংলাদেশে থাকতো, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হতো এবং মুক্তিবাহিনীর কোথাও কোনো স্থান ছিল না। মার্কিন অধ্যবসায় বিষয়টিকে ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ

পরিষদের বিবেচনায় নিয়ে গেল। সেখানে প্রস্তাব হলো যুদ্ধবিরতি ও দুই দেশের সৈন্যদের নিজেদের দেশে অবস্থান (এখানেও মুক্তিবাহিনীর কোনো স্বীকৃতি ছিল না), শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের ত্রাণকার্যে মুক্তহস্তে দান। এই প্রস্তাবেও মুক্তিযুদ্ধের কোনো সুরাহার ব্যবস্থা ছিল না, বাংলাদেশের বিজয়ের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এইসব প্রস্তাব ছিল একেবারে অকার্যকর, সবকিছুর ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ছিল বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগতির ওপর। যতো জলদি পাকিস্তান বাহিনীর পতন হয় ততো জলদি নিউইয়র্কের এই কৃত্রিম কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য রণাঙ্গনে যবনিকা পড়ে। ১৩ ডিসেম্বর জেনারেল মানেকশো এক নির্দেশ দিলেন যে, মফস্বলের সব শহর দখল করতে হবে। তাঁর বোধ হয় ভয় ছিল যে, যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব যদি আর আটকানো না যায় তাহলে পাকিস্তানি দুর্গের শহরগুলো (খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, সিলেট, চট্টগ্রাম) তাঁদের হাতে থাকবে। একই সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হলো, যুদ্ধের কনভেনশন অনুযায়ী তাঁদের যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দেয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হলো।

বিজয়ের মুহূর্ত

পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তখন শুরু হলো শেষ মুহূর্তের স্নায়ুযুদ্ধ। আত্মসমর্পণের আহ্বান ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারপত্রের বন্যাও চালানো হলো। জেনারেল জ্যাকব সরাসরি জেনারেল নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করতে অনুরোধ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে টেলিফোন করে বসলেন। ঢাকার ওপর চললো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে বিমান হামলা। ১৩ ডিসেম্বর লাটভবনে পরপর দুইবার বোমাবর্ষণ হলো। গভর্নর এ.এম. মালিক পদত্যাগ করে দলবল নিয়ে নিরপেক্ষ শিবির বলে ঘোষিত রেডক্রস আশ্রয় কেন্দ্র ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জায়গা নিলেন। অবশেষে জেনারেল নিয়াজি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে আত্মসমর্পণের অনুমতি চেয়ে বার্তা পাঠালেন। ১৪ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর নির্দেশ প্রেরণ করলেন। তারবার্তায় বলা হলো, "তুমি এখন এমন অবস্থায় পৌঁছছো যে কোনো প্রতিরোধ আর সম্ভব নয় এবং তাতে কোনো কাজও হবে না। এতে শুধু অতিরিক্ত জীবন ক্ষয় ও ধ্বংসলীলা হবে। এখন তোমার উচিত হবে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ। সৈন্যদের জীবন রক্ষা, পশ্চিম পাকিস্তানিদের এবং অনুগত গোষ্ঠীর হেফাজত করার জন্যও ব্যবস্থা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।"[২২] জেনারেল নিয়াজি ১৪ ডিসেম্বরই জেনারেল মানেকশোর সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বার্তা প্রেরণের জন্য তিনি মধ্যস্থ মানেন মার্কিন কনসাল জেনারেল হারবার্ট স্পিভাককে। স্পিভাক এই বার্তা সরাসরি জেনারেল মানেকশোর কাছে না পাঠিয়ে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দফতরে প্রেরণ করেন। জেনারেল মানেকশো ১৫ ডিসেম্বর এই বার্তা পান এবং অপরাহ্ন পাঁচটায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ীর বেশে ঢাকায় এলেন যৌথ বাহিনীর অনেক সেনাধিনায়ক। প্রথমে এলেন জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের

ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য। মেজর জেনারেল নাগরা তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে সাভার হয়ে ঢাকা পৌছলেন। কাদের সিদ্দিকী তাঁর বাহিনী নিয়ে ঢাকায় পৌছলেন। সস্ত্রীক জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস এডমিরাল কৃষ্ণন, লে. জে. সগত সিং, মে. জে. কৃষ্ণ রাও, মে. জে. আর ডি হিরা, মে. জে. বি. এফ. গনজালভেস এবং উইং কমান্ডার আবদুল করিম খন্দকার এলেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীরও এই অনুষ্ঠানে থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন সিলেটের পথে এবং তাঁর হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ায় তাঁর আর ঢাকা যাওয়া হলো না। পাকিস্তান থেকে জেনারেল নিয়াজিকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাতে তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারবেন কি না তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয় নি। তাই অনেকে বলেন যে, তিনি আত্মসমর্পণ করে অন্যায় বা এখতিয়ার-বহির্ভূত কাজ করেছেন। প্রকৃত কথা হলো যে, শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত, নিজের উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সাধারণ জনতা কর্তৃক ঘৃণিত গণহত্যাকারী সেনাপতি হিসেবে চিহ্নিত একটি বিদেশি সেনাবাহিনীর অধিপতি হিসেবে তাঁর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তাঁর আত্মসমর্পণের দলিল যৌথ কমান্ড রচনা করে এবং তাঁর জন্য অবশিষ্ট থাকে শুধু চিহ্নিত জায়গায় দস্তখত করা। এই দলিলটি পরিশিষ্ট ১৪-তে দেয়া হলো। ১৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার বেলা ৪-৫৫ মিনিটে জেনারেল নিয়াজি এবং জেনারেল অরোরা ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) আত্মসমর্পণের দলিলটি দস্তখত করেন। রেসকোর্স ময়দান তখন লোকে লোকারণ্য এবং সারা বাংলাদেশ আনন্দে উদ্বেল। জয় বাংলা নিনাদে কালরাত্রির অবসানে আসে বল্গাহীন জয়োল্লাস। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আশঙ্কা ছিল যে, জনতা না প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু জয়োল্লাসে মাতোয়ারা ও বিজয়ের আনন্দে পরিপূর্ণ বাঙালিরা বিজয়ে মহত্ত্বের আদর্শ সমুন্নত করে রাখে। পরবর্তী দুই একদিন অবশ্য কয়েকটি প্রতিহিংসামূলক ঘটনা ঘটে এবং শাস্তির খড়গহস্ত নেমে আসে মূলত বাঙালি গাদ্দার এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসী বিহারিদের ওপর। তবে পল্টন ময়দানে পরদিন প্রতিহিংসার এক প্রদর্শনী জনতার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাতেই প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয়প্রাপ্ত পাকিস্তানি ও ইয়াহিয়ার পুতুল সরকারের বাঙালি কর্মকর্তাদের ২০ ডিসেম্বর ছাউনিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐদিনই পাকিস্তানি উচ্চপদস্থ সেনানায়কদের কলকাতায় বিমানযোগে স্থানান্তর করা হয়। সমুদয় যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তরণ সম্পন্ন হয় জল ও রেলপথে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে।

মুজিবনগর সরকার বিজয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। বিজয়-পরবর্তীকালে দেশ শাসনের মৌলিক কাঠামো এবং দেশ গঠনের প্রধান নীতিমালা তাঁরা নভেম্বর ডিসেম্বরে প্রণয়ন করেন। ১৬ ডিসেম্বরই মুজিবনগর সরকারের সদর দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং পরদিন মুখ্য সচিব ও সংস্থাপন সচিব ঢাকায় আগমন করেন। ১৬ ডিসেম্বরের আগেই জেলা কর্তাদের নিযুক্তি দেয়া হয় এবং এলাকা শত্রুমুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা

ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ২১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা ঢাকায় আগমন করেন। দেশে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, জীবন প্রবাহে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সবকিছুই চলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম ও উৎসাহের জোরে। সরকার ও প্রশাসন যন্ত্র ছিল কর্মোদ্যমের নিশান বিশেষ। দ্রুতগতিতে পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে, একটি স্বল্প কলেবরে সেনাবাহিনীও গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রায় ৪ হাজার সৈন্য আত্মবলিদান করেন এবং প্রায় ততোজন সৈনিক নানাভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। তাই তাঁরা যখন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন তাঁদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়। পাকিস্তানিরাও তাঁদের বরণ করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। তারা যে বর্বরতা চালিয়েছে তাতে বাঙালিদের হাতে শাস্তি তারা অবধারিত বলেই মনে করে। কিন্তু পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পদ, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ রসদ লুণ্ঠনের অভিযোগ উঠে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং তাতে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে এ নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। বিধ্বস্ত বাংলাদেশে যেখানে নয় মাস ধরে চলে গণহত্যা ও গণধর্ষণ এবং সব ধরনের বঞ্চনা, সেখানে মানুষের হয় দুর্বৃত্তায়ন এবং হিংস্রতার বিকাশ। এই পরিস্থিতিতে জীবনের গতি স্বাভাবিক করা দেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বিজয়ের আনন্দ ও গৌরব অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিরাট অবদান রাখে। তবে ১০ জানুয়ারিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন এবং রাষ্ট্রতরীর কাণ্ডারির ভার গ্রহণ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিকে দেয় গভীর আত্মবিশ্বাস এবং অসীম উৎসাহ ও বল্গাহীন প্রেরণা। জয় বাংলার রণনিনাদ হয় রাষ্ট্রগঠনের মন্ত্র।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. *দি ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর*, বোস্টন, ৪ মে ১৯৭১।
২. বি.এন. আহুজা : *The Liberation of Bangladesh*, দিল্লি, ভর্মা ব্রাদার্স, ১৯৭২, পৃ. ১৩০-১৩৪।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।
৪. *The Financial Times* : লন্ডন, ১৯ জুলাই, ১৯৭১।
৫. জেনারেল ইয়াহিয়ার ১২ অক্টোবরের বিবৃতি, *Reproduced by Pakistan Mission*, নিউইকয়র্ক, ১৯৭১।
৬. *Bangladesh Documents. Vol. 1*, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দিল্লি, ১৯৭১, পৃ. ৬৭২।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭-৬৯৮।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।
৯. *Bangladesh Documents. Vol. II*, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাদ্রাজ, ১৯৭২, পৃ. ২১৮।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-২৯৪।
১১. সংবাদপত্রে প্রতিবেদনের কয়েকটি ছিল নিম্নোক্ত :
The Christian Science Monitor, বোস্টন, ১৩ অক্টোবর ও ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১, *The*

New York Times, নিউইয়র্ক, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১।
১২. কিসিঞ্জারের সাংবাদিক ব্রিফিং সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার কংগ্রেসের রেকর্ডে সন্নিবেশিত করেন। মার্কিন কংগ্রেসের রেকর্ড সুপারিনটেনডেন্ট : *The Congressional Record.* ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯৭১, ৯ ডিসেম্বরের বিবরণ পৃ. এস ২১০১২- ২১০২৬।
১৩. জোবেদা মোস্তফা : *USSR & Indian Action Pakistan. Pakistan Stories* চতুর্থ চতুর্থাংশ, করাচি, ১৯৭১, পৃ. ১৫।
১৪. ভারতীয় কৌশল ও অগ্রগতির কাহিনীর উৎস : লে. জে. জে. এফ. আর জ্যাকব : *Surrender at Dhaka*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১০৫-১২৮।
১৫. পাকিস্তানি কৌশলের বিবরণ পাওয়া যায় : সিদ্দিক সালেক : *Witness to Surrender*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৭৭, পৃ. ১২৩-১২৮।
১৬. রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided*, জং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯২, পৃ. ১২০।
১৭. জেনারেল কে.এম শরীফ : *Working with Zia : Pakistan Power Politics 1977-1988* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। করাচি, ১৯৯৫। পৃ. ৩২-৩৪।
১৮. হাসান জাহির : *The Separation of East Pakistan : The Rise & Realization of Bengli Muslim Nationalism*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৯৩। পৃ. ৩৫৫-৩৬২।
১৯. *Bangladesh Documents. Vol II*, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মাদ্রাজ, ১৯৭২। পৃ. ২০৯।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।
২১. হেনরি কিসিঞ্জার : *The White House Years*, লিটল ব্রাউন এন্ড কোম্পানি বোস্টন, ১৯৭৯, পৃ.
এবং ক্রিস্টফার ভান হোলেন : "The Tilt Policy Revisited : Nixon-Kissinger Geopolitics in South Asia", *South Asian Survey*, ২০ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮০, বার্কলে, কেলিফোর্নিয়া।
২২. সিদ্দিক সালেক : *Witness to Surrender*. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

জেনারেল ইয়াহিয়ার যুদ্ধংদেহি মনোভাব এবং উড়োজাহাজে অনবরত পাকিস্তানি সেপাইদের আগমন মার্চ মাসে বাঙালিদের খুবই শঙ্কিত করে তোলে। ১১ মার্চ একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করেন, "দেখুন এরা কি করছে? ১ মার্চ থেকে ওদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে সমঝোতার পরিপন্থী এবং বস্তুত তারা গণহত্যার অজুহাত খুঁজছে। তাদের হাতে অস্ত্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা, সুতরাং তারা ইচ্ছে করলেই আমাদের হত্যা করতে পারে। তারা যদি আমাদের নিধন করে আমরা সত্যিই মারা যাবো। তবে আমরা নিশ্চিত যে, পৃথিবী অনতিবিলম্বে বুঝতে পারবে যে এরা কি ধরনের নরপশু।"[১] অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে গেলে জাতিসংঘের মহাসচিব সকল জাতিসংঘ কর্মচারীকে ঢাকা থেকে উদ্বাসন করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন যে, মহাসচিবের দায়িত্ব এতেই শেষ হয় না। গণহত্যার হুমকি এবং মৌলিক অধিকারের নিষ্পেষণ জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী এবং কি করে তা বন্ধ করা যায় সেদিকে নজর দেয়া দরকার।[২] বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং নেতৃত্ব সত্যিকারভাবে জাতিসংঘের সনদের প্রতি আস্থাবান ছিল এবং তাঁদের ধারণা ছিল যে, জাতিসংঘ মানুষের প্রতি তার অঙ্গীকার রক্ষা করবে।

প্রশ্নাবলি : উপনিবেশবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, গণহত্যা ও মানবিক অধিকার, শান্তির প্রতি হুমকি

জাতিসংঘের সনদ বলে যে তার সদস্য দেশগুলো তিনটি বিষয়ে তৎপর হবে। প্রথমত, তারা নিজেদের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে এবং শান্তির প্রতি সব হুমকি হয় পরিহার করবে, না হয় নিয়ন্ত্রণ করবে। যে-কোনো আগ্রাসী কর্মকাণ্ড দমন করবে এবং সকল বিবাদ আলোচনা সাপেক্ষে মীমাংসা করবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে, যার ভিত্তি হবে সমঅধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

নীতি। তৃতীয়ত, প্রতিটি মানুষের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবিক অধিকার স্বীকার করে তার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবে।[৩] বাংলাদেশ সঙ্কটের মূলকথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রাম। যে-কোনো বিচারে বাংলাদেশ ছিল বাঙালি জাতির দেশ এবং তারা সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির পণ করেছিল। জাতিগত গোষ্ঠী হিসেবে এবং ভাষার পার্থক্যে তারা পাকিস্তানিদের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল সংহত। পাকিস্তান থেকে হাজার মাইল দূরে একটি চিহ্নিত নির্দিষ্ট এলাকা ছিল তাদের দেশ।

অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ ছিল একটি স্বতন্ত্র সত্তা। ১৯৪৭ সালে স্বেচ্ছায় তারা পাকিস্তানের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় গাটছাড়া বাঁধে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে সমানাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আর থাকলো না। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অবৈধভাবে প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনকে যখনই পদচ্যুত করলেন, তখন থেকে শুরু হলো বাঙালিদের অধিকার হরণ। আইউব খানের ১২ বছরের শাসনামলে বাঙালিরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের কোনো হিস্যা ছিল না। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে নীতি-নির্ধারণী এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বাঙালিদের সরাসরি বাদ দেয়া হয়। আগে তবু কিছু বশংবদ মন্ত্রী বা উপদেষ্টা ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া তখন থেকে শুধু সামরিক প্রশাসকের মাধ্যমে দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করেন এবং এইসব প্রশাসকের একজনও বাঙালি ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান বাস্তবিকই কোনো স্বশাসিত এলাকা ছিল না। তা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। ইয়াহিয়ার সরকার উচ্চ পর্যায়ে কোনো বাঙালিকে বিশ্বাস করতো না। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে যে বাঙালি গভর্নর ও মন্ত্রিসভা নিয়োজিত হয় তারা ছিল ইয়াহিয়ার হাতের পুতুল। তাদের কোনো রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। তারা হুকুম নিতো সামরিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে, জেনারেল নিয়াজি ও ফরমান আলীর হুকুমে তারা উঠবস করতো। প্রাদেশিক প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী থেকেও বাঙালি নেতৃত্ব বিতাড়ন করে পশ্চিম থেকে ঔপনিবেশিক কর্তাদের আমদানি করা হয়। মুখ্য সচিব, পুলিশের আই জি, বিভাগীয় কমিশনার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সচিব সবাই এলেন পশ্চিম থেকে।

১৯৫২ সালে জাতিসংঘ সকল দেশ ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে সুপারিশ করা হয় যে, সব সদস্য বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মানবে এবং যে সব এলাকা স্বশাসিত নয় সেখানে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। জাতিসংঘ ঔপনিবেশিক দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতা প্রদানেরও ঘোষণা দেয় এবং প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তাতে আবারো স্বীকৃত হয়। সাধারণ পরিষদ ছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদেও এই বিষয়ে নানা সময়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। রোডেশিয়ার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করে ১৯৬৩, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬-তে নিরাপত্তা পরিষদ উদ্যোগ নেয়।[৪] বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে কিন্তু জাতিসংঘের কোনো মঞ্চেই কোনো আলোচনা হলো না।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অবস্থানকালে মানবাধিকার নানাভাবে লংঘিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়। এই সনদ প্রতিপালন পাকিস্তানের দায়িত্ব ছিল কিন্তু ইয়াহিয়ার পঙ্গপাল সদম্ভে মানবাধিকার লংঘন করে। যুক্তির খাতিরে যদি বলা যায়, বাংলাদেশে নয় মাসব্যাপী গৃহযুদ্ধ চলে, তবুও যে ধরনের লুটতরাজ, ধ্বংস, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং বলাৎকার অনুষ্ঠিত হয় তা একান্তই অকল্পনীয়। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি দখলদার বাহিনীর অত্যাচার ও নিষ্পেষণকে লাগামহীন করে তোলে। মনে হয় তারা একটি ভিন্ন জাতির 'পদদলিত সম্প্রদায়'কে শাস্তি দিচ্ছে।[৫] ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ সবরকমের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য অবসানের সনদ গ্রহণ করে। এই সনদের জোরেই দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা মায় জীবনের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। অথচ তা নিয়ে জাতিসংঘ মোটেও উচ্চবাচ্য করে নি। বাঙালিদের পাকিস্তানে সমঅধিকার ছিল না অথবা আইনের আশ্রয় নেয়ার সুযোগ ছিল না। বাঙালিদের প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অমর্যাদাকর ব্যবহারের কোনো প্রতিকার ছিল না। বাংলাদেশে যথেচ্ছ গ্রেফতার, দেশ থেকে বহিষ্কারকরণ, স্বেচ্ছাচারীভাবে সম্পত্তিচ্যুতকরণ এই ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ড ছিল নিত্যদিনকার বিষয়। বস্তুতপক্ষে শুধু দখলিকৃত বাংলাদেশে নয় বরং পাকিস্তানের সর্বত্র কোনো বাকস্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধি বা ব্যক্তিগত বিচারের সুযোগ ছিল না।

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করে এবং গণহত্যা চালিয়ে যায়। জনগণকে হত্যা করা হয় নির্বিচারে। যাঁরা আহত অথবা বিবাদে অংশীদার নয়, যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং একান্তই নির্বিরোধী তাঁদের কেউই রেহাই পেল না। স্ত্রীলোক ও শিশুদের প্রতিও কোনো দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয় নি। যাঁদের তারা গ্রেফতার করে অথবা হত্যা করে তাঁদের প্রতি চূড়ান্ত বর্বরতা প্রদর্শন করা হয়। পাকিস্তান বস্তুতই মানবসত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ করে। হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা তাদের ছিল। তারা বাঙালিদের ক্ষুধার্ত রেখে তাঁদের বশ্যতা আদায়ের প্রচেষ্টা নেয়। মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধের বর্ণনায় আছে, "হত্যা, নিশ্চিহ্নকরণ, ক্রীতদাসে পরিণতকরণ, দেশ থেকে বিতাড়ন, বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অমানবিক পদক্ষেপ অথবা রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা সাম্প্রদায়িক কারণে নিষ্পেষণ।" ১৯৪৬ সালের ৮ আগস্ট এইসব অপরাধ বিষয়ে লন্ডন সনদ প্রণীত হয় এবং এরই অধীনে হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার—নুরেমবার্গ মামলা। জেনারেল ইয়াহিয়া এতে মোটেই দমেন নি, তাঁর হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। ১৯৪৯ সালের জেনেভা সনদে অনান্তর্জাতিক বিরোধেও মানবিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করে। এতে নানা ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন জিম্মি নেয়া, জীবনের হানি করা, মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা এবং আইনমাফিক ছাড়া জীবননাশ করা। ইয়াহিয়া জান্তা এই ধরনের কোনো সুসভ্য রীতিনীতি বা আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করার চিন্তাও করে নি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গণহত্যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে হিটলারের ইহুদি নিধনযজ্ঞের

বিবরণী প্রকাশ পাওয়ার পর। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা নিবৃত্তি ও শাস্তি বিষয়ক সনদ গ্রহণ করে। গণহত্যার সংজ্ঞায় ব্যাপক কর্মকাণ্ড গর্হিত। "যে-কোনো পদক্ষেপ যার উদ্দেশ্য হলো একটি সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বা জাতীয় কোনো গোষ্ঠীকে আংশিক অথবা সার্বিকভাবে ধ্বংস করা, তাই হলো গণহত্যা। এইসব পদক্ষেপ হতে পারে ক. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা, খ. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের মানসিক বা শারীরিকভাবে কঠোর আঘাত করা, গ. উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি গোষ্ঠীর উপর এমন অত্যাচার করা, যাতে তাদের আংশিক বা সার্বিক ধ্বংস সাধন হয়, ঘ. এমন পদক্ষেপ নেয়া, যাতে কোনো গোষ্ঠীতে নতুন প্রজন্ম পৃথিবীর আলো দেখতে না পারে এবং ঙ. বল প্রয়োগে এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীতে ঠেলে দেয়া।" এই সনদ স্বাক্ষরকারীদের কর্তব্য শুধু গণহত্যা না করা নয় বরং সর্বত্র গণহত্যা প্রতিরোধ করা এবং তার জন্য শাস্তি প্রদান। সনদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, নিজস্ব সীমানায় যদি কোনো সরকার তার দেশে গণহত্যা চালায়, তাহলে তা অভ্যন্তরীণ বিষয় থাকে না এবং আন্তর্জাতিক এখতিয়ারভুক্ত হয়।[৬] ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যা সূচনা করে।

বাংলাদেশ সঙ্কট সরাসরি শান্তিকে বিঘ্নিত না করলেও শান্তির জন্য একটি বড় হুমকি ছিল। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা সনদ একটি যুদ্ধের সূচনা করে। পাকিস্তান তখন ছিল স্বনিয়োজিত একটি অবৈধ দখলদার সামরিক চক্রের অধীনে এবং তাই যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।[৭] জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী শুধু বাংলাদেশে নয় বরং সারা দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা বিঘ্ন করে। পাকিস্তানের অত্যাচার প্রতিবেশী ভারত এবং মিয়ানমারে প্রায় এক কোটি বাঙালিকে শরণার্থী হিসেবে বিতাড়িত করে। এ যেন ছিল এক ধরনের বেসামরিক আগ্রাসন। মার্কিন কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গালাগার বলেন যে, শরণার্থী সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়কে মানবজাতির অভ্যন্তরীণ সমস্যায় রূপান্তরিত করে।[৮] শুরু থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল। জুলাই মাসেই জেনারেল ইয়াহিয়া 'সাধারণ যুদ্ধ' অথবা 'সার্বিক যুদ্ধের' হুমকি দিতে শুরু করেন। জাতিসংঘের নিবর্তন ক্ষমতার অধিকারী স্বস্তি পরিষদ শান্তির বিরুদ্ধে হুমকি বা শান্তিভঙ্গের প্রতিবিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোনো রকম শান্তি ভঙ্গ সম্ভাবনার তদন্ত করাও এই পরিষদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা পরিষদ অবহেলা করে এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। শুধু ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ বাধলে স্বস্তি পরিষদের ঘুম ভাঙে।

বাংলাদেশ সঙ্কট অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বা প্রতিষ্ঠানে বিবেচিত হতে পারতো। মানবাধিকার কমিশন বা তার বৈষম্য নিবৃত্তি এবং সংখ্যালঘু সংরক্ষণ সাব-কমিশন বাংলাদেশ সঙ্কটে ভূমিকা রাখতে পারতো। বস্তুতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশন এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আগস্ট মাসেই বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) মানবাধিকার লংঘনের

বিষয় বিবেচনা করতে পারতো। এই পরিষদ শুধু শরণার্থীদের বিষয়টিই হিসেবে নিতে বাধ্য হয়েছে। গোষ্ঠীভিত্তিক বৈষম্য কমিটি (CERD) বাংলাদেশ সঙ্কট বিবেচনা করতে পারতো। এপ্রিলেই এই কমিটি পাকিস্তানকে অবস্থা ব্যাখ্য করো একটি প্রতিবেদন পেশ করতে বলে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকে নি। এমন কি উপনিবেশবাদ বিষয়ক বিশেষ কমিটিও কোনো উচ্চবাচ্য করা থেকে বিরত থাকে। সেপ্টেম্বরে এই কমিটিতে বিষয়টি উত্থাপিত হলে তা এড়িয়ে যাওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টি শুধু শেষ মুহূর্তে বিবেচনা করে। সাধারণ পরিষদ সেপ্টেম্বরে অধিবেশনে বসলো, কিন্তু এই সঙ্কটটি তার আলোচ্যসূচিতে ছিল না।

জাতিসংঘে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ সঙ্কটে জাতিসংঘের অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো। এতে অনেক বিষয় ছিল, যা নিয়ে জাতিসংঘ সক্রিয় হতে পারতো। কিন্তু কেন জাতিসংঘ কোনো ভূমিকা রাখতে পারলো না? তা কি নিতান্তই একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মৌলিক দুর্বলতার জন্য? জাতিসংঘ কোনো বিশ্ব সরকার নয় কিন্তু বিভিন্ন সঙ্কটে তার অবদান রাখবার ব্যবস্থা তো রয়েছে। এই ব্যর্থতা কি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার জন্য ছিল, না নেতৃত্বের গলদের জন্য? সব বিষয়েই যে নিখাদ ব্যবস্থার অভাব ছিল তা স্বীকার করে নিলেও যে কারণে আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্ভব হলো না তা হলো বৃহৎ শক্তির রাজনীতি এবং জাতিসংঘে তাদের কর্তৃত্বের লড়াই। মৌলিক দুর্বলতা যা ছিল তাও বেশ জটিল। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কোথায় শুরু হয় আর কোথায় জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমানা শেষ হয় তা আজও তেমন পরিষ্কার নয়। গৃহযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সীমারেখাও খুব সহজে নির্ধারণ করা যায় না। মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়েও তখন অনেক সন্দেহ ছিল, এই যুদ্ধকে অনেক দেশপ্রেমিক বৃটিশ-প্রজা গৃহযুদ্ধ বলেই বিবেচনা করতে ইতস্তত করেন নি। বলা হয় যে, মার্কিন মুল্লুকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো অধিবাসী ছিল বৃটিশ ভক্ত। তুর্কি বা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের পথে, তখন কোনো বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন যে কখন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় তার হিসাব রাখা ছিল মুশকিল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সঙ্কট ছিল খুবই জটিল। তবে মানবাধিকার লংঘন, গণহত্যা সাধন ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। এসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নীরব দর্শকের ভূমিকা ও পঙ্গুত্বের একমাত্র কারণ ছিল পরাশক্তির রাজনীতি ও স্বার্থবাদ।

জাতিসংঘের মহাসচিব ১ এপ্রিলেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য ত্রাণ সাহায্যের প্রস্তাব দেন। পাকিস্তান প্রথমে সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা তখন একটি রেডক্রসের বিমানকে ঢাকায় অবতরণ করতে দিল না। তাদের বক্তব্য ছিল যে, তারা নিজেরাই অবস্থার মোকাবিলা করতে সক্ষম। ২২ এপ্রিল মহাসচিব জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ত্রাণ সাহায্য ব্যবস্থার জন্য আবেদন করেন। প্রায় পক্ষকাল পরে বিশ্বমতের

বিবরণী প্রকাশ পাওয়ার পর। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা নিবৃত্তি ও শাস্তি বিষয়ক সনদ গ্রহণ করে। গণহত্যার সংজ্ঞায় ব্যাপক কর্মকাণ্ড গর্হিত। "যে-কোনো পদক্ষেপ যার উদ্দেশ্য হলো একটি সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বা জাতীয় কোনো গোষ্ঠীকে আংশিক অথবা সার্বিকভাবে ধ্বংস করা, তাই হলো গণহত্যা। এইসব পদক্ষেপ হতে পারে ক. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা, খ. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের মানসিক বা শারীরিকভাবে কঠোর আঘাত করা, গ. উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি গোষ্ঠীর উপর এমন অত্যাচার করা, যাতে তাদের আংশিক বা সার্বিক ধ্বংস সাধন হয়, ঘ. এমন পদক্ষেপ নেয়া, যাতে কোনো গোষ্ঠীতে নতুন প্রজন্ম পৃথিবীর আলো দেখতে না পারে এবং ঙ. বল প্রয়োগে এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীতে ঠেলে দেয়া।" এই সনদ স্বাক্ষরকারীদের কর্তব্য শুধু গণহত্যা না করা নয় বরং সর্বত্র গণহত্যা প্রতিরোধ করা এবং তার জন্য শাস্তি প্রদান। সনদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, নিজস্ব সীমানায় যদি কোনো সরকার তার দেশে গণহত্যা চালায়, তাহলে তা অভ্যন্তরীণ বিষয় থাকে না এবং আন্তর্জাতিক এখতিয়ারভুক্ত হয়।[৬] ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যা সূচনা করে।

বাংলাদেশ সঙ্কট সরাসরি শান্তিকে বিঘ্নিত না করলেও শান্তির জন্য একটি বড় হুমকি ছিল। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা সনদ একটি যুদ্ধের সূচনা করে। পাকিস্তান তখন ছিল স্বনিয়োজিত একটি অবৈধ দখলদার সামরিক চক্রের অধীনে এবং তাই যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।[৭] জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী শুধু বাংলাদেশে নয় বরং সারা দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা বিঘ্ন করে। পাকিস্তানের অত্যাচার প্রতিবেশী ভারত এবং মিয়ানমারে প্রায় এক কোটি বাঙালিকে শরণার্থী হিসেবে বিতাড়িত করে। এ যেন ছিল এক ধরনের বেসামরিক আগ্রাসন। মার্কিন কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গালাগার বলেন যে, শরণার্থী সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়কে মানবজাতির অভ্যন্তরীণ সমস্যায় রূপান্তরিত করে।[৮] শুরু থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল। জুলাই মাসেই জেনারেল ইয়াহিয়া 'সাধারণ যুদ্ধ' অথবা 'সার্বিক যুদ্ধের' হুমকি দিতে শুরু করেন। জাতিসংঘের নিবর্তন ক্ষমতার অধিকারী স্বস্তি পরিষদ শান্তির বিরুদ্ধে হুমকি বা শান্তিভঙ্গের প্রতিবিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোনো রকম শান্তি ভঙ্গ সম্ভাবনার তদন্ত করাও এই পরিষদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা পরিষদ অবহেলা করে এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। শুধু ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ বাধলে স্বস্তি পরিষদের ঘুম ভাঙে।

বাংলাদেশ সঙ্কট অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বা প্রতিষ্ঠানে বিবেচিত হতে পারতো। মানবাধিকার কমিশন বা তার বৈষম্য নিবৃত্তি এবং সংখ্যালঘু সংরক্ষণ সাব-কমিশন বাংলাদেশ সঙ্কটে ভূমিকা রাখতে পারতো। বস্তুতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশন এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আগস্ট মাসেই বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) মানবাধিকার লংঘনের

বিষয় বিবেচনা করতে পারতো। এই পরিষদ শুধু শরণার্থীদের বিষয়টিই হিসেবে নিতে বাধ্য হয়েছে। গোষ্ঠীভিত্তিক বৈষম্য কমিটি (CERD) বাংলাদেশ সঙ্কট বিবেচনা করতে পারতো। এপ্রিলেই এই কমিটি পাকিস্তানকে অবস্থা ব্যাখ্য করো একটি প্রতিবেদন পেশ করতে বলে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকে নি। এমন কি উপনিবেশবাদ বিষয়ক বিশেষ কমিটিও কোনো উচ্চবাচ্য করা থেকে বিরত থাকে। সেপ্টেম্বরে এই কমিটিতে বিষয়টি উত্থাপিত হলে তা এড়িয়ে যাওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টি শুধু শেষ মুহূর্তে বিবেচনা করে। সাধারণ পরিষদ সেপ্টেম্বরে অধিবেশনে বসলো, কিন্তু এই সঙ্কটটি তার আলোচ্যসূচিতে ছিল না।

জাতিসংঘে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ সঙ্কটে জাতিসংঘের অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো। এতে অনেক বিষয় ছিল, যা নিয়ে জাতিসংঘ সক্রিয় হতে পারতো। কিন্তু কেন জাতিসংঘ কোনো ভূমিকা রাখতে পারলো না? তা কি নিতান্তই একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মৌলিক দুর্বলতার জন্য? জাতিসংঘ কোনো বিশ্ব সরকার নয় কিন্তু বিভিন্ন সঙ্কটে তার অবদান রাখবার ব্যবস্থা তো রয়েছে। এই ব্যর্থতা কি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার জন্য ছিল, না নেতৃত্বের গলদের জন্য? সব বিষয়েই যে নিখাদ ব্যবস্থার অভাব ছিল তা স্বীকার করে নিলেও যে কারণে আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্ভব হলো না তা হলো বৃহৎ শক্তির রাজনীতি এবং জাতিসংঘে তাদের কর্তৃত্বের লড়াই। মৌলিক দুর্বলতা যা ছিল তাও বেশ জটিল। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কোথায় শুরু হয় আর কোথায় জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমানা শেষ হয় তা আজও তেমন পরিষ্কার নয়। গৃহযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সীমারেখাও খুব সহজে নির্ধারণ করা যায় না। মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়েও তখন অনেক সন্দেহ ছিল, এই যুদ্ধকে অনেক দেশপ্রেমিক বৃটিশ-প্রজা গৃহযুদ্ধ বলেই বিবেচনা করতে ইতস্তত করেন নি। বলা হয় যে, মার্কিন মুল্লুকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো অধিবাসী ছিল বৃটিশ ভক্ত। তুর্কি বা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের পথে, তখন কোনো বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন যে কখন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় তার হিসাব রাখা ছিল মুশকিল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সঙ্কট ছিল খুবই জটিল। তবে মানবাধিকার লংঘন, গণহত্যা সাধন ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। এসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নীরব দর্শকের ভূমিকা ও পঙ্গুত্বের একমাত্র কারণ ছিল পরাশক্তির রাজনীতি ও স্বার্থবাদ।

জাতিসংঘের মহাসচিব ১ এপ্রিলেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য ত্রাণ সাহায্যের প্রস্তাব দেন। পাকিস্তান প্রথমে সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা তখন একটি রেডক্রসের বিমানকে ঢাকায় অবতরণ করতে দিল না। তাদের বক্তব্য ছিল যে, তারা নিজেরাই অবস্থার মোকাবিলা করতে সক্ষম। ২২ এপ্রিল মহাসচিব জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ত্রাণ সাহায্য ব্যবস্থার জন্য আবেদন করেন। প্রায় পক্ষকাল পরে বিশ্বমতের

পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেয়। ৩ মে জেনারেল ইয়াহিয়া জানালেন যে, ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তবে কোনো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। মার্কিন চাপে অবশেষে ২২ মে পাকিস্তান জাতিসংঘকে ত্রাণ সাহায্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বললো। জাতিসংঘ ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তান ত্রাণ কার্যক্রম (UNEPRO) গ্রহণ করে। প্রথমে মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে এই কার্যক্রমের দায়িত্ব নেন ভগত আল তাবিল। আগস্টের ২৪ তারিখে এই দায়িত্ব নিলেন পল মার্ক অঁরি এবং তিনি বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর ঢাকা ত্রাণ কার্যক্রমের (UNROD) দায়িত্বে থাকলেন। ২১ ডিসেম্বর হলো UNROD, তারও অনেক পর এর নামকরণ হলো UNROB। বাংলাদেশ নামটি এর আগে আন্তর্জাতিক সংস্থা মেনে নিতে উৎসাহী ছিল না। অন্যদিকে বাঙালি শরণার্থীদের দল ভারতে ভারি হতে থাকলে ভারত ২৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানালো। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এ বিষয়ে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব নিল এবং মহাসচিব ১৯ মে সাহায্যের আবেদন জানালেন। ভারতে শরণার্থী সংস্থা ছাড়াও জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং খাদ্য কার্যক্রম (UNICEF এবং WFP) সারা বছরই সক্রিয় থাকে এবং জাতিসংঘের সার্বিক কার্যক্রমে ২১৫ মিলিয়ন ডলারের সাশ্রয় হয়। শরণার্থীদের ব্যাপারে অনেক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছাড়া বিশ্বব্যাঙ্কও নানা অবদান রাখে।

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট ১ আগস্টেই বাংলাদেশ সঙ্কট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত হন। তবে কোনো কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন নি। তিনি বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নজরে আনলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, "মার্চের পর সময় যতো যেতে থাকলো আমি ততোই আঞ্চলিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করছি এবং এর নানা দিক নিয়ে খুবই শঙ্কিত।" শরণার্থীদের সাহায্যে নানা দেশের বদান্যতার কথা তিনি তুলে ধরেন। তবে একই সঙ্গে প্রয়োজনের বিশাল কলেবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি শরণার্থী সমস্যার আশু সমাধান সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করে বলেন যে, এই স্রোত মনে হচ্ছে বিরামহীন। তাঁর মনে হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে পরপর যে দুটি দুর্যোগ গেল, প্রথমে ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড় এবং তারপর এই গৃহযুদ্ধ, তার মোকাবিলা করা খুবই দুরূহ। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় স্বাভাবিকতা না এলে এবং কোনো রকম রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে যে সহিংসতার জন্ম হয়েছে তার প্রভাব হবে বিস্তৃত। পাকিস্তান-ভারতের সম্পর্কের এতে অবনতি হবে এবং এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং গোষ্ঠী কলহ ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তিনি মন্তব্য করেন, "অবস্থা এমনি যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদান কতগুলো দুষ্ট বৃত্তের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে ওখানকার কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ মায় মানবিক সাহায্য প্রদানেও ব্যর্থ হচ্ছে।" তাঁর প্রতিবেদনের উপসংহারে তিনি বলেন :

"আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে একান্ত অনিচ্ছায় আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে আর বসে থাকলে চলবে না। ত্রাণ কাজ, মানবিক উদ্যোগ এবং সদিচ্ছার জোরে ক্রমান্বয়ে দুরবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যাবে না, মানুষের দুর্দশা

এবং সম্ভাব্য মহাদুর্যোগ ঠেকানো যাবে না। আমি গভীরভাবে চিন্তাগ্রস্ত যে বর্তমান অবস্থার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী এবং নানা মাত্রায়। মানবিক দুর্যোগ তো রয়েছেই তার উপরে আছে এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এবং এর চেয়ে শঙ্কাজনক হলো জাতিসংঘের সুনাম ও ভূমিকা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও পদক্ষেপে সক্রিয় ভূমিকা রাখার অধিকার বা দাবিই ব্যাহত হতে পারে। আমার কাছে মনে হয় যে, এই সঙ্কটে মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন এমনভাবে মিশ্রিত যে এদের মধ্যে তফাত করা প্রায় অসম্ভব এবং এতে জাতিসংঘের সামনে এসেছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, যার সমাধান পেতেই হবে। ভবিষ্যতেও এই রকম অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তাই এবারে জাতিসংঘ যদি এর মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে তাহলে এর কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে এরকম অবস্থার সম্মুখীন হলে বলিষ্ঠভাবে এবং নতুন কৌশলে তা সমাধান করা যাবে" ।[৯]

মহাসচিবের প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্রই ফুটে ওঠে। তিনি সব সমস্যাই সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেন। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও এতে তুলে ধরা হয়। কিন্তু এই দলিলের কোনো কার্যকরী প্রতিফল পাওয়া গেল না। জাতিসংঘের সম্মিলিত উদ্যোগের ছিল বড়ই অভাব। কেউই বিষয়টি ঘাঁটাতে তৈরি ছিলেন না। তাঁরা সবাই যেন প্রার্থনা করছিলেন যে,কোনো ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে সঙ্কটের সমাধান আপনাআপনিই হয়ে যাবে। জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা এবং যুদ্ধরোধে ও গণহত্যা নিরসনে ব্যর্থতা ছিল নিতান্তই লজ্জাকর।

ত্রাণ কাজেও জাতিসংঘের কৃতিত্ব ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। শরণার্থীদের দেখাশোনা করতে আগস্ট মাসের মধ্যে ভারতের খরচ হয় ৫০০ মিলিয়ন ডলার, বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্ভাব্য খরচ ছিল ৮০০ মিলিয়ন ডলার। বস্তুতপক্ষে খরচ আরো বেশি হয়, কারণ শরণার্থীর স্রোত ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সম্ভবত শুধু সরকারি বাজেটের মাধ্যমে ভারতের ব্যয় হয় মোট ১০০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৮০০০ মিলিয়ন রুপি। জাতিসংঘ এতে সহায়তা করে মাত্র ২১৫ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে জাতিসংঘ একটি ত্রাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে কিন্তু কীভাবে ত্রাণ কাজ চলবে এবং বিশেষ করে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকরা কীভাবে পরিবীক্ষণ করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে ও বাস্তবায়িত করতে দেরি হওয়ার ফলে এর কার্যক্রমে প্রাণ আসে নি। কেবল ১৫ নভেম্বর পরিবীক্ষণ বিষয়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ও জাতিসংঘ ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সম্পন্ন হয়। তাই দেশ যখন মুক্ত হলো তখন এই প্রতিষ্ঠানের হাতে অব্যবহৃত সম্পদ ছিল প্রায় একশ' মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৭২-৭৩ সালে এবং তার পরেও কিছুকাল বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয় করে এবং বিশেষ করে খাদ্য সরবরাহে বড় রকমের অবদান রাখে। ত্রাণ কাজে মুক্ত বাংলাদেশে জাতিসংঘ মিশনের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘ দুর্গতি ত্রাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় (UNDRO)।

১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন

বসে। ১৯৭১ সালে যখন এই অধিবেশন শুরু হয় তখন বিশ্বের অন্যতম জরুরি ও জটিল সমস্যা ছিল বাংলাদেশকে নিয়ে। কিন্তু সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে ছিল না। অনেকগুলো প্রতিনিধিদল বিশ্ব রাজনৈতিক ও মানবিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ সঙ্কটের উল্লেখ করে।[১০] এইসব বক্তব্যে বিশ্ব সংস্থার ব্যর্থতা নিয়ে বেশ কটি প্রত্যক্ষ মন্তব্য হয়। তবে অধিকাংশ প্রতিনিধি শুধু শরণার্থী ও ত্রাণ সমস্যা নিয়ে কথা বলে মূল রাজনৈতিক বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। অনেকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ নিউজিল্যান্ড, মাদাগাস্কার, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম, নরওয়ে এবং সুইডেন উপমহাদেশের সার্বিক সঙ্কটে উদ্বেগ প্রকাশ করে এর আশু সমাধান চায়। ফ্রান্স ও বৃটেন পরিষ্কার বলে দেয় যে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় সরকারের পুনর্প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করুক। সোভিয়েত ইউনিয়ন জানালো যে, সঙ্কটটিকে তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা আর করে না। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দ্ব্যর্থবোধক এবং পাকিস্তানের প্রতি নমনীয়। একেবারে অসহিষ্ণুভাবে লুক্সেমবুর্গের প্রতিনিধি প্রশ্ন করলেন, "যখন আমাদের চোখের সামনে লাখ লাখ লোকের বর্ণনাতীত দুর্দশা দেখতে পাই, যখন দেখি যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার ধুয়া তুলে, যখন দেখি যে সভ্য সমাজে যে মৌলিক অধিকার দুর্বলতম জনের জন্যও স্বীকৃত তা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, তখন প্রশ্ন জাগে যে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার নামে এই ধরনের বর্বরতাকে কি চলতে দেয়া উচিত হবে?" কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিশেল শার্প ২৯ সেপ্টেম্বর প্রশ্ন করলেন, "যখন একটি অভ্যন্তরীণ বিবাদ অগণিত দেশকে এতো প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলিত করে, তখন তাকে কি আর অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বিবেচনা করা সমীচীন হবে?" সুইডেনের প্রতিনিধি পাকিস্তানকে সংযম ও নমনীয়তার আশ্রয় নিতে আহ্বান জানালেন। তিনি আরো বললেন যে, "মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ভোটের মাধ্যমে ঘোষিত জনমতকে মেনে নেয়া পাকিস্তানের জন্য উচিত হবে।" মার্কিন সরকার বেহায়ার মতো পাকিস্তানকে সমর্থন করে গেল, "পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়টি পাকিস্তানের জনগণ ও সরকারই মোকাবিলা করবে।" কিন্তু এতে যে একটি বিশ্ব সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না এবং এই বিশ্ব সঙ্কটের মূলে ছিল পাকিস্তানি বর্বরতা, যার ফলে লাখে লাখে শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দেশে আশ্রয় খুঁজছিল। ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী অত্যন্ত যৌক্তিকতার সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন যে, "এই অন্যায়কে যদি মূলে শুধরানো না যায় তাহলে শরণার্থীর স্রোত বন্ধ হবে না।" বেলজিয়ামের প্রতিনিধি ফরাসি মন্ত্রী শুম্যানের প্রশ্নটিই আবার তুলে ধরলেন, "শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন কি সম্ভব হবে?" তিনি বললেন যে, "এই সঙ্কটের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমাধান বের করতে হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই এই সমাধান খুঁজতে হবে। তারা যখন নিশ্চিত হবে যে, মানবাধিকার লংঘিত হবে না এবং তারা যখন ভবিষ্যতে আস্থা রাখতে পারবে, তখনই শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবে।" বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার অ্যালেক হিউমও সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে ছিলেন দ্ব্যর্থহীন।

"পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষের আস্থা সৃষ্টি হবে এবং তারা স্বদেশে থাকবে, দেশোন্নয়নে মনোনিবেশ করবে।" এতো বক্তৃতার পরেও কিন্তু সাধারণ পরিষদ এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বা দিকনির্দেশনা দিতে রাজি ছিল না। এইসব বক্তব্যে পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমঝোতা খুঁজতে বলা হলো এবং দ্রুত একটি সমাধানে পৌছতে আহ্বান জানানো হলো। সাধারণ পরিষদ নিতান্তই একটি জ্ঞানজাগতিক বিতর্কের অবতারণা করলো এবং তার ক্রিয়াকাণ্ডে ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করলো।

স্বস্তি পরিষদে বিভিন্ন উদ্যোগ

মুক্তিবাহিনীর সাফল্য যত অনুভূত হলো ততোই পাকিস্তানের বন্ধুরা বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক আওতায় আনতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। মার্কিন উদ্যোগে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পরিদর্শক নিয়োগের প্রস্তাব হলো, বিষয়টিকে পাক-ভারত বিরোধিতায় রূপান্তরিত করতে পারলে মুক্তিযুদ্ধ ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে বলেই পাকিস্তানপন্থীদের আশা ছিল। ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে ভারতীয় বাহিনী ভারি অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে। নিক্সন-কিসিঞ্জার তখনই বিষয়টিকে স্বস্তি পরিষদে উত্থাপনের পাঁয়তারা করেন। তবে পাকিস্তান বা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নীতি-নির্ধারণকারীরা তখন এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই উদ্যোগে উৎসাহ দেখানোর কোনো কারণ ছিল না।[১১] পাকিস্তান সীমান্ত পরিদর্শকদের জন্য সরাসরি প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদের কাছে ৩০ নভেম্বর পেশ করলো। কিন্তু তখনো পাকিস্তান স্বস্তি পরিষদের বৈঠকে যেতে রাজি ছিল না। কি জানি কেঁচো খুঁড়তে সাপের দেখা না মিলে যায়। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, নিরাপত্তা পরিষদ হয়তো যার যেখানে অবস্থান আছে সেই ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি করতে পারে এবং সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার আবেদন করতে পারে।[১২] কিন্তু ৩ ডিসেম্বর যেই পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা হলো তখন পরাশক্তিরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন তখন স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণে ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের জন্য সব দায়দায়িত্ব পাকিস্তানের কাঁধে ন্যস্ত করলেন। তিনি বললেন যে, "সামরিক স্বৈরতন্ত্র সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্বিচারে পদদলিত করেছে।" অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে একজন উচ্চপদস্থ মুখপাত্র এই যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে কড়া মন্তব্য করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "আমাদের বিশ্বাস যে সঙ্কটের শুরু থেকেই ভারতীয় কৌশল সুপরিকল্পিতভাবে একে জিইয়ে রাখা এবং আরো জটিল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল এবং বর্তমান সীমান্ত যুদ্ধের মুখ্য দায়িত্ব ভারত বহন করে।" বেইজিং-এ নিউ চায়না সংবাদ সংস্থা কঠোরভাবে ভারতকে আক্রমণ করে বলে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নিউজ এজেন্সি সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট হয়ে ভারত এই সশস্ত্র আগ্রাসন শুরু করেছে। পাকিস্তান সরকার ও জনগণের প্রতি যুদ্ধে চীন তাদের দৃঢ় সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[১৩]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক দাবি করলো। পরিস্থিতির যে অবনতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা করেছে তা বিবেচনা করার জন্য আরো আটটি দেশ—আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সোমালিয়া এবং যুক্তরাজ্য মার্কিন চাপে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলো। এই সভায় চীন ভারতকে নিন্দা করবার আহ্বান জানায় এবং পাকিস্তানি এলাকা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পেশ করে, যাকে সোভিয়েত রাশিয়া একপক্ষীয় ও অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে। মার্কিন প্রস্তাব ছিল একটি সাদামাটা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি হবে আর দুই দেশ তাদের সেনাবাহিনীকে নিজের দেশে সরিয়ে নেবে। দুই দেশের যে-কোনোটির আহ্বানে মহাসচিব যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য সীমান্ত এলাকায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবেন। শরণার্থীরা যাতে স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে পারে তার জন্য ভারত ও পাকিস্তান উদ্যোগ নেবে। এই এলাকায় শান্তিভঙ্গের কোনো রকম ক্রিয়াকাণ্ড থেকে অন্যান্য দেশকে বিরত থাকতে হবে। সর্বশেষে এই প্রস্তাবে দুই দেশকে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য মহাসচিবের সাহায্য নিতে আহ্বান জানানো হয়। এই প্রস্তাবে মুক্তিবাহিনীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়, পাকিস্তানি জবরদখল সম্বন্ধে নিশ্চুপ থাকা হয় এবং পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক অনুমোদনে বাংলাদেশে তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। রাজনৈতিক সমস্যাকে পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের কোনো ব্যবস্থার ইঙ্গিতও এই প্রস্তাবে ছিল না। সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক বস্তুতই মন্তব্য করেন যে, এই প্রস্তাবে সব প্রতিকূল শক্তিকে পাকিস্তানের সীমান্তের ওপারে ডেকে নিয়ে প্যাকিস্তানের ওপর সব চাপ প্রত্যাহার করে তার সেনাবাহিনীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। ৪ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে এবং ফ্রান্স ও বৃটেন ভোটদানে বিরত থাকে।

নিরাপত্তা পরিষদ তখন আরো তিনটি প্রস্তাব বিবেচনা করতে থাকে। আর্জেন্টিনা, সোমালিয়া, সিয়েরা লিয়ন ও নিকারাগুয়া মার্কিন উদ্যোগে আর একটি নির্ভেজাল যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার প্রস্তাব পেশ করে। দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল বেলজিয়াম, ইতালি ও জাপানের। এতে বলা হয় যে, প্রথম পদক্ষেপ হবে যুদ্ধবিরতি। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে কার্যকর ও দ্রুত সংলাপের মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে শরণার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দ্রুতলয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে এই প্রস্তাব নিশ্চুপ রইলো। এবং ভারত-পাকিস্তানসহ সব দেশকে শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য আহ্বান জানালো। সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল তৃতীয় প্রস্তাব। এতে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে কারণে অবস্থার অবনতি হয়েছে সেই পাকিস্তানি সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে এবং এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে হবে, যাতে যুদ্ধ এমনি বন্ধ হয়ে যায়।[১৪] আবারও নির্ভেজাল যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি

ভোটে দেয়া হলো। ৬ ডিসেম্বর সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয়বারের মতো ভেটো প্রয়োগ করলো। এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য দেয়ার জন্য একটি উদ্যোগ চলে এবং এই উদ্যোগে সোভিয়েত সমর্থন মেলে। চীন একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত করে নি। এই প্রস্তাবটি শুধু একপেশে নয়, ছিল নিতান্তই ধৃষ্টতামূলক। প্রথমে এতে ভারতকে পাকিস্তানের এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বলা হয়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানকে ভারতীয় এলাকা থেকে সৈন্য সরাতে বলা হয়। তৃতীয়ত, দুই দেশকে যুদ্ধ বন্ধ করে সীমান্ত থেকে দূরে সরে যেতে আহ্বান করা হয়। সর্বশেষে একটি উস্কানিমূলক শর্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয় যে সব দেশ ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জনগণের ন্যায় ও সাহসী সংগ্রামকে সমর্থন দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে।[১৫]

মার্কিন উদ্যোগ কিন্তু তাতেও ব্যাহত হলো না। পরের দিন তাদের পক্ষে সোমালিয়া বিষয়টি পুনরুত্থাপন করলো। এবারে প্রস্তাব হলো যে, যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদ কিছু করতে পারছে না সুতরাং বিষয়টি সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করা দরকার। ১৯৫০ সালে কোরিয়া সঙ্কটে এই রকম অবস্থায় সাধারণ পরিষদ দিকনির্দেশনা দেয়। মার্কিন প্রভাবিত সাধারণ পরিষদ উত্তর কোরিয়া ও চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করে এবং জাতিসংঘের আওতায় এই আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানায়। এই প্রস্তাবকে বলা হয় 'শান্তির জন্য ঐকমত্য'। এই প্রস্তাবের জোরে আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং জাতিসংঘের পতাকার নিচে আরো অনেক দেশ (পশ্চিমা জোটের সদস্য) এতে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫০-এর পরে এই দৃষ্টান্তের আরো পাঁচবার পুনরাবৃত্তি হয়— ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ আক্রমণ করলে, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি যখন সোভিয়েত পরাশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলো, ১৯৫৮ সালে লেবাননে যখন মার্কিন হস্তক্ষেপ হলো, ১৯৬০ সালে কঙ্গো সঙ্কট এবং ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার দুটি ভেটোর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্কটে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারলো না। তাই বিষয়টি সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত হলো। সাধারণ পরিষদ শক্তি প্রয়োগ করতে না পারলেও দিকনির্দেশনা দিতে পারতো। নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে চীন-সোভিয়েত বিরোধের পুনরায় একটি বহির্প্রকাশ ঘটে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় চীন ছিল মুখর এবং প্রায় অশ্রাব্য। চীনা রাষ্ট্রদূত হোয়াং হোয়া জানালেন যে, সোভিয়েত শক্তি চীনকে অপদস্থ করার এক ঘৃণ্য ও রাক্ষুসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা চাচ্ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে ও চারদিক থেকে চীনকে পরিবেষ্টন করে এশিয়ায় তাদের প্রভাব বলয়কে নিরঙ্কুশ করা। তিনি অভিযোগ করলেন যে, "সোভিয়েত শক্তি সর্বত্র আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে চলছে। তারা বিভিন্ন দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলে তাদের প্রভাব বলয় সর্বত্র বাড়াতে ব্যস্ত।" তিনি ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত আগ্রাসনের কথা উঠালেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "সোভিয়েত বিশ্বাসঘাতকরা হালে যেসব অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তাতে মহান অক্টোবর

বিপ্লব ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় শহীদদের আত্মাহুতি ম্লান হয়ে গেছে।" রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকও তাঁর বক্তব্যে চীনের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন যে, চীনা রাষ্ট্রদূত শুধু শুধুই মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি অপসারণের ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত। তিনি বললেন, "আমরা ক্রমে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদে চীনা প্রতিনিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণে মোটেই আগ্রহী নন। তার ভূমিকা হচ্ছে একটি ভাঁড়ের ভূমিকা। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনৈক্যে যারা খুশি হয় সেই সব যুদ্ধবাজ, আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ভাঁড়ের ভূমিকা চীন গ্রহণ করেছে। এই রকম ব্যবহারে আমরা দুঃখ পাই কিন্তু তারা এই ভাঁড়ামো চালিয়ে যাবেনই। তাদের এই ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের গৃহশত্রুদের জন্য যথাযথ বটে এবং তারা এতে সাফল্য লাভ করবেন বলেই আমাদের ধারণা।" তিনি চীনকে বিরোধিতা, সন্ত্রাস, সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার উদ্যোক্তা এবং ধারক বলে অভিযুক্ত করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, চীনা প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের অপবাদ প্রদানে সিদ্ধহস্ত, নিন্দাবাদ তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তিনি সাম্রাজ্যবাদের ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্বেষাত্মক অপবাদ জানিয়ে তাঁর সামাজ্যবাদী প্রভুদের আহ্লাদিত করছেন। এখন এই রকম অপবাদ প্রদান বা বিদ্বেষ প্রকাশে সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তাদের একজন বিশ্বস্ত ও বংশবদ মুখপাত্র পাওয়া গেছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ প্রথম দিনেই ভারতকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের প্রতি তাঁর বিষোদ্গার প্রকাশ করলেন। নিরাপত্তা পরিষদের লবিতে তিনি বললেন যে, ভারতই এই যুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে এবং তারা এর নিন্দাবাদ করবেনই।[১৬] নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন উদ্যোগে যে একপেশে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সোভিয়েত রাশিয়া দু'বার ভেটো প্রয়োগ করে বানচাল করে দিল তিনি তাতে খুব ক্ষুব্ধ হন। সোভিয়েতের যুক্তি ছিল যে, এই প্রস্তাবে পাকিস্তানের বাংলাদেশে অন্যায় জোরদখল বহাল থাকবে এবং মূল সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এক বছর পর ১৯৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জর্জ বুশ মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক তৎপরতা বন্ধের জন্য এরকম একটি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করেন। সেখানে তাঁর যুক্তি ছিল যে, এই প্রস্তাবে মূল সমস্যার সমাধান হবে না শুধু দখলদারের অধিকার বহাল থাকবে। মজার ব্যাপার হলো যে, এক বছরের ব্যবধানে জর্জ বুশ জ্যাকব মালিকের যুক্তির আশ্রয় নিয়েই জাতিসংঘের ইতিহাসে দ্বিতীয় মার্কিন ভেটো প্রয়োগ করেন, যদিও এক বছর আগে মালিকের বিরুদ্ধে তাঁর উষ্মা ছিল গভীর। তিনি এই ভেটো প্রদানকালে বলেন, "এই প্রস্তাব গ্রহণ করে পরিষদ বাস্তবকে অস্বীকার করবে, এই রকম সহিংসতার নিন্দাবাদ করবে কিন্তু অন্যটি সহ্য করে যাবে এবং কারণের প্রতি নজর না দিয়ে প্রতিফলের জন্য ব্যবস্থা নিবে।"[১৭] সোভিয়েত ভেটো দুটো প্রয়োগে জর্জ বুশেরই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

মার্কিন চাপে নিরাপত্তা পরিষদ দ্বিতীয় সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগের পর বিষয়টি সাধারণ পরিষদে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। এই উদ্যোগে ১১টি ইতিবাচক ভোট পড়ে এবং বাকি ৪ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। ৬ ডিসেম্বর রাতে সাধারণ পরিষদ ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং নিজেদের সেনাবাহিনীকে নিজেদের এলাকায় ডেকে নিতে আহ্বান জানালো। একই সঙ্গে শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ বলবৎ করতে আবেদন করলো। প্রস্তাবের তৃতীয় বিষয় ছিল শরণার্থীদের ত্রাণকাজে মুক্ত হস্তে সাহায্য প্রদান। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট হলো ১০৪টি, বিপক্ষে ১১টি এবং ১০জন ভোটদানে বিরত। সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হলেও সকলের মনোপূত হলো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে ভারতকে দোষী ঘোষণা করতে উৎসাহী ছিল। ভারত ও সোভিয়েতসহ কতিপয় দেশ বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে পাকিস্তানি দখলের অবসান দাবি করছিল। একটি তৃতীয় দল পাকিস্তানি বর্বরতা ও নিস্পেষণ মানতে রাজি ছিল না। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অনুপ্রবেশও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না, অনেকেই যারা প্রস্তাব সমর্থন করেন তারা একটি যথার্থ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি সামরিক জান্তাকে সমর্থনে খুবই আহত হন। এইসব অনুভূতির প্রকাশ পায় প্রস্তাবের অবতরণিকায়। প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, যেসব কারণে এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীকালে তার সমাধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অধিবেশন বিশ্বাস করে যে আশু রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া যুদ্ধগ্রস্ত এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে না এবং শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদ এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৮] ভারত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল যে, এই প্রস্তাব বাংলাদেশ না মানলে কোনোমতেই বাস্তবায়িত হবে না। ইতোমধ্যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশকে আলোচনায় আহ্বান করতে তারা দাবিও জানালো। পাকিস্তান বললো যে, প্রস্তাবটি ভারত গ্রহণ করলে তারা মানবে। পাকিস্তানের জন্য প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত অনুকূল, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহৃত হলে তারা মুক্তিবাহিনীর ভারি অস্ত্রের অভাবের সুযোগে কোনোমতে পালানোর ব্যবস্থা করতে পারতো।

৭ ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর ভবনে পাকিস্তানিরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করছিল। দেখা গেল যে তাদের বাঁচবার কোনো পথ নেই এবং সেনাধিনায়ক নিয়াজি কান্নায় ভেঙে পড়েন। অথচ পাকিস্তানের সদর দফতরে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ইয়াহিয়া জান্তার কোনো পরিচিতিই ছিল না। তারা জানতোই না যে সর্বত্র পাকিস্তানি সেনানিবাসের অনবরত পতন হচ্ছে। চাঁদপুরের সেনাধিনায়ক পালাতে গিয়ে আহত হন, বগুড়ার সেনাপতি হারিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। বিপদে পড়ে ইয়াহিয়া যুদ্ধ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদেশপালের হাতে ন্যস্ত করেন। ডা. মালিক জেনারেল নিয়াজির সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি প্রস্তাব দেন। তিনি

বিপ্লব ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় শহীদদের আত্মাহুতি ম্লান হয়ে গেছে।" রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকও তাঁর বক্তব্যে চীনের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন যে, চীনা রাষ্ট্রদূত শুধু শুধুই মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি অপসারণের ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত। তিনি বললেন, "আমরা ক্রমে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদে চীনা প্রতিনিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণে মোটেই আগ্রহী নন। তার ভূমিকা হচ্ছে একটি ভাঁড়ের ভূমিকা। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনৈক্যে যারা খুশি হয় সেই সব যুদ্ধবাজ, আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ভাঁড়ের ভূমিকা চীন গ্রহণ করেছে। এই রকম ব্যবহারে আমরা দুঃখ পাই কিন্তু তারা এই ভাঁড়ামো চালিয়ে যাবেনই। তাদের এই ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের গৃহশত্রুদের জন্য যথাযথ বটে এবং তারা এতে সাফল্য লাভ করবেন বলেই আমাদের ধারণা।" তিনি চীনকে বিরোধিতা, সন্ত্রাস, সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার উদ্যোক্তা এবং ধারক বলে অভিযুক্ত করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, চীনা প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের অপবাদ প্রদানে সিদ্ধহস্ত, নিন্দাবাদ তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তিনি সাম্রাজ্যবাদের ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্বেষাত্মক অপবাদ জানিয়ে তাঁর সামাজ্যবাদী প্রভুদের আহ্লাদিত করছেন। এখন এই রকম অপবাদ প্রদান বা বিদ্বেষ প্রকাশে সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তাদের একজন বিশ্বস্ত ও বংশবদ মুখপাত্র পাওয়া গেছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ প্রথম দিনেই ভারতকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের প্রতি তাঁর বিষোদ্গার প্রকাশ করলেন। নিরাপত্তা পরিষদের লবিতে তিনি বললেন যে, ভারতই এই যুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে এবং তারা এর নিন্দাবাদ করবেনই।[১৬] নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন উদ্যোগে যে একপেশে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সোভিয়েত রাশিয়া দু'বার ভেটো প্রয়োগ করে বানচাল করে দিল তিনি তাতে খুব ক্ষুব্ধ হন। সোভিয়েতের যুক্তি ছিল যে, এই প্রস্তাবে পাকিস্তানের বাংলাদেশে অন্যায় জোরদখল বহাল থাকবে এবং মূল সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এক বছর পর ১৯৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জর্জ বুশ মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক তৎপরতা বন্ধের জন্য এরকম একটি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করেন। সেখানে তাঁর যুক্তি ছিল যে, এই প্রস্তাবে মূল সমস্যার সমাধান হবে না শুধু দখলদারের অধিকার বহাল থাকবে। মজার ব্যাপার হলো যে, এক বছরের ব্যবধানে জর্জ বুশ জ্যাকব মালিকের যুক্তির আশ্রয় নিয়েই জাতিসংঘের ইতিহাসে দ্বিতীয় মার্কিন ভেটো প্রয়োগ করেন, যদিও এক বছর আগে মালিকের বিরুদ্ধে তাঁর উষ্মা ছিল গভীর। তিনি এই ভেটো প্রদানকালে বলেন, "এই প্রস্তাব গ্রহণ করে পরিষদ বাস্তবকে অস্বীকার করবে, এই রকম সহিংসতার নিন্দাবাদ করবে কিন্তু অন্যটি সহ্য করে যাবে এবং কারণের প্রতি নজর না দিয়ে প্রতিফলের জন্য ব্যবস্থা নিবে।"[১৭] সোভিয়েত ভেটো দুটো প্রয়োগে জর্জ বুশেরই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

মার্কিন চাপে নিরাপত্তা পরিষদ দ্বিতীয় সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগের পর বিষয়টি সাধারণ পরিষদে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। এই উদ্যোগে ১১টি ইতিবাচক ভোট পড়ে এবং বাকি ৪ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। ৬ ডিসেম্বর রাতে সাধারণ পরিষদ ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং নিজেদের সেনাবাহিনীকে নিজেদের এলাকায় ডেকে নিতে আহ্বান জানালো। একই সঙ্গে শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ বলবৎ করতে আবেদন করলো। প্রস্তাবের তৃতীয় বিষয় ছিল শরণার্থীদের ত্রাণকাজে মুক্ত হস্তে সাহায্য প্রদান। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট হলো ১০৪টি, বিপক্ষে ১১টি এবং ১০জন ভোটদানে বিরত। সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হলেও সকলের মনোপূত হলো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে ভারতকে দোষী ঘোষণা করতে উৎসাহী ছিল। ভারত ও সোভিয়েতসহ কতিপয় দেশ বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে পাকিস্তানি দখলের অবসান দাবি করছিল। একটি তৃতীয় দল পাকিস্তানি বর্বরতা ও নিষ্পেষণ মানতে রাজি ছিল না। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অনুপ্রবেশও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না, অনেকেই যারা প্রস্তাব সমর্থন করেন তারা একটি যথার্থ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি সামরিক জান্তাকে সমর্থনে খুবই আহত হন। এইসব অনুভূতির প্রকাশ পায় প্রস্তাবের অবতরণিকায়। প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, যেসব কারণে এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীকালে তার সমাধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অধিবেশন বিশ্বাস করে যে আশু রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া যুদ্ধগ্রস্ত এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে না এবং শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদ এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৮] ভারত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল যে, এই প্রস্তাব বাংলাদেশ না মানলে কোনোমতেই বাস্তবায়িত হবে না। ইতোমধ্যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশকে আলোচনায় আহ্বান করতে তারা দাবিও জানালো। পাকিস্তান বললো যে, প্রস্তাবটি ভারত গ্রহণ করলে তারা মানবে। পাকিস্তানের জন্য প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত অনুকূল, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহৃত হলে তারা মুক্তিবাহিনীর ভারি অস্ত্রের অভাবের সুযোগে কোনোমতে পালানোর ব্যবস্থা করতে পারতো।

৭ ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর ভবনে পাকিস্তানিরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করছিল। দেখা গেল যে তাদের বাঁচবার কোনো পথ নেই এবং সেনাধিনায়ক নিয়াজি কান্নায় ভেঙে পড়েন। অথচ পাকিস্তানের সদর দফতরে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ইয়াহিয়া জান্তার কোনো পরিচিতিই ছিল না। তারা জানতোই না যে সর্বত্র পাকিস্তানি সেনানিবাসের অনবরত পতন হচ্ছে। চাঁদপুরের সেনাধিনায়ক পালাতে গিয়ে আহত হন, বগুড়ার সেনাপতি হারিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। বিপদে পড়ে ইয়াহিয়া যুদ্ধ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদেশপালের হাতে ন্যস্ত করেন। ডা. মালিক জেনারেল নিয়াজির সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি প্রস্তাব দেন। তিনি

জানালেন যে, পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক লোকজনকে নিরাপদে পাকিস্তানে অপসারণের শর্তে দেশের শাসনভার হস্তান্তর করা হবে এবং যুদ্ধবিরতি সম্ভব হবে।[১৯] এই বার্তাটি বেসামরিক সম্পর্কের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল রাও ফরমান আলী ১০ ডিসেম্বর প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার অনুমোদন নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল মার্ক অরির হাতে দেন। পল এই বার্তা নিউইয়র্কে পাঠানোর আগে গভর্নর ডা. মালিকের সম্মতি গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য নিক্সন-কিসিঞ্জারের উপদেশে জেনারেল ইয়াহিয়া এই আবেদন প্রত্যাহার করেন। কিসিঞ্জার কোনোমতেই পাকিস্তানের পরাজয় মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা করে মনে করেন যে, চীন ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধোদ্যোগ নেবে এবং একটি সঙ্কটের সৃষ্টি করবে।[২০] একই সঙ্গে নিক্সনের হুকুমে পারমাণবিক অস্ত্রে-সজ্জিত মার্কিন রণতরী এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির ভুল কৌশল বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতি পিছিয়ে দিল। পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিষদে অভিনীত হলো পরাশক্তির বিরোধিতার একটি দুর্ভাগ্যজনক নাটক। বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের বিরতি এলো। তবে পাকিস্তানি বর্বরতার দোসর রাজাকার আলবদররা সেই সুযোগে বাংলাদেশের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করলো।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হুকুমে রাষ্ট্রদূত বুশ ১২ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন আহ্বান করতে আবেদন করলেন। পরিষদ আর একটি মার্কিন প্রস্তাব বিবেচনা করতে বসলো। এই প্রস্তাবটি ছিল সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি। এই অধিবেশনে ভারত থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং এবং পাকিস্তান থেকে মনোনীত পররাষ্ট্র মন্ত্রী (উপ-প্রধানমন্ত্রীও বটে) জুলফিকার আলী ভুট্টো অংশগ্রহণ করেন। ভারত আবার জানিয়ে দিল যে, বাংলাদেশের মতামত পরখ না করে সমস্যার কোনো সমাধান করা যাবে না এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে বৈঠকে আহ্বান করা দরকার। বাংলাদেশের অভিমত ছিল যে, শুধু পাকিস্তানি দস্যুদলকে অপসারণ করা ছাড়া আর কোনো বিবেচ্য বিষয় ছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ইচ্ছায় যে-কোনো সময় বাংলাদেশ পরিত্যাগ করবে বলে এটি কোনো সমস্যাই নয়। মার্কিন প্রশ্নের উত্তরে ভারত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করলো যে, পশ্চিম রণক্ষেত্রে তাদের কোনো এলাকা দখলের বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা বা ইচ্ছা নেই। মার্কিন একগুঁয়েমির ফলে তাদের প্রস্তাব আবার ১৩ ডিসেম্বর ভোটে এলো এবং আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করলো। এবারের আলোচনায় এক সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধির বক্তব্য শোনবার ব্যবস্থা হয় কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘোর আপত্তির জন্য তা আর হয়ে উঠলো না।[২১] এই ভেটোর পর ইতালি ও জাপান আর একটি নতুন প্রস্তাব প্রণয়নে ব্রতী হয়। এতে বলা হয় যে, ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির জন্য সব পদক্ষেপ নেবে এবং দুই সেনাবাহিনীকে পৃথক করে যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ করবে। এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় দফায় বলা হয় যে, একটি সার্বিক

রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সংলাপ শুরু হবে এবং দুই দেশকে এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে। প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই ব্যবস্থাগুলো নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এই প্রস্তাব যুদ্ধবিরতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের যুগপৎ সুযোগ করে দেয়। কিন্তু প্রস্তাবটি মোটেই এগুতে পারলো না।

বৃটিশ-ফরাসি উদ্যোগ এবং নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা

১৪ ডিসেম্বর একটি বৃটিশ-ফরাসি প্রস্তাব নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার স্বার্থে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক মুলতবি রাখা হয়। এই প্রস্তাবের মূল কথা ছিল বাংলাদেশে দুই বিবদমান বাহিনীর সেনাধিনায়করা যুদ্ধবিরতি করবেন। সেনাবাহিনী পৃথকীকরণ করবেন এবং যত শিগগির সম্ভব সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেবেন। এই প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনমতের অনুকূলে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে আহ্বান জানানো হয়। এই প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির সুযোগ রাখা হয়। সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়েও বাংলাদেশের আশঙ্কার প্রতি খেয়াল রাখা হয়। একই প্রস্তাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা রাখা হয়। পোল্যান্ড একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে। এতে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তাদের বর্তমান অবস্থানে জড়ো করে পশ্চিমে অপসারণের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। বাংলাদেশে শাসনভার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করতে বলা হয়। সর্বশেষে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি নাগরিক ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাঙালি নাগরিকদের অবাধ স্থানান্তরের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। সৈন্য ও জনগণ অপসারণ এবং রাজনৈতিক সমাধানে ঐকমত্য হয় যুদ্ধবিরতির পূর্বশর্ত।[২২] বৃটিশ-ফরাসি উদ্যোগ চূড়ান্তকরণের আগেই ১৫ ডিসেম্বর সকালে ভুট্টো পরিষদের বৈঠকের জন্য আবেদন জানালেন। এই অধিবেশনে নিরাপত্তা পরিষদে অভিনীত কৌতুক নাটকের চরম পরিণতি লক্ষিত হয়। ভুট্টো পোল্যান্ডের প্রস্তাবে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি নিদারুণ নিরাশায় ভুগছিলেন; কারণ পূর্ব রণাঙ্গনে পরাজয় রোধের কোনো উপায় ছিল না। তিনি একটি ভাবাবেগ-তাড়িত বক্তৃতা দিলেন এবং নিরাপত্তা পরিষদকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন। তাঁর মতে পরিষদটিই ছিল 'প্রবঞ্চনা ও প্রহসনের' মঞ্চ। এই পরিষদের নিষ্ক্রিয়তা ও দীর্ঘসূত্রিতাকে তিনি অভিযুক্ত করলেন। নিরাপত্তা পরিষদে বেহুদা কথার জাল বুননই প্রধান বিশেষত্ব। তিনি তাঁর আসন থেকে সব কাগজপত্র ছিন্নভিন্ন করে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে, রাগতভাবে উঠে দ্রুতগতিতে পরিষদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলে গেলেন, "আমি এইখানে আর একটি মুহূর্ত ব্যয় করা আমার জন্য ও আমার দেশের জন্য নিতান্ত অসম্মানজনক বলে বিবেচনা করি। আপনাদের যা খুশি সেই সিদ্ধান্ত জারি করুন। ভার্সাই চুক্তির চেয়েও অন্যায় কোনো চুক্তি প্রণয়ন করুন। আগ্রাসনকে বৈধ ঘোষণা করুন। জোর দখলকে জায়েজ করুন। আমি এরকম সিদ্ধান্তে অংশ নেবো না। আমার দেশ আমাকে ডাকছে। কেন

এই নিরাপত্তা পরিষদে আমি আমার সময় নষ্ট করবো? আমি আমার দেশের একটি অংশের লজ্জাকর আত্মসমর্পণে অংশীদার হতে চাই না। আপনারা আপনাদের নিরাপত্তা পরিষদ নিয়ে থাকুন। আপনারা বসুন। আমি চললাম।" লবিতে বেরিয়ে তিনি বললেন, "রাষ্ট্রদূত আগা শাহি তো রইলেন!"[২৩] ভুট্টোর নাটকীয় ভূমিকা একটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি রচনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলো। বৃটিশ-ফরাসি প্রস্তাব উপমহাদেশে একটি সার্বিক সমাধানের পথ খুঁজছিল। বাংলাদেশে শান্তি আসুক, পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা পাক, যুদ্ধবন্দি ও আটকেপড়া নাগরিকদের জানমাল রক্ষা পাক। এছাড়াও এই প্রস্তাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার পুনর্বাসনের জন্যও পদক্ষেপ বিবেচনায় ছিল। এই উদ্যোগে অগ্রগতি ব্যাহত হলো এবং পরদিন ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করলো এবং ভারত পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো। জাতিসংঘের কোনো ভূমিকা ছাড়াই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। নিরাপত্তা পরিষদ ছুটি নিল।

ভারতীয় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা কার্যকর হলো। জেনারেল ইয়াহিয়া প্রথমে তর্জনগর্জন করে পরে মেষশাবকের মতো তা মেনে নিলেন। মুজিবনগর সরকার ঢাকায় প্রতিষ্ঠা পেল। নিরাপত্তা পরিষদ কিন্তু একটি বৈঠক ডাকতেও ব্যর্থ হলো। অবশেষে পাঁচদিন পর ২১ ডিসেম্বর আর্জেনটিনা, নিকারাগুয়া, জাপান, বুরুন্ডি, সোমালিয়া ও সিয়েরা লিয়নের একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। এর পক্ষে হলো ১৩ ভোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড ভোটদানে বিরত থাকলো। এই প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :[২৪]

নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব : ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১

উপমহাদেশের গুরুতর সমস্যা যার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে আছে তা আলোচনা করে :

সাধারণ পরিষদের ৭ ডিসেম্বরের প্রস্তাব ২৭৯৩[২৬] বিবেচনায় নিয়ে ভারত সরকারের ১২ ডিসেম্বরের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে :

স্বস্তি পরিষদে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পশ্চিম রণাঙ্গনে একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা শুনে : পাকিস্তানের পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতিতে ১৭ ডিসেম্বর থেকে রাজি হওয়া বিবেচনা করে : পরবর্তীকালে যুদ্ধবিরতি ও বিরোধের অবসান অবলোকন করে :

১. দাবি করছে যে, সকল বিবদমান এলাকায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং বিরোধের অবসান কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত হবে। যত শিগগির সম্ভব সব সেনাবাহিনী নিজেদের সীমানায় প্রত্যাহৃত হবে, যাতে জম্মু ও কাশ্মিরে জাতিসংঘ ভারত ও পাকিস্তান সামরিক পর্যবেক্ষক দলের তদারকিতে যুদ্ধবিরতি সীমানাকে পুরোপুরি মানা হয়।
২. সকল সদস্যের এমন কোনো উদ্যোগ যাতে অবস্থার অবনতি হয় অথবা আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হয় তা পরিহার করতে আহ্বান করছে।
৩. সম্পৃক্ত সবাইকে আহ্বান করছে মানবজীবন রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে এবং ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আহত ও রুগ্ন যুদ্ধবন্দি এবং বেসামরিক জনগণের পরিচর্যার ব্যবস্থা নিতে।

৪. শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে তাদের দেশে ফিরে যেতে আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন করছে এবং এই ব্যাপারে মহাসচিবকে পূর্ণ সহযোগিতা দিতে আহ্বান জানাচ্ছে।
৫. মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য মহাসচিবকে প্রয়োজনে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করছে।
৬. এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে পরিষদকে ওয়াকিবহাল রাখতে মহাসচিবকে অনুরোধ করছে।
৭. বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা অব্যাহত রাখতে এবং সক্রিয় থাকতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

এই প্রস্তাবেই জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে। ১৯৭২ সালে আনরড UNROD এবং ১৯৭৩ সালে আনরব UNROB বাংলাদেশে একটি সফল ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে এই অভিজ্ঞতার অন্যতম সুফল হয় ১৯৭২ সালে স্থাপিত জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ প্রতিষ্ঠান (UNDRO)। এই কার্যক্রমের অধীনে দেড় বছরে মোট ১৮২ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য বাংলাদেশে প্রদত্ত হয়। এছাড়াও এই কার্যক্রমের অধীনে দ্বিপাক্ষিক সূত্রে প্রাপ্ত আরো ৩৯৪ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য সমন্বিত হয়।[২৫] কিন্তু এই প্রস্তাবের দুর্বলতা ছিল পোল্যান্ড বা ইঙ্গ-ফরাসি উদ্যোগে যে আরো ক'টি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয় তার প্রতি অবজ্ঞা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের স্থানান্তরের কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় আরো প্রায় দু'বছর এই সমস্যা বহাল থাকে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কও অমীমাংসিত থেকে যায় এবং দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শেষ বিশ্লেষণে মনে হয় যে, জাতিসংঘ শুধু মানবিক ত্রাণকার্যেই যা কিছু সফলতার নিদর্শন রাখতে সক্ষম হয়। জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশন ভারতে শরণার্থীদের যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ কার্যক্রমে এই সংস্থা ২১৫ মিলিয়ন ডলারের যোগান দেয়। জাতিসংঘ শিশু সংস্থা (UNICEF) শরণার্থী শিবিরে প্রায় ৩০ লাখ শিশুর খাদ্য সরবরাহ করে এবং অপুষ্টি সমস্যা নিরসনে কিছু অবদান রাখে। বাংলাদেশে জাতিসংঘ একটি ত্রাণ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু পাকিস্তানের গড়িমসি এবং অনিচ্ছার কারণে এতে তেমন জোর আসে নি। মহাসচিব ১ এপ্রিল তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন কিন্তু পাকিস্তান এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো ২২ মে। এরপর কেবল আগস্টে গিয়ে সিদ্ধান্ত হলো যে, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এই ত্রাণ কাজ দেখাশোনা করবে। ১৫৮ জন পর্যবেক্ষক পাকিস্তান গ্রহণ করতে রাজি হলো। কিন্তু এই বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন হলো ১৫ নভেম্বর।[২৬] এর ফলে এই ত্রাণ কার্যক্রম মোটেই জোরদার হয় নি। তবে যে অবকাঠামো এবং পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তাতে ১৬ ডিসেম্বরের পর সহজেই একটি বলিষ্ঠ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। UNEPRO থেকেই UNROD -এর উদ্ভব হয়।

জাতিসংঘ বাংলাদেশ সঙ্কট মোকাবিলায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এর জন্য দায়ী পরাশক্তির বিরোধ এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘের দুর্বলতা। একটি শক্ত সমস্যাকে

সরাসরি মোকাবিলা করতে জাতিসংঘের এখতিয়ার নেই। তাই সমস্যার সহজ বিষয়ে জাতিসংঘ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। পাকিস্তানি গণহত্যা ও অত্যাচার বিবেচনা করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বাদ সাধে। তাই একমাত্র উপায় হয় মানবিক সাহায্য কার্যক্রম প্রণয়ন করা। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি ছিল জটিল এবং মানবিক দুর্গতির কারণ ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাই মানবিক সাহায্য প্রদানেও জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়। সাধারণ পরিষদ তো নিতান্তই অক্ষম প্রমাণিত হয়, এতো বড় সঙ্কট তার আলোচ্যসূচিতেই স্থান পায় নি। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদও হয় অকার্যকর এবং সেজন্য পরাশক্তির বিরোধ ছিল মূল কারণ। পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন না করলে নিরাপত্তা পরিষদ সম্ভবত শক্ত হাতে সঙ্কট সমাধানে ব্রতী হতে পারতো।

টীকা ও পাঠপঞ্জি

১. *Baltimore Sun,* বাল্টিমোর, ম্যারিল্যান্ড, ১২ মার্চ, ১৯৭১।
২. *Baltimore Sun,* বাল্টিমোর, ম্যারিল্যান্ড, ১২ মার্চ, ১৯৭১।
৩. *Charter of the United Nations & Statute of the International Court of Justice.* নিউইয়র্ক ১৯৭০, পৃ. ৩।
৪. *United Nations & Human Rights* : নিউইয়র্ক, ১৯৬৮, পৃ. ৩৬-৩৮।
৫. আইউব খান : *Friends Not Masters,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৬৭, পৃ. ১৮৭।
৬. *United Nations & Human Rights* : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।
৭. পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট মালিক গোলাম জিলানি ও আলতাফ গওহর বনাম সিন্ধু প্রদেশ ও অন্যান্য মামলার রায়ে ইয়াহিয়া সরকারকে অন্যায় দখলদার বলে অভিহিত করে।
The Hindustan Times, নিউ দিল্লি, ২৪ এপ্রিল, ১৯৭২।
৮. রেকর্ড সুপারিনটেনডেন্ট : *Congressional Records,* মার্কিন সরকারি মুদ্রণ দফতর, ওয়াশিংটন, ১৯৭১, ১১ জুন, ১৭৯১, পৃষ্ঠা ই ৫৭৫০।
৯. জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রেস রিলিজ, ২ আগস্ট, ১৯৭১।
১০. জাতিসংঘ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালে এই সব বক্তব্যের একটি সংগ্রহ প্রস্তুত করে। বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের নামের জন্য লেখকের *স্মৃতি অম্লান*-১৯৭১ (আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ২০২-২০৩) দ্রষ্টব্য।
১১. হেনরি এ কিসিঞ্জার : *White House Years.* বোস্টন ম্যাসাচুসেটস, লিটল ব্রাউন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭৯, পৃ. ৮৮৭-৮৮৯, ৮৯৪, ৯৮২।
১২. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
১৩. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
Evening Star, ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
১৪. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
১৫. *The New York Times* : নিউইয়র্ক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
১৬. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
Evening Star : ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
১৭. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
১৮. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ২৭৯৩ (২৪), ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১৯. Washingtion Post, ওয়াশিংটন ডিসি, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১, এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাকিস্তানে প্রকাশিত সব বইয়ে এখন পাওয়া যায়। যেমন রাও ফরমান আলী : *How Pakistan Got Divided.* জাং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯২, পৃ. ১২৪-১৩১।
আলমদর রাজা : *Dacca Debacle,* জাং পাবলিশার্স, লাহোর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৩-১৩৩।
হাসান জহীর : *The Separation of East Pakistan,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯৪, পৃ. ৩৮১-৩৯৯।

২০. হেনরি এ কিসিঞ্জার : *White House Years,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০৫-৯১৩, জ্যাক এন্ডারসন : *The Anderson Papers,* নিউইয়র্ক : র‍্যানডম হাউস, ১৯৭৩, পৃ. ২২৪-২৩০।

২১. *The New York Times,* ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
Washingtion Post, ওয়াশিংটন ডিসি, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
Baltimore Sun, বাল্টিমোর, ম্যারিল্যান্ড, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

২২. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

২৩. *Washingtion Post,* ওয়াশিংটন ডিসি, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

২৪. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ৩০৭, ২১ ডিসেম্বর।

২৫. বাংলাদেশ সরকার বহিঃসম্পদ বিভাগ : *Flow of External Resources to Bangladesh,* 1989, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

সাহায্য প্রদানকারী দেশ ও সংস্থা	মিলিয়ন ডলার
জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম	১৮২
ভারত	২১৬
যুক্তরাষ্ট্র	৪৬
কানাডা	৪৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪৩
যুক্তরাজ্য	২৮
সুইডেন	১৯
	৪৭৮

২৬. *The New York Times,* নিউইয়র্ক, ১ আগস্ট ১৯৭১।
জেনারেল একাউন্টিং অফিস রিপোর্ট : *US Humanitarian Aid to Pakistan Following the Outbreak of War in March* 1971, ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন সরকারি মুদ্রণ দফতর, ১৯৭২, ২০ এপ্রিল, পৃ. ১০-১১।

ষোড়শ অধ্যায়

বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ

ইতিহাসে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিশ্লেষণে ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করলে একটি মহাকাব্য রচনা করা যায়। সম্ভবত যেকোনো প্রাগৈতিহাসিক ভূখণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে মহাকাব্য প্রণীত হতে পারে। বঙ্গীয় অববাহিকা বিবেচনা করলে যে ভূখণ্ডের ছবি ভেসে ওঠে তার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে গারো পাহাড়, আর পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় ও পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়। এই ভূখণ্ড মূলত গাঙ্গেয় বদ্বীপ। প্রায় পঁচিশ লাখ বছর আগে এখানে বসতি শুরু হয়। প্রায় দশ হাজার বছর পুরনো নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেছে। পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি-চট্টগ্রামেও আদিকালের নিদর্শন বর্তমান। উত্তরবঙ্গে খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৬০০ সাল থেকে পুন্ড্রনগর বিকাশ লাভ করে। বগুড়ার মহাস্থানগড় খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের সমৃদ্ধিশালী জনপদ। দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার খৃষ্টীয় পঞ্চাশ শতকে নির্মিত হয়। রাজশাহীর পাহাড়পুর জনপদে সোমপুর বিহার হলো খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের। এবং কুমিল্লার ময়নামতি লালমাই জনপদে শালবন বিহার অষ্টম শতকে নির্মিত হয়।

নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় এক সময় ধারণা ছিল এই ভূখণ্ডে বসতি ছিল দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির। ভিন্ন মতে এর মূল অধিবাসী ছিল অস্ট্রেলয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠি। তবে ইন্দো-আর্য, তুর্কো-ইরানীয়, দ্রাবিড়ীয়ও মোঙ্গলীয় গোষ্ঠির নানা দল-উপদল এই ভূখণ্ডের গলনপাত্রে যে একীভূত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গীয় অববাহিকায় আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই অনেক রাজপরিবার বিভিন্ন এলাকায় তাদের রাজত্ব চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তবে মোটামুটিভাবে চারটি জনপদে বঙ্গীয় অববাহিকা বিভক্ত ছিল। রাঢ় হলো পশ্চিমাংশ, বরেন্দ্র বা গৌড় হলো উত্তরাংশ, বঙ্গ হলো দক্ষিণাংশ এবং সমতট হলো পূর্বাংশ। মৌর্য যুগে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্ভবত রাঢ় ও বরেন্দ্রই ছিল তাদের দখল। গুপ্তযুগে খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম

শতকে রাঢ় ও বরেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গও যুক্ত হয়। রাজা শশাঙ্ক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে তাঁর গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর দখল সমতটে ও বঙ্গীয় অববাহিকার পশ্চিমেও বিস্তার লাভ করে। পালবংশ খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত রাঢ়, বরেন্দ্র ও সমতট ছাড়াও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করেন। সেন বংশ খৃষ্টীয় দশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে প্রায় দুশো বছর গোটা বঙ্গীয় অববাহিকায় তাদের রাজত্ব বহাল রাখেন। দিল্লীতে দাস রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগেই ১২০১ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি গৌড়ে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী প্রায় দেড় শো বছর বঙ্গীয় অববাহিকা ও বিহারে দিল্লীর দাস, খিলজি ও তুগলক সম্রাটদের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৩৩৮ সাল থেকেই দিল্লীর কর্তৃত্ব শিথিল হলো এবং ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় এগারো বছর ধরে পরিচালিত নানা অভিযানে বিজয় লাভ করে তিনি বঙ্গীয় অববাহিকার চারটি জনপদেই তাঁর কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন এবং "শাহে বাঙালা" উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্বে সিলেট থেকে পশ্চিমে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত অববাহিকা তখন থেকেই বাংলা নামে খ্যাত হয়। মোগল "সুবা বাংলা" হয় আরো বিস্তৃত—পশ্চিমে উড়িষ্যা, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান এবং পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত। বৃটিশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীও ছিল সুবা বাংলার মত বিস্তৃত। ১৮৭৪ সালে আসামে চলে গেল সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাসমূহ। ১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হলো। ১৯৪৭ সালে বঙ্গপ্রদেশ ভাগ হয়ে একদিকে হলো বর্তমানের বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।

বাংলাদেশে জাতীয়তার বিকাশ

বঙ্গীয় অববাহিকায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ঘটে বাংলাভাষার বিকাশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ইন্দো-ইরানিয়ান গোষ্ঠিভুক্ত বাংলাভাষা। উপমহাদেশে খৃস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ধ্রুপদী সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। কথ্য প্রাচীন আর্য ভাষা হিসেবে প্রাকৃত স্থান করে নেয় খৃস্টপূর্ব অস্টম শতাব্দীতে। প্রাকৃত থেকে উদ্ভব হয় অপভ্রংশের। গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বিকশিত হয় বাংলা। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলার উৎস হলো মগধী অপভ্রংশ। সংস্কৃত ও পালি থেকে বাংলা সাহায্য পেয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরবী ফারসী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় আধুনিক ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষার বিকাশের পর এই ভাষাই হয় এখানকার মানবগোষ্ঠির প্রধান ঐক্যসূত্র। ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গ বিভাগ করলে এর বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন হয় ভাষাগত ঐক্য ছিল তার অন্যতম যুক্তি। ভাষার প্রতি আনুগত্য আরো পরে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উন্মেষে সর্বপ্রধান অবদান রাখে।

বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ আধুনিক ইউরোপীয় রেনেসাঁরই একটি ফসল। জাতীয় ভাষার বিকাশ এবং ধর্মকে রাষ্ট্রাচার থেকে পৃথক করে রেনেসাঁ জাতিরাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করে মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে। বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের বিরতি পর্যন্ত। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা চুক্তিতে জাতির

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি মিললো এবং এই প্রক্রিয়া প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তিতেও প্রতিফলিত হলো। অবশ্যি এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পেতে আরো অর্ধশতকেরও বেশি অপেক্ষা করতে হলো। উপমহাদেশে বিগত শতকে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতায় রূপ পেল। তার ফলে ভারতে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার বিকাশে তেমন জোর এলো না। বাংলা প্রেসিডেন্সিতে অবশ্যি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে এদিকে সাময়িক হলেও খানিকটা দৃষ্টি পড়ে। তবে বৃহত্তর ভারতীয় উপনিবেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ধর্মের আশ্রয় নিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেল। এরই ফলে বৃটিশ শাসনের অবসানে উপমহাদেশে গঠিত হলো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে হলো পাকিস্তান। আর বাকী গোটা দেশ হলো ভারত। বৃটিশ শাসনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে বাংলায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমবাংলা ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ হিসেবে নিজের একটি অবস্থান করে নেয়। বঞ্চনা বা পশ্চাদপদতার অভিযোগ থাকলেও সেই রাজ্যের বাঙালিরা বৃহত্তর ভারতীয় জাতিসত্তার মধ্যে মিলে গেছে। বহু গোষ্ঠির রাষ্ট্রে এ'টি মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। বেলজিয়ামের ফরাসী গোষ্ঠি বা সুইজারল্যান্ডের জার্মান গোষ্ঠির দিকে তাকালে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ববাংলায় কিন্তু পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ মোটেও শিকড় প্রবেশ করাতে সক্ষম হলো না। শুরুতেই ভাষার দাবি পূর্ব অঞ্চলের বাঙালিদের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠা করলো। পাকিস্তান জোর করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপাতে গিয়ে বাংলাভাষা আন্দোলনের জন্ম দিল এবং বাঙালি তরুণরা ভাষার জন্য আত্মবলিদান করলো ১৯৫২ সালে। তদুপরি রাজনৈতিক মতৈক্যের অভাবে পাকিস্তানে নয় বছর কোনো সংবিধানই রচনা করা গেল না। এবং যখন ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান চালু হলো তা বাঙালিদের সন্তুষ্ট করতে পারলো না। সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে পূর্ববাংলা হলো বঞ্চিত ও অবদমিত এলাকা। বাংলাদেশের সামাজিক সমতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারা এবং গণতান্ত্রিক আচার আচরণের সমতুল্য কিছুই পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল না। সেখানে ছিল একটি সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব এবং অনুক্রমী সমাজ ব্যবস্থা। পাকিস্তানের সামরিক সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারলো না। পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের সামরিক শাসন (পরোক্ষভাবে ১৯৫৩ সাল থেকে এবং সরাসরি ১৯৫৮ সাল থেকে) বাঙালিদের বঞ্চনা, নির্যাতন ও মনোযাতনা বাড়িয়েই চললো। সর্বোপরি পাকিস্তানের তেইশ বছরে অর্থনৈতিক বৈষম্য এমনি বাড়লো যে অধিক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে দারিদ্র্য বেড়ে চললো, জাতীয় সম্পদের প্রবৃদ্ধি হলো বিঘ্নিত এবং এমন কি শিক্ষায়ও তারা পিছিয়ে পড়তে থাকলো। স্মরণ রাখা দরকার যে ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারত বিদ্বেষ। পাকিস্তানের স্থপতি যদিও ধর্মনিরপেক্ষ দেশের স্বপ্ন দেখেন কিন্তু পাকিস্তান হয় একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কোনো অমুসলমানের সে দেশে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হবার সুযোগ ছিল না। রাষ্ট্রীয় আচার আচরণে সাম্প্রদায়িকতা হয় সর্বব্যাপী এবং সংখ্যালঘুরা হয় নিষ্পেষিত গোষ্ঠি। পাকিস্তানের শুরুতে ভারতের সঙ্গে নানা ব্যাপারে বিবাদ বাধে। সম্পদ বন্টন, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ভাগাভাগি, সামরিক সম্ভার বিভাজন, পানি ব্যবহারের হিস্যা এগুলো নিয়ে ভারতের হীনমন্যতা বিবাদের গভীরতা বৃদ্ধি করে। সর্বোপরি কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ে দুই দেশে যুদ্ধ বেধে যায় ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের দাবিদার হয়। কিন্তু কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ভারতের পক্ষ নেন। কাশ্মীর যুদ্ধ পাক-ভারত সম্পর্ক একেবারে বিষিয়ে দেয় এবং আজও এই সমস্যাই হচ্ছে দুই দেশের বিবাদের ভিত্তি। পাকিস্তানের এই মানসিকতা কিন্তু বাঙালিরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারে নি। ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক বিবাদকে যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নিয়ে যেতে হবে তার কোনো যৌক্তিকতা বাঙালির পক্ষে গ্রহণ করা কষ্টকর ছিল। বাঙালি চরিত্র মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ। বাঙালি মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে পাকিস্তানিদের চেয়েও বেশি ধার্মিক, কিন্তু তারা ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার তারা অপছন্দ করে। বাস্তবে বাংলাদেশের সমাজ অত্যন্ত উদার, সর্বগ্রাহী এবং এক হিসেবে সার্বজনীন। এমন কি ধর্মীয় আচার আচরণেও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাপক লেনদেন করে আসছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শ সুলতানী আমলের বাংলায় প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীকালে আরো শক্তি সঞ্চয় করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে যে সমাজ সহস্রাধিক বছরে গড়ে উঠেছে তা বস্তুতপক্ষে সংশ্লেষী (Synthctic) নয়, বরং যৌগিক (Syncretic)। সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যও হয় জাতীয়তার অন্যতম উপাদান।

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদের যাত্রা শুরু হলো ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দিয়ে। ১৯৫০-এ মতান্তর ঘটলো গণতন্ত্রের রূপ নিয়ে। জনগণের ভোটাধিকার খর্ব করা যাবে না, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মানতে হবে, হাজার মাইলের দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি দেশে কেন্দ্রীভূত সরকার চলবে না, স্বায়ত্তশাসন হতে হবে ব্যাপক—সংবিধান রচনায় এইসব সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। ১৯৫২ সালে আবার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন সামনে এলো। আনন্দের বিষয় যে বাংলা ভাষার জন্য শহীদের স্মৃতি এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫৪তে সারা দেশ গণবিচ্ছিন্ন ও দেশের স্বার্থ-সমর্পণকারী মুসলিম লীগ সরকারকে ভোটের মাধ্যমে গদীচ্যুত করে। একই সময়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তাতে কেন্দ্রীভূত সরকারের ও উন্নয়ন কৌশলের যথার্থতা নিয়ে শুরু হলো দুই অর্থনীতি তত্ত্বের আন্দোলন। ১৯৫৬ সালে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্তশাসনের কবর রচনা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের একনায়কত্বের সুযোগ দানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান

রুখে দাঁড়ালো। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন সরাসরি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকাশ্য প্রতিবাদের সুযোগ কমে গেল। ক্ষমতার চৌহদ্দী থেকে বাঙালিরা বিতাড়িত হলো। গণতন্ত্র বিসর্জিত হয়ে এলো রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা চাপা পড়ে গেল নিবর্তনমূলক আইনের চাপে। রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আইউব এবং তাঁর দুই দুরাত্মা প্রাদেশিক গভর্নরের স্বেচ্ছাচারিতা জনগণকে পদে পদে নিপীড়িত করে চলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের ওপর প্রথম হামলা আসে ১৯৫৩ সালে অধ্যাপকদের কার্যপরিধি সীমিত করে। কিন্তু সামরিক সরকার চালালো আরো ব্যাপক হামলা। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষকদের নির্যাতন ও বিতাড়ন এবং শরীফ কমিশনের সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের বশংবদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হলো। ১৯৬২ সালে এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের উদ্যোগে শুরু হলো প্রতিরোধ আন্দোলন যা রূপ নিল সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে।

একই সময়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠলো সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিতে। সোহরাওয়ার্দীর অসুস্থতা ও অবশেষে তার প্রয়াণে ১৯৬৩ সালে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলো। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পরোক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে ১৯৬৪ সালে আবার শুরু হলো সম্মিলিত বিরোধী দলের ভোটাধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিব বাংলার মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবিনামা ঘোষণা করলেন। সর্ববিষয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্তানে বাঙালিদের নিজেদের ভাগ্য নিজে নির্বাচনের ক্ষমতা দাবি করলো ছয় দফা কার্যক্রম। ঝগড়া ফ্যাসাদ এবং অভাব অভিযোগ সমাধানের জন্য শেখ মুজিব প্রস্তাব করলেন, "তুমিও বাঁচো এবং আমাকে বাঁচতে দাও।" পরবর্তী দুবছর ধরে চললো সামরিক শাহীর নির্যাতন, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং সর্বশেষে দেশদ্রোহিতার মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা। মহাসমারোহে আইউবের "উন্নয়নের দশ বছর" উৎসব শুরু হলো। কিন্তু বছর শেষে এই উৎসব গণঅভ্যুদয় ও আইউব বিতাড়নে পর্যবসিত হলো। জনমতের চাপে আইউব বিদায় নিলেন কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হলো না। ইয়াহিয়া প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে আবার প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। জনমতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুরু হলো মন্থর গতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণতন্ত্রায়ণের প্রহসন। অবশেষে ইয়াহিয়া জান্তার ক্ষমতা দখলের প্রায় দু বছরের মাথায় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হলো দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ দিল ছয় দফার পক্ষে ম্যান্ডেট। ৩১৩ সদস্যের জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৭ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের অনুসারী এবং বাকি দু'জনও ছিলেন ছয় দফার সমর্থক। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে পিপিপির ৮৮ জন, কাইয়ুম মুসলিম লীগের ৯ জন এবং জামাতে ইসলামীর ৪ জন মোট ১০১ জন সদস্য ছিলেন ছয় দফা বিরোধী। তবে বাকি ৪৩ জনের মধ্যে অনেকে ছিলেন ছয় দফার

সমর্থক আর অন্যদের ছয় দফাতে তেমন আপত্তি ছিল না। তাই মনে হলো এবারে বাঙালিকে ক্ষমতা দিতেই হবে, তাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু মঞ্চের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়ালেন সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশের উচ্চাভিলাষী ও চক্রান্তকারী নেতা পিপিপির জুলফিকার আলী ভুট্টো। কথায় ও কাজে তিনি জনগণের ম্যাণ্ডেট বানচালের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হলেন। ছলে বলে কৌশলে তিনি ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তাকে জয় করে নিলেন। জান্তা বাঙালিদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেবে না, সামরিক বাজেটকে খর্ব করতে দেবে না এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যর্থ করবে। গণতান্ত্রিক রীতিতে ভুট্টো পশ্চিমের দুই প্রদেশে ক্ষমতা পেতে পারেন কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, পাকিস্তানে তাঁকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। সংকীর্ণ গোষ্ঠি বা ব্যক্তির স্বার্থে ষড়যন্ত্র পাকা হলো। স্থির হলো যে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে গণবিক্ষোভকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে এবং যথাসময়ে সামরিক শক্তির আশ্রয়ে বাংলাদেশ শোষণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিরাষ্ট্রের অনন্য অভ্যুদয়

বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহিংস আন্দোলন এড়িয়ে যাবার জন্য ১৯৭১ সালের গোটা মার্চ মাস জুড়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলন চললো। সংলাপে আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের নেতা। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা প্রকাশ্যে সংলাপে বসে আড়ালে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি পাকাপোক্ত করলেন। অবশেষে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার বানচাল করে কোনোরকম সাবধান বাণী না দিয়ে বা সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা না করে ২৫ মার্চের কালরাতে শুরু হলো পাকিস্তানের অপারেশন সার্চলাইট। নয় মাস ধরে চললো গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা। সোনার বাংলাদেশ হলো শ্মশান। এক কোটি বাঙালি হলো ভারতে শরণার্থী। একই সঙ্গে শুরু হলো সামরিকভাবে অপ্রস্তুত বাঙালিদের প্রতিরোধ। লাঠি-সোটা, বর্শা বল্লম আর টোটা বন্দুক দিয়ে কামান আর বোমার মোকাবেলায় রুখে দাঁড়ালো জনতা। নিয়মতান্ত্রিক সব পদক্ষেপ নিঃশেষ হলে ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে নিজে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর কাছে ধরা দিলেন, তবুও যদি গণহত্যা বন্ধ হয়, সংলাপ অব্যাহত থাকে। ২৬ মার্চ ঢাকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কিন্তু মফস্বলে প্রতিরোধ জারি রইলো। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বাধীনতা ঘোষণা বেতারে প্রচার করলো। ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে হলো তাদের অভিষেক। মুজিবনগর সরকার ভারতে আশ্রয় পেল এবং শুরু থেকেই সামরিক শক্তি সংগঠনে মনোনিবেশ করলো। মুক্তিবাহিনী ক্রমে লাখোর্ধ্ব যোদ্ধার বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠলো। তাদের প্রধান কৌশল হলো সীমান্ত এলাকায় সম্মুখসমর এবং দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা। সারাদেশে নির্দিষ্ট গুটিকয় পাকিস্তানি সমর্থক ছাড়া সবাই গেরিলা যুদ্ধে মেতে উঠলো।

কিন্তু নয় মাসের সুদীর্ঘকালে পাকিস্তান তার হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলায় কোনো বিরতি টানলো না। কোনোরকম আপোসেরও ব্যবস্থা নিল না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সংলাপের

পরিবর্তে তারা শুরু করলো দেশদ্রোহিতার জন্য তাঁর বিচার। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই সময় আন্তর্জাতিকভাবেও সঙ্কট সমাধানের কোনো সুযোগ সৃষ্টি হলো না। অবশেষে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিতাড়নের জন্য চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হলো। কোটি কোটি বিরোধীর সমুদ্রে পাকিস্তানের লাখ খানেক সৈন্য আর প্রায় অর্ধলক্ষ রাজাকার তখন কোনো উপায় দেখছে না, তাদের নৈতিক কোনো শক্তি নেই। তারা ছাউনির বাইরে টহল দিতে ভয় পায়। এই সময়ে ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ পেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারি কামান ও অস্ত্রসম্ভারের সমর্থন। বিপর্যস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তখন নেতৃত্বের দারুন সঙ্কট দেখা দেয়। পশ্চিমের অপদার্থ এবং অসৎ ইয়াহিয়া জান্তা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ৩ ডিসেম্বর এই বেপরোয়া আত্মঘাতী জান্তা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বিমান আক্রমণ করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ভারত পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধ। পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি যুদ্ধবিরতি। তাতে তারা বাংলাদেশে কিছুটা হলেও দখল রাখতে পারবে, নতুবা সেখান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের সুযোগ পাবে। তাদের বন্ধু ও সমর্থক আমেরিকা ও চীনের সহায়তা সম্বন্ধে তারা ছিল নিশ্চিত। ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সমাধানে বাধ সাধলো এবং বাংলাদেশের মুক্তি নিশ্চিত করবার জন্য আর এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সামরিক কমান্ড গঠন করলো। বাংলাদেশকে ছাড়া যুদ্ধ বিরতির আর কোনো উপায় রইলো না। মার্কিন ও চীনের উদ্যোগে যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রয়াসের অন্ত ছিল না কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার উপর্যুপরি তিনটি ভেটো পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে পলায়নের কোনো সুযোগ দিল না। আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর রইলো না। সরাসরি মার্কিন বা চীনা হস্তক্ষেপ ছাড়া পাকিস্তানের বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ছিল এবং তদুপরি পাকিস্তানের টিকে থাকারও কোনো সময় ছিল না। যুদ্ধ শুরুর তেরো দিনের মাথায় ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড আত্মসমর্পণ করলো। বাংলাদেশ হলো রাহুমুক্ত। নয় মাসের ভয়াবহতার হলো অবসান। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলো মুক্ত ভূখণ্ডে। নতুন জাতিরাষ্ট্রের আদর্শ হলো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায় তা ছিল উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত। যুদ্ধকে পরিহার করা হবে, বিবাদের মীমাংসা হবে সংলাপের মাধ্যমে এবং সমঝোতার আবেশে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ সবাই মানবে, উপনিবেশবাদের হবে অবসান, সমরাস্ত্র ধ্বংস করা হবে, ভ্রমণ ও বাণিজ্যের সুযোগ পাবে সবাই, শান্তির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে উপাসনার স্বাধীনতা, অভাব থেকে মুক্তি, বাক-স্বাধীনতা এবং ভীতি থেকে নির্বাণ। কিন্তু এই উচ্চাদর্শ নীতিগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত পৃথিবীতে বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ পেল না। শীতল যুদ্ধের কৃপায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নীতিগতভাবে প্রবল ও যৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও বিপুল রক্তক্ষয়ী হলো। বিশ্ব জনমত এই মুক্তিযুদ্ধকে প্রবল সমর্থন দিলেও একটি সার্বিক যুদ্ধ ব্যতিরেকে তাতে যতি টানা গেল না। গণতন্ত্রের

অবমাননা, মানবাধিকারের দলন, গণহত্যার উদ্যোগ এসব কিছুতেই আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল। কিন্তু শীতল যুদ্ধের ছায়াতলে জাতীয় সার্বভৌমত্বের মায়াজালে সব প্রচেষ্টা ও সব উদ্যোগই আটকা পড়ে গেল। পাকিস্তানের দুই অংশের বিচ্ছেদ যতোই যৌক্তিক হোক না কেন তাতে কেউ কিছু করতে পারবে না, কারণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ নিষেধ। একটি রাষ্ট্রে কোনো গোষ্ঠির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা জনগণের মানবাধিকার তাও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এক দেশের কোনো অংশের বিচ্ছেদ ছিল নিতান্তই অকল্পনীয়। একটি স্বাধীনতা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল অসম্ভব। জাতিসংঘে তার প্রতিনিধিত্ব তো দূরের কথা শুধু উপস্থিতিই ছিল অচিন্তনীয়। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত। ভিয়েতনাম, আলজিরিয়া বা রোডোশিয়ার (জিম্বাবওয়ে) অভ্যুদয় ছিল দীর্ঘ সময়ের বিষয়।

১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর জনতা ভেঙ্গে দিল এবং এই দিনটিকেই শীতল যুদ্ধের অবসানের চূড়ান্ত মুহূর্ত বলে বিবেচনা করা যায়। এতে দুনিয়াটা যে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার পরিমাপ নেওয়া নিতান্তই দুষ্কর। সভ্যতার অগ্রগতিতে এটি এক বিস্ময়কর পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এখন সার্বিয়াকে কসোভো ধ্বংস করতে দেয় নি। বসনিয়া-হারজাগোভিনা অথবা রোয়ান্দার গণহত্যার এখন বিচার চলছে আন্তর্জাতিক আদালতে। পি.এল.ও স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবেই জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেল। গণতন্ত্রের দাবি পাচ্ছে আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ও উদ্যোগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ফিলিপাইনস, দক্ষিণ আফ্রিকা, হাইতি বা কাম্বোডিয়ার দৃষ্টান্তই ধরা যাক না কেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ এইসব ক্ষেত্রে কোনোরকম আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহায়তা লাভ করে নি। বরং মাত্র ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার আন্তর্জাতিক চাপে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক এই পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে করেছে বিশিষ্ট। আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের ছেদন হয়েছে অনন্য। অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে ছেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে আপোসের মাধ্যমে। নরওয়ে-সুইডেন, আলজিরিয়া-ফ্রান্স বা সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়েছে সমঝোতার মাধ্যমে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য এতো অল্প সময়ে যে বিপুল রক্তক্ষরণ এবং জীবনাহুতি হয়েছে তাও অনন্য।

উপসংহার

বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের মহাকাব্য সত্যিই অনন্য। প্রায় হাজার বছরের আগে শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। ভাষা হয়েছে জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান। যৌগিক সমাজ সেখানে রেখেছে বিশেষ অবদান। আবার নিষ্পেষণ ও অর্থনৈতিক শোষণের অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে ঐক্য এবং উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা। ধর্ম হয়তো পাকিস্তানের উদ্ভবে রেখেছে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সেই বিনিশ্চায়ক ভূমিকা রেখেছে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নিধন, গণহত্যা ও ধ্বংসলীলায় সামরিক উদ্যোগ, অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মান্ধতা ও আঞ্চলিক কৃষ্টির নিবর্তন এবং ভাষা ও বাকস্বাধীনতার

ওপর আক্রমণ। স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে কিন্তু পাকিস্তানি প্রভাব এখনো শক্তিশালী। এই প্রভাবের বিকাশ হয়েছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রতিবিপ্লবের সাফল্যে। পাকিস্তানি সামরিক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন লাভ করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে। সেদিন সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর নাবালক সন্তানসহ গোটা পরিবার পরিজন এবং আরো ক'জন ঘনিষ্ঠ নেতাকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রকারী গুটিকয়েক আওয়ামী লীগ নেতাকে সামনে রেখে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সেনাবাহিনী এই হঠকারী সুবিধাবাদীদের বিদায় করে নিজেরাই অচিরে ক্ষমতা দখল করে এবং নানা কায়দায় তা অব্যাহত রাখে পরবর্তী ষোল বছর। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাই হয়েছে আঠারো বছর ধরে পাকিস্তানে সেনাশাসন এবং মাত্র সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে আরো ষোলবছর বাংলাদেশে একই সেনাশাসন। এই দুঃশাসনে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রথম আঘাতেই বিসর্জিত হয় ১৯৭৮ সালে। ভারত বিদ্বেষ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সমাজে সমতার পরিবর্তে বিশেষ গোষ্ঠির সুযোগ সৃষ্টি পায় প্রাধান্য। গণতান্ত্রিক আচার আচরণের পরিবর্তে আসে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শিষ্টাচার, সহিষ্ণুতা ও সততা বিদায় হয়। জনপ্রশাসন হয় দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষী। জ্ঞানসাধনা হয় গণবিচ্ছিন্ন ও সীমিত। সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাতে গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য সামরিক শাসন সবরকম পদক্ষেপ নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের আগুনে পরীক্ষিত বাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবশক্তি অবশেষে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের উনিশ বছরের বার্ষিকীতে তারা ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সেনাশাসনকে টেনে নামিয়ে দেয়। অবাধ নির্বাচন এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যদিও পেশী ও অর্থবল দিয়ে তাকে বানচালের প্রচেষ্টা এখনো নির্মূল হয় নি। নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ধারা বহাল হতে চলেছে। বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা অনেকদূর এগিয়েছে। বিচার বিভাগের অনুক্রমী চরিত্রের পরিবর্তনের সূচনা মাত্র হয়েছে। রাজনীতিতে সহিষ্ণুতা এখনো সুযোগ পাচ্ছে না। পরিবর্তে সহিংসতার রাজত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে। সুষ্ঠু রাজনৈতিক নেতৃত্বের রয়েছে মহা-আকাল। সর্বত্রগামী সরকার, সর্বগ্রাসী দলীয়করণ, সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং সেবা সরবরাহে সার্বিক অনীহা এখনো শ্রাবণের আকাশের ঘনঘটাসম। প্রতিবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী কুফল থেকে মুক্তি এখনো আসে নি। তবে অগ্রগতির পথ কন্টকাকীর্ণ হলেও উন্মুক্ত। গণতন্ত্রের ক্ষেত্র ফল ফুলে সুশোভিত না হলেও উত্তম কিছু চারাগাছ রোপিত হয়েছে। সব ভরসার কেন্দ্রস্থল হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ। নতুন প্রজন্ম শিকড়ের সন্ধানে আগ্রহ দেখাচ্ছে। দেশের পঞ্চাশ শতাংশ নাগরিক মহলে (নারী মহল) মুক্তির পরশ লেগেছে। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যে যুদ্ধের সূচনা ঘটে, অগণিত জনমানুষের জান ও ইজ্জতের বিনিময়ে যে যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়, তা কখনো বৃথা যেতে পারে না।

প রি শি ষ্ট

পরিশিষ্ট-১
বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশিক এলাকা

আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণ এবং পানি প্রবাহের বিচারে বাংলাদেশকে ছয়টি কৃষি পরিবেশিক এলাকায় ভাগ করা হয়।

১. উত্তর-পশ্চিম এলাকা : গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদীর মধ্যবর্তী বৃহত্তর জেলা দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা। এর মধ্যে আছে তেরোটি উপ-অঞ্চল যথা তিস্তা বন্যা এলাকা, গঙ্গা বন্যা এলাকা, মরা ব্রহ্মপুত্র বন্যা এলাকা, করতোয়া বন্যা এলাকা, বারেন্দ্র ভূমি, আত্রাই অববাহিকা (চলন বিল এলাকা) এবং প্রাচীন হিমালয় পর্বত পাদদেশ এলাকা।

২. উত্তর-কেন্দ্রীয় এলাকা : মরা ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনার মধ্যবর্তী বৃহত্তর জেলা টাঙ্গাইল, ঢাকা এবং জামালপুর ও ময়মনসিংহের অংশ। এতে আছে নয়টি উপ-অঞ্চল, যথা যমুনা প্লাবন এলাকা, মরা ব্রহ্মপুত্র প্লাবন এলাকা, গঙ্গা প্লাবন এলাকা, আড়িয়ল বিল এবং মধুপুর ভূমি।

৩. উত্তর-পূর্ব এলাকা : বৃহত্তর সিলেট জেলা, ময়মনসিংহের বিস্তর এলাকা এবং কুমিল্লার একাংশ নিয়ে এই এলাকা, এতে আছে তিনটি উপ-অঞ্চল যথা সুরমা কুশিয়ারার প্লাবন এলাকা, মরা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম প্লাবন এলাকা এবং সিলেটের ভাটির নিম্নাঞ্চল যাতে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত।

৪. দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা : গঙ্গা ও পদ্মার দক্ষিণে এবং পূর্বে আড়িয়াল খা ও স্বরূপকাঠি নদী বেষ্টিত এলাকা। এতে আছে পাচটি উপ-অঞ্চল যথা বৃহত্তর কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা এবং গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম প্লাবন এলাকা সহ খুলনা ও যশোর জেলা।

৫. দক্ষিণ-কেন্দ্রীয় এলাকা : দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার পূর্বে এবং মেঘনা নদীর পূর্বে অবস্থিত এই এলাকা। বৃহত্তর পটুয়াখালি, ভোলা এবং ফরিদপুর ও বরিশালের কিয়দংশ এতে অন্তর্ভুক্ত। এতে আছে ছয়টি উপ-অঞ্চল, যথা গঙ্গা প্লাবন এলাকা, মেঘনা মোহানা এলাকা, গোপালগঞ্জ খুলনা বিল এবং দক্ষিণাঞ্চলের জোয়ারভাটার অববাহিকা।

৬. দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা : মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চল যা একদিকে কক্সবাজারের উপকূলে পৌছে এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা নিয়ে এই এলাকা। এতে আছে আটটি উপ-অঞ্চল, যথা বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, মেঘনা প্লাবন এলাকা, মেঘনা মোহানা এলাকা, চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকা, পর্বত পাদদেশ এলাকা এবং পূর্বের পাহাড়ি এলাকা।

পরিশিষ্ট-২

বাংলার কালানুক্রমিক ইতিহাস

৩২৭ খৃস্ট পূর্বাব্দ—১৭৬৫ সাল

৩২৭—৩২৫ খৃস্ট পূর্বাব্দ	:	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও গঙ্গাঋদ্ধির শৌর্যের সুনাম
৩১৭-৩৩২ খৃস্ট পূর্বাব্দ	:	মগধের মৌর্য সাম্রাজ্যের দখল
পরবর্তী তিন শতাব্দী	:	ছোট ছোট রাজার রাজ্যসমূহ
৭৮ সাল—একশত বছর	:	কুশান সাম্রাজ্যের দখল
৩২০—৫৪৪ খৃস্টাব্দ	:	গুপ্ত সাম্রাজ্যের দখল
		গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত বরেন্দ্রের অধিবাসী বলে কিংবদন্তী রয়েছে।
৩৮০-৪১০	:	২য় সমুদ্রগুপ্তের কাছে চন্দ্রবর্মনের পরাজয়
৫০৭	:	সমতটে বৈন্যগুপ্ত
৫১০-৫৩০	:	গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেবের স্বাধীন রাজ্যসমূহ
		উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় গুপ্ত অধিকার
৫৬৭-৫৯৭	:	দাক্ষিণাত্যের চাণক্য রাজ কীর্তিবর্মনের বঙ্গ আক্রমণ
৫৮১-৬০০	:	তিব্বতের স্রোন বাৎসানের বঙ্গ অভিযান
৬০৫-৬৩৭	:	বঙ্গে রাজা শশাঙ্ক
৬৩৮	:	ইউয়ান চোয়াং এর বঙ্গ ভ্রমণ
৬৫০-৭৫০	:	উত্তর বঙ্গে মাৎস্যন্যায়
		বঙ্গে খগড়া রাজবংশ
		সমতটে রাত বংশ
		তিব্বত রাজ স্রোংসানের গৌড় আক্রমণ
৭৫০-১১৫৫	:	পাল স্বর্ণযুগ
		বাংলা ভাষ ও সাহিত্যের বিকাশ
		পাল রাজত্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে দুর্বলতা এবং প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুটের বঙ্গ আক্রমণ।
৯০০-১০৪৪	:	দক্ষিণ বঙ্গে চন্দ্রবংশ
১০৭৫-১০৮০	:	বরেন্দ্রে সুর ও কৈবর্ত রাজবংশ
১০৮০-১১৫০	:	সমতটে বর্ম রাজবংশ
১০৯৫-১২২৩	:	সেন রাজবংশ
		বিজয় সেন দাক্ষিণাত্য থেকে রাঢ়ে এসে প্রথম ক্ষমতা দখল করেন।
		সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার
		বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার
১১৯৯-১২০৬	:	ইখতিয়ারুদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী-১১৯৯ সালে দিল্লী

		সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবকের প্রতিনিধি হিসাবে বিহার বিজয়।
		১২০১ সালে লক্ষণাবতী দখল
		লক্ষণ সেন নদিয়া ছেড়ে সমতটে পালিয়ে যান।
১২০৪-১২৯০	:	দিল্লীতে দাস রাজবংশ
১২০৬-১৩৪২	:	দিল্লি সম্রাটের রাজত্ব তবে দিল্লির প্রতিনিধিরা প্রায়শই স্বাধীনতা ঘোষণা করে পরাস্ত হতেন।
১২১০	:	আলি মার্দান আলাউদ্দিন খিলজী নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
১২২৭	:	দিল্লি সম্রাট ইলতুৎমিস বঙ্গ পুনর্দখল করেন
		বঙ্গের শাসক আনোয়ার খান আইবক (১২৩৫-২৬), মুগিসুদ্দিন উজবেক (১২৫১-৫৭) ও মুগিসুদ্দিন তুগরল খান (১২৬৮-৮১) সবাই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
১২৮২-১২৯১	:	দিল্লি সম্রাটের পুত্র নাসিরউদ্দিন বুগরা খান শাসনকর্তা
১২৮৭	:	দিল্লি সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের মৃত্যু ও বুগরা খানের স্বাধীনতা ঘোষণা
১২৯০-১৩২০	:	দিল্লিতে খিলজী রাজবংশ
১২৯১-১৩০১	:	সুলতান রুকনুদ্দিন কাইকাউস (স্বাধীন সুলতান)
১৩০১-২২	:	সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বঙ্গদেশে তাঁর দখল বিস্তার করেন।
		বিহার লখনৌতি, সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও হরিকেল তাঁর দখলে আসে।
১৩২০-১৪১৩	:	দিল্লিতে তুগলুক রাজত্ব
১৩২২-২৪	:	গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ
১৩২৪	:	গিয়াসুদ্দিন তুগলুকের বংশে দিল্লির শাসন পুনঃস্থাপন
		নাসিরউদ্দিন ইবরাহিম বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত
১২২৫-২৮	:	গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহকে মুহম্মদ বিন তুগলুক নিযুক্তি দেন
১৩২৮-৩৮	:	বাহরাম খান দিল্লির মনোনীত শাসনকর্তা
১৩৩৮-১৩৫০	:	ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগায়ে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন।
		দিল্লি সম্রাট মোহাম্মদ বিন তুগলুক তাঁকে পরাজিত করলেও তিনি ক্ষমতা পুনর্দখল করেন।
		লখনৌতিতে দিল্লির সম্রাটের দখল অব্যাহত রইলো কিন্তু দিল্লি সম্রাটের এক সেনাপতি আলী মোবারক সুযোগ বুঝে আলাউদ্দিন আলী শাহ নামে নিজেই সুলতান হয়ে যান এবং ১৩৪২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
১৩৪২-১৪৮৭	:	ইলিয়াস শাহী রাজত্ব
		সাহিত্য, শিল্পকলা ও বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ
		বাংলা ভাষার প্রচলন ও শ্রীবৃদ্ধি
১৩৪২-১৩৫৮	:	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
		লখনৌতিতে হাজী ইলিয়াস আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা।
		১৩৪৪ ত্রিহুত বিজয়। ১৩৫০ নেপাল বিজয়, উড়িষ্যা বিজয়
		১৩৫৩ সোনারগাও বিজয়
		১৩৫৩ দিল্লি সম্রাট ফিরোজ শাহ তুগলকের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি
১৩৫৮-১৩৯৩	:	সিকন্দর শাহ

দিল্লি সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি
আদিনা মসজিদ নির্মাণ

১৩৯৩-১৪০৯ : গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ
১৪১৪-১৮ : রাজা গণেশের সফল অভ্যুত্থান
১৪১৮-৪২ : অভিজাত ও সেনাপতিদের শাসন
১৪১৫-৩১ : রাজা গণেশের ছেলে জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্ব
১৪৪২-৪৯ : রুকনুদ্দিন বরবক শাহ ও অভিজাত গোষ্ঠির দমন।
৮০০০ আবিসিনীয় হাবসী সৈন্য আমদানি।
১৪৪৯-৮১ : আবিসিনীয় সৈন্যদের পরোক্ষ রাজত্ব।
১৪৮১-৮৭ : জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ ১৪৮৭-তে নিহত
১৪৮৭-১৪৯৩ : আবিসিনীয় সেনাবাহিনীর রাজত্ব
ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, নিপীড়ন, দুর্নীতি ও সুবিধাভোগের রাজত্ব।
১৪৮৬-১৫৩৩ : শ্রীচৈতন্য।
১৪৯৩-১৫৩৮ : হোসেন শাহী রাজত্ব
সুবর্ণযুগ
১৪৯৩-১৫১৯ : আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা, বাংলা সাহিত্যের প্রসার।
১৫১৯-৩২ : নুসরত শাহ, সাহিত্যের বিকাশ
১৫৩৩-৩৮ : মাহমুদ শাহ, পর্তুগীজ প্রভাব
১৫৩৯-১৫৬৪ : শুরী রাজবংশ
১৫২৬ : পানিপথের যুদ্ধে তুর্কী-আফগানদের পরাজয় ও পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ।
১৫৩৮ : শের শাহ ও সম্রাট হুমায়ুনের যুদ্ধ ও শের শাহের মোগল সাম্রাজ্য দখল।
১৫৫৬ : হুমায়ুনের সাম্রাজ্য পুনর্দখল (দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধ)
বাংলায় শুরী রাজত্ব অব্যাহত, শেরশাহ বাংলাকে ১৯ সরকারে বিভক্ত করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেন ও দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
১৫৩৪-১৫৭৬ : কররানি রাজবংশ, সুলতান তাজ খান কররানি।
১৫৬৮ : উড়িষ্যা দখল, সম্রাট আকবরের সঙ্গে সখ্য।
১৫৭৪ : আকবরের পাটনা দখল ও সেনাপতি মুনিম খানের টাণ্ডার দিকে আগমন।
১৫৭৫ : ঢুকোরাই এর যুদ্ধে কররানি পরাজয়, দায়ুদ খানের বিদ্রোহ ও ব্যর্থতা।
১৫৭৫-১৬৭৩ : মোগল শাসন ও বাংলার প্রতিরোধ
১৫৭৫ : কালাপাহাড়ের আক্রমণ
১৫৭৬-৭৯ : রাজমহলের যুদ্ধ ও খান জাহানের হাতে আফগানদের পরাজয়।
বারো ভুইয়ার স্বায়ত্তশাসন
১৫৮৮-১৬৪৪ : সুবেদার মানসিংহের শাসন
১৫৯১ : সুবেদার মানসিংহের উড়িষ্যা দখল
১৫৯৭ : লক্ষী নারায়ণের দমন
১৫৯৯ : ঈশা খানের দমন
১৬০৩ : মুসা খানের দমন,
প্রতাপাদিত্য পরাজিত

		বাহাদুর গাজী পরাজিত
১৬০৪	:	কেদার রায়ের দমন।
১৫৯৫	:	রাজধানী টাণ্ডা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত
১৬০৫-১৬২৭	:	দিল্লিতে সম্রাট জাহাঙ্গীর
১৬০৮-১৩	:	সুবেদার ইসলাম খানের শাসন
১৬১১	:	মুসা খানের যুদ্ধ
		প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ
১৬১২	:	ওসমান খান পরাজিত
১৬০৭	:	রাজধানী ঢাকায় স্থাপন : জাহাঙ্গীরনগর
১৬১৩-১৬৬০	:	মোগল সুবেদারদের রাজত্ব
১৬২৭-১৬৫৯	:	দিল্লিতে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব
১৬৩৯-৬০	:	যুবরাজ শাহ্ সুজার সুবেদারি
		বাংলায় শান্তি ও প্রগতি
১৬৫৯-১৭০৭	:	দিল্লিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব
১৬৬০-৬৩	:	সুবেদার মীর জুমলা
		শাহ্ সুজার দমন
		কুচবিহার বিজয় ১৬৬২
		আসাম বিজয় ১৬৬২
১৬৬৩-৮৮	:	সুবেদার শায়েস্তা খান—দুইবারে শাসন
		মগদের দমন, চট্টগ্রাম বিজয়, বৃটিশদের দমন।
		বাণিজ্য ও বাস্তুকলার বিকাশ, লালবাগ দুর্গ নির্মাণ।
১৬৭৪	:	ফরাসী অনুপ্রবেশ
১৬৯৮	:	বৃটিশের কলিকাতা দুর্গ স্থাপন
১৭১৭-১৭২৭	:	মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানি। ত্রিপুরা ও আসাম পরাজিত
		ফরাসি, বৃটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ
১৭৪০-১৭৫৬	:	নবার আলিবর্দী খান সুবেদার
		বিহার ও উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দমন, মারাঠা প্রতিহত, মগ দমন।
১৭৫৭	:	নবাব সিরাজউদ্দৌলা
১৭৫৬	:	বৃটিশ ফোর্ট উইলিয়ামের পতন
১৭৫৭	:	লর্ড ক্লাইভের ফোর্ট পুনর্দখল
		২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ
১৭৫৭-১৭৬৫	:	বৃটিশ প্রভুত্বের বিকাশ
১৭৫৭-১৭৬০	:	নবাব মীর জাফর আলী খান
১৭৬০-১৭৬৪	:	নবাব মীর কাশিম
১৭৬৪	:	বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়
১৭৬৫	:	মীর জাফর পুনরায় নবাব নিযুক্ত
		সম্রাট শাহ্ আলম কর্তৃক বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান।
		লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো কলিকাতার বৃটিশ গভর্নর।

পরিশিষ্ট-৩
ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের নির্ঘণ্ট

১৭৫৬-৬০	:	লর্ড ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ামের বৃটিশ গভর্নর
১৭৫৭	:	পলাশীর যুদ্ধ লর্ড ক্লাইভ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করেন
১৭৬৪	:	বক্সারের যুদ্ধ, নবাব মীর কাশিমের পরাজয়
১৭৬৫	:	লর্ড ক্লাইভের দ্বিতীয়বার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি। সম্রাট শাহ আলম বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করেন।
১৭৭০	:	বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
১৭৭২-৮৫	:	ওয়ারেন হ্যাস্টিংস বৃটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল
১৭৭২-১৭৮৫	:	ওয়ারেন হ্যাস্টিংস গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল (১৭৭৩)
১৭৭২	:	হ্যাস্টিংস প্রশাসন পরিকল্পনা, জেলা কালেকটর নিয়োগ
১৭৭৩	:	নর্থের রেগুলেটিং আইন, বৃটিশ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা (পরবর্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্ট)
১৭৮১	:	কলিকাতা মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা
১৭৮৪	:	পিটের ভারত আইন, বোর্ড অব কন্ট্রোল স্থাপন, প্রতি বিশ বছরে অবস্থার বিশ্লেষণ ও বিচার
১৭৮৬-৯৩	:	লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল
১৭৯২	:	চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত—জমিদারি প্রথা সৃষ্টি
১৭৯৮-১৮০৫	:	গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী সব ছোট ছোট রাজ্যে পরোক্ষ বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠা
১৮০০	:	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮১৬	:	হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫ সালে তা প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়)
১৮২৮	:	রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা
১৮৩৩	:	চার্টার আইনে কোম্পানির বাণিজ্য রহিত কোম্পানি হয় বৃটিশ ভারতের প্রশাসক
১৮৩৬	:	হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮৩৫	:	কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮৩৭	:	মেকোলের শিক্ষানীতি প্রবর্তন ফারসির পরিবর্তে ইংরাজি রাজভাষা

১৮৪১	:	ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮৪৩	:	সিন্ধুদেশ দখল
১৮৪৩	:	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়মিত চাকরি (প্রথম ভারতীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন ১৮৩৩ সালে)
১৮৪৪	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজি
১৮৪৯	:	পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দখল
১৮৪৮-৫৬	:	লর্ড ডালহৌসী ও সাম্রাজ্যবাদ
১৮৫২	:	বর্মা দখল
১৮৫৩	:	চার্টার আইনে মেধার ভিত্তিতে প্রশাসনে নিযুক্তির নীতি
১৮৫৬	:	কলিকাতা প্রকৌশলী কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮৫৬-৬২	:	লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল
১৮৫৭	:	প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (সিপাহী বিদ্রোহ), সম্রাট বাহাদুর শাহ বর্মায় নির্বাসিত
১৮৫৮	:	রাণী ভিক্টোরিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ ও ভাইসরয় নিযুক্তি। সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া এবং তাঁর উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সুশাসন ও বৈষম্য বিলোপের ঘোষণা।
১৮৬১	:	ভারত কাউন্সিল আইন, ভাইসরয়ের মন্ত্রিসভায় অতিরিক্ত আইন পরিষদ সদস্য নিয়োগ, বাংলায় লেফট্যানেন্ট গভর্নর নিয়োগ,
১৮৬২	:	প্রাদেশিক কাউন্সিল নিয়োগ,
১৮৬৩	:	মৌলবী আবদুল লতিফের কলিকাতায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৮৬৪	:	স্যার সৈয়দ আহ্মদের আলিগড় সাইন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
১৮৬৪	:	প্রথম ভারতীয় আই সি এস অফিসার নিযুক্ত : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৭১	:	উইলিয়াম হান্টারের "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস" প্রকাশ
১৮৭২	:	প্রথম আদমশুমারী
১৮৭৪	:	আসামে চীফ কমিশনার প্রদেশ স্থাপন : সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামে ন্যস্ত।
১৮৭৬	:	সুরেন্দ্রনাথ বানার্জীর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৭	:	স্যার সৈয়দের এংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা (পরবর্তীতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়)
১৮৭৮	:	সৈয়দ আমির আলির ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৫	:	ডেভিড হিউমের ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা
১৮৮৫	:	লর্ড রিপনের লোকাল গভর্নমেন্ট আইন
১৮৮৬	:	স্যার সৈয়দের বার্ষিক মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা
১৮৯২	:	ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস আইন, ভারতীয় সদস্য বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কিছু প্রতিনিধিত্ব বহাল
১৮৯৬	:	কলিকাতা মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা
১৯০৩	:	লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা
১৯০৫	:	বঙ্গভঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ স্থাপন।
১৯০৬	:	দাদাভাই নওরোজী কংগ্রেসে স্বরাজ দাবি পাশ করেন
১৯০৬	:	লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিম দাবি পেশ, প্রিন্স আগা খানের নেতৃত্বে

		সিমলা দল
১৯০৯	:	মোর্লি মিন্টো সংস্কার, স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রিভিকাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য : স্যার আবদুর রহিম। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য—সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য : সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, ভারতীয় বিধান সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি, প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি।
১৯১১	:	বঙ্গভঙ্গ রহিত। বাংলা প্রদেশ ও বিহাড়-উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্টি। ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর।
১৯১৩	:	মুসলিম লীগ কর্তৃক স্বরাজ দাবি
১৯১৫	:	গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যু, গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারত প্রত্যাবর্তন।
১৯১৬	:	হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির নিদর্শন লখনৌ চুক্তি গ্রহণ।
১৯১৯	:	মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, প্রদেশে দ্বৈত শাসন, কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বিধান সভা।
১৯১৯	:	কুখ্যাত রাওল্যাট আইন, ধরপাকড় ও বিচারে স্বেচ্ছাচার
১৯১৯	:	বিক্ষোভ ও জালিওয়ানায়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।
১৯২০	:	খেলাফত ও অসহযোগ যুগপৎ আন্দোলন।
১৯২১	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৯২২	:	চৌরিচৌরায় সহিংস বিক্ষোভ ও আন্দোলন বন্ধ
১৯২৩	:	চিত্তরঞ্জন দাশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বেঙ্গল চুক্তি
১৯২৫	:	চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু, হিন্দু মুসলিম বিরোধ
১৯২৩	:	শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন
১৯২৩	:	রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা
১৯২৭	:	সাইমন কমিশন নিযুক্ত
১৯২৮	:	মতিলাল নেহরু সাংবিধানিক প্রতিবেদন
১৯২৯	:	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা
১৯৩০	:	লবণ আন্দোলন ও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন
১৯৩০	:	সাইমন কমিশনের রিপোর্ট-প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ নাকচ।
১৯৩০	:	মুসলিম লীগ সম্মেলনে কবি ইকবালের স্বতন্ত্র মুসলিম রাজ্যের দাবি
১৯৩০	:	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দেশত্যাগ
১৯৩০	:	১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রগার দখল।
১৯৩০-৩২	:	গোল টেবিল বৈঠক, ১৯৩০-এ কংগ্রেস অনুপস্থিত ১৯৩১-এ গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে কংগ্রেসের উপস্থিতি, ১৯৩২-এ তৃতীয় সম্মেলনে।
১৯৩২	:	অসহযোগ আন্দোলন পুনর্বহাল
১৯৩২	:	প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের রোয়েদাদ।
১৯৩৪	:	অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা।
১৯৩৫	:	ভারত সরকার আইন : প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ভোটাধিকার বৃদ্ধি, সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, সব প্রদেশের সম্মতি সাপেক্ষে কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার, গভর্নর জেনারেলের হাতে বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষণ।
১৩ অক্টোবর ১৯৩৬	:	কলিকাতায় 'আজাদ' পত্রিকা মুসলমানদের দৈনিক মুখপত্র
১৯৩৬	:	উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র প্রদেশ, সিন্ধুও স্বতন্ত্র প্রদেশ

১৯৩৭	সাধারণ নির্বাচন, সাত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার। আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন, শুধু সিন্ধু, বাংলা ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেস সরকার, বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দলের সরকার।
১৯৩৯	বিশ্বযুদ্ধের কারণে কংগ্রেস সরকারের পদত্যাগ, মুসলিম লীগ কর্তৃক নাজাত দিবস পালন।
১৯৪০	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা মাধ্যম
২৩ মার্চ ১৯৪০	মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হকের প্রস্তাবে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজ্যের দাবি পাকিস্তান প্রস্তাব
১৯৪০-৪২	কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলন
১৯৪২	ক্রিপস মিশন—সাংবিধানিক সমাধান প্রচেষ্টা
১৯৪৩	বাংলায় দুর্ভিক্ষ
১৯৪৩-৪৭	লর্ড ওয়াভেল গভর্নর জেনারেল
১৯৪৫	(২৫ জুন-২৬ জুলাই) ব্যর্থ সিমলা সম্মেলন
১৯৪৫ ডিসেম্বর ১৯৪৬ জানুয়ারি	সাধারণ নির্বাচন, শুধু বাংলা ও সিন্ধুতে মুসলিম লীগ সরকার
১৬ মে ১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান- তিন গ্রুপে ফেডারেল সরকার এবং তাৎক্ষণিক অন্তর্বর্তী সরকার। মুসলিম লীগের সম্মতি (৬ জুন) কংগ্রেসের সম্মতি (২৪ জুন), কংগ্রেসের শর্তারোপ ও প্ল্যানের ব্যর্থতা।
১৬ আগস্ট ১৯৪৬	মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, কলিকাতা দাঙ্গা। পরবর্তীতে নোয়াখালি ও বিহার
২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬	শুধু কংগ্রেস সদস্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল, আসাফ আলী, আলি জহির, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জগজীবন রাম ও শরৎচন্দ্র বসু (৭জন), পরে সর্দার বলদেব সিংও যোগ দেন।
১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬	অতিরিক্ত মন্ত্রিসভা সদস্য : চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি, জনমাথাই, স্যার শাফাত আহমদ, সি আই ভাবা (৪জন)
২৬ অক্টোবর ১৯৪৬	মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান, লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার, ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড়, রাজা গজনফর আলি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। (স্যার শাফাত, শরৎ বসু, আলি জাহির বিদায়) মোট চৌদ্দ সদস্যের মন্ত্রিসভা।
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭	১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রী এটলির ঘোষণা।
২২ মার্চ, ১৯৪৭	লর্ড মাউন্টব্যাটেনের গভর্নর জেনারেল হিসেবে যোগদান
২৭ এপ্রিল ১৯৪৭	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের জন্য সোহরাওয়ার্দীর আহ্বান
২০ মে ১৯৪৭	শরৎ বসু ও আবুল হাশিমের মধ্যে সংযুক্ত বাংলার কাঠামো প্রণয়ন
৩ জুন ১৯৪৭	মাউন্টব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তর ঘোষণা
২০ জুন ১৯৪৭	বাংলা বিধানসভা দেশবিভাগে সম্মত
২৩ জুন ১৯৪৭	পাঞ্জাব বিধানসভায় দেশবিভাগ প্রস্তাব পাশ
৬ ও ৭ জুলাই ১৯৪৭	সিলেটে গণভোট
১৮ জুলাই	ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ
১৪ আগস্ট ১৯৪৭	পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা
১৫ আগস্ট ১৯৪৭	ভারতে স্বাধীনতা

পরিশিষ্ট-৪
পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা (গণপরিষদ ভাঙা পর্যন্ত)

প্রথম মন্ত্রিসভা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭—১৬ অক্টোবর ১৯৫১

	নাম	দফতর	দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ
১.	প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান	প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়	
২.	ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড়	শিল্প ও বাণিজ্য	৭ মে, ১৯৪৮
৩.	গোলাম মোহাম্মদ	অর্থ	১৫ আগস্ট ১৯৪৭
৪.	সরদার আবদুর রব নিশতার	যোগাযোগ	২ আগস্ট ১৯৪৯
৫.	রাজা গজনফর আলী	খাদ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, শরণার্থী	৩০ জুলাই ১৯৪৮
৬.	যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বাঙালি)	আইন, শ্রম ও পূর্ত	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫০
৭.	ফজলুর রহমান (বাঙালি)	শিক্ষা (তথ্য, পুনর্বাসন, স্বরাষ্ট্র সাময়িক দায়িত্ব)	১৫ আগস্ট ১৯৪৭
৮.	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা	পররাষ্ট্র	২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭
৯.	আবদুস সাত্তার পীরজাদা	খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য	৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৭
১০.	খাজা শাহাবুদ্দিন (বাঙালি)	স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও পুনর্বাসন	৮ মে, ১৯৪৮
১১.	মুশতাক আহমদ গুরমানী	মন্ত্রণালয়বিহীন	৩ জানুয়ারি ১৯৪৯—৩১ অক্টোবর ১৯৪৯
		কাশ্মির	১৩ এপ্রিল ১৯৫০
১২.	সরদার বাহাদুর খান	যোগাযোগ (সাময়িকভাবে স্বাস্থ্য)	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯
১৩.	চৌধুরী নাজির আহমদ	শিল্প	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯
১৪.	ডা. এ. মোত্তালেব মালিক (বাঙালি)	শ্রম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (সাময়িকভাবে স্বাস্থ্য ও পূর্ত)	২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

প্রতিমন্ত্রী

	নাম	দফতর	দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ
১.	ড. মাহমুদ হোসেন	সীমান্ত ও স্টেট	২৪ অক্টোবর ১৯৫০—২৪ অক্টোবর ১৯৫১
২.	ড. ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী	শরণার্থী ও পুনর্বাসন	২৪ অক্টোবর ১৯৫০—২৪ অক্টোবর ১৯৫১
৩.	আজিজুদ্দিন আহমদ (বাঙালি)	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	২৩ এপ্রিল ১৯৫১—২৪ অক্টোবর ১৯৫১

উপমন্ত্রী

	নাম	দফতর	দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ
১.	ড. মাহমুদ হোসেন	পররাষ্ট্র, অর্থ, অর্থনৈতিক বিষয় (সাময়িকভাবে প্রতিরক্ষা)	৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮—২৪ অক্টোবর ১৯৪৯

২.	সরদার বাহাদুর খান	পররাষ্ট্র, যোগাযোগ	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯— ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫০
৩.	ড. আইএইচ কোরেশী	স্বরাষ্ট্র, তথ্য, শরণার্থী পুনর্বাসন	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯— ২৪ অক্টোবর ১৯৫০
৪.	সরদার মোহাম্মদ নওয়াজ খান	প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯— ২৪ অক্টোবর ১৯৫০
৫.	গিয়াসুদ্দিন পাঠান (বাঙালি)	অর্থ ও অর্থনৈতিক বিষয়	২৩ এপ্রিল ১৯৫১— ২৪ অক্টোবর ১৯৫১

দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা
১৯ অক্টোবর ১৯৫১—১৭ এপ্রিল ১৯৫৩

১.	প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (বাঙালি)	দেশরক্ষা	১৯ অক্টোবর ১৯৫১
২.	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা	পররাষ্ট্র	২৪ অক্টোবর ১৯৫১
৩.	ফজলুর রহমান (বাঙালি)	বাণিজ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিষয়	২৪ অক্টোবর, ১৯৫১ ১৯ অক্টোবর ১৯৫১
৪.	মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	অর্থ	২৪ অক্টোবর ১৯৫১
৫.	আবদুস সাত্তার পীরজাদা	খাদ্য, কৃষি ও আইন	২৪ অক্টোবর ১৯৫১
৬.	খাজা শাহাবুদ্দিন (বাঙালি)	স্বরাষ্ট্র, তথ্য	২৪ অক্টোবর ১৯৫১— ২৪ নভেম্বর ১৯৫১
৭.	মুশতাক আহমদ গুরমানী	স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত	২৪ অক্টোবর ১৯৫১
৮.	সরদার বাহাদুর খান	যোগাযোগ	২৪ অক্টোবর ১৯৫১
৯.	ডা. এ.এম. মালিক (বাঙালি)	স্বাস্থ্য, পূর্ত, শ্রম	২৪ অক্টোবর ১৯৫১
১০.	সরদার আবদুর রব নিশতার	শিল্প	২৬ অক্টোবর ১৯৫১
১১.	ড. মাহমুদ হোসেন	কাশ্মির (সাময়িকভাবে শিক্ষা)	২৬ অক্টোবর ১৯৫১
১২.	ড. ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী	তথ্য, শরণার্থী ও পুনর্বাসন	২৬ নভেম্বর ১৯৫১

প্রতিমন্ত্রী

১.	ড. মাহমুদ হোসেন	দেশরক্ষা, কাশ্মির	২৪ অক্টোবর—২৬ নভেম্বর ১৯৫১
২.	ড. আই এইচ কোরেশী	শরণার্থী ও পুনর্বাসন	২৪ অক্টোবর—২৬ নভেম্বর ১৯৫১
৩.	আজিজুদ্দিন আহমদ (বাঙালি)	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	২৪ অক্টোবর ৫১
৪.	গিয়াসুদ্দিন পাঠান (বাঙালি)	অর্থ, সংসদীয় বিষয়	১৯ আগস্ট ৫২
৫.	সৈয়দ খলিলুর রহমান	দেশরক্ষা	১৯ আগস্ট ৫২

উপমন্ত্রী

১.	গিয়াসুদ্দিন পাঠান (বাঙালি)		২৪ অক্টোবর—১৯ আগস্ট ১৯৫২

তৃতীয় মন্ত্রিসভা
১৭ এপ্রিল ১৯৫৩—২৪ অক্টোবর ১৯৫৪

১.	প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)	বাণিজ্য, দেশরক্ষা, তথ্য	১৭ এপ্রিল ১৯৫৩
২.	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা	পররাষ্ট্র	
৩.	মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	অর্থ, অর্থনৈতিক বিষয়	"
৪.	মুশতাক আহমদ গুরমানী	স্বরাষ্ট্র, সীমান্ত	"
৫.	সরদার বাহাদুর খান	যোগাযোগ	"
৬.	ডা. এ.এম. মালিক (বাঙালি)	শ্রম, স্বাস্থ্য ও পূর্ত	"

৭.	ড. ইশতিয়াক কোরেশী	শিক্ষা	"
৮.	এ.কে. ব্রোহী	আইন, সংসদীয় বিষয়,	"
		(সাময়িকভাবে তথ্য)	"
৯.	খান আবদুল কাইয়ুম খান	খাদ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য	"
১০.	শোয়েব কোরেশী	শরণার্থী, কাশ্মির, সীমান্ত	"
		(সাময়িকভাবে তথ্য)	"

প্রতিমন্ত্রী

১.	গিয়াসুদ্দিন পাঠান (বাঙালি)	কৃষি, সংখ্যালঘু, সংসদ	৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩
২.	আমির আজম খান	দেশরক্ষা	৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩
৩.	মুর্তাজা রেজা চৌধুরী (বাঙালি)	অর্থ	৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩

চতুর্থ মন্ত্রিসভা

অক্টোবর ২৪, ১৯৫৪—আগস্ট ১১, ১৯৫৫

১.	প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)	পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য	২৪ অক্টোবর ১৯৫৪
২.	মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	অর্থ, অর্থনৈতিক বিষয়,	"
		শরণার্থী, কাশ্মির (সাময়িক)	"
৩.	ডা. এ.এম. মালিক (বাঙালি)	শ্রম, স্বাস্থ্য	"
৪.	এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি (বাঙালি)	শিল্প, বাণিজ্য	"
৫.	মেজর জেনারেল ইসকান্দর মীর্জা	স্বরাষ্ট্র, সীমান্ত, কাশ্মির	৭ আগস্ট ১৯৫৫ পর্যন্ত
৬.	জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান	প্রতিরক্ষা	২৪ অক্টোবর ১৯৫৪
৭.	গিয়াসুদ্দিন পাঠান (বাঙালি)	খাদ্য, কৃষি, সংখ্যালঘু,	"
		আইন ও সংসদ	"
৮.	মীর গোলাম আলী তালপুর	তথ্য, শিক্ষা	১৮ মার্চ ১৯৫৫ পর্যন্ত
৯.	ডা. খান সাহেব	যোগাযোগ	৪ নভেম্বর ১৯৫৪
১০.	হাবিব ইবরাহিম রহিমতুলা	বাণিজ্য	২০ ডিসেম্বর ১৯৫৪
১১.	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (বাঙালি)	আইন	২০ ডিসেম্বর ১৯৫৫
১২.	সৈয়দ আবিদ হোসেন	খাদ্য, শিক্ষা	১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৪
১৩.	সরদার মমতাজ আলী খান	তথ্য, কাশ্মির	২২ ডিসেম্বর ১৯৫৪
১৪.	আবু হোসেন সরকার (বাঙালি)	স্বাস্থ্য	৪ জানুয়ারি ১৯৫৫—৬ জুন ১৯৫৫

প্রতিমন্ত্রী

১.	আমির আজম খান	শরণার্থী ও পুনর্বাসন, প্রতিরক্ষা	২৪ অক্টোবর ১৯৫৪
২.	মুর্তাজা রেজা চৌধুরী (বাঙালি)	অর্থ	"

পঞ্চম মন্ত্রিসভা

আগস্ট ১১, ১৯৫৫—১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১.	প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ	
		(সাময়িকভাবে) অর্থনৈতিক বিষয়, কাশ্মির, সীমান্ত	
২.	ডা. খান সাহেব	যোগাযোগ	
৩.	এ.কে. ফজলুল হক (বাঙালি)	স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা	৯ মার্চ ১৯৫৬ পর্যন্ত
৪.	হাবিব ইবরাহিম রহিমতুলা	বাণিজ্য, শিল্প	১১ আগস্ট ১৯৫৫
৫.	সৈয়দ আবিদ হোসেন	কাশ্মির, শিক্ষা	১৪ অক্টোবর ১৯৫৫ পর্যন্ত
৬.	কামিনীকুমার দত্ত (বাঙালি)	আইন (সাময়িক), স্বাস্থ্য	১১ আগস্ট ১৯৫৫
৭.	পীর আলি মোহাম্মদ রাশদী	তথ্য ও বেতার	২৯ আগস্ট ১৯৫৫ পর্যন্ত
৮.	নুরুল হক চৌধুরী (বাঙালি)	শ্রম, পূর্ত, সংখ্যালঘু	১১ আগস্ট ১৯৫৫

৯.	আবদুল লতিফ বিশ্বাস (বাঙালি)	খাদ্য ও কৃষি	১১ আগস্ট ১৯৫৫
১০.	ইবরাহিম ইসমাইল চুন্দ্রীগড়	আইন	১১ আগস্ট ১৯৫৫
১১.	হামিদুল হক চৌধুরী (বাঙালি)	পররাষ্ট্র	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫
১২.	সৈয়দ আমজাদ আলী	অর্থ, অর্থনৈতিক বিষয়	১৭ অক্টোবর ১৯৫৫
১৩.	এম. আর. কায়ানি	যোগাযোগ	১৭ অক্টোবর ১৯৫৫
১৪.	আবদুস সাত্তার (বাঙালি)	স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা	১৭ মার্চ ১৯৫৬

প্রতিমন্ত্রী

১.	সরদার আমির আজম খান	শরণার্থী ও পুনর্বাসন, সংসদ	১১ আগামী ১৯৫৫
২.	লুৎফর রহমান খান (বাঙালি)	অর্থ	"
৩.	অক্ষয় কুমার দাস (বাঙালি)	অর্থনৈতিক বিষয়	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

ষষ্ঠ মন্ত্রিসভা

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬—১৮ অক্টোবর ১৯৫৭

১.	প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (বাঙালি)	প্রতিরক্ষা, কাশ্মির, সীমান্ত, আইন, অর্থনৈতিক বিষয়	
২.	মালিক ফিরোজ খান নুন	পররাষ্ট্র	
৩.	আবুল মনসুর আহমদ (বাঙালি)	শিল্প, বাণিজ্য	
৪.	সৈয়দ আমজাদ আলি	অর্থ	
৫.	মোহাম্মদ আবদুল খালেক (বাঙালি)	শ্রম, পূর্ত	
৬.	গোলাম আলি তালপুর	স্বরাষ্ট্র	
৭.	এ.এইচ. দিলদার আহমদ (বাঙালি)	খাদ্য, কৃষি	
৮.	সরদার আমির আজম খান	তথ্য ও বেতার, আইন ও সংসদ	৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত
৯.	মিয়া জাফর শাহ	যোগাযোগ	
১০.	জহিরুদ্দিন (বাঙালি)	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংখ্যালঘু	

প্রতিমন্ত্রী

১.	রসরাজ মণ্ডল (বাঙালি)	অর্থনৈতিক বিষয়
২.	হাজী মওলা বখশ সমরু	পুনর্বাসন
৩.	আবদুল আলিম (বাঙালি)	অর্থ
৪.	নুরুর রহমান (বাঙালি)	বাণিজ্য

সপ্তম মন্ত্রিসভা

১৮ অক্টোবর, ১৯৫৭—১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭

১.	প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল আই চুন্দ্রীগড়	অর্থনৈতিক বিষয়, শ্রম, পূর্ত, পুনর্বাসন
২.	মালিক ফিরোজ খান নুন	পররাষ্ট্র
৩.	ফজলুর রহমান (বাঙালি)	বাণিজ্য ও আইন
৪.	সৈয়দ আমজাদ আলি	অর্থ
৫.	মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দওলাতানা	প্রতিরক্ষা
৬.	মুজফফর আলি খান কিজিলবাস	শিল্প
৭.	আবদুল লতিফ বিশ্বাস (বাঙালি)	খাদ্য ও কৃষি
৮.	গোলাম আলি তালপুর	স্বরাষ্ট্র
৯.	সৈয়দ মেসবাহুদ্দিন হোসেন (বাঙালি)	যোগাযোগ
১০.	মিয়া জাফর শাহ	তথ্য, বেতার, সীমান্ত
১১.	আবদুল আলিম (বাঙালি)	পুনর্বাসন (সাময়িক), পূর্ত
১২.	ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন	কাশ্মির, সংসদ

১৩.	লুৎফুর রহমান (বাঙালি)	স্বাস্থ্য ও শিক্ষা	
১৪.	ফরিদ আহমদ (বাঙালি)	শ্রম	

প্রতিমন্ত্রী

১.	হাজী মওলা বখশ সমরু	পুনর্বাসন	
২.	অক্ষয় কুমার দাস (বাঙালি)	বাণিজ্য	৫ নভেম্বর ১৯৫৭

অষ্টম মন্ত্রিসভা
১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭—৭ অক্টোবর ১৯৫৮

১.	প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন	পররাষ্ট্র, সীমান্ত, প্রতিরক্ষা,	১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭
		কাশ্মির, সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক বিষয়,	"
		পুনর্বাসন, তথ্য, আইন ও সংসদ	"
২.	সৈয়দ আমজাদ আলী	অর্থ	"
৩.	মুজফফর আলি খান কিজিলবাস	শিল্প, বাণিজ্য, সংসদ	"
৪.	গোলাম আলি তালপুর	স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ	"
৫.	মিয়া জাফর শাহ	খাদ্য, কৃষি	"
৬.	আবদুল আলিম (বাঙালি)	পূর্ত, শ্রম	"
৭.	রমিজুদ্দিন আহমদ (বাঙালি)	যোগাযোগ	"
৮.	কামিনীকুমার দত্ত (বাঙালি)	স্বাস্থ্য (সাময়িক),	"
		শিক্ষা (সাময়িক), আইন	"
৯.	হাজী মওলা বকশ সমরু	পুনর্বাসন	২২ জানুয়ারি ১৯৫৮
১০.	মাহফুজুল হক (বাঙালি)	স্বাস্থ্য, সমাজসেবা,	২৪ জানুয়ারি ১৯৫৮
		সমাজ উন্নয়ন	
১১.	বসন্তকুমার দাস (বাঙালি)	শ্রম, শিক্ষা	৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮
১২.	সরদার আবদুর রশীদ	শিল্প, বাণিজ্য	২৯ মার্চ ১৯৫৮
১৩.	সরদার আমির আজম খান	অর্থনৈতিক বিষয়, সংসদ	২৯ মার্চ ১৯৫৮
১৪.	এস. আইয়ুব খুরো	প্রতিরক্ষা	৮ এপ্রিল ১৯৫
১৫.	হামিদুল হক চৌধুরী (বাঙালি)	অর্থ	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
১৬.	এ.এইচ দিলদার আহমদ (বাঙালি)		২ অক্টোবর ১৯৮৫ কিন্তু দায়িত্ব
১৭.	মোহাম্মদ জহিরুদ্দিন (বাঙালি)		" নেয়ার সুযোগ হয় নি
১৮.	নুরুর রহমান (বাঙালি)		"

প্রতিমন্ত্রী

১.	হাজী মওলা বখশ সমরু	প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক	১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭
		বিষয়, পুনর্বাসন, তথ্য,	২২ জানুয়ারি ১৯৫৮
		কাশ্মির, আইন, সংসদ	
২.	অক্ষয় কুমার দাস (বাঙালি)	অর্থ	১৬ জানুয়ারি ১৯৫৭
৩.	খান মোহাম্মদ জালালুদ্দিন খান	অর্থ, স্বরাষ্ট্র (সাময়িক)	৫ এপ্রিল ১৯৫৮
৪.	সৈয়দ আহমদ নওয়াজ শাহ গারদেজী	খাদ্য ও কৃষি	"
৫.	সরদার মোহাম্মদ আকবর খান বুগতী	স্বরাষ্ট্র	২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
৬.	মিয়া আবদুস সালাম		২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮-তে
৭.	আবদুর রহমান খান (বাঙালি)		নিযুক্ত, দায়িত্ব পান নি
৮.	পিটার পল গোমেজ (বাঙালি)		
৯.	আদেলুদ্দিন আহমদ (বাঙালি)		
১০.	সৈয়দ আলমদর হোসেন শাহ জিলানি		

পরিশিষ্ট—৫
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি

১.	শেখ মুজিবুর রহমান	সভাপতি, আওয়ামী লীগ
২.	লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	পাকিস্তান নৌবাহিনী
৩.	স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান	প্রাক্তন নৌবাহিনী স্টুয়ার্ট
৪.	সুলতানুদ্দিন আহমদ	প্রাক্তন নৌবাহিনী লিডিং সীম্যান
৫.	নূর মোহাম্মদ	লিডিং সীম্যান
৬.	আহমদ ফজলুর রহমান	ছুটি ভোগকারী সি.এস.পি অফিসার
৭.	মাহফুজউল্লাহ	ফ্লাইট সার্জেন্ট
৮.	আবুল বশর আবদুস সামাদ	প্রাক্তন সেনাবাহিনী কর্পোরাল
৯.	দলিল উদ্দিন	প্রাক্তন হাবিলদার
১০.	রুহুল কুদ্দুস	অবসর প্রস্তুতির ছুটিতে সি.এস.পি অফিসার
১১.	মোহাম্মদ ফজলুল হক	ফ্লাইট সার্জেন্ট
১২.	ভূপতিভূষণ চৌধুরী / মানিক চৌধুরী	চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ, কোষাধ্যক্ষ
১৩.	বিধানকৃষ্ণ সেন	চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি
১৪.	আবদুর রাজ্জাক	সুবেদার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
১৫.	মুজিবুর রহমান	প্রাক্তন হাবিলদার
১৬.	মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক	প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট
১৭.	জহুরুল হক	সার্জেন্ট
১৮.	মোহাম্মদ খুরশিদ	প্রাক্তন সেনাবাহিনী
১৯.	খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান	সি.এস.পি অফিসার
২০.	এ.কে.এম শামসুল হক	রিসালদার
২১.	আজিজুল হক	হাবিলদার
২২.	মাহফুজুল বারি	সেনাবাহিনী
২৩.	শামসুল হক	সার্জেন্ট
২৪.	মেজর ডাক্তার শামসুল আলম	মেডিকেল কোর
২৫.	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মুতালিব	সেনাবাহিনী
২৬.	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শওকত আলী মিয়া	সেনাবাহিনী
২৭.	ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা	সেনাবাহিনী
২৮.	ক্যাপ্টেন এ.এন.এম নুরুজ্জামান	সেনাবাহিনী
২৯.	আবদুল জলিল,	সার্জেন্ট
৩০.	মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী	বেসামরিক নাগরিক
৩১.	লেফটেন্যান্ট এম.এম.এম. রহমান	নৌবাহিনী
৩২.	এ.কে.এম তাজুল ইসলাম	প্রাক্তন সুবেদার

৩৩.	এম. আলী রেজা	সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যানাল (সুইজারল্যান্ড) পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৩৪.	ক্যাপ্টেন ডাক্তার খুরশিদউদ্দিন আহমদ	মেডিকেল কোর
৩৫.	লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ	নৌবাহিনী

পরিশিষ্ট-৬
১৯৭১ সালের মার্চের দিনপঞ্জি

১ মার্চ দুপুর দেড়টা	:	পরিষদ অধিবেশন স্থগিতকরণের ঘোষণা পূর্বানি হোটেলে আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সভা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অপারেশন ব্লিৎজ-এর সূচনা ঢাকা ও চট্টগ্রামে গুলিবর্ষণ ও কারফিউ
২ মার্চ	:	ঢাকায় হরতাল শহীদের লাশ নিয়ে মিছিল ও বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, অবাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আবেদন ও হুঁশিয়ারি অ্যাডমিরাল আহসানের গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসভায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন
৩ মার্চ	:	সারাদেশে হরতাল বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা : অসহযোগ আন্দোলন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি ইয়াহিয়ার ঘোষণা : ঢাকায় ১০ মার্চ ১২-নেতার সম্মেলন চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনিতে দাঙ্গা, খুলনায়ও দাঙ্গা
৪ মার্চ	:	ইয়াহিয়াকে ঢাকায় আসতে জেনারেল ইয়াকুবের আহ্বান জেনারেল ইয়াকুবের পদত্যাগ চট্টগ্রাম ও খুলনায় দাঙ্গা অব্যাহত
৬ মার্চ	:	ঢাকায় জেল ভেঙে বন্দিদের পলায়ন মফস্বল শহরে গোলমাল সেনাবাহিনী প্রত্যাহার
৭ মার্চ	:	মার্কিন দূত ফারল্যান্ডের বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মোলাকাত রেসকোর্সের জনসভা— বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনামূলক বিবৃতি চার শর্ত : সামরিক শাসনের অবসান, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১ মার্চ থেকে গণহত্যার তদন্ত রেডিও টিভিতে বক্তৃতার সম্প্রচার বন্ধ অসহযোগ বিষয়ক নির্দেশাবলি—উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, পুলিশ মোতায়েন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইয়াহিয়ার ঘোষণা—২৫ মার্চে অধিবেশন এবং না যোগদানের জন্য ভুট্টোর হুমকি জেনারেল টিক্কা খানের গভর্নর নিযুক্তি, আমির আবদুল্লা নিয়াজিকে সেনাপতি নিযুক্তি

নবাবজাদা নসরুল্লার ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমঝোতার উপদেশ
ঢাকা ও চট্টগ্রামে গোলযোগে হতাহতের বিষয়ে সামরিক প্রশাসনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি—ঢাকায় ১৭২ আর চট্টগ্রামে ১৩২ নিহত।

৮ মার্চ : জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নরের শপথ পাঠ করাতে প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকীর অস্বীকৃতি

৯ মার্চ : ইয়াহিয়ার ঢাকা সফরের ঘোষণা
ভাসানীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা

১০ মার্চ : নারায়নগঞ্জে জেল ভাঙা

১১ মার্চ : রবিশাল ও কুমিলায় জেল ভাঙা
অসহযোগ সম্বন্ধে তাজউদ্দিনের ঘোষণা—অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করতে হবে

১২ মার্চ : অসহযোগে আমলাতন্ত্রের সমর্থন ঘোষণা
ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এয়ার মার্শাল আসগর খানের আহ্বান

১৩ মার্চ : পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবর্গের চার শর্তের প্রতি সমর্থন
বাঙালি কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব সৈয়দ আহমদের বদলি

১৪ মার্চ : ভুট্টোর বিবৃতি—পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

১৫ মার্চ : ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন
তাজউদ্দিনের ৩৫ দফা নির্দেশনামা-অসহযোগ আন্দোলনে গতি

১৬ মার্চ : ইয়াহিয়া-মুজিব একান্ত আলোচনা
ভুট্টোকে ঢাকায় আসতে ইয়াহিয়ার আহ্বান

১৭ মার্চ : ইয়াহিয়া-মুজিব একান্ত আলোচনা
ইয়াহিয়ার অপারেশন সার্চলাইটের জন্য প্রস্তুতির হুকুম
ওয়ালি খান-ইয়াহিয়া বৈঠক
২-৯ মার্চে নিহতদের বিষয়ে জেনারেল টিক্কা খানের তদন্ত কমিশন নিয়োগ

১৮ মার্চ : ওয়ালি খান-মুজিব সাক্ষাৎকার
বঙ্গবন্ধু তদন্ত কমিশন অনুমোদন করেন না

১৯ মার্চ : মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা
জেনারেল হামিদের ঢাকা আগমন
উপদেষ্টাদের আলোচনা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ড. কামাল হোসেন আওয়ামী লীগ দলে আর প্রেসিডেন্টের দলে বিচারপতি আরভিন রবার্ট কর্নেলিয়াস, লে. জে. এস.জি.এম.এম. পীরজাদা ও কর্নেল এম.এ. হাসান;
জয়দেবপুরে গুলি ও কারফিউ
সোভিয়েত কনসাল জেনারেল পেট্রোভ ভালটিন ও বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকার

২০ মার্চ : উপদেষ্টাসহ বঙ্গবন্ধু -ইয়াহিয়া বৈঠক
মিয়া মমতাজ দৌলতানা ও মুফতি মাহমুদ শেখের সঙ্গে মোলাকাত
এ কে ব্রোহির ঢাকা আগমন

২১ মার্চ : চৌদ্দ উপদেষ্টাসহ ভুট্টোর ঢাকা আগমন
বঙ্গবন্ধুর তাজউদ্দিনসহ ইয়াহিয়ার সঙ্গে মোলাকাত
ভুট্টো
ইয়াহিয়া একান্ত বৈঠক
জেনারেল হামিদের চট্টগ্রাম সফর

২২ মার্চ : ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব বৈঠক

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বিলম্বিত
ইয়াহিয়া কাইয়ুম খানকে ঢাকায় আসতে আহ্বান করেন
পশ্চিম পাকিস্তানি অন্য নেতৃবর্গের (ওয়ালি খান, মমতাজ দৌলতানা, শওকত হায়াত, মুফতি মাহমুদ ও গাউসবক বাজেঞ্জোর) সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠক
ইয়াহিয়ার পাকিস্তান দিবস বিবৃতি-সমঝোতার ইঙ্গিত
ভুট্টো-উপদেষ্টা (আবদুল হাফিজ পীরজাদা, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, জে.এ. রহিম, ড. মুবাশির হোসেন ও রফি রাজা) ও ইয়াহিয়া-উপদেষ্টাদের বৈঠক
অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী সদস্যদের কুচকাওয়াজ ও শপথ

২৩ মার্চ : প্রতিরোধ দিবস পালিত—বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন
আওয়ামী লীগ ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের দুই দফা বৈঠক
মির্জা মোজফফর আহমদের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা দলে যোগ দেন
পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মোলাকাত
ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক (ভুট্টোর উপদেষ্টাসহ)
কাইয়ুম খান-ইয়াহিয়া বৈঠক
পশ্চিম পাকিস্তানি অন্য নেতৃবৃন্দ (কাইয়ুম খানসহ) ও ইয়াহিয়া বৈঠক
রংপুরে জনতা ও সামরিক বাহিনী সংঘাত—কারফিউ

২৪ মার্চ : আওয়ামী লীগ দলের খসড়া ঘোষণা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের প্রদান
দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনা
চট্টগ্রাম বন্দরে জনতা ও সামরিক বাহিনী মুখোমুখি (সোয়াত জাহাজ খালাস নিয়ে সমস্যা), তাজউদ্দিনের হুঁশিয়ারি বিবৃতি।
পশ্চিম পাকিস্তানি অন্য নেতৃবৃন্দের ঢাকা ত্যাগ—আশার বাণী, সামরিক আইন প্রত্যাহার হবে।
পিপিপির ৮ সদস্যের ঢাকা ত্যাগ।
পিপিপি উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের বৈঠক-ভুট্টোর যোগদান
ভুট্টো-ইয়াহিয়া আকস্মিক একান্ত বৈঠক
জেনারেল রাজা, আনসারী, মিঠা খান ও খোদাদাদ খানের চট্টগ্রাম সফর
ভুট্টোর বক্তৃতা—২৫ তারিখ উপদেষ্টাদের আলোচনায় সব বিষয় ফয়সালা হবে।
ব্রোহির বিবৃতি—সামরিক আইন প্রত্যাহারে কোনো আইনগত বাধা নেই (করাচিতে প্রদত্ত)
জেনারেল খাদিম রাজা ও রাও ফরমান আলীর হেলিকপ্টারে সর্বত্র সার্চলাইট অপারেশনের নির্দেশ দান

২৫ মার্চ : সারাদিন প্রতীক্ষা
সন্ধ্যাবেলা শঠতার আশ্রয়ে ইয়াহিয়ার পলায়ন, ভুট্টো তাঁর সহযাত্রী
রাত এগারোটায় অভিযান সার্চলাইট শুরু

সূত্র : *Pakistan Observer*। ঢাকা, ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চের কাগজ, ১৯৭১।
সিদ্দিক সালেক : *Witness to Surrender.* অক্সফোর্ড প্রেস করাচি, ১৯৭৭, পৃ. ৪৩-৭০।

পরিশিষ্ট-৭

অসহযোগ আন্দোলনের পঁয়ত্রিশটি মৌলিক নির্দেশ

১৫ মার্চ, ১৯৭১

নির্দেশ-১ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবে এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলি এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে সবই মেনে চলবে।

নির্দেশ-২ সমগ্র বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

নির্দেশ-৩ (ক) ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দফতর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

(খ) পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্য দেবেন।

(গ) জেলের দফতরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডারগণ তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্দেশ-৪ বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেইসব অফিস খোলা থাকবে যেগুলো বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনোভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সামুদ্রিক বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের পাওনা (পোর্ট ডিউজ) ও চার্জ আদায় করবেন। নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের পাওনা ও অন্যান্য চার্জ আদায় করবেন।

নির্দেশ-৫ আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধার জন্যে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবে কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোনোমতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

নির্দেশ-৬ রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবল সেই সব অফিসই খোলা থাকবে, যেগুলি রেল চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোনো কাজে কোনোভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবে।

নির্দেশ-৭ সারা বাংলাদেশে ইপিআরটিসি বাস ট্রাক চালু থাকবে।

নির্দেশ-৮ অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আইডব্লিউটিএ-র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণনির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেয়ার ব্যাপারে এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবেন না।

নির্দেশ-৯ বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি-অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। বিদেশে মেইল ও টেলগ্রাম সরাসরি পাঠানো যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে শুধু অপরাহ্ন তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫ নম্বর নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।

নির্দেশ-১০ বাংলাদেশের কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ককল-টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

নির্দেশ-১১ বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণআন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

নির্দেশ-১২ জেল হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক ও কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেল্‌থ সেন্টার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

নির্দেশ-১৩ বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সঙ্গে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সঙ্গে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

নির্দেশ-১৪ গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এসবের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজও চালু থাকবে।

নির্দেশ-১৫ ইট ভাটার জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

নির্দেশ-১৬ আমদানি, বন্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু থাকবে।

নির্দেশ-১৭

(ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এর সকল প্রকল্প যথারীতি কাজ করবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতি চলাচল, বন্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া তেল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও এসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

(গ) নলকূপ খনন, খাল খনন ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গসংস্থাগুলো,

থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখা খোলা থাকবে।

(চ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়া বলবৎ থাকবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মজুত রাখতে হবে।

নির্দেশ-১৮ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদীখনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেয়া এবং এধরনের অন্যান্য জরুরি কাজ সুচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি এজেন্সি বিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

নির্দেশ-১৯ বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মাল-মসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

নির্দেশ-২০ ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেবে।

নির্দেশ-২১ ইপিআইডিসি ও ইপসিকের কারখানায় কাজ চলবে এবং যতোদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যেসকল শাখা খোলা রাখা প্রয়োজন হবে, তা খুলে রাখতে হবে। ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

নির্দেশ-২২ সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থা কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন, যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে, তাদের সেভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি, আধা-সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

নির্দেশ-২৩ সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

নির্দেশ-২৪ এই নির্দেশে যেসকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেয়া-নেয়া ও সরকারি কর্মচারীদের বিল তৈরির জন্য সামান্যসংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

নির্দেশ-২৫ (ক) ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে। (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবার ও শনিবারে ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মি. পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্সসহ অন্যান্য কার্যাবলি সম্পন্ন করা হবে।

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের বিভিন্ন কার্যাবলি অব্যাহত রাখবে; যেমন যে কোনো অঙ্কের জমা গ্রহণ করবে, বাংলাদেশের মধ্যে আন্তঃব্যাংক লেনদেন বা দলিল পত্র খালাসে কোনো অঙ্ক সীমানা থাকবে না, অথবা পশ্চিম পাকিস্তান

থেকে ডাকে বা টেলিগ্রামে (টিটি বা এমটি) অর্থগ্রহণ চালিয়ে যাবে। শুধু নিম্নোক্ত বিধি-নিষেধ মানতে হবে।

১ শ্রমিক প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন সাপেক্ষ বা চেকের সঙ্গে বেতন রেজিস্ট্রার পেশ করলে বেতন ও ভাতা বিল প্রদান করা হবে।

২. ব্যক্তিগত একাউন্টে সপ্তাহে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা উঠানো যাবে।

৩. চিনি কলের জন্য আখ বা পাঠকলের জন্য পাটসহ সমুদয় শিল্প কারখানার জন্য কাচামাল বা রসদ খরিদের খরচ প্রদান করা যাবে।

৪. বাংলাদেশস্থিত ভোক্তাদের জন্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহসহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যেকোনো ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত চেকে বা নগদে অর্থ পেতে পারবে।

তবে পূর্বোক্ত (৩) ও (৪) এর উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদানের আগে ব্যাংক নিশ্চিত করছে যে ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানটি খাঁটি এবং বিগত এক বছরে এই হারেই তারা অর্থগ্রহণ করেছে।

নিবন্ধিত ঠিকাদারগণ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খরিদের জন্য আগাম পেতে পারে তবে সেজন্য যে প্রকল্পের জন্য এইসব সামগ্রীর প্রয়োজন তার কর্তৃপক্ষকে প্রকল্পের প্রয়োজনে এই অর্থসংস্থান প্রত্যয়ন করতে হবে।

গ. বাংলাদেশের যেকোনো একাউন্টে যেকোনো অঙ্কের ক্রস চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট জমা বা ইস্যু করা যাবে।

ঘ. স্টেট ব্যাংক এবং পাকিস্তান ন্যাশন্যাল ব্যাংক সমুদয় টি টি ডিসকাউন্ট করবে তবে সব অর্থ পরিশোধ ঢাকায় সম্পন্ন হবে। যেসব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের তহবিল এনে স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

ঙ. উপরোক্ত প্রয়োজনে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এক ঘন্টার জন্য আন্ত-অঞ্চল টেলিপ্রিন্টার চালু থাকবে।

সোম ও বুধবারে প্রতিটি ব্যাংক প্রয়োজনীয় তহবিল চেয়ে একটি বার্তা পাঠাতে পারবে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে প্রত্যেকে একটি বার্তায় অর্থ প্রেরণের নিশ্চয়তা পেতে পারবে।

চ. বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাংকিং এর জন্য পরিচালিত টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস পুরোদমে চালু থাকবে।

ছ. বাংলাদেশের মধ্যে সমুদয় বিল আদায় চালু থাকবে কিন্তু শুধু ক্রস চেক বা ড্রাফটে অর্থ প্রদেয়।

জ. যেকোনো অধিকার প্রাপ্ত ডিলার বিদেশী ট্রাভেলার্স চেক ভাঙ্গাতে পারবে।

ঝ. বিদেশী কুটনীতিকরা তাদের একাউন্ট যেকোনোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। বিদেশী নাগরিকরা বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের একাউন্ট যেকোনোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

ঞ. লকার সার্ভিস বন্ধ থাকবে

ত. স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে বাংলাদেশের বাইরে কোনো রেমিটেন্স পাঠানো যাবে না।

থ. আমদানি লাইসেন্সের (বোনাস ভাউচার লাইসেন্স সহ) বিপরীত আকলপত্র (লেটার অব ক্রেডিট) খোলা যাবে।

দ. যেসব দ্রব্যাদি জাহাজজাত হয়েছে তার বিনিময়পত্র প্রদেয় হবে

ধ. অমীমাংসিত বা ঝুলন্ত রফতানি বিল শুধু ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্তৃক আদায় হবে।

নির্দেশ- ২৬ স্টেট ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সময়সূচি মোতাবেক কাজ করবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উপরোক্ত বিধি নিষেধ মেনে চলে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ স্টেট ব্যাংক গ্রহণ করবে। 'পি' ফরম বরাদ্দ করা যেতে পারে। এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

নির্দেশ-২৭ বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রফতানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

নির্দেশ-২৮ সকল ট্রাভেল এজেন্সি অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

নির্দেশ-২৯ বাংলাদেশের সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

নির্দেশ-৩০ পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য কাজ চালু থাকবে।

নির্দেশ-৩১ কোনো খাজনা-কর আদায় করা যাবে না।

(ক) পুনর্নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত : (১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে; (২) বাংলাদেশের কোথাও কোনো লবণ কর আদায় করা যাবে না;

(৩) বাংলাদেশে কোথাও কোনো তামাক কর আদায় হবে না;

(৪) তাঁতীরা আবগারি শুল্কদান ব্যতিরেকেই সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারি শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

(খ) এছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর যেমন প্রমোদকর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের ওপর ধার্য কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অকট্রয়সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর যেমন আবগারি শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে "বিশেষ অ্যাকাউন্ট" খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দু'টিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময় তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

নির্দেশ-৩২ পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সসহ সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবে।

নির্দেশ-৩৩ সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

নির্দেশ-৩৪ সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।

নির্দেশ-৩৫ সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

পরিশিষ্ট-৮
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকমূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুনতি গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায় গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্টপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবীর ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের ওপর যে-দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করবো

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

পরিশিষ্ট-৯
বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সেক্টর ও কমান্ডার
জুলাই ১৯৭১

প্রথম সেক্টর	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি। শুরু থেকে মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন অধিনায়ক। জুলাই মাসে জেড ব্রিগেড গঠিত হলে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম কম্যান্ড গ্রহণ করেন।
দ্বিতীয় সেক্টর	কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা। শুরু থেকে মেজর খালেদ মোশররফ ছিলেন অধিনায়ক। অক্টোবরে কে ব্রিগেড গঠিত হলে মেজর আবু সালেক চৌধুরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।
তৃতীয় সেক্টর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলবীবাজার, নারায়ণগঞ্জ এবং কেরানীগঞ্জ এলাকা। শুরু থেকে মেজর এম শফিউল্লা ছিলেন অধিনায়ক। সেপ্টেম্বরে এস ব্রিগেড গঠিত হলে ক্যাপ্টেন এ.এন.এম. নুরুজ্জামান দায়িত্ব নেন।
চতুর্থ সেক্টর	সিলেট ও হবিগঞ্জ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত।
পঞ্চম সেক্টর	সিলেটের উত্তরাংশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেজর মীর শওকত আলী।
ষাট সেক্টর	রংপুর দিনাজপুর উইং কম্যান্ডার কে এম বসর
সপ্তম সেক্টর	রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর। মেজর নাজমুল হক ছিলেন অধিনায়ক। তার পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান।
অষ্টম সেক্টর	কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন প্রথম অধিনায়ক। কিন্তু জুলাই-এর শেষে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মেজর আবুল মনজুর হন অধিনায়ক।
নবম সেক্টর	বরিশাল, পটুয়াখালি, খুলনা, ফরিদপুরের অংশে (বরিশাল ও পটুয়াখালি অষ্টম সেক্টর থেকে জুলাইর শেষে বাদ দেওয়া হয়)। ক্যাপ্টেন এম.এ. জলিল ছিলেন প্রথম অধিনায়ক। তারপর আসেন ক্যাপ্টেন জয়নাল আবেদিন।
দশম সেক্টর	নাবিক বাহিনী ২১ জুনে ফ্লাইট লেফটেনেন্ট আহমদ রেজা হন এর অধিনায়ক। মোট ১৭৮ জন নৌ-কমাণ্ডো এই বাহিনীতে ছিলেন। যেকোনো অপারেশনে তারা স্থানীয় কম্যান্ডের অধীনে ন্যস্ত হতেন।
একাদশ সেক্টর	টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ মেজর এম. এ তাহের ছিলেন অধিনায়ক। মধ্য নভেম্বরে তিনি আহত হলে ক্যাপ্টেন আবদুল আজিজ কম্যান্ড গ্রহণ করেন।

পরিশিষ্ট-১০
মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ও সচিববৃন্দ

সাধারণ প্রশাসন		নুরুল কাদের খান, সচিব
অর্থ		খন্দকার আসাদুজ্জামান, সচিব
স্বরাষ্ট্র		এম আবদুল খালেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও সচিব
পররাষ্ট্র		মাহবুব আলম, সচিব
মন্ত্রিসভা		হোসেন তওফিক ইমাম, সচিব
প্রতিরক্ষা		আবদুস সামাদ, সচিব
স্বাস্থ্য		ডা. টি. হোসেন, সচিব
কৃষি		নুরুদ্দিন আহমদ, সচিব
আইন ও সংসদ		আবদুল হান্নান চৌধুরী, সচিব
ত্রাণ		জয়গোবিন্দ ভৌমিক, কমিশনার
প্রকৌশল		এমদাদ আহমদ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও সচিব
তথ্য		আনওয়ারুল হক খান, সচিব
যুব শিবির		নুরুল কাদের খান, সচিব
মুখ্য সচিব	৭ ডিসেম্বর	রুহুল কুদ্দুস

পরিকল্পনা বোর্ড

চেয়ারম্যান	অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী
সদস্য	অধ্যাপক সারওয়ার মুরশিদ খান
সদস্য	অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন
সদস্য	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সদস্য	ড. স্বদেশরঞ্জন বোস

জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বে বিশেষ কার্যাবলি

সাহায্য ও পুনর্বাসন	:	অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সাংসদ
বাণিজ্য বোর্ড	:	মতিউর রহমান, সাংসদ
তথ্য, বেতার ও প্রচার	:	আবদুল মান্নান, সাংসদ
স্বেচ্ছাসেবী দলগুলো	:	আমিরুল ইসলাম, সাংসদ

পরিশিষ্ট-১১
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোনাল প্রশাসন কাউন্সিল
জুন-আগস্ট ১৯৭১

জোন ও সদর দফতর	জেলাসমূহ	চেয়ারম্যান	প্রশাসক সচিব
১. দক্ষিণ-পূর্ব জোন ১ সাবরুম	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম নোয়াখালির ফেনী মহকুমা	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	সৈয়দ আবদুস সামাদ
২. দক্ষিণ-পূর্ব জোন ২ আগরতলা	ঢাকা কুমিল্লা নোয়াখালি (অবশিষ্ট)	জহুর আহমদ চৌধুরী	কাজী রকিবউদ্দিন
৩. পূর্ব জোন ধর্মনগর	সিলেট জেলার হবিগঞ্জ ও মৌলবিবাজার মহকুমা	লেঃ কর্নেল এম.এ রব	ডা. কে.এ. হাসান
৪. উত্তর-পূর্ব জোন ১ ডাউকি	সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ ও সদর মহকুমা	দেওয়ান ফরিদ গাজী	এস.এইচ. চৌধুরী
৫. উত্তর-পূর্ব জোন ২ তুরা	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	শামসুর রহমান খান	লুৎফুর রহমান
৬. উত্তর জোন কুচবিহার	রংপুর	মতিউর রহমান	ফয়েজুদ্দিন আহমদ
৭. পশ্চিম জোন ১ বালুরঘাট	দিনাজপুর ও বগুড়া	আবদুর রহিম	এ কাশেম খান
৮. পশ্চিম জোন ২ সালদা	রাজশাহী	আশরাফুল ইসলাম	জহুরুল ইসলাম ভুঁইয়া
৯. দক্ষিণ-পশ্চিম জোন ১ কৃষ্ণনগর	পাবনা ও কুষ্টিয়া	এম.এ. রউফ চৌধুরী	শামসুল হক
১০. দক্ষিণ-পশ্চিম জোন ২ বনগাঁও	যশোর ও ফরিদপুর	ফণীভূষণ মজুমদার	বি.বি. বিশ্বাস
১১. দক্ষিণ জোন বারাসাত	বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালি	* *তখনো নির্ধারিত হয়নি*	আবদুল মোমেন

* পরবর্তীকালে আবদুর রব সেরনিয়াবাত চেয়ারম্যান হন কিন্তু এ'টি মূল উৎসতে ছিল না।
উৎস : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২ ঢাকা, পৃ. ২৩৮-২৪০।

পরিশিষ্ট-১২
পাকিস্তানের বাঙালি কূটনীতিবিদদের আনুগত্য পরিবর্তন

(ক)

১.	কে.এম. শেহাবুদ্দিন	দ্বিতীয় সচিব, দিল্লি : ৬ এপ্রিল
২.	আমজাদুল হক	সহকারী প্রেস এটাশি, দিল্লি : ৬ এপ্রিল
৩.	এম হোসেন আলী	ডেপুটি হাই কমিশনার, কোলকাতা : ১৮ এপ্রিল
৪.	রফিকুল ইসলাম	প্রথম সচিব, কোলকাতা : ১৮ এপ্রিল
৫.	আনওয়ারুল করিম চৌধুরী	তৃতীয় সচিব, কোলকাতা : ১৮ এপ্রিল
৬.	কাজী নজরুল ইসলাম	তৃতীয় সচিব, কোলকাতা : ১৮ এপ্রিল
৭.	মাকসুদ আলী	তৃতীয় সচিব, কোলকাতা : ১৮ এপ্রিল
৮.	সাইদুর রহমান	সুপারিনটেনডেন্ট, কোলকাতা : ১৮ এপ্রিল
৯.	এ.এইচ. মাহমুদ আলী	ভাইস কনসাল, নিউইয়র্ক : ২৬ এপ্রিল
১০.	হাবিবুর রহমান	শিক্ষা অফিসার, লন্ডন : ২৭ এপ্রিল
১১.	আবদুর রাজ্জাক খান	সহকারী শিক্ষা এটাশি, ওয়াশিংটন : ১৭ মে
১২.	আবুল মাল আবদুল মুহিত	অর্থনৈতিক কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন : ৩০ জুন
১৩.	মহিউদ্দিন আহমেদ	দ্বিতীয় সচিব লন্ডন : ১ আগস্ট
১৪.	এস আনওয়ারুল করিম	উপস্থায়ী প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক : ৪ আগস্ট
১৫.	এনায়েত করিম	মিনিস্টার, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
১৬.	শাহ এ.এম. শামসুল কিবরিয়া	কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
১৭.	আবু রুশদ মতিন উদ্দিন	শিক্ষা কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
১৮.	আতাউর রহমান চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব হিসাব, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
১৯.	সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	তৃতীয় সচিব, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
২০.	এ.এম. শরফুল আলম	সহকারী প্রশাসন এটাশি, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
২১.	শেখ রুস্তম আলী	সহকারী তথ্য এটাশি, ওয়াশিংটন : ৪ আগস্ট
২২.	লুৎফুল মতিন	তৃতীয় সচিব হিসাব, লন্ডন : ৮ আগস্ট
২৩.	আবদুর রউফ	সহকারী তথ্য এটাশি, লন্ডন : ৮ আগস্ট
২৪.	ফজলুল হক চৌধুরী	সহকারী শ্রম এটাশি, লন্ডন : ১১ আগস্ট
২৫.	মহিউদ্দিন আহমদ	অস্থায়ী ট্রেড কমিশনার, হংকং : ১৮ আগস্ট
২৬.	এ. এফ. এম. আবুল ফতেহ	রাষ্ট্রদূত, ইরাক : ২৯ আগস্ট
২৭.	খুররম খান পন্নী	রাষ্ট্রদূত, ফিলিপাইনস : ১৩ সেপ্টেম্বর
২৮.	মুহিউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার	তৃতীয় সচিব, লেগোস : ১৩ সেপ্টেম্বর
২৯.	এম. মুস্তাফিজুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব, কাঠমন্ডু : ৩ অক্টোবর
৩০.	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	কাউন্সেলর, দিল্লি : ৪ অক্টোবর
৩১.	এম. রেজাউল করিম	প্রথম সচিব, লণ্ডন : ৭ অক্টোবর
৩২.	আবদুল মোমিন	রাষ্ট্রদূত, বুয়েনস আইরেস : ১১ অক্টোবর

৩৩. ফজলুল করিম	তৃতীয় সচিব, কায়রো : ২৬ অক্টোবর
৩৪. এস.এম. মাসুদ	তথ্য সচিব, টোকিও : ২ নভেম্বর
৩৫. কিউ.এ.এম.এ. রহিম	তৃতীয় সচিব, টোকিও : ২ নভেম্বর
৩৬. ওয়ালিউর রহমান	দ্বিতীয় সচিব, জেনেভা : ২ নভেম্বর
৩৭. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম	তৃতীয় সচিব, টিউনিস : ১১ নভেম্বর
৩৮. আজিজুল হক চৌধুরী	তৃতীয় সচিব, লন্ডন : ৭ ডিসেম্বর

বৈদেশিক মিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিবিদ যাঁরা আনুগত্য পরিবর্তন করেন নি
(খ)

১. এম. ওসমান গনি	রাষ্ট্রদূত, তানজানিয়া
২. এরফান আহমদ	রাষ্ট্রদূত, তিউনিসিয়া
৩. খাজা মোহাম্মদ কায়সার	রাষ্ট্রদূত, চীন
৪. মীর্জা রশীদ আহমদ	রাষ্ট্রদূত, লেবানন
৫. এম আনওয়ারুল হক	রাষ্ট্রদূত, সেনেগাল
৬. এ.এফ. এম বশিরুল আলম	রাষ্ট্রদূত, পোল্যান্ড
৭. মোস্তাফা কামাল	রাষ্ট্রদূত, বুলগেরিয়া
৮. মনজুর আহমেদ চৌধুরী	কাউন্সেলর, ফ্রান্স
৯. এ.এইচ. আতাউল করিম	কাউন্সেলর, ইতালি
১০. এম. আরশাদুজ্জামান,	প্রেস কাউন্সেলর, টোকিও
১১. এম মহসিন	অর্থনৈতিক কাউন্সেলর, জেনেভা
১২. এ. এইচ. কায়সার মুরশেদ	কাউন্সেলর, অস্ট্রেলিয়া
১৩. ফারুক সোবহান	প্রথম সচিব, ফ্রান্স
১৪. মাহববুল হক	প্রথম সচিব, ইরান
১৫. খুরশিদ হামিদ	দ্বিতীয় সচিব, চীন
১৬. এ.এস.এম. খায়রুল আনাম	দ্বিতীয় সচিব, বেলজিয়াম
১৭. এ. কে. এম ফজলুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব, সুদান
১৮. আবদুল কাইয়ুম	দ্বিতীয় সচিব, মালয়েশিয়া
১৯. কাজী আনওয়ারুল মাসুদ	দ্বিতীয় সচিব, বার্মা
২০. মোস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ	দ্বিতীয় সচিব, ইন্দোনেশিয়া
২১. আবদুল মমিন চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব, তানজানিয়া
২২. এম. আনওয়ারুল হাশেম	দ্বিতীয় সচিব, যুগোশ্লাভিয়া
২৩. এ.কে.এম. ফারুক	দ্বিতীয় সচিব, থাইল্যান্ড
২৪. আহমদ তারেক করিম	দ্বিতীয় সচিব, ইরান
২৫. জিয়াউস শামস চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব, অস্ট্রেলিয়া
২৬. আমিনুল ইসলাম	দ্বিতীয় সচিব, মালয়েশিয়া
২৭. এস. এম রাশেদ আহমদ	দ্বিতীয় সচিব, যুগোশ্লাভিয়া
২৮. মোস্তাফা কামাল	দ্বিতীয় সচিব, জেনেভা
২৯. এস. এম. এ. গাজী	দ্বিতীয় সচিব, মরক্কো
৩০. হাবিবুল বাশার	দ্বিতীয় সচিব, বাহরাইন
৩১. মোহাম্মদ জামির	তৃতীয় সচিব, ইজিপ্ট
৩২. মাহবুব আলম	তৃতীয় সচিব, থাইল্যান্ড
৩৩. রেয়াজুল হাসান	তৃতীয় সচিব, সোভিয়েত রাশিয়া
৩৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন	তৃতীয় সচিব, জর্ডন
৩৫. সৈয়দ নুর হোসেন	তৃতীয় সচিব, চীন

৩৬. মোহাম্মদ আফসারুল কাদের	তৃতীয় সচিব, তুর্কি
৩৭. মোহাম্মদ হুমায়ুন কামাল	তৃতীয় সচিব, মালয়েশিয়া
৩৮. এস. খাজা শারজিল	তৃতীয় সচিব, ইজিপ্ট
৩৯. নাসির আহমদ	তৃতীয় সচিব, জাপান
৪০. আবদুল্লা আল আহসান	তৃতীয় সচিব, ইজিপ্ট
৪১. কাজী আফজালুর রহমান	তৃতীয় সচিব, ইরান
৪২. মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন	তৃতীয় সচিব, ফ্রান্স
৪৩. তোফায়েল করিম হায়দার	তৃতীয় সচিব, পশ্চিম জার্মানি
৪৪. মোস্তাফা জামাল	তৃতীয় সচিব, তুর্কি
৪৫. এস. এম. আফাজুদ্দিন	ভাইস কনসাল, বার্মা
৪৬. এ.এইচ.এম. নুরুদ্দিন	তৃতীয় সচিব, সউদি আরব
৪৭. মাহমুদ হাসান	তৃতীয় সচিব, আবুধাবি
৪৮. এম. মতিউর রহমান	তৃতীয় সচিব, মরিশাস

(গ)

ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনেক বাঙালি কূটনীতিবিদ আটক হয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালের ১১ জুলাই তাঁরা প্রায় সবাই বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। ঢাকায় নিযুক্ত দুইজন কূটনীতিবিদ ফারুক আহমদ চৌধুরী এবং হুমায়ুন কবির ১৬ ডিসেম্বরেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতরের ভিত্তি স্থাপন করেন। মোট ছয়জন বাঙালি কূটনীতিবিদ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন এবং তাঁদের সবাই বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত

১. এস. মোতাহার হোসেন	রাষ্ট্রদূত, জাপান (মরহুম)
২. হুমায়ুন খান পন্নী	রাষ্ট্রদূত, সিরিয়া
৩. কামালুদ্দিন আহমদ	রাষ্ট্রদূত, চেকোশ্লোভাকিয়া (মরহুম)
৪. এম সেলিমুজ্জামান	ডেপুটি হাই কমিশনার, যুক্তরাজ্য
৫. আজহারুল ইসলাম চৌধুরী	রাষ্ট্রদূত, রুমানিয়া
৬. আফজাল কাদের	পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মন্তব্য : (খ) তালিকা কূটনৈতিক সার্ভিসের কর্মকর্তা ছাড়া আরো কিছু কর্মকর্তার ফর্দ সম্পূর্ণ নয়।

পরিশিষ্ট-১৩
ভারতীয় যুদ্ধ কৌশল ও সেনাপতিবর্গ

পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। তাঁর সদর দফতর ছিল ফোর্ট উইলিয়াম। চিফ অব স্টাফ ছিলেন মেজর জেনারেল জে.এফ. আর. জেকব। গোটা রণাঙ্গনকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর	:	রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া-রাজশাহী ছিল এই সেক্টরের অধীন।
কৌশল ছিল	:	১. ফুলবাড়ি, পীরগঞ্জ, গাইবান্ধা হয়ে ফুলছড়ি ঘাটে মেঘনা পৌঁছানো হিলিতে প্রতিরোধ হলে সেখানে যুদ্ধ বহাল রেখে এগিয়ে গিয়ে মেঘনা পৌছা। ২. রংপুর, দিনাজপুরে আক্রমণ বহাল রেখে দ্রুতগতিতে বগুড়া দখল। শক্ত ঘাঁটি দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর ও পার্বতীপুরে চাপ প্রয়োগ
অধিনায়ক	:	লে.জে.এম.এল থাপান।
অধীনস্থ	:	মে. জে. লচমন সিং, মে.জে. পিসি রেড্ডী
পশ্চিম সেক্টর	:	যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, খুলনা ছিল এই সেক্টরে।
কৌশল ছিল	:	১. শিকারপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা হয়ে ফরিদপুর দখল ও গোয়ালন্দে পদ্মা অতিক্রম ২. বয়রা যশোর অতিক্রম করে খুলনা দখল এবং মাগুরায় চাপ প্রদান ৩. কুষ্টিয়া ও হার্ডিঞ্জ সেতু দখল ৪. নৌবহরের সাহায্যে পদ্মা পারাপার
অধিনায়ক	:	লেফট্যানেন্ট জেনারেল টিএন রাইনা
অধীনস্থ	:	মে. জে. দলবীর সিং, মে.জে. এম.এস. বেরার
দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর	:	মৌলভীবাজার, সিলেট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা চাঁদপুর, ভৈরববাজার, দাউদকান্দি, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ছিল এই সেক্টরে কৌশল ১. মৌলভীবাজার হয়ে সিলেট দখল বা ঘেরাও ২. আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরববাজার হয়ে মেঘনা অতিক্রম ৩. কুমিল্লা,-দাউদকান্দি এবং কুমিল্লা-চাঁদপুর হয়ে মেঘনা অতিক্রম ৪. নোয়াখালি হয়ে চট্টগ্রাম দখল
অধিনায়ক	:	লেফটেন্যান্ট জেনারেল সগৎ সিং
অধীনস্থ	:	মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাও, মে.জে. আর.ডি হিরা, মে.জে.বি.এফ গনজালভেস

উত্তর-পূর্ব সেক্টর	:	জামালপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নরসিংদি, সাভার, টঙ্গী এলাকা হয়ে ঢাকা ছিল এর লক্ষ্য।
কৌশল	:	১. জামালপুর দখল করে টাঙ্গাইলের পথে ২. ছত্রীসেনাদের টাঙ্গাইল, মধুপুর ও নরসিংদিতে অবতরণ ৩. ময়মনসিংহ দখল করে ঢাকার পথে
অধিনায়ক	:	মেজর জেনারেল গুরবকশ সিং জিল জামালপুরে তিনি আহত হলে মে.জে. জিসি নাগরা দায়িত্ব নেন

উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে ঢাকায় আক্রমণ ছিল মূল লক্ষ্য। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ঢাকায় চাপ প্রয়োগই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বিমান বাহিনীর প্রধান কাজ ছিল ঢাকায় পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পরাভূত করা।

কক্সবাজারে সমুদ্রপথে দখলের পরিকল্পনা ছিল।

মফস্বলের শহর পাশ কাটিয়ে ঢাকার পতন হয় চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রধান কৌশল। এই বিবরণ দুইটি বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সিদ্দিক সালেকের *Witness to Surrender*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১২২-২৩, ১৩৯-১৮০।

লে.জে. জেএফআর জেকব : *Surrender of Dacca*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬৬-৭৭, ১০৫-১২৮।

পরিশিষ্ট-১৪

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER SIGNED AT DACCA AT 1631 HOURS (IST)

ON 16 DEC 1971

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. The forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi Lt Gen.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অজস্র গ্রন্থ রচিত হলেও বাঙালির মুক্তিসাধনার পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের অভাব দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। বাঙালির জাতিসত্তার বিকাশ এবং স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্পর্কে আলোকসম্পাতী গ্রন্থরচনার জন্য প্রয়োজন পরিব্যাপ্ত জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ মেধা ও নিবিড় শ্রমের সমন্বয়। এমনি দুরূহ দায়িত্ব নির্বাহের দক্ষতা-সম্পন্ন লেখক বিশেষ নেই। আর এই কাজে আবুল মাল আবদুল মুহিতের যোগ্যতা নিয়ে দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই। তিনি সরকারি উচ্চপদে সমাসীন থেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্যমূলক কর্মকাণ্ড, বাঙালির জায়মান জাতীয় আন্দোলনের রূপকারদের সঙ্গে যোগসূত্র দ্বারা পরিপুষ্ট করেছেন আপন উপলব্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দিয়ে পালন করেছেন তাৎপর্যময় ভূমিকা। সর্বোপরি মার্কিন সিনেটসভা, সংবাদমাধ্যম, দাতাগোষ্ঠী ও সারস্বত মহলের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঘনিষ্ঠ অবলোকনের সুযোগ পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের। আরামকেদারার পাণ্ডিত্য অথবা নিছক গ্রন্থবদ্ধ গবেষণা নয়, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির সঙ্গে পঠন-পাঠন, তথ্য সংগ্রহ, উপাত্ত আহরণের শ্রমসাধনা যোগ করে এক অনন্য গ্রন্থ তাই আমাদের উপহার দিলেন এ.এম.এ. মুহিত। প্রশস্ত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছেন বাঙালির বিকাশের দিকে, হাজার বছরের সৃষ্টিসাধনা ইতিহাসের চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে বিশ শতকের মধ্যপাদে কোন্ যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হাজির করে লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তী ঘটনাধারা। সর্বোপরি একাত্তরের মহত্তম সংগ্রামকে বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকপাত দ্বারা উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তিনি। বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যাকারী এই অনন্য গ্রন্থ যেমন গবেষকদের জন্য বিবেচিত হবে অপরিহার্যরূপে, তেমনি নবীন প্রজন্মের পাঠকদের যোগাবে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক এক উপলব্ধি।

ISBN 984-465-219-7